সূচী।

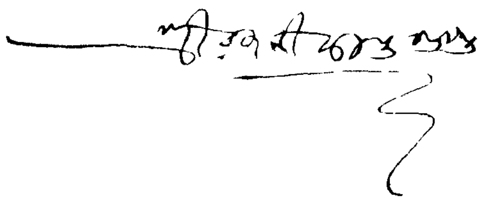
তৃতীয় বর্ষের প্রদীপের লেখকগণের নাম।

(বর্ণমালানুসারে)

১। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল
২। ,, অক্ষয়কুমার বড়াল
৩। ,, অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত বি, এ (কেম্বিজ)
৪। ,, অবিনাশচন্দ্র দাস এম এ বি এল
৫। ,, অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৬। ,, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বি, এ
৭। ,, কর্ণেল মহিমচন্দ্র দেব বর্ম্মা
৮। ,, কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত
৯। শ্রীযুক্তা কৃষ্ণভাবিনী দাস
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ
,, গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়
১। ,, চন্দ্রশেখর কর বি, এ
১৩। ,, জলধর সেন
১৪। ,, জগদানন্দ রায়
১৫। ,, জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি, এল
১৬। ,, [illegible] াধ্যায়
১৭। ,, দীনে[illegible]ন বি, এ
১৮। ,, দীনেন্দ্র[illegible] রায়
১৯। ,, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এম্ এ
,, নবকৃষ্ণ ঘোষ বি, এ
,, নগেন্দ্রনাথ সোম
,, নগেন্দ্রনাথ বসু
,, নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ এম্ এ
,, প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
২৪। ,, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী
২৫। ,, প্রফুল্লচন্দ্র সোম
২৬। ,, প্রিয়নাথ সেন
২৭ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন
২৮। ,, ভবানীচরণ ঘোষ
২৯। ,, ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী এম্ এ বি এল
৩০। ,, মন্মথনাথ সেন বি, এ
৩১। ,, মন্মথনাথ দে বি, এল
৩২। ,, মনোরঞ্জন গুহ
৩৩। ,, মুরলীধর রায়চৌধুরী এম এ
৩৪। ,, যোগেশচন্দ্র রায় এম্, এ
৩৫। ,, রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
৩৬। ,, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম, এ
৩৭। ,, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ
৩৮। ,, বিজয়কুমার সেন এম্ এ
৩৯। ,, বিপিনচন্দ্র পাল
৪০। শ্রীযুক্তা বিনয়কুমারী বসু
৪১। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর গোস্বামী
৪২। ,, শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
৪৩। ,, সখারাম গণেশ দেউস্কর
৪৪। ,, সীতানাথ দেব
৪৫। ,, সুন্দরীমোহন দাস এম্ বি
৪৬। ,, সুরেশচন্দ্র সরকার এম্ এ
৪৭। ,, হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৪৮। ,, হরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত
৪৯। ,, হরিহর শেঠ
৫০। ,, হারেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ
৫১। ,, ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত







KUNTALINE PRESS



চতুর্থ ভাগ। } পৌষ, ১৩০৭ । ১ম সংখ্যা।

নববর্ষে

ভগবৎ কৃপায় নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া 'প্রদীপ' আজ চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিল। এত অল্প সময়ের মধ্যে যে 'প্রদীপ' দেশের গণ্যমান্য ও সাহিত্যানুরাগী লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইবে, তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি নাই। আমাদের সহৃদয় গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ যে 'প্রদীপ'কে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন, আমরা তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি। দৈবাৎ কোন মাসের 'প্রদীপ' প্রকাশে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইলে তাঁহারা যৎপরোনাস্তি ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কেহ পত্র লিখিয়া, কেহ বা কার্য্যালয়ে আসিয়া বিলম্বের কারণ অনুসন্ধান করেন। তাঁহাদের এই আগ্রহ ও অনুগ্রহ 'প্রদীপ' সম্পাদন কার্য্যে আমাদিগকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছে। ভাবিয়াছি এ নববর্ষে 'প্রদীপ'কে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তাঁহাদের এ আদরের কথঞ্চিৎ প্রতিদান করিব।

আর 'প্রদীপে'র লেখকগণ, যাঁহারা হৃদয়ের অজস্র অনুরাগ দিয়া 'প্রদীপ'কে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়াছেন, তাঁহাদের ঋণ ত অপরিশোধ্য। উদ্বেলিত হৃদয়ের আবেগে আজ বর্ষারম্ভে তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

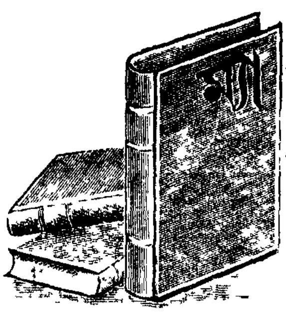
দুইটী কৈফিয়ৎ দিবার আছে। অনেকেই 'প্রদীপে' সম্পাদকের নাম ও মাসিক সাহিত্য সমালোচনা প্রকাশিত না হইবার কারণ জানিতে চাহিয়াছেন। বলি, পাঠকেরা প্রবন্ধই পাঠ করিবেন, সম্পাদকের নাম ত পাঠ করিবেন না? আর সম্পাদকের যোগ্যতার বিচার বিষয়ে তাঁহার নাম অপেক্ষা কার্য্যই অধিক উপযোগী নয় কি? অধিকন্তু সম্পাদকের নাম প্রকাশ না করিলে যে, কোন অঙ্গ হানি হয়, তাহা ত বোধ হয় না।

দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্য বিষয়ে বক্তব্য এই যে আমরা প্রদীপে কখনও মাসিক সাহিত্যের সমালোচনা করি নাই, করিবার প্রবৃত্তিও রাখি না।

মাসিক 'সম্মার্জ্জনা'র ভয়ে বাঙ্গালা সাহিত্য ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িয়াছে। যত শীঘ্র সম্পাদকের 'সম্মার্জ্জন বৃত্তি' ঘুচিয়া যায়, বাঙ্গালা সাহিত্যের ততই মঙ্গল। ভগবান করুন, সাহিত্যের পরিচর্য্যাই 'প্রদীপে'র একমাত্র ব্রত হউক।

গুরুজনের আশীর্ব্বাদ, বন্ধুবান্ধবের উৎসাহ, গ্রাহকগণের সহানুভূতি ও লেখকদিগের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া নবোদ্যমে কার্য্য আরম্ভ করিলাম। সর্ব্বসিদ্ধিদাতা আমাদের সহায় হউন।

পরলোকগত অধ্যাপক ম্যাক্স মূলর



ম্যাক্স মূলরের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা সম্বন্ধে নানালোকের নানারূপ ধারণা আছে। কেহ বা তাঁহাকে অসাধারণ পণ্ডিত ও অতি প্রতিভাশালী লোক বলিয়া মনে করেন, আর কেহ বা তাঁহার পাণ্ডিত্যে আদৌ বিশ্বাস করেন না, তাঁহার প্রতিভার প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও শ্রদ্ধাবান্ নহেন। এই উভয়বিধ ধারণাই নিতান্ত অমূলক। ভারতীয় শাস্ত্র সাহিত্যের চর্চ্চা ও প্রাচীন প্রাচ্য সাধনার আলোচনায় কোনও কোনও জর্ম্মাণ পণ্ডিত ম্যাক্স মূলরের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ছিলেন, সন্দেহ নাই। আপনাদিগের প্রতিভা বলে যে সকল মহাপুরুষ বর্ত্তমান যুগের সাধনা ও সভ্যতায় এক অভিনব শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন, ম্যাক্স মূলর সেই যুগপ্রবর্ত্তকদিগের সমকক্ষ ছিলেন না, ইহাও অতি সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে কেবলমাত্র পল্লবগ্রাহী ছিলেন; জর্ম্মাণ পণ্ডিতগণ বহু শ্রম ও অশেষ ধৈর্য্য সহকারে যে সকল তত্ত্ব উদ্ধার করিয়াছেন, ম্যাক্স মূলর আপনার কল্পনা বলে, প্রাঞ্জল ভাষায় কেবল তাহাই জনসমাজে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, নতুবা কোনও বিষয়েই তাঁহার গভীর দৃষ্টি বা মৌলিকতা ছিল না; কিম্বা তাঁহার পরিচর্য্যা দ্বারা বর্ত্তমান শতাব্দীর সর্ব্বতোমুখী সাধনা কিছুই পরিপুষ্টি লাভ করে নাই, এরূপ মনে করাও নিতান্তই অসঙ্গত। সংস্কৃত সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, ধর্ম্ম ও দেব-বিজ্ঞানের আলোচনাতেই ম্যাক্স মূলর মুখ্যভাবে আপনার জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন; এবং এই চতুর্ব্বিধ প্রসঙ্গেই স্বল্প বিস্তর তাঁহার পাণ্ডিত্য ও মৌলিকতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

য়ুরোপের মধ্যযুগ ও নবযুগ।

গ্রীক ও রোমক সাধনা হইতেই য়ুরোপীয় সভ্যতার উৎপত্তি। ইহুদীয় ও গথিক সাধনা কিয়ৎ পরিমাণে ইহার অঙ্গপুষ্টি বিধান করিয়াছে সত্য, কিন্তু গ্রীস ও রোমেরই উত্তরাধিকারী হইয়া, বর্ত্তমান য়ুরোপীয় জাতি সমূহ সভ্য সমাজে প্রভূত আধিপত্য ভোগ করিতেছে। কিন্তু মধ্যযুগে গ্রীস ও রোমের প্রভাব বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুখ সম্পদ, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য, গ্রীক্ সাধনার মূলমন্ত্র ছিল। মানবের মহত্ত্ব, মানবের অধিকার, মানবীয় শক্তির স্ফূর্ত্তি সাধন, রোমক সভ্যতার আদর্শ ছিল। কিন্তু ক্রমে গ্রীসের অধঃপতনে ও রোমের অহিতাচারে, মানবীয় শক্তি, সাধনা ও সম্পদৈশ্বর্য্যের প্রতি লোকের প্রাণে গভীর অনাস্থার উদয় হইল। ইহজীবনের শ্রেয়ঃ ও সৌন্দর্য্যের উপরেই প্রাচীন য়ুরোপীয় সভ্যতার আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু গ্রীক্ সাধনার বিলোপে, রোমক সাম্রাজ্যের বিনাশে, সভ্যতার লীলাভূমিতে দুর্দ্ধর্ষ বর্ব্বর-শক্তির অভ্যুদয়ে, সেই প্রাচীন আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা সমূলে উৎপাটিত হইয়া গেল, এবং ইহা লোকের আশা ভরসার বিনাশে সংসার দুঃখময় ও জীবন যন্ত্রণার আধার হইয়া উঠিল। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের প্রাক্কাল হইতে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, সপ্তশতাধিক সহস্র বৎসর কাল য়ুরোপ এই গভীর দুঃখভাবে নিষ্পেষিত হয়। জীবনের এই দুর্ব্বিষহ দুঃখভার অতিক্রম করিবার চেষ্টা হইতেই একদিকে ষ্টোইক্‌গণের, অপরদিকে ইপিকিউরিয়ানগণের, অন্যদিকে আলেক্‌জাণ্ড্রিয়ার তত্ত্বজ্ঞানিগণের, এবং সর্ব্বশেষে খৃষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়। ষ্টোইক্‌গণ মর্কট বৈরাগ্য ও নির্ম্মম আত্মনিগ্রহের দ্বারা সুখ দুঃখের অতীত হইবার পন্থা প্রদর্শন করেন। ইপিকিউরিয়ানগণ, আমাদিগের দেশের লোকায়তদিগের ন্যায়, ক্ষণিক ভোগ বিলাসে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া, দুঃখময় জীবন হইতে যথাসাধ্য সুখ আহরণের বিধান প্রচার করেন। তত্ত্বজ্ঞানিগণ,



অধ্যাপক ম্যাক্স মূলর।

পারমার্থিক তত্ত্ব আযত্ত কবিয়া, নিগূঢ় অধ্যাত্মযোগ সাধনে নিত্যানন্দলাভের উপায় নির্দ্দেশ করিলেন। আর খৃষ্টীযানগণ, আগতপ্রায স্বর্গরাজ্যের সুসমাচাব প্রচাব কবিযা, অনুতাপ ও সংযমের দ্বাবা, সেই স্বর্গরাজ্য লাভে প্রযাসী হইতে জনমণ্ডলীকে প্রণোদিত করিতে লাগিলেন। অবান্তর মতামতের অশেষ বিভিন্নতা সত্ত্বেও, মানবজীবন যে দুঃখ ও পাপের বীজভূত; সুখ, স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য ও সম্পদ আহরণের চেষ্টা যে নিষ্ফল; মানবের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির স্বাভাবিক চরিতার্থতা দ্বারা যে কোন প্রকারেই পরম পুরুষার্থ সিদ্ধি হইতে পারে না, পরোক্ষ বা অপরোক্ষভাবে, ইঁহারা সকলেই এই সর্ব্বনাশী মত প্রচার করিলেন।

মানবের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির প্রতি এইরূপ অনাস্থা ও অশ্রদ্ধার উদয়ে জ্ঞান বিজ্ঞানাদির স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি অসম্ভব। মানব-প্রকৃতির প্রতি এই অশ্রদ্ধা হইতে যে বাহ্য প্রকৃতির ক্রোড়ে মানব লালিত পালিত, বর্দ্ধিত ও বিকশিত হয, তাহারও প্রতি অশ্রদ্ধার উদয অবশ্যম্ভাবী। এই অবস্থায মানবের চিন্তা ও ভাবনা স্বভাবতঃই ইহলোককে উপেক্ষা করিযা পরলোকাভিমুখে ধাবিত হয; এবং এইরূপে, দৃশ্যজগতকে একেবারে অগ্রাহ্য করিযা কেবল অদৃশ্যে চিত্তসমাধান করিলে, জ্ঞানবিজ্ঞানের বিকৃতি অনিবার্য্য হইযা দাঁড়ায। বিজ্ঞান চিরদিনই প্রমাণের মুখাপেক্ষী। কিন্তু মানব মন যখন অদৃশ্যের দ্বারা সম্পূর্ণ অভিভূত হইযা পড়ে, তখন প্রমাণের রাজ্যে, অনুমান প্রত্যক্ষ অপেক্ষা প্রবল হইযা উঠে, কল্পনা সত্যের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসে। যুরোপীয সমাজে, মধ্যযুগের প্রকৃতি-বিজ্ঞান, এই কারণে উদ্দাম কল্পনার ক্রীড়াপুত্তলি হইযাছিল। এই অদৃশ্যের ও অনন্তের দ্বারা অভিভূত হইয়াই হিন্দুগণ কদাপি জড়বিজ্ঞানাদির যথাযথ আলোচনায় নিযুক্ত হইতে পারেন নাই। প্রত্যক্ষের উপরে এইরূপে কল্পনা অযথা আধিপত্য বিস্তার করিলে, বিজ্ঞানাদির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পাদিও বিকৃতি প্রাপ্ত হয। প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণেই চিত্রাদির শ্রেষ্ঠতা সাধিত হয। বাহ্য প্রকৃতি কেবলই যে জড় তাহা নহে, তাহার মধ্যেও চৈতন্য লুক্কায়িত। দৃশ্য কেবলই দৃশ্য নহে, তাহারই অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া অদৃশ্যও বাস করিতেছে। দৃশ্যকে অগ্রাহ্য করিযা নহে, কিন্তু দৃশ্যের মধ্যেই অদৃশ্যকে ফুটাইয়া তোলা রঞ্জিনীবৃত্তির লক্ষ্য ও শিল্পের আদর্শ। কিন্তু মধ্যযুগের শিল্প চাক্ষুষ সৌন্দর্য্যকে অগ্রাহ্য করিয়া কল্পিত, অদৃশ্য সৌন্দর্য্যের সাধনায় নিযুক্ত হইয়া, এই উচ্চ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল।

শিল্পবিজ্ঞানাদির বিকৃতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মেরও অধোগতি অনিবার্য্য। মানবের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির প্রতি অযথা অনাস্থার উদয়ে ধর্ম্ম আপনার স্বাভাবিক, ভগবন্নির্দ্দিষ্ট ভিত্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া অতিপ্রাকৃত ভূমি আশ্রয় করিতে বাধ্য হয়। তখন অতিপ্রাকৃত শাস্ত্র, অতিপ্রাকৃত অবতার ও গুরু ব্যতীত ধর্ম্মের আর অন্য অবলম্বন থাকে না। কাজেই ধর্ম্ম তখন একদিকে আত্যন্তিক গুরু-আনুগত্যে, ও অপর দিকে বাহ্য ক্রিয়াকাণ্ডের অযথা আড়ম্বরে পরিণত হয়। জ্ঞান ও ধর্ম্মের অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে জনসমাজ সর্ব্ব বিষয়েই অধোগতি প্রাপ্ত হয়। তখন যজমানের উপর পুরোহিতের প্রভুত্ব, প্রজার উপরে রাজার প্রভুত্ব; প্রকৃতিপুঞ্জের উপরে অভিজাতবর্গের প্রভুত্ব; এইরূপ শত দাসত্ব নিগড়ে নিবদ্ধ হইয়া, জনসমাজের মনুষ্যত্ব একেবারে নিষ্পেষিত হইয়া যায়। এইরূপে মধ্যযুগে য়ুরোপীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম সমাজনীতি ও রাজনীতি সকলই অত্যধিক অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে, এই ঘোর দুর্গতির দিনে গ্রীক ও রোমক সাহিত্য ও সাধনার পুনরালোচনায় য়ুরোপীয় সমাজে এক নবযুগের অভ্যুদয় হয়। প্রকৃতি চর্চ্চা, প্রকৃতির অনুশীলন ও অনুকরণ, গ্রীক সাধনার প্রধান লক্ষণ ছিল। য়ুরোপেও তখন হইতে পুনরায় প্রকৃতি চর্চ্চার সূচনা হইল। এই নূতন সাধনার সাহায্যে, মধ্য যুগের কল্পনা ও অনুমানের আধিপত্য হইতে বিমুক্ত হইয়া, য়ুরোপীয় বিজ্ঞান পরীক্ষা ও প্রত্যক্ষের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। মধ্য যুগের অচাক্ষুষ কল্পিতরূপের সাধনা বর্জ্জন করিয়া, শিল্প চাক্ষুষ রূপের অনুশীলনে নিযুক্ত হইল। ক্রমে ধর্ম্মের উপরেও অতিপ্রাকৃত শাস্ত্রবাদীর পূর্ব্ব প্রভুত্ব হ্রাস হইতে লাগিল। প্রাচীন-নিগড়-নির্ম্মুক্ত হইয়া মানবের বিচার ও চিন্তাশক্তি এইরূপে নবজীবনের নবোৎসাহ ও নবীন উদ্যম সহকারে বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল। মধ্যযুগে মানবপ্রকৃতি ও মানবীয় প্রবৃত্তি সকলের প্রতি লোকের যে অনাস্থা জন্মিয়াছিল, ক্রমে তাহা বিদূরিত হইয়া, মানবীয় শক্তি, সাধনা, সম্পদ্ ও সৌন্দর্য্যের প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হইল। পূর্ব্বে যে মনুষ্যত্বের নিষ্পেষণে পুরুষার্থ সিদ্ধি হয় বলিয়া বিবেচিত হইত, এখন সেই মনুষ্যত্বের স্ফুরণ ও বিকাশই পরম পুরুষার্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল, এবং মানবের আশা ও আকাঙ্ক্ষা স্বল্পবিস্তর পরিমাণে পরলোককে পরিহার করিয়া, ইহলোকেই আসিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে আরম্ভ করিল।

বর্ত্তমান যুগের য়ুরোপীয় সভ্যতা।

গত পাঁচশত বৎসরকাল, এইরূপে প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমক সাধনার আদর্শই, দেশকাল অনুযায়ী কিঞ্চিদধিক পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া, য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রধান নিয়ন্তা হইয়া রহিয়াছে। এই জন্য গ্রীক ও রোমক সাধনার ভাল মন্দ উভয়ই বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার অঙ্গে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যযুগে, মানবমনে পরলোকের প্রভাব অত্যধিক প্রবল ছিল, তাহাতে মানব জীবন ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং সেই আদর্শের বিরুদ্ধে ইহজীবনের শ্রেয়ঃ ও সৌন্দর্য্যের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করা নিতান্তই প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। কিন্তু এই প্রতিবাদ করিতে গিয়া, বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতা, পরলোক সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন হইয়া পড়িতেছে। অদৃশ্যে নিরন্তর দৃষ্টি সংলগ্ন করিয়া, মধ্যযুগের জীবনের আদর্শ, দৃশ্য সম্বন্ধে অন্ধপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল; সুতরাং অদৃশ্যের এই অযথা আধিপত্য সংকুচিত করা নিতান্তই আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু য়ুরোপের বর্ত্তমান সাধনা, অদৃশ্যের প্রতিকূলে দৃশ্যের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া, আপনি আবার অন্যদিকে, অদৃশ্যের প্রতি অন্ধ হইয়া পড়িতেছে। নিবৃত্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া, মধ্যযুগের ধর্ম্মনীতি, প্রবৃত্তিকে একেবারে নিষ্পেষিত করিতেছিল; মানবীয় প্রবৃত্তির উপরে এই অযথা উৎপীড়ন নিবারণ করা নিতান্তই সঙ্গত হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু বর্ত্তমান য়ুরোপীয় ধর্ম্ম মধ্যযুগের সন্ন্যাস ধর্ম্মের প্রতিবাদ করিতে গিয়া, জীবনের উচ্চতর লক্ষ্য সাধনে নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি উভয়েরই যে সমান সমাবেশ প্রয়োজন, ইহা ভুলিয়া যাইতেছে, এবং কার্য্যতঃ কেবল প্রবৃত্তি সাধনেই নিযুক্ত হইতেছে। বিনা আপত্তিতে ও বিনা বিচারে সর্ব্ব প্রকারের প্রতিষ্ঠিত প্রভুত্বের ঐকান্তিক আনুগত্য স্বীকার করা, মধ্যযুগে সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ ছিল। মানবের দেহমনের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি সাধনের জন্য, এই অস্বাভাবিক আনুগত্যের প্রতিকূলে সংগ্রাম ঘোষণা নিতা-

ন্তুত কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সমাজনীতি ও রাজনীতি, পূর্ব্বযুগের অযথা আনুগত্যের প্রতিবাদ করিতে গিয়া, অন্যদিকে উচ্ছৃঙ্খল আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রভাব সর্ব্বত্রই বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে। এইরূপে য়ুরোপের বর্ত্তমান সভ্যতা ও সাধনা, প্রতিক্রিয়া বেগে মধ্যযুগের অতিপ্রাকৃত ভাব ও আদর্শের প্রতিকূলে ধাবিত হইয়া, ক্রমেই সর্ব্ব বিষয়ে আত্যন্তিক প্রাকৃত হইয়া উঠিতেছে। অতি প্রাকৃতের ভাবে এক সময়ে যেমন য়ুরোপীয় জীবন জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল, বর্ত্তমানে আত্যন্তিক প্রাকৃত ভাবের তাড়নায় তাহা আবার অন্যদিকে বিষম বিকৃতি প্রাপ্ত হইতেছে। এই আত্যন্তিক প্রাকৃত ভাব যথাযথ সংযত হইয়া, প্রাকৃত ও অতি প্রাকৃতের দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তি না হইলে, বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার বিনাশের আশঙ্কা আশু উপস্থিত হইবে।

বর্ত্তমান যুগের প্রধান সমস্যা।

স্বাধীনতা ও আনুগত্য, শাস্ত্র ও স্বানুভূতি, সংসার ও ধর্ম্ম, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, দৃশ্য ও অদৃশ্য, ইহলোক ও পরলোক এই সকলের মধ্যে প্রাচীন বিবাদ ভঞ্জন করিয়া, একটা উন্নততর ও প্রশস্ততর ভূমিতে ইহাদের সন্ধি ও সম্মিলন সংস্থাপন করাই বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রধান সমস্যা। প্রাচীন গ্রীক সাধনা ও রোমক্ রাজনীতি, কিম্বা প্রচলিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মের দ্বারা এ সন্ধি ও সম্মিলন সংগঠিত ও সংস্থাপিত হইবার কোনও আশাই নাই। গ্রীক ও রোমক সাধনায় অতি-প্রাকৃতের ধারণা নিতান্ত ক্ষীণ। প্রচলিত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে অতি-প্রাকৃতের প্রভাব এখনও অতি প্রবল। কিন্তু এই সকল সাধনার কোনটীতেই প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃতের যথাযথ সমাবেশ ও সম্মিলনের উপযুক্ত প্রয়াস কখনও হয় নাই। এই সমাবেশ ও সম্মিলনের চেষ্টা কেবল মাত্র উচ্চতর হিন্দু-সাধনাতেই দৃষ্ট হয়। ধর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মসাধনকে জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড এই দুই প্রশস্ত বিভাগে বিভক্ত করিয়া, জ্ঞানকাণ্ডে, স্বাধীনতা ও স্বানুভূতি, কর্ম্মকাণ্ডে শাস্ত্র ও আনুগত্যের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা দ্বারা, উচ্চতর হিন্দু সাধনা বহুকাল পূর্ব্বে স্বাধীনতা ও আনুগত্যের, শাস্ত্রও স্বানুভূতির বিরোধ ভঞ্জনের চেষ্টা করিয়াছে। কাম্য কর্ম্ম, নিবৃত্ত কর্ম্ম ও নিষ্কাম কর্ম্ম, কর্ম্মের এই শ্রেণী ও ক্রম বিভাগের দ্বারা হিন্দুসাধনা সংসার ও ধর্ম্ম, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির মধ্যে একটা আশ্চর্য্য সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছে। স্বরূপ ও তটস্থ এই দুই লক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মসত্তাকে আয়ত্ত করিবার প্রয়াস পাইয়া, এবং তাঁহার বিরাট মূর্ত্তি প্রকাশ ও জীবের জীবন্মুক্ত অবস্থার মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া হিন্দুসাধনা, দৃশ্য ও অদৃশ্য এবং ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে চিরসন্ধি ও চির সম্মিলন সংস্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। সর্ব্বোপরি উচ্চতর হিন্দু সাধনা, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চ রসের মধ্য দিয়া ভগবানের ভজনার পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া, মানবীয় কর্ত্তব্য, স্নেহ ও প্রেমের সম্বন্ধ সকলকে সংসারের পঙ্কিল ভূমি হইতে তুলিয়া লইয়া ভগবল্লীলার পবিত্র রঙ্গভূমিতে প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এইরূপে বৈষ্ণবসাধনা, গ্রীক্‌দিগের সুখ সম্পদ, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য সাধনার প্রাচীন আদর্শকে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের শৃঙ্খল হইতে বিমুক্ত করিয়া, অতীন্দ্রিয়ের সঙ্গে তাহার সংযোগ সাধনের চেষ্টা করিয়াছে। এই বৈষ্ণব আদর্শ সম্যক রূপে আয়ত্ত হইলে বর্ত্তমান য়ুরোপীয় ও মার্কিণ সমাজে সাধারণতন্ত্রের প্রভাব বৃদ্ধিতে যে সকল জটিল সমস্যার উদয় হইয়াছে, তাহার মীমাংসা সহজ ও সম্ভব হইবে। গ্রীক্, রোমক ও খৃষ্টীয় সাধনায় বর্ত্তমানের এই সকল জটিল সমস্যার মীমাংসা করিবার একরূপ চেষ্টা কখনও হয় নাই। য়ুরোপীয় সভ্যতার শক্তি ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য, গ্রীক, রোমক ও খৃষ্টীয় সাধনা যাহা করিতে পারে, তাহা সকলই করিয়াছে। জ্ঞান ধর্ম্মের এই সকল প্রাচীন খনি একেবারে নিঃশেষিত হইয়াছে। আর তাহা হইতে অভিনব রত্ন উদ্ধারের সম্ভাবনা আদৌ নাই। এই কারণে বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে য়ুরোপে জ্ঞানবিজ্ঞানের অসাধারণ আলোচনা সত্ত্বেও কোনও অলোক-সামান্য মৌলিক প্রতিভার প্রকাশ হয় নাই। এই নব যুগের নূতন সমস্যা সকলের মীমাংসার জন্য, নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা, নূতন সাধনার অনুসরণ এবং নূতন শক্তির সঞ্চার করা প্রয়োজন। একমাত্র ভারতের প্রাচীন সাধনাই বোধ হয় বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতাতে এই অভিনব শক্তি সঞ্চার করিতে সক্ষম। বোধ হয়, ভারতের নিকট হইতেই য়ুরোপকে এই মহান্ আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে; ভারতের পদতলে বসিয়াই বোধ হয়, তাহাকে এই নূতন সাধনায় দীক্ষিত হইতে হইবে। য়ুরোপে বর্ত্তমান চিন্তার গতি এই দিকেই ইঙ্গিত করিতেছে।

সংস্কৃত ভাষার আবিষ্কার ও সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা।

সংস্কৃত ভাষার আবিষ্কার ও প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র ও সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা ইতিমধ্যেই য়ুরোপীয় চিন্তা ও সাধনায় এক নূতন শক্তির সঞ্চার হইতে আরম্ভ করিয়াছে। তুলনায় সমালোচনা প্রণালী (Comparative method) বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা ও সাধনার অতি প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইযাছে। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া ভাষাতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, জ্ঞানের সকল বিভাগই অভূতপূর্ব্ব পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত ভাষার আবিষ্কারের ফল স্বরূপই সর্ব্ব প্রথমে এই অভিনব বিচার প্রণালী আবিষ্কৃত হয়। য়ুরোপীয় সভ্যতার বহির্ভূত যে কোনও উচ্চ অঙ্গের সভ্যতা আছে বা থাকিতে পারে; গ্রীক্‌ ও রোমক সাধনার অতিরিক্ত যে কোনও উচ্চ অঙ্গের সাধনা সম্ভব; খৃষ্টীয় শাস্ত্র ও সাধনের অতীত যে কোনও সত্য শাস্ত্র বা আধ্যাত্মিক সাধন কুত্রাপি ছিল বা থাকিতে পারে, এক সময়ে সভ্যতাভিমানী য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ ইহা আদৌ বিশ্বাস করিতেন না। এখনও এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা এ সকলে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু ভগবৎ কৃপায় ক্রমে য়ুরোপীয় জ্ঞানিমণ্ডলীর দৃষ্টিসীমা সম্প্রসারিত হইয়া সেই প্রাচীন ভ্রান্তি অপনোদন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহা প্রধানতঃ হিন্দু-শাস্ত্র সাহিত্যাদির আলোচনারই ফল। এক দিন হিন্দু ও বৌদ্ধশাস্ত্রে খৃষ্টীয় নীতির উপদেশ দর্শনে খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ ইহাকে শয়তানের কৌশল বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ ইংলণ্ডে, আমেরিকায়, এবং ভারতবর্ষে অনেক সুশিক্ষিত খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মযাজক ও ধর্ম্মপ্রচারক হিন্দুর শাস্ত্র সাহিত্যাদিতে যে খৃষ্টীয়ানের শিক্ষণীয় বিষয় অনেক আছে, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন। এমন কি কিছুকাল পূর্ব্বে খৃষ্টীয়ান পিক্টরিয়াল (Christian Pictorial) নামে এক পত্রিকায়, ভারতের দর্শন ও আধ্যাত্মিক সাধনা, জর্ম্মাণ সাধনার হস্ত ধারণ করিয়া য়ুরোপে প্রতিষ্ঠা লাভ ও য়ুরোপীয় চিন্তা ও সাধনাকে অভিভূত করিতেছে, এ কথা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। এ সকলের মধ্যে অল্পাধিক অত্যুক্তি দোষ থাকিলেও বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার উপরে, সংস্কৃত শাস্ত্রসাহিত্যের আলোচনা দ্বারা যে ভারতীয় প্রাচীন সাধনার প্রভাব শনৈঃ শনৈঃ বিস্তৃত হইতেছে, এ প্রমাণ অগ্রাহ্য করা যায় না।

সংস্কৃত শাস্ত্র সাহিত্যের আলোচনায় ম্যাক্স মূলরের কার্য্য।

পাশ্চাত্য সমাজে, বিশেষতঃ ইংলণ্ডে ও আমেরিকাতে প্রাচীন ভারতীয় সাধনার প্রভাব বিস্তারের জন্য ম্যাক্সমূলর যেরূপ চেষ্টা করিয়াছেন, এমন আর, বোধ হয় কোনও পণ্ডিতই করেন নাই। প্রধানতঃ শিক্ষিত ইংরাজ ও মার্কিনীয়দিগের সমক্ষে তাঁহার গ্রন্থাবলীই ভারতের প্রাচীন গৌরব ও প্রাচীন সাধনা প্রকাশ করিয়াছে। তিনি যে কেবল অপরের আবিষ্কৃত তত্ত্বই সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছেন, এমনও নহে। বরং অন্যদিকে, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস উদ্ধারে তাঁহার মত আর কোনও পণ্ডিতই এত কৃতকার্য্য হন নাই। এই বিষয়ে ম্যাক্সমূলরের মৌলিকতারও বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনিই সর্ব্ব প্রথমে, সংস্কৃত সাহিত্যকে দুই প্রধান বিভাগে বিভক্ত করেন। আমাদিগের ভাষায় ইহার এক বিভাগকে শ্রুতি ও অপর বিভাগকে স্মৃতি ও পুরাণ কহা যাইতে পারে। প্রাচীন ভারতে, হস্তলিপি প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে, মুখে মুখে যে সাহিত্য রচিত ও মুখে মুখেই প্রচারিত ও রক্ষিত হইত, তাহাই শ্রুতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বেদই শ্রুত সাহিত্যের কেন্দ্র স্থান। বেদ ও তাহার আনুসঙ্গিক সাহিত্য সকলই এইরূপ মৌখিক ছিল। মুখে মুখে একটা বিস্তৃত সাহিত্যকে রক্ষা করিতে হইলে, যাহারা এই সাহিত্য রক্ষা করিবে, তাহাদিগের মধ্যে শ্রমবিভাগের জন্য শ্রেণী বিভাগ নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাদি মুখস্থ করিয়া রাখিবে, তবেই পুরুষ পরম্পরা ক্রমে এই সাহিত্য রক্ষিত হইতে পারিবে। সংস্কৃত সাহিত্যের এই শ্রুতিযুগে, এই কারণে প্রাচীন ব্রাহ্মণ সমাজে, সাহিত্যের সংরক্ষণের জন্যই শাখা, চরণ, প্রবর প্রভৃতি বিভিন্ন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। মুখস্থ করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া, এই যুগের সাহিত্য যথাসম্ভব তানলয়যুক্ত হইয়া গীত কিম্বা তারস্বরে পঠিত হইত। এই কারণেই বেদগানের প্রথাও প্রচলিত হয়; এবং এখনও সেই প্রাচীন প্রণালী অনু-

সারেই কাশী প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতেরা বৈদিক সাহিত্য পাঠ করিয়া থাকেন। মুখে মুখে বিস্তৃত সাহিত্যকে শিক্ষা দিতে, ও রক্ষা করিতে হইলে, তাহার মূল তত্ত্ব সকলকে যথাসাধ্য সংক্ষিপ্ত আকারে নিবদ্ধ করিলে বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। এই জন্যই প্রাচীন ভারতের শ্রুতিযুগে, সূত্র সাহিত্যেরও সৃষ্টি হইয়াছিল। শ্রৌত ও গৃহ্য সূত্রাদি এইজন্য সেই যুগের সাহিত্যেরই অন্তর্গত। কিন্তু কেবল শ্রৌত ও গৃহ্য সূত্রেই সূত্রসাহিত্য শেষ হয় নাই। শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্রের সঙ্গে সঙ্গে চরণ, শাখা ও প্রবরাদি, প্রাচীন ব্রাহ্মণ সমাজের এই বিভিন্ন বিভাগের আচার ব্যবহার ও বিধি ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট করিয়া ধর্ম্মসূত্র অবশ্যই রচিত হইয়াছিল, ম্যাক্সমূলর সর্ব্বপ্রথমে এই মত প্রচার করেন। সেই সকল ধর্ম্মসূত্র অবলম্বনেই পরবর্ত্তী ধর্ম্মস্মৃতি সকল রচিত হয়। অতএব মনুর স্মৃতিও ঐরূপ একটা ধর্ম্ম সূত্রেরই উপরে প্রতিষ্ঠিত। কিছু কাল পূর্ব্বে এই মানবসূত্রের কিয়দংশ আবিষ্কৃত হইয়া ম্যাক্সমূলরের এই মতকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

অতি আদিকাল হইতে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পরে, অশোকের রাজত্বের প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত, সংস্কৃত সাহিত্যের এই শ্রুতিযুগ বহমান ছিল। অশোকের সময় হইতেই লিপিযুগের আরম্ভ। সংস্কৃত বর্ণমালা ও লিপিপ্রণালীর উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতদিগের মধ্যে দুই মত প্রচলিত আছে। এক মতে প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যেরা ফিনিশীয়দিগের নিকট হইতে বর্ণমালা ও লিপিপ্রণালী শিক্ষা করেন। গ্রীকেরাও ফিনিশীয়দিগের নিকট হইতেই বর্ণমালা লাভ করিয়াছিলেন। অপর পণ্ডিতেরা বলেন যে ভারতীয় আর্য্যেরা সাক্ষাৎ ভাবে ফিনিশীয়দিগের নিকট হইতে বর্ণমালা শিক্ষা করেন নাই। কিন্তু ফিনিশীয়দিগের শিষ্য গ্রীক্‌দিগের নিকটেই শিক্ষা করিয়াছিলেন। প্রাচীন কালে উত্তর ভারতে দুই প্রকারের বর্ণমালা প্রচলিত ছিল। ইহার একটীকে লাটলিপি কহে। আলেকজেণ্ডারের পূর্ব্বে ভারতে লাটলিপি প্রচলিত ছিল বলিয়া, কেহ কেহ মনে করেন, এই লিপিতেই তদানীন্তন কালে চিঠিপত্র ও হিসাবাদি লেখা হইত। অতএব এই লাটলিপি সাক্ষাৎভাবে ফিনিশীয়দিগের নিকট হইতেই ভারতে আসিয়াছিল কেহ কেহ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু ম্যাক্সমূলরের মতে প্রাচীন ভারতের উভয়বিধ বর্ণমালাই গ্রীকদিগের নিকট হইতে আর্য্যেরা শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু যেরূপেই ভারতের প্রাচীন আর্য্যগণ বর্ণলিপি শিক্ষা করুন না কেন, অশোকের সময়ের বহু পূর্ব্বে যে এ দেশে লিখিত সাহিত্য ছিল না, ইহা একরূপ স্থির নিশ্চিত। ম্যাক্সমূলর সংস্কৃত সাহিত্যের দুই যুগ বিভাগ করিয়া, প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের অনেক জটিল বিষয়ের যে বিশদ মীমাংসার উপায় করিয়া গিয়াছেন, ইহাতেই বর্ত্তমান যুগের বৈদিক সাহিত্যের আলোচনার ইতিহাসে তাঁহার কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় থাকিবে।

বৈদিক সাহিত্যের আলোচনায় ম্যাক্সমূলরের কার্য্য।

ম্যাক্সমূলর বৈদিক সাহিত্যকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,—(১) সংহিতা; (২) ব্রাহ্মণ; (৩) উপনিষদ্। এই বিভাগ সঙ্গত ও সমীচীন, এবং আজি পর্য্যন্ত কোনও পণ্ডিত এই বিভাগের বিরুদ্ধে কোনও মতামত প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াসী হন নাই। কিন্তু এই বিভাগত্রয়ের তিনি যে কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই কাল্পনিক। তাঁহার মতে খৃষ্ট পূর্ব্ব দশম শতাব্দীর মধ্যে বেদের সংহিতা ভাগের রচনা শেষ হয়। এবং খৃষ্ট পূর্ব্ব ১০০০ হইতে ৬০০ অব্দ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণভাগের কাল, এবং তৎপরে খৃষ্টপূর্ব্ব ৪০০ অব্দ পর্য্যন্ত উপনিষদের সময় নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। তাঁহার এই কাল বিভাগ সর্ব্বত্র গৃহীত হয় নাই। তিনি যেমন খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বাদশ কি চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে বেদের আরম্ভ কল্পনা করিয়াছেন, সেইরূপ অপর কেহ বা খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীকে ঋগ্বেদের কাল বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ফলতঃ প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে, বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে, কাল নিরূপণের চেষ্টা বৃথা। প্রাচীন ইহুদার ইতিহাসে অপর জাতির আক্রমণাদির উল্লেখ আছে। অপর দেশের রাজাদের নাম পর্য্যন্ত ইহুদীয় শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং ঐ সকল জাতির বা রাজার কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রভৃতি আলোচনা ও অনুশাসনাদি উদ্ধার করিয়া পণ্ডিতেরা তাহার সাহায্যে, ইহুদীয় ইতিহাসের কাল নির্ণয় করিতে পারিতেছেন। প্রাচীন ভারতে গ্রীক্‌দিগের পূর্ব্বে অন্য কোনও যবন জাতির সঙ্গে আর্য্যদিগের যুদ্ধ বিগ্রহাদির উল্লেখ পাওয়া যায় না। সুতরাং আমাদিগের প্রাচীন

ইতিহাসে কাল নির্ণয় করিবার চেষ্টা কোনও প্রকারেই সফল হইতে পারে না। বেদের সংহিতা ভাগ রচিত হইতে কত কাল যে লাগিয়াছিল কে বলিতে পারে? আবার বেদের সংহিতাকে ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি ভাগে বিভাগ করিয়া, ঋক্ প্রথমে, তার পর যজু, তৎপরে সাম, সর্ব্বশেষে পরিশিষ্টরূপে অথর্ব্ব রচিত হইয়াছিল, একথারই বা প্রমাণ কোথায়? অথচ য়ুরোপীয় পণ্ডিত মণ্ডলী বৈদিক সংহিতার রচনার এই ক্রম বেদ বাক্যের মত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। ফলতঃ এ বিষয়ে ভারতীয় ভাষ্যকারগণের মতই সমধিক যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। ঋক্ অর্থে পদ্য, যজু অর্থে গদ্য এবং সাম অর্থে গান, বেদের কোনও অংশ পদ্য কোনও অংশ গদ্য কোনও অংশ বা গান এই জন্যই "ত্রয়ী বেদাঃ" কথা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বেদের প্রকৃতি-অনুযায়ী এই বিভাগত্রয়কে কালানুযায়ী বিভাগ বলিয়া গ্রহণ করিয়া বিষম ভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন। এই জন্যই তাঁহারা অথর্ব্ববেদকে পরিশিষ্ট বলিয়া মনে করেন। কিন্তু অথর্ব্ব বেদ অপর বেদত্রয়ের পরিশিষ্ট নহে, কিন্তু যজ্ঞার্থে সংগৃহীত ও রচিত বলিয়া, তাহাতে ঋক্, যজু ও সাম এই তিনই পাওয়া যায়। বেদ প্রথম হইতেই, একই সঙ্গে, পদ্যে, গদ্যে ও গানের আকারে রচিত হইতেছিল; এবং একই কালে সমুদায় সংহিতা সঙ্কলিত হয়, প্রাচীন ভাষ্যকারগণের এই মত, ম্যাক্সমূলর প্রভৃতি য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মত অপেক্ষা সমধিক যুক্তিযুক্ত। তবে তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও উপনিষদকেও সংহিতার সমকালীন মনে করিয়া, বৈদিক সাহিত্যে ক্রম বিকাশের সত্যতা যে অস্বীকার করেন, এই বিষয়ে ভাষ্যকারেরা নিশ্চয়ই ভ্রান্ত।

যেমন বৈদিক সংহিতার কালবিভাগ করিতে গিয়া, প্রাচীন ভাষ্যকারদিগের মত অগ্রাহ্য করিয়া ম্যাক্সমূলর অশেষ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ প্রথমে, বৈদিক ধর্ম্মের মর্ম্ম উদ্ঘাটনেও প্রাচীন নিরুক্তকারদিগের ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য করিয়া, কেবলমাত্র আধিভৌতিক অর্থে, বৈদিক সূক্তের ব্যাখ্যা করিতে গিয়াও তিনি অশেষ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে এই বিষয়ে তাঁহার পূর্ব্ব মত বহুল পরিমাণে সংশোধিত হইয়াছিল; এবং অবশেষে সায়নাচার্য্যকে উপেক্ষা করিয়া, বেদের সদর্থ নির্ণয় করা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, এই কথা পর্য্যন্ত তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন।

পুরাণ ও কাব্যের কাল নির্ণয়।

যেমন বৈদিক সাহিত্যের কাল-নির্ণয়ে সেইরূপ পৌরাণিক সাহিত্য এবং প্রাচীন কাব্যাদির কাল নির্ণয়েও ম্যাক্সমূলর অশেষ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। উইলসনের অনুসরণ করিয়া তিনি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া তৎপরবর্ত্তী যুগে সমুদায় পুরাণ রচিত হইয়াছে, এই সিদ্ধান্ত প্রচার করেন। এই কারণেই তিনি পুরাণাদির চর্চ্চায় তেমন মনোনিবেশ করেন নাই। এই জন্যই ভারতীয় *ধর্ম্ম-বিকাশের ক্রম নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া, তিনি* শঙ্কর-বেদান্তকেই, হিন্দুর তত্ত্ব-বিচারের চরমকালরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বেদের ন্যায়, পুরাণেরও এইরূপ কাল নির্ণয় চেষ্টা বৃথা। উইলসন এবং ম্যাক্সমূলর উভয়েরই এই সিদ্ধান্ত কোনও উপযুক্ত প্রমাণের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

বিক্রমাদিত্যের সময়ে, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী হইতেই সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের সৃষ্টি, ম্যাক্স মূলর, এই আর এক সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে বেদ ও তৎপরে রামায়ণ ও মহাভারত রচিত হইলে পরে, কোনও কারণে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা ভারতে বিলোপ প্রাপ্ত হয়। বিক্রমের সময় ইহার পুনরালোচনা আরম্ভ হইয়া, ভারতীয় সাহিত্যের এক নব যুগের অভ্যুদয় হয়। মহাকবি কালিদাসই এই নবযুগের যুগাবতার। কিন্তু বুলারপ্রমুখ পণ্ডিতগণ, ম্যাক্স মূলরের এই মত খণ্ডন করিয়াছেন। অশ্বঘোষ প্রভৃতি বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থকারেরা, খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে সংস্কৃত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, ইহা এখন স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে। ফলতঃ সংস্কৃত চর্চ্চা যে প্রাচীন ভারতে কখনও বিলোপ পাইয়াছিল, ইহার কোনও উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না। কালিদাস প্রভৃতির ভাষা ও ছন্দাদি তাঁহাদের বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল, ইহা সপ্রমাণ হওয়াতে ম্যাক্স মূলর সংস্কৃত কাব্য-যুগের যে কাল নির্ণয় করিয়াছিলেন, তাহার ভ্রান্তি প্রতিপন্ন হইয়াছে।

তারবিহীন তাড়িত বার্ত্তা।

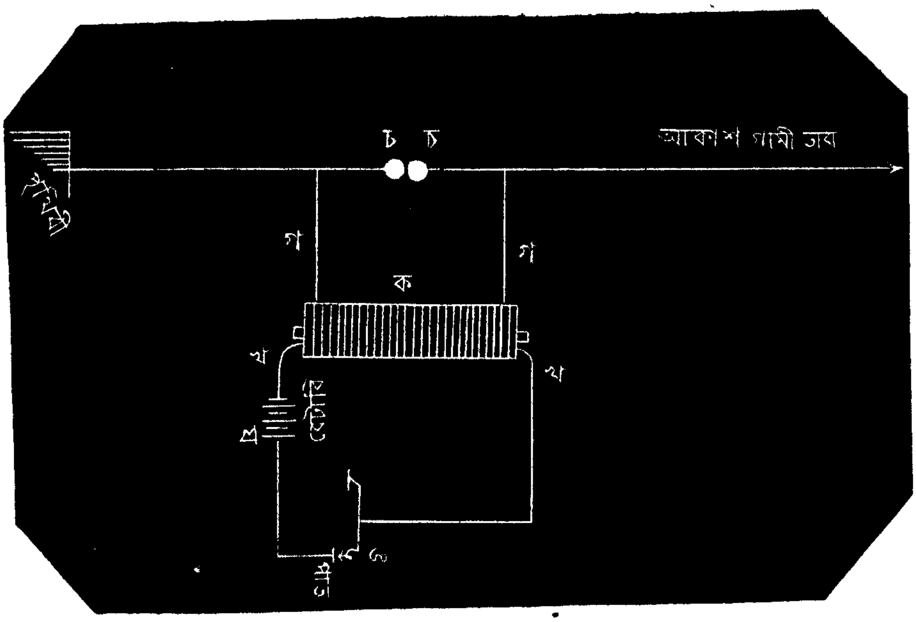
বহুদিন হইতেই তার বিহীন তাড়িত বার্ত্তা প্রেরণের চেষ্টা হইতেছিল। এমন কি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ডাণ্ডি (Dundee) সহরের মিষ্টার টি বি লিণ্ডজে (Mr T B, Lindsay) ডাণ্ডি ডক্‌সের অপর পারে ও ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে টে (Tay) নদীর এক পার হইতে অপর পারে এবং এবার্ডিন (Aberdeen) সহরে ডী (Dee) নদীর এক পার হইতে অন্য পারে দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের কাঁটার সঞ্চালন (needle deflection) দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তিনি নদীর দক্ষিণ পারে একটি ধাতব পাত জলের নীচে রাখিয়া বেটারির পজিটিবদিকের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। নিগেটিবদিক্ সেইরূপ অন্য একটি জলমগ্ন পাতের সহিত লম্বা তার দ্বারা সংযোজিত ছিল। এই দ্বিতীয় পাতটি প্রথম পাত হইতে অনেক দূরে অবস্থিত এবং এই দূরত্ব নদীর প্রস্থ হইতে অনেক বেশী। বাম পারেও ঠিক ঐরূপ দুইটী পাত প্রোথিত ছিল, কিন্তু অন্য পাত অপেক্ষা খাট তার দ্বারা সংযোজিত এবং মাঝখানে একটি গেল্‌বেনোমেটার ছিল। এই গেল্‌বেনোমেটারের (Galvanometer) কাঁটার সঞ্চালন দ্বারা বার্ত্তা লওয়া হইত। তাড়িত প্রবাহ পজিটিব দিক্ হইতে নির্গত হইয়া জলে আসিয়া শাখা প্রবাহে বিভক্ত হইত। একটি প্রবাহ নদী পার হইয়া গেলবেনোমেটারের ভিতর দিয়া যাইয়া পুনর্ব্বার নদী পার হইয়া নিগেটিবে আসিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিত।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের টেলিগ্রাফ বিভাগের ডিরেক্টর প্রীস্ (Priece) সাহেবও এইরূপ কয়েকটি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এস্থলেও তাড়িত প্রবাহ সমুদ্র বাহিয়া যাইত, এবং টেলিফোণের সাহায্যে মরসের সাঙ্কেতিক (Morse's Telegraph Signals) শব্দ (যাহা এখনও টেলিগ্রাফ আফিসে ব্যবহৃত হইয়া থাকে) পড়া হইত। এই প্রণালী অনেকাংশে সংশোধিত হইয়া ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস হইতে লেবারনক্ (Lavernock) ও ফ্লেটহলনে (Flatholne) প্রতিদিন ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

আমরা এখানে যে প্রণালীর কথা বলিব তাহাতে তাড়িত প্রবাহ আকাশ বাহিয়া এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে। হার্টজ (Hertz) সাহেবই ইহার প্রথম প্রবর্ত্তক। যদিও এই প্রণালী যে সব মতের উপরে নির্ভর করে তাহা বিশদভাবে বর্ণন করিতে আমাদের ইচ্ছা নাই, তথাপি মহাত্মা ফ্যারাডে (Faraday) ও ক্লার্ক ম্যাক্‌সওয়েল (Clerk Maxwell) প্রবর্ত্তিত মতের কিছু উল্লেখ না করিলে প্রবন্ধ একেবারেই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল এক বস্তুর তড়িৎ অন্য একটি দূরস্থিত বস্তুতে তাড়িত ক্রিয়া সম্পাদন করিতে কোন মধ্যবর্ত্তীর সাহায্য গ্রহণ করে না। যেমন একটি চুম্বক দূরস্থিত একখানি লৌহফলকে তাহার আকর্ষণ শক্তি চালনা করে, সেইরূপ তড়িৎও দূরস্থিত কোন বস্তুতে তাহার ক্রিয়া সম্পাদন করে। ফ্যারাডে সাহেবই প্রথমে পরীক্ষা দ্বারা তাহার 'লাইনস্ অব্ ফোরস্' (Lines of force) মত পোষণ করেন। তিনি বিভিন্ন স্থিতিস্থাপক (elastic) বস্তুর মধ্যবর্ত্তিতাতে আকর্ষণের তারতম্য দেখাইয়া, স্থিতিস্থাপক বস্তুর সাহায্য প্রতিপন্ন করেন। তৎপরে ক্লার্ক ম্যাক্স্‌ওয়েল সাহেব এই মতের বহুল উন্নতি সাধন করিয়া আলোকরশ্মির সহিত তাড়িত রশ্মির একত্ববাদ প্রচলন করেন। এই মত "ফ্যারাডে ম্যাক্স্‌ওয়েল ইলেক্ট্রোমেগ্‌নেটিক থিয়রি অব্ লাইট্" (Electromagnetic Theory of Light) নামে প্রচলিত। এখানে সর্ব্বব্যাপী অতি সূক্ষ্ম ঈথরই স্থিতিস্থাপক মধ্যবর্ত্তীর কার্য্য করিতে সমর্থ। এই মত মহাত্মা হার্টজ সাহেব সর্ব্বপ্রথম ১৮৮৮ সনে পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপাদন করেন। তদবধি তাঁহার পোষকগণ ইহার বহুল উন্নতি সাধন করিয়া আসিতেছেন।

১ নং চিত্রে সঙ্কেত প্রেরণের যন্ত্র দেখান হইয়াছে।—"ক" একটি রম্‌করফ্‌স্ কয়েল (Ruhmkorf's coil), "খ" তাহার প্রাইমারী কয়েল (Primary coil), এবং "গ" তাহার সেকেণ্ডরি কয়েল (Secondary coil)। "ঘ" একটি বেটারি; তাহার একদিক্ প্রাইমারির এক দিকের সঙ্গে সংযোজিত ও অন্য দিক্ একটি ছোট ধাতব পাতের সহিত সংযোজিত রহিয়াছে। এই পাতটির ঠিক উপরেই "ঙ" চিহ্নিত একটি স্প্রীং রহিয়াছে, এই স্প্রীংটি প্রাইমারির অপর দিকের সহিত সংযোজিত। "ঙ" চিহ্নিত স্প্রীংটী পাতের উপর চাপিয়া ধরিলেই বেটারি হইতে তাড়িত প্রবাহ নির্গত হইয়া প্রাইমারিতে প্রবাহিত হয়। স্প্রীং ছাড়িয়া দিলেই তাড়িত



১নং চিত্র।

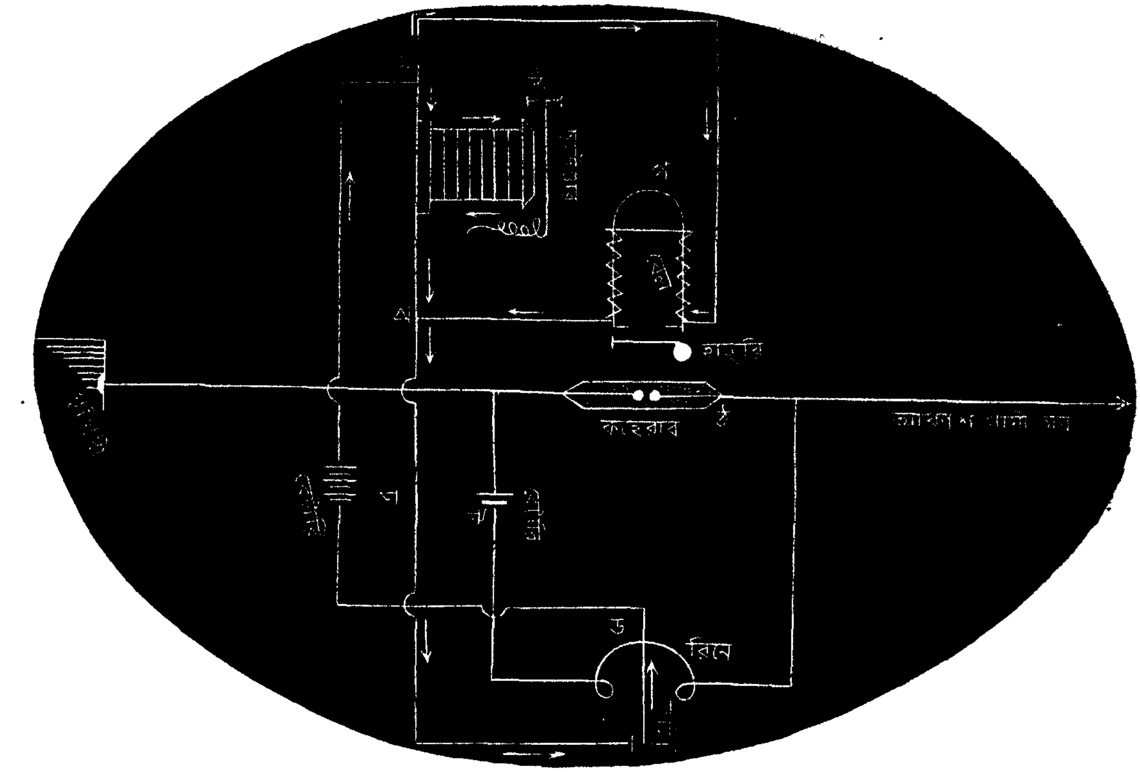
প্রবাহ প্রতিহত হইয়া যায়। এবং সেই মুহূর্ত্তে ক্ষণকালের নিমিত্ত সেকেণ্ডরি কয়েলে অতি বেগে তাড়িত প্রবাহ উদ্দীপিত হইয়া থাকে। সেকেণ্ডরি কয়েলের দুই দিকে দুইটি "চ" ও "চ" চিহ্নিত প্লেটিনাম কিম্বা অন্য ধাতু নির্ম্মিত ছোট ছোট বর্ত্তুল সংযোজিত; আবার এই বর্ত্তুল দুটির একটি তারদ্বারা পৃথিবীর সহিত ও অন্যটি একটি আকাশগামী তারের সহিত সংযোজিত। এই আকাশগামী তারটি পৃথিবী হইতে একরূপ বিচ্ছিন্ন, ইহার তড়িৎ কোনরূপেই পৃথিবীতে যাইতে পারে না। বর্ত্তুল দুটির মধ্যে ব্যবধান অতি সামান্য। "ঙ" চিহ্নিত স্প্রীংটি চাপিয়া ছাড়িয়া দিলেই, সেই উদ্দীপিত তাড়িত প্রবাহ সেই মুহূর্ত্তে বর্ত্তুল দুইটির মধ্যস্থলে একটি তাড়িতস্ফুলিঙ্গ উৎপাদন করে। এখানে বলা আবশ্যক যে, এই তাড়িতস্ফুলিঙ্গ যদিও একটি বলিয়া মনে হয় তথাপি উহা বহু বহু সংখ্যক স্ফুলিঙ্গের সমষ্টি মাত্র।

জলে প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে যেমন তরঙ্গের উৎপত্তি হয় এবং সেই তরঙ্গরাশি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে, সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী ঈথরসমুদ্রে কোন প্রকারের আঘাত লাগিলে ঈথরতরঙ্গের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই ঈথর সমুদ্রের তরঙ্গমালা চক্ষুর স্নায়ুতে আঘাত করিয়া আলোক অনুভূতির উৎপাদন করে। কিন্তু এই সকল তরঙ্গমালা ছোট বড় নানা প্রকারের। তাহার কতকগুলি আলোক তরঙ্গ, আবার কতকগুলি অদৃশ্য তরঙ্গ। এই অদৃশ্য তরঙ্গেরও নানা বিভাগ আছে। তাহার এক বিভাগ তাড়িত তরঙ্গ। আলোকরশ্মি যেমন আমাদের চক্ষুর সাহায্যে বোধগম্য হয়, সেইরূপ তাড়িতরশ্মিও তাড়িত যন্ত্রের সাহায্যে বোধগম্য হইতে পারে। সেই বিশেষ তাড়িত যন্ত্রকে "তাড়িত চক্ষু" বলা যাইতে পারে।

একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন সৃষ্ট হইয়াই চতুর্দ্দিকে আলোক তরঙ্গ উৎপাদন করে, সেইরূপ তাড়িতস্ফুলিঙ্গও তৎক্ষণাৎ তাড়িততরঙ্গ উৎপাদন করে; এবং এই "তাড়িত চক্ষুর" সাহায্যে তাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

২ নং চিত্রে একটি "তাড়িত চক্ষুর" নানা অংশ দেখান হইয়াছে:—"ট" একটি ছোট বেটারি; "ঠ" একটি এক ইঞ্চি পরিমিত লম্বা সরু কাচের নল, ইহার দুই দিকই বন্ধ। ইহার অভ্যন্তর ভাগ নিকেল ও রৌপ্য চূর্ণ দ্বারা অসংলগ্ন ভাবে পূর্ণ রহিয়াছে ও দুই দিক হইতে দুটি প্লেটিনামের তারের সহিত সংযোজিত, এই তার দুটির মধ্যের ব্যবধান অতি যৎসামান্য। বাহিরের দিকে তার দুটি বেটারির পজিটিব ও নিগেটিব প্রান্তের সহিত সংযোজিত, আবার তেমনই একটী পৃথিবীর সহিত ও অন্যটী পূর্ব্বকথিত আকাশগামী তারের ন্যায় আর একটী তারের সহিত সংযোজিত। বেটারি ও কাচের নলের (যাহাকে "কহেরার" বলে) একদিকের তারের মাঝে একটি টেলিগ্রাফ রিলে (Relay) "ড" সংযোজিত।

প্রথমে "কহেরারের" মধ্যে ধাতব চূর্ণ অসংলগ্ন ভাবে



২নং চিত্র।

থাকায় বেটারির তাড়িত প্রবাহ বহিতে পারে না। কিন্তু যখনই কোন তাড়িত তরঙ্গের আঘাত লাগে, তখনই সেই অসংলগ্ন ভাব কিরূপ হইয়া যায়, আব অমনি তাড়িত প্রবাহ বহিতে আরম্ভ করে ও রিলের কাঁটা সরিয়া আসে। এখন "কহেরারটি" একটু নাড়া দিলেই পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তাড়িত প্রবাহ প্রতিহত করিয়া দেয়, এবং রিলের কাঁটা পুনরায় সরিয়া যায়। এই এদিক ওদিক সরিয়া আসা যাওয়ায় আমরা তাড়িত তরঙ্গের অস্তিত্ব বুঝিতে পারি।

রিলে যন্ত্রটীর আরও বিশেষ উদ্দেশ্য রহিয়াছে। "ঢ" একটি বেটারি, ইহার পজিটিব দিক্ হইতে প্রবাহ নির্গত হইয়া "ণ" তে আসিয়া দুটি শাখা প্রবাহে বিভক্ত হইয়াছে। একটি শাখা "প" চিহ্নিত ইলেক্‌ট্রিক বেলের (Electric Bell) মধ্য দিয়া, ও অন্যটি "ক" চিহ্নিত মরসের সাউণ্ডারের (Morses' Sounder—যাহা শব্দ করিবার জন্য সকল টেলিগ্রাফ আফিসেই ব্যবহৃত হয়) মধ্য দিয়া পুনরায় "ব"তে আসিয়া এক প্রবাহে মিশিয়া রিলেতে আসিয়া পড়িয়াছে। রিলের অন্য দিক্ নিগেটিবের সহিত সংযোজিত; কিন্তু তাড়িত প্রবাহ, যখন রিলের কাঁটা সরিয়া আসে, কেবল তখনই বহিতে পারে। তাই যতক্ষণ প্রথম তাড়িত প্রবাহ থাকে, ততক্ষণই দ্বিতীয় তাড়িত প্রবাহের সম্ভব। দ্বিতীয় তাড়িত প্রবাহ জনন মাত্রই বেল ও সাউণ্ডার দুটি তাহাদের কাজ করিতে থাকে। বেলের হাতুড়ির আঘাত "কহেরারে" লাগে এবং এবং তাহাতেই উহা সাধারণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

এখন দেখা যাইবে যে যখনই "ঙ" চিহ্নিত স্প্রীঙে আঘাত হয় সেই মুহূর্ত্তে "চ" ও "চ" চিহ্নিত বর্ত্তুলের মাঝে একটি তাড়িত স্ফুলিঙ্গের ও তাহাতেই চতুর্দ্দিকে তাড়িত তরঙ্গের উৎপত্তি হয়। সেই তরঙ্গরাশি "ঠ" চিহ্নিত "কহেরারে" আঘাত করিয়া রিলের কাঁটার সঞ্চালন করে, এবং সেই মুহূর্ত্তে সাউণ্ডারে শব্দ হয় ও বেলের হাতুড়ি "কহেরারে" আঘাত করিয়া উহাকে পূর্ব্বাবস্থায় আনয়ন করে। পর মুহূর্ত্তে আর একটি তাড়িত স্ফুলিঙ্গ উৎপাদন করিলে পুনরায় আর একটি শব্দ হয়, ও হাতুড়ির আঘাতে

"কহেবার" পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই সকল সাঙ্কেতিক শব্দের সমষ্টিতে যে কোন কথাই প্রেরণ করা যায়।

যে দুটি আকাশগামী তারের কথা বলা হইয়াছে, বহু দূরে বার্ত্তা প্রেরণই তাহাদের উদ্দেশ্য। এই দুটি তার যত উচ্চে অবস্থিত হইবে, ততই দূর হইতে বার্ত্তা লওয়া যাইতে পারিবে। মার্কনি (Marconi) সাহেব ইহা প্রথমে ব্যবহার করেন।

আমরা গুটি কতক কথায় এই দুরূহ ব্যাপার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহাতে অনেক কথা বাদ দিতে হইয়াছে। বুঝাইতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি জানি না।

বিজ্ঞান জগতে ও সাধারণে এই বিষয়ের এত প্রচলন হইয়াছে যে আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই ইহার কিছু জানা আবশ্যক বিশেষতঃ যখন আমাদের দেশের গৌরবস্বরূপ, ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় এ বিষয়ে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া পূর্ব্ব মত খণ্ডন ও তাহার নিজ মত প্রচলন করিয়া বিজ্ঞান জগতের পণ্ডিত মণ্ডলীকে স্তম্ভিত করিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি হার্টজ সাহেবই প্রথমে এ বিষয়ের পরীক্ষা করেন। তাঁহার "তাড়িত চক্ষু" আমাদের বর্ণিত "তাড়িত চক্ষু" হইতে বিভিন্ন। তাঁহার "তাড়িত চক্ষু" বিশেষভাবে বক্রিত একটি চক্রাকৃতি তার ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাহাতে যে দুটি বর্ত্তুল আছে তাহাদের মধ্যে ব্যবধান অতি সামান্য এবং তাহারও হ্রাস বৃদ্ধি করিবার উপায় আছে। তাড়িত তরঙ্গের আঘাত হইলে এই বর্ত্তুল দুটির মধ্যে তাড়িত স্ফুলিঙ্গের উৎপত্তি হয়।

এই প্রবন্ধে বর্ণিত "তাড়িত চক্ষুর" ক্রিয়া ১৮৯১ সনে ব্রানলি (M Branly) সাহেব প্রথমে আবিষ্কার করেন। অধ্যাপক লজ (Prof Lodge) সাহেবের মত এই যে, তাড়িত তরঙ্গের আঘাতে ধাতব চূর্ণ সংলগ্ন ভাব ধারণ করে এবং তাহাতেই তড়িৎ প্রবাহিত হইতে সমর্থ হয়। কিন্তু অধ্যাপক বসু মহাশয় সে মত পরীক্ষা দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পটাসিয়াম রিসিভার (Potassium Receiver) দ্বারা দেখাইয়াছেন, যে তাড়িত তরঙ্গের আঘাতে প্রবাহ ক্ষণকালের নিমিত্ত প্রতিহত হয়। তাঁহার মতে তাড়িত তরঙ্গের আঘাতে অণু সকল বিরূপ ভাব ধারণ করে এবং তাহাতেই তাহাদের ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। শুধু তাহাই নয়, এই মত, জীব ও উদ্ভিদ জগতের অনেকানেক আজ পর্য্যন্ত দুর্ব্বোধ্য বিষয় সহজ করিয়া দিয়াছে। তাঁহার এই মত প্রায় সর্ব্বগ্রাসী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও বস্তুগুণ সকল এই মতের আলোকে সহজে বোধগম্য হইবে।

সাময়িক সাহিত্যের কথা।

ব্যারিংটন আর্বিং "সাহিত্যের পরিবর্ত্তনশীলতা" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—"Many a man of passable information at the present day, reads scarcely anything but reviews, and before long a man of erudition will be little better than a mere walking catalogue." আজ প্রায় আশী বৎসর হইল আর্বিং এ কথা লিখিয়া গিয়াছেন। তখন এডিনবরা রিবিউ, কোয়ার্টার্লি রিবিউ এবং ব্ল্যাক উড্স্ ম্যাগাজিনের অক্ষুণ্ণ প্রতাপ। তাহার পর ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডে সাময়িক পত্রের সংখ্যা এরূপ বাড়িয়াছে যে, তাহাদের সকলের নাম লিখিতে হইলেও প্রদীপের কয়েক পৃষ্ঠা লাগিবে। এখন পাশ্চাত্য দেশ সমূহের অবস্থা এমনই হইয়াছে যে লোকে ত্রৈমাসিক পত্রের প্রবন্ধগুলি অত্যন্ত দীর্ঘ মনে করে, পড়িয়া শেষ করিতে না পারিয়া ক্লান্তিভরে হাই তুলিতে থাকে। মাসিক পত্রের প্রবন্ধগুলিও অনেকে বড়ই দীর্ঘ মনে করেন। মাসিকপত্রের সংখ্যাও অত্যন্ত বেশী হইয়া পড়িয়াছে। তাই রিবিউ অব্ রিবিউজের সৃষ্টি। তাহাও কি সকলে পড়িয়া উঠিতে পারে? দৈনিক কাগজখানি পড়িয়া উঠাই দায়। উহার সকল অংশ সকলে পড়েন না। কেহ কেবল তারের খবরগুলি পড়েন, কেহবা ঘোড়দৌড়ের বাজির বৃত্তান্ত পড়েন, কেহবা নানা দ্রব্যের, এবং যৌথকারবারের অংশের, বাজার দর পড়েন, কেহবা পুলিস আদালতের মোকদ্দমার বিবরণ মাত্র আগ্রহের সহিত পাঠ করেন।

বাস্তবিক আজি কালিকার দিনে পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হওয়া দুর্ঘট। বিদ্যার একটি শাখার, একটী প্রশাখার, একটি পল্লবের সম্যক্ অধিকারী হওয়াও দুর্ঘট। প্রথমেই ত ভাষা শিক্ষা লইয়া বিপন্ন হইতে হয়। বিজ্ঞানের অনেক

উচ্চ অঙ্গ আছে, যদ্বিষয়ক গ্রন্থ ইংরাজীতে অতি অল্পই আছে। ঐ সকল অঙ্গের অনুশীলন করিতে হইলে অন্ততঃ ফরাশী ও জর্ম্মান্ ভাষা জানা দরকার। ইতালীয় ও রুশীয় ভাষা জানিলে আরও ভাল। মনে করুন, কেহ কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করিয়া ইংরাজী ব্যতীত আরও দুই তিনটি ভাষা শিক্ষা করিলেন। কিন্তু তাহাতেই কি পার পাওয়া যায়? তিনি যদিই বা বিদ্যার একটী প্রশাখার একটি মাত্র পল্লবের কিঞ্চিৎ পরিমাণে অধিকারী হইলেন, তথাপি তিনি অল্পই জ্ঞান লাভ করিলেন। আমি এরূপ বলিতেছি না যে কাহারও সর্ব্ববিদ্যাবিৎ হইবার সম্ভাবনা আছে। তাহা বর্ত্তমানকালে একেবারেই অসম্ভব। যে সকল পুস্তক পূর্ব্বে পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের কথা ছাড়িয়াই দেওয়া যাক্। বর্ত্তমানকালেই প্রতি বৎসর গ্রেট ব্রিটেন হইতে ৭৫০০, জর্ম্মণী হইতে ২১০০০, ফ্রান্স হইতে ১৩০০০, ইটালী হইতে ৯০০০, এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে ৫০০০ পুস্তক প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ এই সকল দেশ হইতে বৎসরে গড়ে ষাট হাজার পুস্তক প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বের গ্রন্থকারদের কত পুস্তক পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকালয়ে সঞ্চিত আছে, তাহা বলা যায় না। তবে উহাদের সংখ্যা যে খুব বেশী তাহা ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ের নিম্নলিখিত পুস্তক সংখ্যা হইতে বুঝা যাইবে।

লাইব্রেরী।			পুস্তক সংখ্যা।
পারিস ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী	...	...	২,৩৭০,০০০
মিউনিক রয়্যাল লাইব্রেরী	...	...	১,০২৬,০০০
সেণ্ট্ পীটর্সবর্গ ইম্পীরিয়াল্ লাইব্রেরী		...	১,০ ৬,০০০
লণ্ডন ব্রিটিষ মিউজিয়ম্	...	...	১,৫৫০,০০০
কোপেনহেগেন রয়্যাল লাইব্রেরী	...	...	৪৯০,০০০
বর্লিন রয়্যাল লাইব্রেরী	...	..	৭৬৬,০০০

এই সকল লাইব্রেরীর পুস্তক সংখ্যা গত উনিশ বৎসরে না জানি আরও কত বাড়িয়াছে। ইহার মধ্যে অবশ্য সকল পুস্তকই সারবান্ নয়, কিন্তু সারবান্ পুস্তকের সংখ্যাও অন্ততঃ এক লক্ষ হইবে। তালিকাটি দেখিয়াই বুদ্ধিমান্ লোকমাত্রেই বলিবেন, তবে আর সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত হওয়া গেল না। কিন্তু সকলেইত আর পণ্ডিত হইবার জন্য সৃষ্ট হন নাই। যাঁহারা পণ্ডিত হইবেন, তাঁহারাও বিদ্যার কোন একটি সামান্য অংশে পণ্ডিত হইতে পারেন। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন সকলেরই কর্ত্তব্য। সর্ব্ব প্রকার মনোবৃত্তির পরিচালনা করিতে হইলে এবং উদার-হৃদয় হইতে গেলে বহু বিষয়ের মোটামুটি খবর রাখা প্রয়োজনীয়, অর্থাৎ যাহাকে ইংরাজীতে বলে well-informed man, তাহাই হওয়া দরকার। কিন্তু ইহা কি প্রকারে হওয়া যায়? পুস্তকে প্রত্যেক বিষয়েরই বিস্তৃত বর্ণনা আছে। কিন্তু পড়ে কে? এত সময় কাহারই বা আছে? এরূপ আপত্তি অনেকেই করিবেন। বাঙ্গালা ভাষায় নানাবিষয়ক পুস্তকও খুব কম। তবে উপায় কি?

উপায় সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্র-সম্পাদকেরা অনেক পরিমাণে করিতে পারেন। বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ সাপ্তাহিক বাঙ্গালা পত্রের কলেবর সংবাদ, রাজনৈতিক প্রবন্ধ, "ভীষণ" গল্প, জাল জুয়াচুরির গল্প এবং ব্যক্তিগত অত্যাচার উপদ্রবের বর্ণনায় পূর্ণ থাকে। তৃতীয় ও চতুর্থটি ছাড়া ইহার কোনটিই অনাবশ্যক নহে। কিন্তু সাধারণতঃ রাজনীতি ও অর্থনীতির চর্চ্চা যেরূপ ভাবে হইয়া থাকে, তদপেক্ষা গভীরতর ভাবে হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা অনেকে উচ্চ শিক্ষা পাইয়াছি, এইরূপ পরিচয় দিই, কিন্তু রাজনীতি এবং শাসনপ্রণালী সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট পুস্তক কয়খানি পড়িয়াছি? পড়া দূরে থাকুক্, ক'খানি গ্রন্থের নাম জানি? অথচ আমরা যত সহজে রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখি, এমন আর কোন বিষয়েই পারি না। তবে একটা কথা আছে,—প্রতিভাশালী লোকে বেশী কিছু না পড়িয়াও নিজ মস্তিষ্ক হইতে অনেক তত্ত্বের উদ্ভাবন করিতে পারেন।—অনেক বৎসর ধরিয়া অনেকগুলি বাঙ্গালা কাগজে "মুদ্রাবিভ্রাট" বিষয়ক প্রবন্ধ পড়িয়াছি, কিন্তু এখনও ব্যাপারটা পরিষ্কার বোধ হয় না। বোধ হয় আমার মত আরও অনেক পাঠক আছেন। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় রাজনৈতিক প্রশ্নের আলোচনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে—কোন্ দেশের কোন্ অবস্থাতেই বা নাই? কিন্তু রাজা বা রাজার আইন যতই ভাল হউক, প্রজাবর্গের স্বাবলম্বন ব্যতিরেকে জাতীয় জীবনের উন্নতি অসম্ভব। অবশ্য রাজকীয় ব্যবস্থা আমাদের উন্নতির অনুকূল বা প্রতিকূল হইতে পারে। কিন্তু মোটের উপর উন্নতি করা না করা আমাদেরই হাতে। এক হিসাবে দেখিতে গেলে রাজকীয় ব্যবস্থা প্রজাপুঞ্জের চরিত্র ও অবস্থার প্রতিবিম্ব বা প্রতিধ্বনি মাত্র। বুদ্ধিমান্, সাহসী, উন্নতি প্রয়াসী জাতিকে কোনও

ব্যবস্থা অধিক দিন অবনত অবস্থায় রাখিতে পারে না। তেমনি আবার অধঃপতিত জাতির মধ্যে উন্নততম শাসন প্রণালী প্রবর্তিত করিলেও, তদনুরূপ সুফল ফলিবে না। কারণ eternal vigilance is the price of liberty স্বাধীনতা কেনা যায় কেবল চিরজাগ্রত সতর্কতা দ্বারা। অধঃপতিত জাতি আলস্যে ইন্দ্রিয় সুখে নিমগ্ন থাকায় ক্রমেই একটি একটি করিয়া উচ্চ অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়।

আমরা ক্রমাগত আন্দোলন করিলে নিশ্চয়ই আমাদের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি করিতে পারিব; নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে অনেক উচ্চ অধিকার পাইব; কিন্তু এই সকল অধিকার আমাদিগকে দেওয়া না দেওয়া রাজার হাতে। আমরা যে এই সকল অধিকারের উপযুক্ত তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করিতে না পারিলে, কখনই তৎসমদয় প্রাপ্ত হইব না। সমাজ, শিক্ষা এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয়ে, কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পে, আমরা যদি উন্নতি করিতে পারি, তবে আমাদের উচ্চ অধিকার লাভের উপযুক্ততা প্রতিপন্ন হইতে পারে। কিন্তু ইহার মধ্যে শিক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ে উন্নতি বহু পরিমাণে রাজকীয় ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। তাহা হইলেও কিছু উন্নতি আমরা গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্য ব্যতিরেকেও করিতে পারি। আর সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয়ে উন্নতি করা সম্পূর্ণরূপে আমাদের নিজের হাতে। সত্য বটে, দেশ বিদেশীর অধীন হইলে সকল বিষয়েই প্রজাবর্গের প্রতিভা, উৎসাহ ও উদ্যম যেন চাপা পড়িয়া যায়; পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে যে আত্মগ্লানি, ও আত্ম সম্মানের অভাব লক্ষিত হয়, তৎপ্রযুক্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষা খাট হইয়া যায়, আত্মনির্ভর কমিয়া যায়, কিছু মহৎ বিষয়ে হাত দিতে সাহসে কুলায় না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয়ের উন্নতি হওয়া অসম্ভব নয়। মুসলমান রাজত্বের সময়েই বৈষ্ণব ও শিখ ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়। যখন য়িহুদীরা রোমের অধীন ছিল, তৎকালেই তাহাদের দেশে ঈশার জন্ম হয়। সুতরাং আমরা যে ইংরাজের অধীনে থাকিয়া ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার করিতে পারি, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তাহার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা, কৃষি বাণিজ্য, শিল্পাদি বিষয়েও যথাসাধ্য উন্নতি করা আমাদের কর্ত্তব্য।

সুতরাং এই সমুদয় বিষয়েই যাহাতে আমাদের লক্ষ্য স্থির থাকে, তাহা করা সংবাদ পত্র সমূহের কর্ত্তব্য। এ স্থলে দুটি কথা উঠিতে পারে। (১) এতগুলি বিষয় সম্বন্ধে একই কাগজে কি সম্যক্‌রূপে আলোচনা সম্ভব? (২) গ্রাহকগণ এরূপ লেখা চায় না। উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে সম্যক্ আলোচনা সম্ভব না হইলেও যাহা সম্ভব তাহা ত করা উচিত। প্রত্যেক বিষয়ের জন্য এক এক খানি কাগজ থাকিলেই ভাল হয়। দশ বৎসর পূর্ব্বে বিলাতে মাসিক পত্র ও বড় বড় সাধারণ কাগজ ছাড়িয়া দিয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকদের জন্য নিম্নলিখিতরূপ খবরের কাগজ ছিল:—

হিসাবরক্ষক (accountants)—২।; এজেণ্ট—৩; কৃষি—৩০; প্রত্নতত্ত্ব—৩; টীকা দেওয়ার বিরুদ্ধে—১; স্থাপত্য ৮; সেনা ১১; ললিতকলা—১৬; জ্যোতিষ—১; ব্যায়াম—১২; নিলাম—৩; পাঁওরুটিওয়ালা—৩; মহাজনী তেজারতী—১; ব্যাপ্টিষ্ট সম্প্রদায়—১১; মৌমাছি—৩; ঘণ্টানির্ম্মাণ—১; পুস্তক বিক্রেতা—৯; জুতার ব্যবসা—২; উদ্ভিদ্‌বিদ্যা—২; বালক—৬, মদ্য প্রস্তুত করা—৪; রাজমিস্ত্রী—১৩; গৃহনির্ম্মাণ সমিতি সমূহ—২; কসাই—১; ছুতার—১; ভোজের বাবস্থাকারী—৩; গোমেষব্যবসায়ী—২; দান সম্বন্ধীয়—৫; ঔষধ ব্যবসায়ী—১০; দাবাখেলা—৩; রাজকীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়—৪৭; সিবিল সার্ব্বিস—৪; গাড়ী নির্ম্মাতা—২; কয়লার ব্যবসা—২; উপনিবেশ সম্বন্ধীয়—২১; রংতামাসা বিষয়ক—৩০; বাণিজ্য বিষয়ক—৪১; ময়রার ব্যবসায়—৩; ঠিকা লওয়া—৪; সহযোগিতা (co-operation)—৪; জনপদ (country)—৭; মফঃস্বলের আদালত—১; গোরক্ষক—১; ক্রিকেট—১; বাইসিকল আরোহণ—১; গৃহসাজান—৬; দন্তসম্বন্ধীয়—৩; কুকুর—৫; নাট্য—১৩; পোষাক নির্ম্মাতা—৪; রঞ্জক (dyers)—১; শিক্ষা—২১; তাড়িত—৬; ইঞ্জিনীয়ারিং—১০; কীট পতঙ্গতত্ত্ব—১; জমিদারী—৭; এক্সচেঞ্জ—৪; ফ্যাষন—৩৭; অর্থসম্বন্ধীয়—৩৯; আগুন—২; মাছধরা ও মাছের ব্যবসা—৪; খাদ্য—৩; ফ্রীমেসন—৪; ফ্রীমেথডিষ্টস্—২; ফ্রেণ্ডলী সোসাইটিজ—৪; সোসাইটী অব ফ্রেণ্ডস্—৩; ফল ব্যবসায়—২; গৃহের আস্‌বাব—৮; মালীর কাজ—১৬; গ্যাস্—৩; ভূগোলবিষয়ক—২; ভূতত্ত্ব—১; জর্ম্মান—২; মুদী—৯; নারীরোগ ও শরীর তত্ত্ব—১; নাপিত—২; বাসন ও তৈজসপত্র—১; হ্যাটনির্ম্মাতা—১; হোমিওপ্যাথী—২; সময়নিরূপণ বিদ্যা—২; ঘোড়া—২; মোজানির্ম্মাতা—১; সচিত্র—১৪; ছাতিয়ার—১; ভারতবর্ষ—৬; রবার—১; জীবনবীমা—১৮; নবাবিষ্ক্রিয়া—৩; লৌহ ও লৌহব্যবসায়ী—৭; জহুরী—১; য়িহুদী—৪; শ্রমজীবী—৪; ধোপা—৩; আইন—১৮; চামড়া—৫; লাইসেন্সট ভিটলর্স—৬; জীবনরক্ষক নৌকা—১।; সাহিত্য বিষয়ক—১৮; গৃহপালিত পশু পক্ষী—৭; স্থানীয় শাসন—৬; কল—৩; বিবাহসম্বন্ধীয়—২; যন্ত্রবিজ্ঞান—৩; চিকিৎসা—২৬; মিটিয়রলজি—১; জাঁতাওয়ালা—২; খনিজ সলিল—৪; খনি খনন—৩; সঙ্গীত—১৮; প্রাণিবিদ্যা—৬; জলযুদ্ধ বিভাগ—৪; ননকনফর্মিষ্টস্—১৩; অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মসম্বন্ধীয়—৪৬; প্রশ্নোত্তরাদি (Notes and Queries)—২; মুদ্রাতত্ত্ব—১; রাজকীয়—২; তৈল ও রং ব্যবসা—২; কাগজ ব্যবসায়—১০; বন্ধকী ব্যবসায়—১; শান্তি—১; ফোটোগ্রাফী—১২; ফ্রেনলজি—২; জল গ্যাস ড্রেন—১; কুম্ভকার—১; গৃহপালিত পক্ষী—৮; প্রেস্‌বিটীরিয়ন্—৩; প্রিমিটিব মেথডিষ্ট—৭; মুদ্রাঙ্কন—১২;

রেলওয়ে—১০ ; রোমান ক্যাথলিক—১৫ ; ঘোড়ারজীননির্ম্মাতা—৩; স্বাস্থ্যবিষয়ক—৮ ; বৈজ্ঞানিক—৬ ; সেকুলার (secular)—৩ ; জাহাজ—১৪ ; সংক্ষেপ লিখন—৩ ; সোসাইটী ("society")—২৪ ; শিকার ক্রীড়াদি—৪০ ; ষ্ট্যাম্প—১ ; রবিবাসরীয় বিদ্যালয়—৬ ; দরজি—৩ ; টেলিগ্রাফী—২ ; মাদকনিবারণ—৩২ ; তন্তুবায়—১১ ; কড়ি কাঠের ব্যবসা—২ ; রেলওয়ে টাইম টেবিল—৩৬ ; তামাক—৪ ; সমাধির ব্যবস্থাকারী—১ ; একেশ্বরবাদী—২ ; গোলাঘর রক্ষক (Warehouse men)—৩ ; ওয়েস্‌লীয়ান—৬ ; নানাবিধ মদ্য—৪ ; আমোদার্থ নৌকাযোগে ভ্রমণ (yachting)—১ ।

এই তালিকা দশবৎসর পূর্ব্বেকার। এখন নিশ্চয়ই সকল প্রকারের কাগজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, আমাদের দেশে এত প্রকারের কাগজ চলিতেই পারে না। কিন্তু দু একটা বিষয় আছে, যৎসম্বন্ধীয় কাগজ চলা উচিত। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধানদেশ। বাঙ্গালা প্রদেশও তাই। অথচ বাঙ্গালা কৃষি বিষয়ক পত্রিকা এক আধখানা সামান্যভাবে কিছুদিন চলে, আবার বন্ধ হইয়া যায়। আমাদের দেশে শিক্ষার অবস্থা অতিশয় হীন। অথচ সমগ্র বাঙ্গালা দেশে কি বাঙ্গালা, কি ইংরাজী একখানিও ভাল শিক্ষা বিষয়ক সাপ্তাহিক বা মাসিক কাগজ নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'শিক্ষাপরিচর' নামে একখানি কাগজ ছিল, এখন তাহা নাই। এডুকেশন গেজেটে সরকারী শিক্ষাবিষয়ক খবর বাহির হয় বটে, কিন্তু সাধারণতঃ শিক্ষা-সম্বন্ধীয় গুরুতর কোন বিষয়ের আলোচনা হয় না। চট্টগ্রাম হইতে "অঞ্জলি" নামে একখানি মাসিক পত্র বাহির হইত। এখন আছে কিনা জানি না। এই যে তিনখানি কাগজের নাম করিলাম, এ গুলিও আবার মোটের উপর নিম্ন শিক্ষা বিষয়ক। মনে হইতে পারে যে Calcutta University Magazine উচ্চ শিক্ষাবিষয়ক কাগজ। কিন্তু তাহা নামে মাত্র। মান্দ্রাজের Educational Reviewএর তুলনায় ইহা অতি অপদার্থ। সাহিত্যের চর্চ্চাও আমাদের দেশে কিঞ্চিৎ পরিমাণে আছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে কোনও সাপ্তাহিক বা মাসিক কাগজে আমি এ পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে ভাল সমালোচনা বাহির হইতে দেখি নাই। বিলাতে কেবল সমালোচনার জন্য Academy, Athenæum, Literary World এবং Literature এই চারিখানি উচ্চ শ্রেণীর কাগজ রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন সাধারণ সমস্ত কাগজে ও শিক্ষাবিষয়ক কাগজে নিয়মিতরূপে সমালোচনা বাহির হয়।

যাহাই হউক, যাহা নাই তাহার জন্য অনুশোচনা করা বৃথা। কি হইতে পারে, তাহাই দেখা উচিত। আমাদের সাপ্তাহিক ও মাসিক কাগজগুলিতে নানা বিষয়ক প্রবন্ধ ও সর্ব্বপ্রকার বাঙ্গালা পুস্তকের সমালোচনা থাকা উচিত। বাজে "ভীষণ" ও জাল জুয়াচুরীর গল্পগুলি তুলিয়া দিলে অনেক জায়গাও হইতে পারে—আমি গল্পের বিরোধী নহি। কিন্তু তাহার মধ্যেও ভাল মন্দ আছে।—যায়গা না হয় হইল। এখন কথা উঠিতে পারে, নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লেখে কে ? সমালোচনাই বা করে কে ? সাপ্তাহিক কাগজের এক সম্পাদক এবং হয়ত এক সহকারী সম্পাদক আছেন, তাঁহারা ঢাক, ঢোল, সানাই সবই বাজান। সময় থাকিলেও সকল বিষয়ে লিখিবার ক্ষমতা এক ব্যক্তির থাকিতে পারে না। সমালোচনা করাও সময় ও ক্ষমতা সাপেক্ষ। অনেক সময় গ্রন্থকারের নিজের বা তাঁহার বন্ধুর লিখিত সমালোচনাই কাগজে বাহির হয়। সুতরাং কাগজ ভাল করিতে হইলে অনেক লেখকের অনেক সমালোচকের সাহায্যের প্রয়োজন। কিন্তু লেখক ও সমালোচকের সাহায্য পাওয়া সহজ নয়। আমি নিজে সম্পাদকতা করিয়াছি ; সুতরাং সম্পাদকদিগের দুর্দশা আমার যথেষ্ট জানা আছে। অনেক লেখককে পত্র লিখিয়া উত্তর বা লেখা কিছুই পাওয়া যায় না। অথচ সম্পাদক সকল স্থলে যে নিজের লাভের জন্য লেখকদের সাহায্য ভিক্ষা করেন, তাহা নয় ; অনেক স্থলে সম্পাদকও পয়সা পান না, লেখকও পান না। পত্রের উত্তর না দেওয়া যে নিতান্তই শিষ্টাচার বিরুদ্ধ, তাহা আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই। কেহ মুখে মুখে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর না দিলে যেমন অভদ্রতা হয়, পত্রের উত্তর না দিলেও তেমনি অভদ্রতা হয়। অনেকে হয়ত বলিবেন, সময় নাই, বা উত্তর দিতে বাধ্য নহি। তাহার উত্তরে একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধ যখন ঘোরতররূপে চলিতেছিল, তখন লক্ষ্ণৌর একটী বাঙ্গালী যুবক লর্ড রবার্টসের বীরত্ব ও যুদ্ধ কৌশলের প্রশংসা করিয়া একটি চলন সই রকমের কবিতা লিখিয়া পাঠান। ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে বাঙ্গালী লেখকদিগের অপেক্ষা লর্ড রবার্টস্‌ কম ব্যস্ত ছিলেন না। কোন প্রকার উত্তর দিতেও বোধ হয় তিনি বাধ্য ছিলেন না। কিন্তু যথাসময়ে সেই বাঙ্গালী যুবক লর্ড রবার্টসের ধন্যবাদ পূর্ণ উত্তর পাইয়া-

ছিলেন।—এমন লেখকও আছেন যাঁহারা লিখিতে প্রতিশ্রুত হইয়া সম্বৎসর কাগজখানি লন, কিন্তু কিছুই লেখেন না। আমার বিবেচনায় লেখকদিগকে টাকা দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করা উচিত। অনেকে মনে করিবেন, টাকা না দিয়াই কাগজের খরচ কুলায় না; তাহার উপর টাকা দিতে হইলে স্বত্বাধিকারীর কিছু পৈতৃক জমিদারী থাকা চাই। "ভীষণ" গল্প বাহির করিব না, "উপহার" দিব না, অশ্লীল বা আপত্তিজনক বিজ্ঞাপন বাহির করিব না, তাহার উপর লেখকদিগকে টাকা দিতে হইবে, এরূপ করিলে একেত গ্রাহক কমিয়া যাইবে, বিজ্ঞাপনের আয় কমিয়া যাইবে, তাহার উপর খরচ ভয়ানক বাড়িবে। খরচ বাড়িবে বটে, কিন্তু খুব বাড়িবে না। হয়ত গ্রাহক না কমিতেও পারে। অনেক লেখকের৷ধারণা আছে যে বিলাতে কাগজে লিখিয়া খুব আয় হয়। তাঁহাদের জন্য chamber's Encyclopædia হইতে নিম্নলিখিত কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"A general idea prevails among the public that to write for the Magazines is a sure and easy road to competence. As a matter of fact the number of contributors to periodical literature, not holding editorial appointments, who make £200 a year out of the magazines might probably be counted upon the fingers of one hand. The best paid contributions by the highest class reviews seldom exceed £1 a page of 500 words."

অর্থাৎ খুব ভাল কাগজের খুব ভাল লেখকেরা প্রায়ই ৫০০ কথার জন্য ১৫৲ টাকার বেশী পান না। কিন্তু এই সকল মাসিক পত্রের গ্রাহক যদি এক লক্ষ হয়, ত আমাদের কাগজগুলির গ্রাহক হইবে এক হাজার। এবং বিলাতের উৎকৃষ্ট লেখকদের সহিত, দু একজন বাদ দিয়া আমাদের দেশের লেখকদের তুলনা করাও বোধ হয় ঠিক্ নয়। না হয় উভয় শ্রেণীর লেখকদিগকে ক্ষমতা হিসাবে সমানই ধরিলাম। তাহা হইলে ও দেখিতে হইবে, বিলাতে লোকের গ্রাসাচ্ছাদনাদির কিরূপ খরচ পড়ে, আর আমাদের দেশেই বা কিরূপ পড়ে। এ বিষয়ে আমার ঠিক্ আন্দাজ নাই। কিন্তু ভদ্রলোকদের কিরূপ খরচ হইতে পারে, ছাত্রদের খরচ হইতে হয় ত তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে। কেম্ব্রিজে একজন ছাত্র মিতব্যয়িতার সহিত ১৫০৲ টাকায় নিজের খরচ চালাইতে পারে, কলিকাতায় ২০৲ টাকায় চলিতে পারে। তাহার পর, বিলাতের ভাল লেখকদের পুস্তক হাজার হাজার বিক্রীত হয়। এই জন্য তাঁহাদের লেখার জন্য তাঁহারা যত টাকা চান, আমাদের দেশের লেখকেরা কখনই তাহার সিকিও চাহিতে পারে না। সুতরাং বিলাতী উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র যেখানে ৫০০ কথার জন্য ১৫৲ টাকা দেয়, সে স্থলে আমাদের দেশে কেহ যদি ৫০০৲ কথার অর্থাৎ মোটামুটি প্রদীপের মত কাগজে এক পৃষ্ঠার জন্য ২৲ টাকা দেন ত নিতান্ত অন্যায় হয় না। বিশেষতঃ গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রদত্ত অর্থ হইতে যখন আমাদের আয় এত কম। ইহা গেল ভাল লেখার দর। চলনসই লেখার মূল্য অনেক কম। বিলাতে এখন ও অনেক মাসিক পত্র বিনামূল্যে প্রাপ্ত লেখায় চলে। আর একটা হিসাব দেখুন। একখানা ডিমাই আট পেজী বহি অর্থাৎ "সাহিত্যের" আকারের বহি ভাল করিয়া ছাপাইতে ও বাঁধাইতে প্রতি হাজারে প্রত্যেক আট পৃষ্ঠায় আন্দাজী দশ এগার টাকা পড়ে। প্রত্যেক আট পৃষ্ঠার মূল্য দুই পয়সা করিয়া রাখিলে ৩১।০ হয়। ইহা হইতে কাগজ, ছাপাই, বাঁধাই এবং পুস্তক বিক্রেতার কমিশন শতকরা ২৫৲ বাদ দিলে ১২।১৩, টাকা থাকে। অর্থাৎ গ্রন্থকার প্রতি পৃষ্ঠায় আন্দাজী ১।০ টাকা লাভ পান। ইহা হইতে বিজ্ঞাপনের খরচ বাদ দিলে লাভ তদপেক্ষা কম হয়। ছবি দিতে গেলে লাভ আরও কম থাকে। অবশ্য কোন কোন বহি এক হাজারের উপর বিক্রয় হয়, কিন্তু আমার ধারণা অধিকাংশ পুস্তকই (বিদ্যালয় পাঠ্য-পুস্তক বাদে) এক হাজারের চেয়ে বেশী বিক্রী হয় না। অনেক গ্রন্থের তদ্রূপ কাট্তি ও হয় না। শেষে প্রায় ওজনদরে গুরুদাস বাবু কিনিয়া লইয়া অর্দ্ধমূল্যে, সিকিমূল্যে, উপহার প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন। যে সকল পুস্তকের কাট্তি আছে, তাহাদেরও কাট্তি ধীরে ধীরে হয়; খরচ উঠিয়া গিয়া লাভের টাকাটা গ্রন্থকারের হাতে আসিতে সময় লাগে। আসল কথা এই, নিজ ব্যয়ে পুস্তক ছাপাইলে লাভ ক্ষতি উভয়েরই সম্ভাবনা আছে। টাকা লইয়া সম্পাদককে লেখা দিলে, যাহা পাওয়া যায়, তাহাই লাভ। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সাহিত্যের আকারের কাগজে লেখা দিয়া যদি কোন লেখক বিনা ঝঞ্ঝাটে পৃষ্ঠা প্রতি ১॥০ টাকা পান এবং সম্পাদক কপিরাইট না চান, তাহা হইলে লেখকের লোকসান নাই। বস্তুতঃ অনেক

লেখকের ইহা অপেক্ষা কমে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। কারণ সকলের লিখিত পুস্তক কিছু বিক্রী হয় না। আমি এতক্ষণ লেখার দরের বিষয় যাহা লিখিলাম, তাহার অর্থ বাজার দর। বাস্তবিক একখানি সদ্গ্রন্থের এক খণ্ডও বিক্রয় না হইতে পারে, কিন্তু তথাপি তাহা বহুমূল্য। আবার একখানা কুৎসিত গল্পের বহির খুব কাট্‌তি হইতে পারে; তাহা হইলেও তাহা মূল্য হীন। এরূপ মূল্যের বিষয় লেখা, কিম্বা লেখকগণের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন আমার উদ্দেশ্য নয়। আমাদের দেশে শিক্ষকদের বেতন কম। কিন্তু তাঁহাদের কাজ খুব মূল্যবান্। তাঁহাদের মজুরী কম বলিলে যেমন তাঁহাদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হয় না, সাহিত্যসেবীদের মজুরী কম বলিলেও তদ্রূপ তাঁহাদের অপমান করা হয় না।

যাহাই হউক লেখকদিগকে টাকা দিতে হইলে সে, ব্যয় বাড়িবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাল জিনিস চাহিলে মূল্য দিতেই হয়।

আমি যে লেখার জন্য টাকা দিতে বলিতেছি, তাহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কেহ যেন ভুল না বুঝেন। আমাদের ভাল ভাল লেখকদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহাদের অন্নবস্ত্র আয় এরূপ আছে, যে তাঁহাদের সাহিত্যজীবী হইবার কোনই প্রয়োজন নাই। তাঁহারা টাকার, বিশেষতঃ সামান্য টাকার, প্রত্যাশায় কলম ধরিবেন, এরূপ মনে করা ভুল। তবে তাঁহারা যখন গ্রন্থ লেখেন, এবং উহার দামও আছে, এবং বিক্রয়ের টাকাও লইয়া থাকেন, তখন কাগজে লিখিলে টাকা লইবেন না কেন? গ্লাড্‌ষ্টোন্ বা ডিউক্ অব্ আর্গাইলের সাহিত্যজীবী হইবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের দ্বারাও সাময়িক সাহিত্য পরিপুষ্ট হইত; এবং তাঁহারা টাকাও লইতেন। লেখার জন্য টাকা দিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইলে সম্পাদককে লেখকদের কাছে নিতান্ত ভিক্ষুক ও অনুগ্রহজীবী সাজিতে হয় না; অপেক্ষাকৃত দরিদ্র লেখকদের উপকার হয় ও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়, এবং কালে সাহিত্যসেবকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। কিছু টাকা দিতে পারিলে সম্পাদক মনে করিতে পারেন, "আমার যাহা সাধ্য লেখকগণকে দিলাম। যদি তাঁহাদের লেখার উপযুক্ত মূল্য না দিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি যেমন বিনালাভে বা অল্প লাভে পরিশ্রম করিতেছি, তাঁহারাও না হয় মাতৃভাষার সেবার জন্য তদ্রূপ কিছু স্বার্থ ত্যাগ করুন।" তাহা ছাড়া, অর্থের জন্য যাঁহাদের সাহিত্যসেবক হইবার আবশ্যক নাই, তাঁহারা লেখার জন্য টাকা লইতে স্বীকৃত হইলে, তাঁহাদের অপেক্ষা নির্দ্ধন লেখকগণের টাকা লইতে কোন সঙ্কোচ বোধ হইবে না। ইহাও কম লাভ নয়।

বর্ত্তমানে যতগুলি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক আছে, আমি যতদূর জানি তাহার সকল গুলিতেই আপত্তিজনক বিজ্ঞাপন থাকে। এগুলি উঠিয়া যাওয়া উচিত। একখানি আদর্শ কাগজ চালাইতে হইলে যদি আপাততঃ আয়ের অতিরিক্ত কিছু টাকা ব্যয় হয়, তাহা নির্ব্বাহ করিবার উপায় করা উচিত। বস্তুতঃ লোক শিক্ষার জন্য যেমন বিদ্যালয়ের প্রয়োজন, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রাদিরও তদ্রূপ প্রয়োজন। যেমন স্কুল কলেজ চালাইবার জন্য বড় লোকেরা টাকা দেন, তেমনি ভাল কাগজ চালাইবার জন্যও দান করা উচিত। কিন্তু একটী বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। যিনি খবরের কাগজ বা মাসিক পত্রের জন্য টাকা দিবেন, তিনি যেন নিজের খোসামোদ না চান। এইজন্য একজন পৃষ্ঠপোষক না হইয়া অনেকে মিলিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলে ভাল হয়।

হয়ত ভাল করিয়া কাগজ চালাইলে গ্রাহক কমিয়া যায়; হয়ত খরচ পোষায় না। বাস্তবিক গ্রাহকেরা যেমনটি চান তেমন লেখা দিতে গেলে, কাগজের আর মর্য্যাদা থাকে না; কোথায়, সম্পাদকেরা সাধারণের মত গঠন করিবেন না নিজেইরাই সাধারণের মতের অনুবর্ত্তী হইয়া উঠেন। আমাদের দেশে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। বিলাতেও বুয়র যুদ্ধ উপলক্ষে সাধারণ গ্রাহকবর্গের মতানুসারে কাগজ পরিচালন না করায় ডেলি ক্রনিক্লের সম্পাদককে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে।

আমি সম্পাদকের কার্য্যকে শিক্ষক বা অধ্যাপকের কার্য্য অপেক্ষা কম পবিত্র ও দায়িত্বপূর্ণ মনে করি না। বাঙ্গলা দেশের অনেক স্কুল কলেজ ছাত্রদত্ত বেতন হইতেই চলে। এই বিদ্যা মন্দিরগুলি বিদ্যার দোকান মাত্র। সকলেই খদ্দের বাড়াইবার চেষ্টায় আছেন। এইজন্য আমাদের দেশে শিক্ষার এমন দুরবস্থা, যখন ছাত্র ছাড়িয়া গেলে কলেজ উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা, তখন ছাত্রদিগকে শাসনে রাখা কখনই সুবিধাজনক হইতে পারে না। স্কুল

কলেজের উন্নতি করিতে হইলে endowment চাই। যেমন পুরাকালে চতুষ্পাঠী এবং দেবমন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর জমি দান করা হইত, একালে তদ্রূপ বিদ্যামন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সম্পত্তি দান প্রয়োজন। আমার মতে সাময়িক সাহিত্যের উৎকর্ষ বিধান এবং মর্য্যাদা রক্ষার জন্যও এইরূপ সম্পত্তির প্রয়োজন।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

বদাল-স্তম্ভে উৎকীর্ণ

রাম-গুরবমিশ্রের প্রশস্তি।



দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাংশে, মঙ্গলবাড়ী হইতে ৩ মাইল ও দমদমা হইতে ৭ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে (অক্ষা. ২৫°৫' উঃ ও দ্রাঘি. ৮৮°৫৮' পূঃ) বদাল-গ্রামে অবস্থিত। এই গ্রামের উত্তরাংশে বদাল-কাছারী নামক স্থানে, একটী ১২ ফিট উচ্চ প্রস্তরস্তম্ভ দণ্ডায়মান; এই স্তম্ভের মাথায় একটী গরুড়মূর্ত্তি ছিল, সেইজন্য এই স্তম্ভের নাম হয় 'গরুড়স্তম্ভ'। স্থানীয় লোকেরা ইহাকে 'ভীমের লাঠী' বলিয়া জানে। এই গরুড়স্তম্ভের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উক্ত স্তম্ভে আলোচ্য প্রশস্তি লিখিত হইয়াছিল।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে চার্লস্ বিল্‌কিন্স এই বদাল-স্তম্ভলিপি আবিষ্কার করেন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহার অনুবাদ ও অক্ষরের নমুনা এবং সর্ উইলিয়াম্ জোন্‌স্ ইহার উপর গবেষণাপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করেন।* তৎপরে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ওয়েষ্টমেকট সাহেব পণ্ডিত হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নিকট হইতে একখানি অস্পষ্ট প্রতিলিপি সংগ্রহ করেন, তাহাই অনুবাদ সহ সুপণ্ডিত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রকাশ করেন।† কিন্তু প্রকাশিত উভয় পাঠ বা অনুবাদই মূল-শিলালিপি-সম্মত নহে।

* Asiatic Researches, Vol. I, pp. 131-144.
† Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. XLIII, pt I, pp. 356-363.

উক্ত প্রশস্তির প্রকৃত পাঠ উদ্ধার করিবার জন্য ভারত-গবর্ণমেণ্ট গারিক সাহেবকে পাঠাইয়া উহার কতকগুলি ছাপ (impressions) তুলিয়া আনেন, এই ছাপগুলির সাহায্যে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক কিলহোর্ণ সাহেব উহার প্রকৃত পাঠপ্রকাশে যত্ন করেন।*

অবশেষে "ঐতিহাসিক চিত্রের"-সম্পাদক সেই শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে-প্রকাশিত বিকৃত পাঠের উপর নির্ভর করিয়া উক্ত শিলালিপির বিস্তৃত আলোচনা করেন।† কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা মূল শিলালিপির অনুযায়ী না হওয়ায় অনেকেই তৎপাঠে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এই কারণ আমার কোন কোন সহৃদয় বন্ধু গরুড়স্তম্ভলিপির যথাযথ পাঠ ও তাহার অনুবাদ প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন, তাঁহাদের আগ্রহে অদ্য যথাসাধ্য পাঠ উদ্ধার করিয়া উপস্থিত করিলাম।

আলোচ্য শিলালিপির পাঠোদ্ধারকল্পে তিনটী উপায় অবলম্বিত হইয়াছে:—

১ম। দিনাজপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী দত্ত গত ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই জুন তারিখে সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের নিকট উক্ত মূল লিপির (পেন্সিল ঘসিয়া) এক প্রস্থ প্রতিকৃতি প্রেরণ করেন, হীরেন্দ্র বাবু তৎকালে পাঠোদ্ধারের জন্য আমাকে সেই প্রতিকৃতি প্রদান করিয়াছিলেন।

২য়। দিনাজপুর-নিবাসী আমার এক বন্ধু ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ৩রা জানুয়ারী উক্ত লিপির একখানি ফটোগ্রাফ পাঠাইয়াছেন।

৩য়। অধ্যাপক কিল্‌হোর্ণ সাহেব গারিকের ছাপ হইতে যে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন।

এই তিন প্রস্থের সাহায্যে বর্ত্তমান প্রতিলিপি নির্ণীত হইল।

শিলালিপির পরিচয়।

এই শিলালিপিতে ২৯ পঙ্‌ক্তি আছে। যে স্থানের উপর ঐ পঙ্‌ক্তিগুলি সন্নিবিষ্ট, তাহা দৈর্ঘ্যে ১ ফুট ৮½ ইঞ্চ এবং প্রস্থে ১ ফুট ৮½ ইঞ্চ। অক্ষরের আয়তন প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চ। ১ম ও ২য় পঙ্‌ক্তির আদ্যক্ষর দুইটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,

* Epigraphia Indica, Vol. II. pp. 160-167.
† ঐতিহাসিক চিত্র ১ম বর্ষ।

এতদ্ভিন্ন পাথরের চোকলা উঠিয়া ২৫শ হইতে ২৮শ পঙ্‌ক্তির আদ্য অনেকগুলি অক্ষর অস্পষ্ট হইয়াছে। অক্ষরগুলির ছাঁদ অনেকটা মদনপালের তাম্রশাসনধৃত অক্ষরের মত।* তবে দেখিলেই শেষোক্ত তাম্রশাসনের অক্ষরের অপেক্ষা এই শিলালিপির ছাঁদ অনেকটা প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। খ্রীষ্টীয় ৯ম ও ১০ম শতাব্দীতে যে অক্ষর এই বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল, এই শিলালিপি সেই অক্ষরে খোদিত হইয়াছে। সূত্রধার বিষ্ণুভদ্রের পরিচয় ব্যতীত আর সকল অংশই সংস্কৃতশ্লোকে গ্রথিত। এই লিপির সর্ব্বত্রই একটী "ব", বর্গীয় "ব" স্থানে অন্তস্থ "ব", "ব"এর পূর্ব্বে অনুস্বারের স্থানে "ম্ব" এবং অনুস্বারের পরিবর্ত্তে তিনটী স্থলে ঙ্‌ (১,২১ ও ২৬ পঙ্‌ক্তি) এবং এক স্থলে "ন্‌" (যথা ৭ম পঙ্‌ক্তিতে পান্সু) ব্যবহৃত হইয়াছে। দুই এক স্থানে সন্ধিব্যত্যয় এবং লুপ্ত অকারের অনর্থক ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

এই শিলালিপির উদ্দেশ্য।

গরুড়মূর্ত্তিশোভিত স্তম্ভের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষেই এই লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এখন কিন্তু সেই গরুড়মূর্ত্তির অংশ নষ্ট হইয়াছে। গরুড়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে লিখিত হইলেও রাম-গুরবমিশ্র এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের মহিমা বর্ণন করাই এই প্রশস্তির মুখ্য উদ্দেশ্য।

ঐতিহাসিক তত্ত্ব।

এই শিলালিপি হইতে কয়েকজন গৌড়াধিপ পালরাজের নাম এবং তাঁহাদের ব্রাহ্মণ-মন্ত্রিবংশের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়:—

শাণ্ডিল্যবংশে (বিষ্ণু?) জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার কুলে বীরদেব, তদ্‌গোত্রে পাঞ্চাল এবং তাঁহা হইতে গর্গ উৎপন্ন হইয়াছিলেন (১ম শ্লোঃ)। এই গর্গ পূর্ব্বদিক্‌পতি ধর্ম্মের (অর্থাৎ ধর্ম্মপালের) উপদেষ্টা ছিলেন (২য় শ্লোক)। গর্গ ইচ্ছার পাণিগ্রহণ করেন, তাঁহার পুত্র দর্ভপাণি রাজা দেবপালের মন্ত্রী হইয়াছিলেন (৩-৭ম শ্লোঃ)। দর্ভপাণির সহিত শর্করাদেবীর বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভে সোমেশ্বরের জন্ম (৮—৯ম শ্লোঃ)। সোমেশ্বর রল্লাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন, (১০ম শ্লোঃ) তাঁহার পুত্র কেদারমিশ্র। এই কেদারমিশ্রের মন্ত্রণাবলে গৌড়াধিপ উৎকল, হূণ, দ্রবিড় ও গুর্জ্জরদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন (১৩শ শ্লোঃ) এবং ইনি যজ্ঞে রাজা শূরপালকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই কেদারমিশ্রের সহিত দেবগ্রামীয় বব্বাদেবীর বিবাহ হয় (১৮শ শ্লোঃ), তাহার গর্ভে প্রসিদ্ধ রাম-গুরবমিশ্র জন্মলাভ করেন (১৮শ শ্লোঃ) রাজা নারায়ণপালের নিকট ইনি উচ্চ সম্মানলাভ করিয়াছিলেন* (১৯শ শ্লোঃ)। বদালের গরুড়স্তম্ভ রাম-গুরবমিশ্রের কীর্ত্তি (২৭ শ্লোঃ)। সূত্রধার বিষ্ণুভদ্র কর্ত্তৃক এই প্রশস্তি খোদিত হইয়াছে (২৯শ পঙ্‌ক্তি)

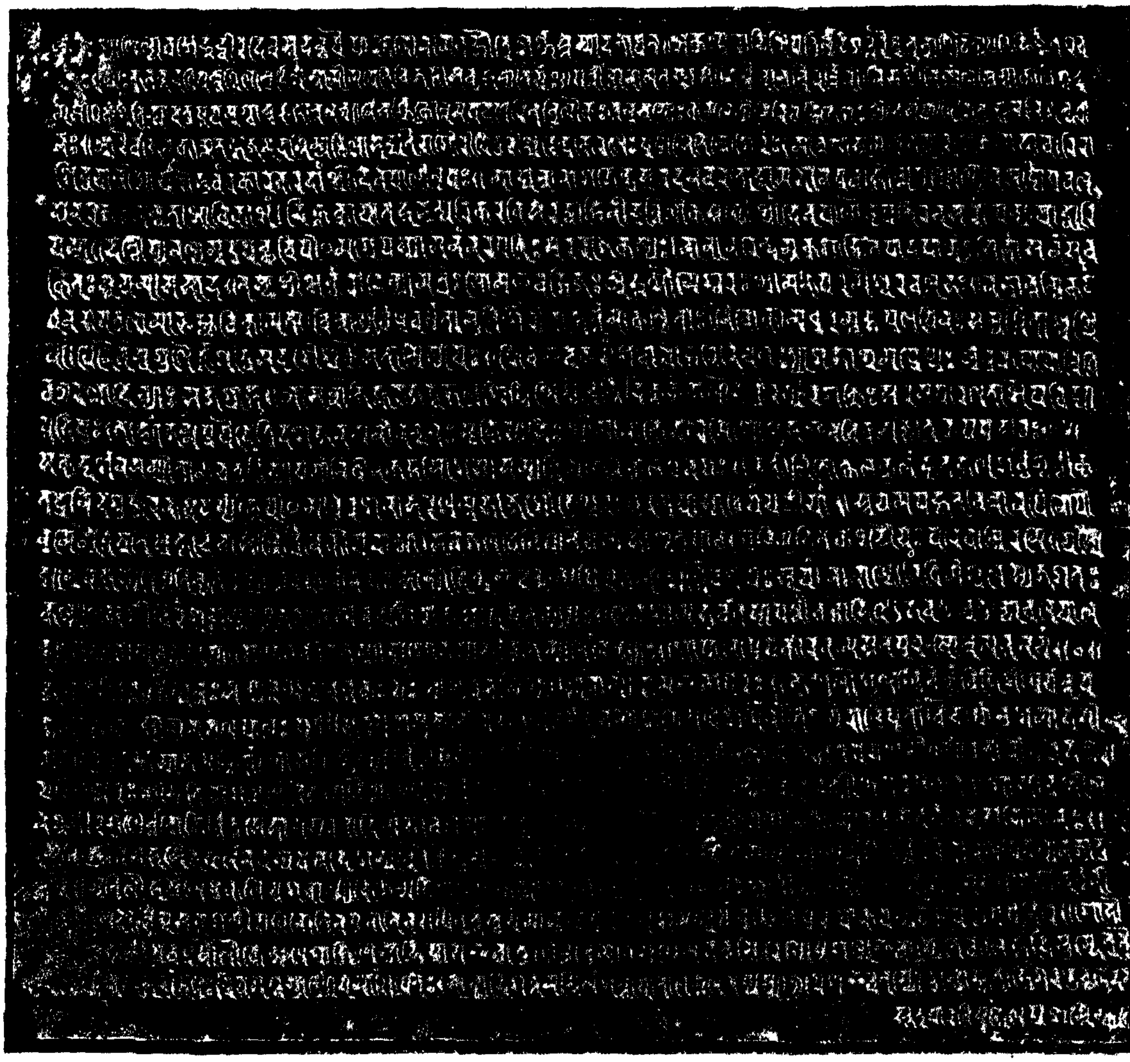
প্রতিলিপি।

১ম পঙ্‌ক্তি। (বিষ্ণু)[1] শাণ্ডিল্যবঙ্‌শে[2]ভূদ্বীরদেব-
স্তদন্বয়ে।
পাঞ্চালো নাম তদ্গোত্রে গর্গস্তস্মাদজায়ত ॥ [১]
শক্রঃ পুরোদিশি পতির্ন দিগন্তরেষু
তত্রাপি দৈত্যপতিভির্জ্জিত এব
২য়।
ধর্ম্মঃ কৃতস্তদধিপস্ত্বখিলাসু দিক্ষু
স্বামী ময়েতি বিজহাস বৃহস্পতিং যঃ ॥ [২]
পত্নীচ্ছা নাম তস্যাসীদিচ্ছেবান্তর্ব্বিবর্ত্তিনী।
নিসর্গনির্ম্মলস্নিগ্ধা কান্তিশ্চন্দ্র-
৩য়। মসো যথা ॥ [৩]
বিদ্যাচতুষ্টয়মুখাম্বুরুহাত্তলক্ষ্মা
নৈসর্গিকোত্তমপদাধরিতত্রিলোকঃ।
সূনুস্তয়োঃ কমলযোনিরিব দ্বিজেশঃ
শ্রীদর্ভপাণিরিতি নাম নিজন্দধা-
৪র্থ। নঃ ॥ [৪]
আরেবাজনকান্মতঙ্গজমদস্তিম্যচ্ছিলসঙ্ঘতে[3]
রাগৌরীপিতুরীশ্বরেন্দুকিরণৈঃ পুষ্যৎ সিতিম্নো
গিরেঃ।

* বিশ্বকোষ ১১শ ভাগ "পালরাজবংশ" শব্দে এবং সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ৫মভাগ ১৪৪ পৃষ্ঠায় মদনপালের তাম্রশাসনের প্রতিকৃতি দ্রষ্টব্য।

* ভাগলপুর হইতে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের তাম্রশাসনে ইনি দূতক ও ভট্ট গুরব নামে আখ্যাত হইয়াছেন। উক্ত পালরাজগণের বিস্তৃত ইতিহাস বিশ্বকোষের ১১শ ভাগে "পালরাজবংশ" শব্দে দ্রষ্টব্য।

১ মূল অস্পষ্ট, যেন 'বিষ্ণু' এইরূপ বোধ হয়।
২ বংশে। ৩ সংহতে।



বদালস্তম্ভে উৎকীর্ণ—রামগুরব মিশ্রের প্রশস্তি (মূল লিপির ঠু অংশ)।

মার্ত্তণ্ডাস্তময়োদয়ারুণজলাদাবারিরা-
৫ম। শিদ্বয়া-
ন্নীত্যা যস্য ভুবং চকার করদাং শ্রীদেব-পালো
নৃপঃ ॥ [৫]

মাদ্যন্নানাগজেন্দ্রস্রবদনবরতোদ্দামদানপ্রবাহো-
ম্মৃষ্টক্ষোণীবিসর্পিপ্রবল
৬ষ্ঠ। ঘনরজঃসম্বৃতা[৪] শাবিকাশং[৫]।

দিকৃচক্রাযাতভূভৃৎপরিকরবিসরদ্বাহিনীদুর্ব্বিলোক-
স্তস্থৌ শ্রীদেবপালো নৃপতিরবসরাপেক্ষয়া দ্বারি
৭ম। যস্য ॥ [৬]

দকৃচা[৬]প্যনল্পমুড়ুপচ্ছবিপীঠমগ্রে
যস্যাসনং নরপতিস্সুররাজকল্পঃ।
নানানরেন্দ্রমুকুটাঙ্কিতপাংসুঃ[৭]
সিংহাসনং সচ-
৮ম। কিতঃ স্বয়মাসসাদ ॥ [৭]

---

৪ সংবৃতাশা।

৫ অধ্যাপক কিলহোর্ণ 'সংবৃতাশাবকাশং' এই পাঠই স্থির করিয়াছেন, কিন্তু মূলে স্পষ্ট 'বিকাশং' এই পাঠ আছে।

৬ দত্বা। ৭ পাংশু।

তস্য শ্রীশর্করাদেব্যামত্রেঃ সোম ইব দ্বিজঃ।
অভূৎ সোমেশ্বরঃ শ্রীমান্ পরমেশ্বরবল্লভঃ ॥ [৮]
ন ভ্রান্তুম্বিকটং[৮]
৯ম। ধনঞ্জয়তুলামারুহ্য বিক্রামতা
বিত্তান্যর্থিষু বর্ষতা স্তুতিগিরো নোচ্চার্ব্বমাকর্ণিতাঃ।
নৈবোক্তা মধুবস্থু[৯] প্রণয়িনঃ সম্বল্গিতাশ্চশ্রিয়া।[১০]
১০ম।
যেনৈবং স্বগুণৈর্জ্জগদ্বিসদৃশৈশ্চক্রে
সতাম্বিস্ময়ঃ[১১] ॥ [৯]
শিব ইব করং শিবায়া হরিরিব লক্ষ্ম্যা
গ্রহাশ্রমপ্রেপ্সুঃ।
অনুরূপায়া বিধি-
১১শ। বৎ[১২] রল্লাদেব্যাঃ স জগ্রাহ ॥ [১০]
আসন্নাজিস্কুরাজদ্বহলশিখিশিখাচুম্বিদিক্চক্রবালো
দুর্ব্বারস্ফারশক্তিঃ স্মরসপরিণতাশেষবিদ্যা-
১২শ। প্রতিষ্ঠঃ।
তাভ্যাং জন্ম প্রপেদে ত্রিদশজনমনোনন্দনঃ
স্বক্রিয়াভিঃ
শ্রীমান্ কেদারমিশ্রো গুহ ইব বিকসজ্জাত-
রূপপ্রভাবঃ ॥ [১১]
১৩শ। সকৃদ্দর্শনসম্পীতান্[১৩] চতুর্ব্বিদ্যাপয়োনিধীন্
[।]
জহাসাগস্ত্যসম্পত্তিমুদ্গিরম্বাল এব যঃ ॥ [১২]
উৎকীলিতোৎকলকুলং হৃতহূণগর্ব্বং
খর্ব্বীকৃ-
১৪শ। তদ্রবিড়গুর্জ্জরনাথদর্প্পং।
ভূপীঠমব্ধিরশনাভরণম্বুভোজ
গৌড়েশ্বরশ্চিরমুপাস্য ধিয়ং যদীয়াং ॥ [১৩]
স্বয়মপহৃতবিত্তানর্থিনো যো-
১৫শ। নুমেনে

দ্বিষতি সুহৃদি চাসৌন্নির্ব্বিবেকো যদাত্মা।
ভবজলধিনিপাতে যস্য ভীশ্চ ত্রপা চ।[১৪]
পরিমুদিতকশায়ো[১৫] যঃ পরে ধাম্নি রেমে ॥ [১৪]
যস্যো-
১৬শ। জ্যাস্যুরহস্পতিপ্রতিকৃতেঃ শ্রীশূরপালো নৃপঃ
সাক্ষাদিন্দ্র ইব ক্ষতাপ্রিয়বলো গত্বৈব ভূয়ঃ স্বয়ং
নানাম্ভোনিধিমেখলস্য জগতঃ
১৭শ। কল্যাণসঙ্গী[১৬] চিরং
শ্রদ্ধাম্ভঃপ্লুতমানসো নতশিরা জগ্রাহ
পূতম্পয়ঃ ॥ [১৫]
দেবগ্রামভবা তস্য পত্নী বব্বাভিধাঽভবৎ ॥
অতুল্যা চলযা ল-
১৮শ। ক্ষ্ম্যা সত্যা চাপ্যনপত্যয়া ॥ [১৬]
সা দেবকীব তস্মাদ্যশোদয়া স্বীকৃতম্পতিং লক্ষ্ম্যাঃ।
গোপালপ্রিয়কারকমসূতপুরুষোত্তমন্তনয়ং[+]॥[১৭]
১৯শ। জমদগ্নিকুলোৎপন্নঃ সম্পন্নক্ষত্রচিন্তকঃ [।]
যঃ শ্রীগুরবমিশ্রাখ্যো রামো রাম ইবাপরঃ। [১৮]
কুশলো গুণাম্বিবেক্তুং বিজিগীষুর্যন্নৃপ-
২০শ। শ্চ বহুমেনে।
শ্রীনারায়ণপালঃ প্রশস্তিরপরাস্তু কা তস্য ॥ [১৯]
বাচাম্বৈভব[১৭] মাগমেষধিগমং নীতেঃ
পরান্নিষ্ঠতাং[১৮]।
বেদার্থানুগমাদসী-
২১শ। মমহসো বঙশস্য[১৯] সম্বন্ধিতাং।
আসক্তিঙ্গুণকীর্ত্তনেষু মহতান্নিষ্কাততাং
জ্যোতিষো
যস্যানল্পমতেরমেয়যশসো ধর্ম্মাবতারোঽবদৎ ॥
[২০]
২২শ। যস্মিন্মিথঃ শ্রীভূতি বাগধীশে
বিহায় বৈরাণি নিসর্গজানি।

---

৮ ভ্রান্তং বিকটং। ৯ মধুরং বহু। ১০ (ছেদ নিষ্প্রয়োজন)। ১১ সতাং বিস্ময়ঃ। ১২ বিধিবল্লভা। ১৩ সংপীতাশ্চতুঃ।

১৪ (ছেদ নিষ্প্রয়োজন)। ১৫ কষায়ো। ১৬ কল্যাণসংশী। + পুরুষোত্তমং তনয়ং। ১৭ বাচাং বৈভবং। ১৮ (ছেদ হইবে না)। ১৯ বংশস্য।

উভে স্থিতে সখ্যমিবাধিগত্য‍া-

বেকত্র লক্ষ্মীশ্চ সরস্বতী চ ॥ [২১]

শাস্ত্রানুশীল-

নগভীরগুণৈর্ব্বচোভি-

২৩শ। র্ব্বিদ্বৎসভাসু পরবাদিমদাবলেপঃ [।]

উদ্বাসিতঃ সপদি যেন যুধি দ্বিষাঞ্চ

নিস্সীমবিক্রমধনেন [ভ]টাভিমানঃ ॥ [২২]

২৪শ। [আবির্ব্বভূ]ব সহনৈব ফলং ন যস্য

যস্যাদ্ৰশম্ব্যধিত[২০] কর্ণসুখন্ন কিঞ্চিৎ।

যৎপ্রাপ্য দানপতিমর্থিজনোন্যমেতি

তৎকেলিদানমপি যস্য ন জাতু

২৫শ। — ◡ *[২১] ॥

অতিলোমহষণেন[চ] কলিযুগ বাল্মীকি

জন্মপিশুনেন।

ধর্ম্মেতিহাসপর্ব্বসু পুণ্যাত্মা যঃ শ্রুতীর্ব্যরণোৎ ॥

[২৪]

অসিন্ধুপ্রসৃতা যস্য স্বধুনী

২৬শ। ◡ — ◡[২২] [ধা]।

বাণী প্রসন্নগম্ভীরা ধিনোতি চ পুনাতি চ ॥ [২৫]

পিতৃত্বং স্বয়মাস্থায় পুত্রত্বমগৎস্বয়ং [।]

ব্রহ্মেতি পুরুষান্ যস্য বঙ্শে[২৩] যঞ্চ

প্রপেদিরে ॥ [২৬]

শোভো

২৭শ।— ◡ ◡ —[২৪] স্বকীয়বপুষোলোকেক্ষণগ্রাহিণি

স্বাভিপ্রায় ইবাতুলোন্নতিমতি স্বপ্রেমবন্ধস্থিরে।

স্পষ্টং শল্য ইবার্পিতে কলিহৃদি সম্ভেত্র তে

২৮শ। * * *

* * * ফণিনাং হরেঃ প্রিয়সখস্তার্ক্ষ্যোযমা-

রোপিতঃ।

আস্ত্রাদিগন্তমখিলং গত্বা পাতালমূলমপ্যস্মাৎ।

যশ ইব তস্যোত্তস্থৌ হৃতাহিগরুড়চ্ছলাদমলম্ ॥

[২৮]

২৯শ। সূত্রধারবিষ্ণুভদ্রেণ প্রশস্তি ক্ষণিতং [॥]

উক্ত প্রশস্তির ঐতিহাসিক অংশ বিবৃত হওয়ায় বাহুল্য-ভয়ে অনুবাদ প্রদত্ত হইল না।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

২০ দৃশং ব্যধিত। ২১ (মূলে নাই, উঠিয়া গিয়াছে)। ২২ (মূলে নাই, উঠিয়া গিয়াছে)। ২৩ বংশে। ২৪ (মূলে নাই, উঠিয়া গিয়াছে। ২৫ (এখানে তিনটী অক্ষর ও পরবর্ত্তী ছত্রে আদ্য তিনটী অক্ষর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে)।

স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত।



ব প্রবাহমান কালস্রোত একে একে আমাদের সকল রত্নগুলিকেই ভাসাইয়া লইয়া বিস্মৃতি-সাগরের অতল সলিলে নিমগ্ন করিতেছে। শত শত আবর্জ্জনা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভাসিয়া যায়; কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়? তাহার সহিত একটী অমূল্য নিধি যাইলেই আমরা জগৎ আঁধার দেখি। অকাল জলদে সাহিত্যাকাশের একে একে সকল প্রদীপ্ত জ্যোতিষ্কগুলিকেই ঢাকিতেছে। এ পৃথিবীতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। তবে, যাহা যায়—সেই স্থানে যদ্যপি সেইরূপ আর একটী প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা হইলেও হয়। কিন্তু আমাদের এমনি দুর্ভাগ্য যে, যে আসনটী একবার শূন্য হইতেছে তাহা প্রায় আর পূর্ণ হইতেছে না; অধিকাংশ স্থলেই একেবারে শূন্য রহিয়া যাইতেছে। আমাদের গৌরব করিবার আর কয়জন রহিল? যে পথে বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিম ইত্যাদি মহাত্মাগণ গিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ের আমাদের বঙ্গভাষার সর্ব্বপ্রধান ঐতিহাসিক রজনীকান্তও সেই পথের পথিক হইলেন। দুঃখিনী বঙ্গমাতার নিতান্ত দুরাদৃষ্ট, তাই আজ

* নানা কারণে এই প্রবন্ধটী যথাকালে প্রকাশিত হইতে পারে নাই।—প্রদীপ সম্পাদক।

এই দুর্দ্দিনে আমরা রজনীকান্তের ন্যায় একজন প্রকৃত সাহিত্যসেবককে হারাইলাম।

বাঙ্গালা ১২৫৬ সালের ভাদ্রমাসের ২৯শে তারিখে মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন মত্তগ্রামে মাতুলালয়ে রজনীকান্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺কমলাকান্ত গুপ্ত তেঁওতা গ্রামে বাস করিতেন। রজনীকান্ত পিতা মাতার সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তান। পুণ্যবতী জননী তাঁহার পাঁচটী পুত্র ও একটী কন্যাকে রাখিয়া পূর্ব্বেই স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

রজনীকান্তের বাল্যশিক্ষা তাঁহার গ্রাম্য বিদ্যালয়েই শেষ হইয়াছিল। তাঁহার শৈশব জীবনে এমন একটি দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়, যাহার বিষময় ফল আজীবন যন্ত্রণার কারণ হইয়াছিল। যখন তাঁহার বয়ক্রম সাত আট বৎসর, তখন তিনি একবার কঠিন জ্বররোগে আক্রান্ত হন, জীবনের আশা অতি অল্পই ছিল। ঈশ্বরেচ্ছায় অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া অবশেষে আরোগ্যলাভ করিলেন বটে; কিন্তু ঐ সময় হইতে চিরদিনের জন্য তাঁহার শ্রবণশক্তি দুর্ব্বল হইয়া গেল এবং জীবনের অন্তকাল পর্য্যন্ত কখন তাহার কিছু উপশম হয় নাই, বরং ক্রমশই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

যে অসাধারণ প্রতিভা বলে রজনীকান্ত যশস্বী হইয়াছেন, সেই মহান্ তরুবীজ শৈশবেই তাঁহার উর্ব্বর মানস ক্ষেত্রে প্রোথিত হইয়াছিল। সেই নাগরিকতার লেশমাত্র শূন্য, পার্থিব লালসা-বিলাসিতা হীন, সামান্য পল্লিমধ্যেই তাঁহার জীবন বীণার তন্ত্রীগুলি যথাস্থানে সংবদ্ধ হইয়াছিল। তিনি রোগমুক্ত হইবার পর যথাসময়েই প্রশংসার সহিত ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চারি টাকা হিসাবে চারি বৎসরের জন্য বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইবার তাঁহার অভিভাবকগণ শ্রবণশক্তির অল্পতা বশতঃ অধিক শিক্ষা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তী করিয়া দেন। তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল যে, তাঁহার ব্যাকরণে কিছু ব্যুৎপত্তি লাভ হইলেই বৈদ্যশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইবে। কিন্তু তাঁহাদের আশা পুরিল না। যিনি আজীবন সাহিত্যসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া স্বদেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার কি কখন সাহিত্যসেবা ভিন্ন অপর পথ অবলম্বনে মতি হইতে পারে? রজনীকান্তের শিক্ষকেরা তাঁহার বিদ্যা শিক্ষার প্রতি বিশেষ যত্ন দেখিয়া সর্ব্বদা প্রশংসা করিতেন। এই সময়ে স্বর্গীয় পণ্ডিত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি রজনীকান্তের শিক্ষা বিষয়ে আন্তরিক অনুরাগ দর্শন করিয়া তাঁহার অধীনস্থ শিক্ষকদিগের প্রতি তাঁহার শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ যত্ন লইবার অনুমতি প্রদান করেন। তিনি তখন বুঝিতে পারেন নাই যে, রজনীকান্তের যত্ন কেবল সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতিই সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি অপর সকল বিষয়ে উপেক্ষা করিয়া মনোযোগের সহিত কেবল সংস্কৃত শিক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে এণ্ট্রান্স ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করিলেন।

রজনীকান্ত অল্প বয়সেই বাঙ্গালা রচনায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন। তিনি ক্লাসের সাধারণ পরীক্ষায় বাঙ্গালা রচনা বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতেন। জয়দেবচরিত নামক পুস্তকখানি তাঁহার প্রথম রচিত। তৎকালে কোন সমিতি, জয়দেব সম্বন্ধে যে ব্যক্তি সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন, তাহাকে একটী পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করেন। রজনীকান্তের জয়দেব চরিত উক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবার আশায় রচিত; বলা বাহুল্য তাঁহার রচনাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হওয়ায় তিনিই সেই পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জয়দেব চরিত, লেখকের প্রথম গ্রন্থ হইলেও উহা বঙ্গসাহিত্যের একখানি উপাদেয় সামগ্রী। তৎকালে ঐ পুস্তক প্রকাশিত হইলে বিদ্বজ্জন-মণ্ডলী উহার ভাষা ও রচনার মাধুর্য্য দেখিয়া রজনীকান্তের ভাবি প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছিলেন। বলিতে গেলে জয়দেবচরিত হইতেই তাহার প্রতিভার বিকাশ। রজনীকান্তের দ্বিতীয় গ্রন্থ পাণিনি বিচার। বঙ্গসাহিত্যে এরূপ প্রকৃত গবেষণা-পূর্ণ গ্রন্থ অতি বিরল। তাঁহার গ্রন্থ সমূহের সমালোচনা করা এস্থলে আমাদের উদ্দেশ্য নহে, আর আমাদের সামান্য হৃদয়ে সে ক্ষমতাও নাই। যে বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস রজনীকান্তকে অমর করিয়াছে, তাহার প্রথম খণ্ড এই সময়েই রচিত হয়। সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস শেষ করিতে অনেক দিন লাগিয়াছিল, মৃত্যুর অতি অল্প দিন পূর্ব্বেই উক্ত পুস্তকের পঞ্চম বা শেষ ভাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তাঁহার আদরের সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস বঙ্গীয় পাঠকমণ্ডলী কিরূপ আদরের

সহিত গ্রহণ করিলেন তাহা তিনি দেখিয়া যাইতে পারিলেন না।

রজনীকান্তের রচনা বাঙ্গালা দেশের প্রাকৃতিক নিয়মের বৈপরীত্য ঘটাইয়াছে। উজ্জ্বল শুভ্র তাড়িতালোকসম কবি-কল্পনা-প্রসূত কাব্যের প্রেম, উচ্ছ্বাস, বিরহ, মিলনরূপ এক ঘেয়ে প্রখর আলোক হইতে জ্যোৎস্নাময়ী প্রকৃতির স্নিগ্ধ সমীরে ক্ষণিক বিরামের উপায় করিয়া দিয়া তিনি বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকাদিগের পরমোপকার সাধন করিয়াছেন। তিনি সাহিত্যরাজ্যের মধ্যে যে মার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা বড়ই নির্জ্জন, অধুনা কোন কোন মহাত্মা সেই পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহার সময়ে তাঁহার সহযোগীর নিতান্ত অভাব ছিল। সুখের কথা, এক্ষণে অনেকেই তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিতেছেন। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, রজনীকান্ত জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অন্য পন্থা অবলম্বন করেন নাই।

জয়দেব চরিত, পাণিনি বিচার, সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস ভিন্ন আর্য্যকীর্ত্তি, ভারতকাহিনী, ভারতের ইতিহাস ইত্যাদি অনেকগুলি গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন। প্রায় সকলগুলিই সাহিত্য সাগরের এক একটী রত্ন তুল্য। প্রথম অবস্থায় রজনীকান্ত দেশের প্রসিদ্ধ সংবাদ ও মাসিকপত্রে বহুল পরিমাণে ঐতিহাসিক প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতেন, এবং পরে সেই সকল প্রবন্ধই আর্য্যকীর্ত্তি নামে পুস্তকাকারে একে একে তিনখণ্ডে প্রকাশ করেন। ভারতপ্রসঙ্গ এবং আরও দুই একখানি পুস্তক এইরূপে প্রকাশিত হয়। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও ভূদেব বাবুর সহিত এই সময়ে তাঁহার আলাপ হয়, এবং ভূদেব বাবুর অনুরোধে 'এডুকেশন গেজেটে' তিনি নিয়মিতরূপে প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করেন।

বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া রজনীকান্ত যে বৈদ্যশাস্ত্রে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন তাহা নহে। বিদ্যালয় ত্যাগের পর যখন তিনি পাণিনি বিচার, সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস ইত্যাদি পুস্তক সকল প্রণয়ন করেন, তখন কলিকাতার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ব্রজেন্দ্র কবিরাজের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি সাহিত্যানুরাগী রজনীকান্ত একমাত্র ভারতীদেবীর অর্চ্চনা ভিন্ন অন্য কোন ব্রত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষায় বিশেষ মনোযোগ স্থাপন করিতে বা চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিতে সক্ষম হন নাই।

রজনীকান্ত ধনবানের পুত্র ছিলেন না। তাঁহার ন্যায় অবস্থাপন্ন লোকের পক্ষে চাকুরী ভিন্ন অর্থোপায়ের অপর কোন উপায় নাই। কবিরাজি শিক্ষাতেও তাঁহার আন্তরিক যত্নের অভাব দেখিয়া আত্মীয়েরা তাঁহার জন্য একটী সব্ ডিপুটী কালেক্টারের পদ যোগাড় করিয়াছিলেন, কিন্তু বোধ হয় যাবজ্জীবন সাহিত্য সেবায় অতিবাহিত করিবার মানসেই তিনি স্বেচ্ছায় উক্ত পদ গ্রহণ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। এবং এই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াই বোধ হয় তিনি তাঁহার প্রধান ও প্রসিদ্ধ সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করেন। জয়দেব চরিত হইতে তাঁহার প্রতিভার বিকাশ হয়, এবং সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাসে তাহার পূর্ণতা সাধন হয়। কেবল মাত্র গ্রন্থ রচনা করিয়া সংসারের আর্থিক অভাব দূর করা বঙ্গীয় গ্রন্থকারদিগের পক্ষে অসম্ভব বলিলেও হয়। রজনীকান্ত এই অভাব দূর করিয়া কোন প্রকারে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ইচ্ছায় বিদ্যালয়-পাঠ্যপুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। গম্ভীর ও গুরুতর বিষয় সকল লিখিয়া তিনি যেরূপ পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছিলেন, বালকপাঠ্য প্রবন্ধগুলিতেও সেইরূপ নানা গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

যে সকল মহাপুরুষ কোন উচ্চ ও মহত্তর বিষয় লক্ষ্য করিয়া জীবন-পথে অগ্রসর হন, তাঁহাদের পবিত্র হৃদয়ে যশোলিপ্সা, অহঙ্কার ইত্যাদি সামান্য বৃত্তিগুলিও স্থান পায় না। রজনীকান্ত আজীবন অপ্রতিহতভাবে পরিশ্রম করিয়া কয়খানি উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে জননী ভারতীর হেমাঙ্গ সাজাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু তজ্জন্য একদিনও তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রে অহঙ্কার বা যশের আকাঙ্ক্ষার চিহ্ন কেহ দেখে নাই। কেমন করিয়া জগৎ সমীপে আত্মগুণের পরিচয় দিতে হয়, কেমন করিয়া অপেক্ষাকৃত সামান্য অবস্থার ব্যক্তি-দিগের উপর প্রভুত্ব খাটাইতে হয়, সে চিন্তা করিবার অবসর তিনি কখন পান নাই। তিনি যেমন অমায়িক, তেমনই ধীর, নম্র, বিনয়ী ও আমোদপ্রিয় ছিলেন। পরোপকার তাঁহার প্রধান ব্রত ছিল, মানবজীবনের উন্নতির জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ছোট ছোট বালক বালিকাদিগকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

রজনীকান্ত বড়ই আড়ম্বর শূন্য ছিলেন, পরের কথায় থাকিতে তিনি কখনই ভালবাসিতেন না। তিনি হুজুকপ্রিয় ছিলেন না। যে বিষয়ে তিনি হস্তক্ষেপ করিতেন তাহা প্রাণপণে সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিতেন। ঐরূপ চরিত্র আমাদের সর্ব্বথা অনুকরণীয়।

নিজ অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে রজনীকান্ত যেরূপ সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কম প্রশংসার কথা নহে। কেবল মাত্র স্বলিখিত পুস্তকের আয় হইতে তিনি পরিবারবর্গের প্রতিপালন করিয়া কলিকাতা সহরের মধ্যে একটী নাতিক্ষুদ্র দ্বিতল বাটী ও একটী ছাপাখানা রাখিয়া গিয়াছেন। একপ সৌভাগ্য অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। রজনীকান্ত প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিবার জন্য বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি পুস্তকসংগ্রহ করিতে বিরত ছিলেন না। হায়, তাঁহার সেই আদরের পুস্তকাগার এক্ষণে আর সেরূপ যত্নে কে রাখিবে?

সংসারে রজনীকান্তের অসুখের কোন বিশেষ কারণ না থাকিলেও, তিনি তাঁহার জীবনের শেষ কয়েক বৎসর মানসিক সুখে কাটাইতে পারেন নাই। ইদানিং তাঁহার শরীরও সুস্থ ছিল না, কয়েক বৎসর বহুমূত্র রোগে ভুগিয়া শেষে তজ্জনিত দুষ্টব্রণ রোগে গত ৩০এ জ্যৈষ্ঠ রাত্রি ১॥ টার সময় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। সাহিত্য সমাজে তাঁহার আসন নিঃসন্দেহ অতি উচ্চে, কিন্তু সেই উচ্চতা নির্ণয়ের সময় এখনো আসে নাই।

অতি সংক্ষেপে রজনীকান্তের জীবনের স্থূল কথাগুলি বিবৃত করা গেল। কিন্তু যে জন্য তিনি এত পরিচিত, এত পূজ্য তাহার কথা প্রায় কিছুই বলা হয় নাই; তাঁহার অমূল্য গ্রন্থাবলীর কথা, ওজস্বিনী ভাষার কথা, অকৃত্রিম রচনা কৌশলের কথা, প্রায় কিছুই বলিতে পারি নাই। কেন পারি নাই তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই দীন হীন সামান্য লেখকের হৃদয়ে সে ক্ষমতার সম্পূর্ণ অভাব, পাঠকগণ তজ্জন্য আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। আপনাদিগকে সে সকল কথা বলিবার জন্য অবশ্যই ভবিষ্যতে কোন উপযুক্ত ব্যক্তি ভার গ্রহণ করিবেন।

শ্রীহরিহর শেঠ।

শব্দ।



শব্দ সাহিত্যের উপাদান। সাহিত্য-পত্রে, সাহিত্যের উপাদান সম্বন্ধে অবশ্যই আলোচনা করা যাইতে পারে।

শব্দ কি? শব্দ কোথা হইতে আসিল? শব্দকে কে অর্থযুক্ত করিল? শব্দ, কবে কাহার কর্ত্তৃক কিরূপে গঠিত নির্ম্মিত হইল?

আমরা শব্দ লিখি, শব্দ পড়ি, শব্দ বলি, আমরা শব্দের সন্ধি করি, সমাস করি, বিচ্ছেদ করি, ব্যুৎপত্তি করি। আমরা বলি শব্দ সঙ্গতি, শব্দ-সৌন্দর্য্য, শব্দ-রূপ, শব্দ চিত্র, শব্দাড়ম্বর, শব্দ সম্বন্ধীয় কত শতই কথা! কিন্তু, শব্দ সামগ্রীটীর সৃষ্টি হইল কবে কিরূপে?

আমরা মাতৃস্তন্য পান করিতে করিতে শব্দ শিখি। টোল চৌপাড়িতে যাই শব্দ শিখিতে, স্কুলে কলেজে যাই শব্দ শিখিতে, আমরা য়ুরোপে আমেরিকায় যাই শব্দ পড়িতে, আমাদের মধ্যে যিনি যত বেশী শব্দ শিখিতে পারেন,—বলিতে কহিতে, লিখিতে পড়িতে ও নাড়িতে চাড়িতে পারেন, তিনি তত বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও বিখ্যাত।

আমরা শব্দ-প্রশ্নের শব্দ-উত্তর দিয়া, নিম্ন প্রাইমারি হইতে আরম্ভ করিয়া, য়ুনিবার্শিটীর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এবং প্রচণ্ড প্রচণ্ড পরীক্ষার "প্যাসেবিক" পারবার পাহাড়ী দিয়া পারে আসি; স্বর্গের সুবর্ণ সিঁড়ি "সিভিল সার্বিস" পাস করি। শব্দ, আমাদের সকলকে না হউক,—আমাদের শুভক্ষণে-জন্মাগণকে সিবিল করে, ব্যারিষ্টার করে, বিদ্যাবাচস্পতি করে, বক্তা করে, কবি করে, জজ ম্যাজিষ্টর কলেক্টর করে, কি না করে?

শব্দ দিয়া, আমরা বিষয় কার্য্য করি—ব্যবসা বাণিজ্য করি, ঘর গৃহস্থালী করি, ধর্ম্মকর্ম্ম করি, ঝগড়াঝাটি করি, রাজনৈতিক আন্দোলন করি, ধর্ম্ম প্রচার করি, ধর্ম্মনৈতিক বাদানুবাদ করি, সমাজনৈতিক কোন্দল করি, কোলাহল করি, গালিগালাজ করি, কি না করি? সবি ত করি আমরা শব্দ দিয়া।

শব্দ সাজাইয়া, আমরা গদ্য লিখি, পদ্য লিখি, প্রবন্ধ

লিখি, পুস্তক লিখি, পত্রিকা লিখি ;—এই আমিই, শব্দেরই কথা ; শব্দ সাজাইয়া সাজাইয়া, "প্রদীপে" লিখিতেছি। অতএব দেখ, আমরা যাহা কিছু লিখি—যত কিছু লিখি সবই শব্দ,—শব্দ ছাড়া আর কিছু না। শব্দ ছাড়া হইয়া, সৃষ্টি সংসারের কোন সামগ্রীই, আমাদের জ্ঞানগোচরে আসিতে পারে নাই ; আসিতে পারিবে না। আমরা যাহা খাই, যেখানে যাই, যাহা করি, যাহা কহি, যাহা না-করি, না-কহি, সবই শব্দ বা সবই বুঝায় শব্দে। শব্দ-ছাড়া কিছুই বুঝিবার, বুঝাইবার, বলিবার, শুনিবার যো নাই।—যো আছে কি ?

তা, এই যে "আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, তিনি তাঁহারা"—এ গুলি কি ? এ সব কিসে বুঝাইতেছে, কিসে বুঝিতেছ, কিসে বুঝাইতেছি ? বুঝাইতেছে, বুঝিতেছ ও বুঝাইতেছে শব্দে। প্রশ্নটী করিলাম শব্দে, উত্তরও দিলাম শব্দে। তুমি শব্দ শুনিয়া সব বুঝিলে।

আমি শব্দ, কাগজ-শব্দের উপর, কলম শব্দের দ্বারা, কালী শব্দ দিয়া, লেখা শব্দ লিখিতেছি। লিখিতেছি "প্রদীপ"-শব্দের পৃষ্ঠা-শব্দ পূর্ণ করিবার জন্য ;—প্রদীপের সম্পাদক-শব্দ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ বা শব্দিত হইয়া। আবার—এই "কর্ত্তৃক" "অনুরুদ্ধ" "শব্দিত" "হইয়া" "আবার"—এ গুলিও শব্দ-ছাড়া আর কিছুই না।

কি লিখিতেছি, কি দিয়া শব্দ লিখিতেছি ? বর্ণ বা অক্ষর দিয়া শব্দ লিখিতেছি।—লিখিতেছি বর্ণ,—স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ। এখন, এই "স্বর" "ব্যঞ্জন" এবং "বর্ণ" ইহারাও এক একটী শব্দ বটে।

বর্ণ, শব্দের বাহক, সংগঠক, সংযোজক। শব্দের ও শব্দাংশের অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, উপাঙ্গ, শাখাঙ্গ,—বর্ণ। বর্ণ, শব্দকে—শব্দ-রাশিকে—শব্দ-সাগরকে, বহিয়া লইয়া যায় সর্ব্বত্র—দূরে—সুদূরে—অতি দূরে, দেশ-দেশান্তরে, বংশ-বংশান্তরে।

শব্দ-শোয়ার, বর্ণ-শোয়ারিতে চড়িয়া, পঞ্চ পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে, পথ পাইলে, সপ্ত স্বর্গেও কোন্ না যাইতে পারে ;—যদি সেখানে শব্দ শুনিবার ও বুঝিবার লোক থাকে ?

বর্ণ-শোয়ারির শব্দ-শোয়ার, স্থানের ব্যবধানের মত, কালের ব্যবধানেও, বাধা পায় না। অসীম সময়ের সড়ক বহিয়া, সাগর মহাসাগর পার হইয়া, সত্যযুগ হইতে কলি-যুগে আসিয়া পৌছে। সত্য যুগের শব্দ-শোয়ার সকলকে আমরা এই ঘোর কলিতেও দেদীপ্যমান দেখিতেছি। স্বর্ণ বর্ণ সুবর্ণ কল্পের শব্দ সকল, এই কৃষ্ণবর্ণ লৌহ কল্পেও, আমাদের স্বত্বাধিকারে বর্ত্তিয়াছে।

বেদে, উপনিষদে, আমরা সত্যকালের শব্দ শোয়ার-গণের সাক্ষাৎ পাইতেছি। বাল্মীকির কাব্যে, ত্রেতার এবং ব্যাসের গ্রন্থে, দ্বাপর যুগের বর্ণারোহী শব্দগণ, আমাদের সম্মুখে উপস্থিত।—এই সকল শব্দ-শোয়ার যে সটান সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগ হইতেই এই কলির শেষে আমাদের কাছে এসেছেন ঠিক তাহাও নয়। সত্য ত্রেতা দ্বাপরের বহু বহু পূর্ব্বেও ইঁহারা বিদ্যমান ছিলেন এবং সময়-স্রোতে অসীম পথপর্য্যটন করিয়াছিলেন এবং আমাদের পশ্চাৎবর্ত্তী সত্য যুগেরও পূর্ব্ববর্ত্তী বহু বহু সত্যযুগ পাহাড়ী দিয়া আসিয়াছিলেন।—এই সব শব্দ মহাশয় ও মহাশয়াদের এক একটীর বয়ক্রম বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ বিহঙ্গ "কাকভুষণ্ডীর" অপেক্ষাও বেশী। ইহারা বোধ করি জননী বসুন্ধরারই সম বয়সী।

বর্ণা-রোহী শব্দরূপী এই আসোয়ারগণ, এক সময়ে, মধ্য এসিয়ায়, আর্য্য-গৃহের হব্য গব্যে পাহারা দিতেন ; হোমাগ্নির আহুতি-কালে উপস্থিত থাকিতেন।—দুগ্ধ দোহনে, হলকর্ষণে, সোম রস-পানে এবং সামগানে সহায়তা করিতেন। সে আজ তিন সহস্র চারি সহস্র বৎসরের কথা। তাহার পূর্ব্বে ইঁহাদের কোথায় স্থিতি, কোথায় বসতি ছিল, কেহ তাহা জানে না ;—আজও জানিতে পারে নাই। কিন্তু, তাহার পর ইঁহারা নানা দেশে; নানা বেশে বসবাস করিতেছেন। ইঁহারা হিন্দুস্থানে ও ম্লেচ্ছ স্থানে সমান সজীব, সচেষ্ট ও শশব্যস্ত ; সম্প্রতি উভয়ের মধ্যে পূর্ব্ব পুরুষত্বের একত্বের পরিচয় দিয়া ও দায়িদত্বের দোহাইয়া দিয়া জাতিত্ব গঠনের উদ্যোগ করিতেছেন।

বর্ণারোহী এই সব শব্দ-বীর, ইয়ুরোপে আমেরিক ভুমে প্যাণ্ট-কোটবুট-আটা এক একটী আস্ত সাহেব,—বিলাতে, তিউতনিক রাজ্যে, ইঁহারা এক একটী জল-জীয়ন্ত জনবুল বা এক এক খানি অথও "পরিপাণ্ডু দুর্ব্বল কপোল সুন্দরম্" "বিলোল কবরী" লাবণ্যময়ী "লেডিসীপ" বা এক একখানি "কিসলয়মিব মুগ্ধং" "মিসী-বাবা" ;—ক্যাপ মাথে, চাবুক হাতে, বাইসাইকেল বাহনে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বিমর্দ্দন—বিধ্বস্ত

করিতেছেন ;—সম্প্রতি তদর্গে, আফ্রিক রাজ্যে—বুয়র ভূমে শিবির সন্নিবিষ্ট।

পক্ষান্তরে বা দেশান্তরে ইঁহাদের অপরবিধ বেশ ও ব্যবস্থা। দৃষ্টান্ত,—অস্মদ্দেশে হিন্দুস্থানে, —বঙ্গ পল্লীতে—বঙ্গীয় গৃহে, সেই শব্দ মহাশয় মহাশয়াগণ, কোথাও কৌপীন চিমটাধারী সংসার বিবাগী সন্ন্যাসী, কোথায়ও বা নামাবলী গায়, টিকি মাথায়, চটি পায় পৈতা-গলায সংস্থানহীন সংসারী বা ভিখারী ; পরন্তু, কোথায়ও বা সেই শব্দ মহোদয়গণ গামছা কাঁধে, খাবা-হাতে, খালি গায, খালি পায খালি মাথায, মেছোহাটায অর্দ্ধ পয়সার খোল্‌সে মাছ দর করিতেছেন। আর কোথাও হয় ত তাঁদের কেহ কেহ আধ-ময়লা ও অতি মোলায়েম শয্যায়, আলস্য-গের্দ্দায স্কন্ধ রাখিযা, অর্দ্ধ নিমিলিত নেত্রে, আরাম-আলবোলা চঞ্চুপুটে চুম্বন করিতেছেন। কেবল বঙ্কিম বাবুর মত ব্যক্তিই বর্ণনা করিতে পারিতেন, সেই কেন্দ্রে কেন্দ্রে কুণ্ডলিতা সুললিত আলম্বিতা শত হস্ত পরিমিতা, রজত-কাঞ্চন-বিখচিতা এবং সুবর্ণ শরপোসের সুন্দর রাজ মুকুট শোভিতা, নিত্যানন্দ দায়িনী, আরাম আলবোলার মুনি-মন-বিমোহনী-বুলী কেমন, আর অলোকা-বিনিন্দ্য বিলাস কি? আর তাহা হইতে বিনির্গত, মৃগ-নাভী-বাসিত ধূম-রাশি কিরূপ "কুণ্ডলাকারে" বাবু কক্ষ বিভাসিত ও বিভূষিত করে।

তাহার পরে, এদেশে সে কালের সেই শব্দ মহাশয়াগণ কি সাজে সজ্জিতা, কি কাজে সমাহিতা, তাহা আমাদের পাক-শালা পানে তাকাইলে, কতক অঞ্চলে এবং কতক আধ ঘোমটায় দেখিযা লইতে পাবেন। কিন্তু সে সব সাজের ও সে সব কাজের আলেখ্য অঙ্কিত করিয়া, এখনি বা যখনি হউক, আমি আঁধার মুখ দেখিতে অভিলাষী নই।

বর্ণাক্ষরারোহী সেকালের শব্দদের কথা বলিতেছিলাম। কিন্তু, বর্ণের কথা বাদ দিয়াই বলিয়াছি। আজ বাদই থাকুক। বর্ণ-বাহাদুর দিগকে বরং আর কোনও দিন দেখা যাইবে। এখানে শব্দের কথা হইতেছে হউক।

তা শব্দেই ত আমাদের সব। শব্দেই ত সমস্ত সংসার চলিতেছে। শব্দই ত ভবসংসার চালাইতেছে।

দেখ, শব্দই ভাব, শব্দই ভাষা, শব্দই সাহিত্য, শব্দই শাস্ত্র। শব্দই কাব্য, শব্দই কবিত্ব। শব্দেই কর্ম্ম, শব্দেই ধর্ম্ম। আবার শব্দেই সুখ, শব্দেই দুঃখ। শব্দ ভিন্ন এ সকলের কোন্‌টী সম্ভব? কেবল আমাদের নয়, সবারই ; —মানুষ মাত্রেরই, জাতি মাত্রেরই।

এই যে আমাদের সুরেন্দ্র বাবু এত বড় বাগ্মী, দেশ-বিদেশ-বিখ্যাত বক্তা, ইহা কেবল শব্দেরই বিক্রমে আর বেগশিলতায়। শব্দের বেগে এবং বাক্যের বিক্রমে, সুরেন্দ্র বাবু, বরফের ভিতর হইতেও বহ্নি ছুটাইতে পারেন।

আর আমাদের রবীন্দ্র বাবু যে এমন দেশ প্রসিদ্ধ কবি, ইহাও কেবল তাঁহার শব্দ সাজাইবার হের ফেরে। শব্দ গাঁথিবার গুণে—শব্দেরই সম্মোহন আকর্ষণে, তাঁহার কবিতায যুবক যুবতীর মন প্রাণ আকৃষ্ট, উদ্বেলিত, উন্মত্ত ও উদাস হয়। কেবল শব্দেরই মাহাত্ম্যে—চিক্কণতায় ও চাতুর্য্যে, সে কাব্য কথায়, কুসুমের কান্তি ও রুচিত্ব, কুসুম নিশ্বাসের মৃদুত্ব এবং কামিনী-কণ্ঠের মোলায়েমত্ব ও সুমধুর মাদকত্ব পাওয়া যায়। কেবল সুরেন্দ্র ও রবীন্দ্র বাবু বলিয়া নয়। ছোট বড় সবাই শব্দের মার প্যাঁচে ছোট বড়।

শব্দের কেবল অর্থবোধেই যে সুখ তাহা নয়। সদ্ভাব যুক্ত শব্দের অর্থবোধের অনির্ব্বচনীয় আরাম ত আছেই। কিন্তু, শব্দের অর্থবোধ যদি নাও হয়, তাহাতেও শব্দের শক্তি লোপ হয় না—শব্দ কিয়ৎ পরিমাণেও আত্মপ্রভাবে তোমায় প্রভাবিত করে। কত সময়ে, শব্দের অর্থ না বুঝিয়াও, কেবল শব্দটী শুনিয়া আমরা আরাম পাই, আনন্দ অনুভব করি! কত সময়ে, কথা বা কবিতা কিছুমাত্র না বুঝিয়া,—কথার বা কবিতার ভাবার্থ বা তাৎপর্য্য কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম না করিয়াও, কেবলমাত্র কথাগুলি বা কবিতাটী শুনিয়া মোহিত হইতে হয়! শব্দটী—কথা কটি বা কবিতাটি শুনিয়া—শুনিয়াই কেবল, আমাদের মনে অনির্দ্দিষ্ট কোনও কোমল করুণ বা কঠোর ভাবের উদয় হয়,—অর্থের অভাবে এবং শব্দেরই স্বভাবে,—উহা উদ্রেক হইতে পারে! ইহা কি কম বিস্ময়কর ব্যাপার! শব্দের শরীরে কি আশ্চর্য্য ঐন্দ্রজালিক শক্তিই সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

আমি এস্থলে সুস্বর সংযুক্ত শব্দের কথা বা সঙ্গীতের কথা বলিতেছি না। সুস্বর সংযুক্ত শব্দের বা সঙ্গীতের অর্থবোধ না হইলেও তদ্দ্বারা আরাম ও আনন্দ অনুভব হয়। সুস্বরের বা সঙ্গীতের সুরের শক্তিই, এই আরাম ও আনন্দের কারণ। কিন্তু, এখানে সুস্বরের ও সঙ্গীতের আলোচনা

হইতেছে না। কেবল বর্ণাত্মক শব্দের কথাই হইতেছে।— কেবল শব্দ শুনিয়াই তুমি সুখী বা দুঃখী হও, অর্থ বুঝ বা না বুঝ।

রবি বাবুর কত কবিতা আছে, যাহা হয়ত তুমি কিছুমাত্র বুঝিতে পার না, অথচ তাহা শুনিয়া বা পড়িয়া তুমি কেমন একরকম কোমল আবল্য বা আরাম অনুভব কর। ইহার কারণ শব্দের শক্তি, কথার নিজের প্রভাব।

কথা কহার প্রভা,—কবিতা পড়ার প্রভা, সে স্বতন্ত্র। কথা কহার গুণে কথা মিষ্ট লাগে, সেত লাগেই। কথা কহার গুণে, কথার অর্থ, ভাব, উদ্দেশ্য, তাৎপর্য্য, হাড়ে হাড়ে অনুভব হয়। কবিতা পড়ার প্রভাবে, অনেক অস্পষ্ট কবিতা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। অনেকানেক উৎকৃষ্ট কবির অনেকানেক উৎকৃষ্ট কবিতা অস্পষ্ট, পড়ার ভাবে, উচ্চারণের ভঙ্গিমায়, পাঠকের স্বর-মাধুরী ও কণ্ঠ-চাতুরীতে, তাহা সুস্পষ্ট ও সুবোধ্য হইয়া যায়। রবার্ট ব্রাউনিঙের কোন কোন অত্যুৎকৃষ্ট কবিতা, অস্পষ্ট, অবোধ্য। বিলাতের ব্রাউনিঙ-সভা, সে সব কবিতা, সুস্পষ্ট ও সুবোধ্য করার জন্য, অন্যান্য উপায়ের মধ্যে, আবৃত্তি-কৌশলকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া গণ্য ও প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ফলতঃ কাব্য কবিতা, শতটা টিকা টীপ্পনীতে যতটা না বুঝায়, একটা উৎকৃষ্ট আবৃত্তিতে তাহার অধিক হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেয়।

ইহার কারণ, শব্দে নিহিত শক্তির সহিত, শব্দকারী কর্ত্তৃক সেই শক্তির তীক্ষ্ণানুভূতি সঞ্জাত শক্তির সংমিশ্রণ। তাহাতেই শব্দকে, কথা এবং কবিতাকে, সুস্পষ্ট ও সুবোধ্য করে; তাহার অর্থ অধিকতর শক্তি-সমন্বিত করে। "অধিকতর শক্তি সমন্বিত করে" না বলিয়া, এমনও বলা যাইতে পারে, বরং ইহা বলিলেই কথাটী সত্য ও সঙ্গত হয় যে, শব্দাবৃত্তিকারী পাঠক বা কথক—শব্দ, কথা বা কবিতা সম্যক্‌রূপে বা সুতীক্ষ্ণরূপে অনুভব বা উপভোগ করিয়া, পূর্ণ মাত্রায় বুঝিয়া ও হৃদয়ঙ্গম করিয়া, উচ্চারণ ও আবৃত্ত্যাদির গুণে, শব্দে, কথায় বা কবিতায়, শব্দের, কথার বা কবিতার সম্পূর্ণ ভাব সমগ্র শক্তি সিঞ্চিত করিয়া দেন। সুতরাং শব্দ, কথা বা কবিতা, তাহাদের সমগ্র শক্তি ও সম্পূর্ণ ভাবের সহিত উদ্বোধিত ও উচ্চারিত হইয়া, জাগ্রত ও জীবিত হইয়া, অধিকতর সুবোধ্য, সুস্পষ্ট ও সুমিষ্ট হয়। অতএব, স্বীকার করিতে হইতেছে যে, শব্দের তীক্ষ্ণানুভূতি ও আবৃত্তি সঞ্জাত শক্তি শব্দের স্বভাব জাত শক্তি হইতে স্বতন্ত্র নয়,—তাহারই অপরাংশ।

"আহা! কথাগুলি কেমন মিষ্ট, দু দণ্ড দাঁড়িয়ে শুনতে ইচ্ছা করে।"—ইহার তাৎপর্য্য কথার জন্য, কথা শুনা,— অন্য কিছুর জন্যও নয়।—কথার সদর্থের জন্য নয়, সদ্ভাব ও সদুপদেশের জন্যও নয়; পরন্তু শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বা শুনার সুখ ভিন্ন, অন্য কোনও স্বার্থের জন্যও নয়। ইহা কেবল কথার মিষ্টত্ব ও কথা কহার মিষ্টত্বের জন্যই কথা শুনার স্পৃহা। পূর্ব্ব বঙ্গের কয়েকটী সরল ও সমীচীন বন্ধুর মুখে সর্ব্বদা শুনিয়া থাকি,—পূর্ব্ববঙ্গের আরও কত বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বলিতে শুনিতে পাই যে, তাঁরা পশ্চিম বঙ্গের কথা শুনিতে খুব ভাল বাসেন, সে কথায় তাঁদের কর্ণ জুড়ায়। ইহা কেবল কথার জন্যই কথা শুনিতে ভালবাসা। কর্ণের তৃপ্তি, অথবা মনের এক রূপ অহেতুক আরাম বা আনন্দের জন্যই কথা-কহা শুনার কামনা। কথা কেবল কথা হইলেই হইল; অর্থহীন কথাই হউক আর এলোথেলো কথাই হউক, তাহাতে হানি নাই। পশ্চিম বঙ্গের কলিকাতা অঞ্চলের শব্দে শব্দিত ও উচ্চারণের ধ্বনিতে ধ্বনিত কথা মাত্র হইলেই হইল। ইহা যাউক।

অতঃপর পুনঃ অনুধাবন করুন, শব্দের কি অসীম শক্তি। শব্দ আগুন জ্বালিয়া দেয়, আবার শব্দই আগুন নিবায়, অন্তর জুড়ায়, সান্ত্বনার শীতল সুবাসিত বারি সিঞ্চন করে। একটা শব্দ শত বৃশ্চিক হইয়া তোমায় দংশন করে, আবার আর একটী শব্দ-কুসুম-কোমল-স্পর্শে তোমায় পরতে পরতে পুলকিত করিয়া তুলে। একটা শব্দ শুনিয়া তুমি সমস্ত জগৎ সংসার অন্ধকার দেখ; আবার একটা শব্দের হয়ত আধখানা শুনিতে শুনিতেই তোমার সাতখানা জগতে জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠে। সংসারের হায়! কতই না দুঃখ, আর কতই না সুখ, শব্দ মাত্রের দ্বারা সৃষ্ট হয়, সঞ্জাগ ও সঞ্চারিত হয়! বল, দেখি, রাত্রি দিনের মধ্যে, কত কতবার না তুমি, শব্দের দ্বারা সুখী ও দুঃখী হও!

শব্দে, তোমার শোকের সাত সমুদ্র, উথলে উঠে। শব্দে, তুমি শূল বিদ্ধ হও, সন্তপ্ত হও, দগ্ধ বিদগ্ধ হও— কণ্টকিত হও। আবার শব্দই তোমার দগ্ধ হৃদয়ে সান্ত্বনার ও শান্তির শীতল বারি সিঞ্চিত করে। পুনশ্চ, শব্দে,

তুমি উত্তাপিত হও উত্তেজিত হও, ক্রোধানলে প্রজ্জ্বলিত, অভিমানে উদ্দীপ্ত হও বা নিস্মমতায় পাষাণ কঠিন হও, আবার শব্দেই তোমায় এই সব বৃত্তির বা প্রবৃত্তির বিপরীত পারে নীত করে, তুমি শব্দের সুমধুর মলয় নিশ্বনে, নবনীতবৎ দ্রবীভূত হইয়া, স্নেহে, প্রেমে, হর্ষে পুলকে পরিপূর্ণ হও, তোমার দুই পার্শ্বে দয়া দাক্ষিণ্যের দুগ্ধ স্রোত উছলিতে থাকে। *

শব্দ সমগ্র সৃষ্টির ভাব ও স্বভাব শরীর ও আত্মা, আত্মস্থ করিয়া, যদৃচ্ছা তাহার প্রবাহ ছুটাইয়া, তরঙ্গ তুলিয়া, প্রতি পদক্ষেপে, তোমায় চলিত বিচলিত করিতেছে। তুমি শব্দ সংস্পৃষ্ট হইয়া মন্ত্রবৎ ঘুরিতেছ। শব্দে —শব্দের অভ্যন্তরে, সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত জাতির সমস্ত ভাব স্বভাব প্রবৃত্তি জ্ঞান বিজ্ঞান বিদ্যাবুদ্ধি আলোচনা, অনুশীলন উন্নতি কার্য্য-কলাপ সবই সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। অতএব তোমার নিজেরও যাহা কিছু ভাব স্বভাব, ভাবনা চিন্তা, কাজকর্ম্ম, প্রবৃত্তি অনুভূতি, তাহাও শব্দের ভিতরে রহিয়াছে, —শব্দ হইতেই ও শব্দের মধ্য দিয়াই, তাহা বাহির হয়। যাহা শব্দিত হয় নাই, তাহা সৃষ্টও হয় নাই,—তাহা ক্রীত ত হয়ই নাই।

কিন্তু তোমার কেবল কর্ম্মই কি শব্দে? তোমার ধর্ম্মও শব্দে। তোমার কেবল সুখ দুঃখ সৃষ্টি সংসারই কি শব্দে? তোমার স্বর্গাপবর্গও শব্দে। শিহরিও না। কথাটা ষোল আনাই সত্য। তোমার প্রণয়ের অতি গোপন সম্বোধন শব্দে বটে, তোমার মন্ত্রণার অতি গোপনীয় "গুপ্তগো"ও শব্দে তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে, তোমার গোপনীয় বা অগোপনীয়, অতি প্রকাশিত, —ততোধিক শব্দিত গালিগালাজ গুলিও শব্দ,—ষোল আনা রকমই শব্দ, তাহাতে সংশয় নাই। এখন দেখ, তোমার শুভাশীর্ব্বাদ, সুমিষ্ট সম্বোধন এবং অশুভ ও অমিষ্ট গালিগালাজগুলিও যেমন শব্দ, তেমনি তোমার উপাসনা প্রার্থনা, গায়ত্রী সাবিত্রী, প্রণব ও প্রাণায়ামও শব্দ বটে। তবেই হইল তোমার সাংসারিক "সু" "কু" যেমন শব্দে সন্নিবিষ্ট, তেমনি তোমার পারলৌকিক স্বর্গ নরকও শব্দেরই দ্বারা সাধিত ও অনুষ্ঠিত হয়। এক কথায়, শব্দ নহিলে আমাদের কাহারও কিছুই হয় না। নিঃশব্দে, নিরাকার ঈশ্বরোপাসনাও হয় না। যখন তুমি মৌনী হইয়া ধ্যান কর,—কোনও শব্দ উচ্চারণ কর না, তখনও ভাবরূপী শব্দ বা শব্দরূপী ভাব তোমার চিত্তে জাগরূক থাকে। তুমি যতই সংযত হও, যতই বাক্য সংযমী হও না কেন, তুমি জোর করিয়া জিহ্বাতে না আসিতে দিলেও—জিহ্বাতে না আনিলেও, শব্দ তোমার সঙ্গ ছাড়ে না। শব্দ তোমার আশে পাশে অনবরত ত থাকেই, তোমার অভ্যন্তরে,—ভাবনা চিন্তার ভিতরেও অনুক্ষণ থাকে,—শব্দের সহিত মানব জীবন এতই জড়িত হইয়া গিয়াছে ও রহিয়াছে।

মানব জীবনই এক মহা শব্দ,—শব্দ সমষ্টিময় এক মহা কোলাহল। জন্মে শব্দ, জীবনময় শব্দ, মরণেও শব্দ। কি সাংঘাতিক শব্দ শব্দিত এই মানব জীবন! কেবল মানব জীবনই বা বলি কেন, জীব মাত্রেই শব্দের সহিত জড়ীভূত।

এখন বলুন এই সব শব্দ, কোথা হইতে কি রূপে আসিল,—কে ইহাদের কি রূপে সৃষ্টি করিল? ইহারা কি আকাশ থেকে পড়েছে, না পাতাল ফুঁড়ে উঠেছে,—এই শব্দ গুলা?

তুমি বলিবে "কেন? বেশ ত, এ আর কি এত বড় "একটা কথা? শব্দ এ ত আছেই। ছোট ছোট শব্দগুলা "আমরা মা বাপের কাছ থেকে পাই, বড় বড় শব্দ বই "প'ড়ে বক্তৃতা শুনে শিখি।"

তা বটে। "শব্দ এ ত আছেই"। এ কথা যথার্থ। "আছেই" বটে। কিন্তু, "আসিল" কোথা হইতে? মা বাপ হইতে। বই বক্তৃতা হইতে। মা বাপ শব্দ পাইলেন কোথা হইতে? তাঁদের মা বাপ হইতে। তাঁদের মা বাপ কোথা হইতে? তাঁদের মা বাপ হইতে। এইরূপে মানুষের সমস্ত মা বাপের আদি মা বাপ শব্দ পাইলেন কোথা হইতে, যখন জিজ্ঞাসা হয়, তখন আর উত্তর চলে না। মা বাপের মুখ ছাড়িয়া শব্দ মহাশয়দের আদি নিবাস অন্য কোথায় অন্বেষণ করিতে যাইতে হয়। বই, বক্তৃতা বাক্যাদি সম্বন্ধেও কথাটা প্রায় ঠিক ঐরূপ। আদি বই, আদি বক্তৃতা ও আদ্য বাক্যের নাগাল না পাইয়া, কল্পনা করিয়া লইলেও তাহার মধ্যে শব্দ জাতির জনক জননীর সন্ধান না পাইয়া অন্য কোথায়ও তল্লাসে বাহির হইতে হয়।

তুমি আবার বলিতে পার "তা অত অত অধিক দূরেই বা যাওয়া কেন? আমাদের আপন বাড়ীর এই সব

বাঙ্গালা শব্দই দেখা হউক না কেন ? ইঁহাদের অনেককেই পাইয়াছি আমরা সংস্কৃত হইতে, অনেককে প্রাকৃত হইতে, কতক কতককে আরবী, পারষী, ইংরেজী হইতে আমরা পাইযাছি। কথা ত কানে হাঁটে। কত কথা—কত শব্দ, কানে হাঁটিতে হাঁটিতে, কত কত ঠাঁই হইতে, কত কত ভাষা হইতে, আমাদেব কাছে এসেছে।"

এ কথা খুব ঠিক। শব্দ আব কথা কাণে হাঁটিতে হাঁটিতে সত্য সত্যই আমাদেব কাছে আসে। কিন্তু কোথা হইতে আসে ? সংস্কৃত প্রাকৃত হইতে আসে; আববী, পারষী ইংবাজী হইতে আসিযাছে। আরব্য, পাবস্য, ইংলণ্ড, আমেরিকা হইতে আসিতেছে। তা বেশ। আসেই ত। আসিবে না ? খুব আসুক। এস আমরা সকলে জুঠিয়া সর্ব্বদেশ থেকে আবও শত শত, সহস্র সহস্র শব্দ আনি। —এনে আমাদের বাড়ীর বড় আদরের বড় যতনেব সুন্দর সজীব বাঙ্গালা ভাষাব ভক্তিময়ী প্রতিমাখানিকে সাজাই; প্রতিমার মণ্ডপখানি পবিপূর্ণ করি। তা ত করিব। কিন্তু যে সব জায়গা হইতে, যে সব ভাষা হইতে আমাদের আগেকার ও এখনকাব এই সব বাঙ্গালা শব্দ এসেছে, আসিতেছে, সে সব জায়গায় সে সব ভাষায় শব্দ আসিল কোথা হইতে ? স্বয়ং সংস্কৃত শব্দ পাইলেন কোথায় ? অন্যান্য ভাষাতেই বা শব্দ আসিল কোথা থেকে। এক ভাষা হইতে আর এক ভাষায শব্দ আসিয়াছে। তা বটে। কিন্তু, মানুষের সর্ব্বাদ্য ভাষা বা ভাষাগুলিতে শব্দ আসিল কিরূপে, শব্দ জন্মিল কেমন করিয়া ? সর্ব্বাদ্য ভাষাতেও "শব্দ সেত আছেই।"

বড়ই ফেরে পড়া গেল যে ! ফেবে পড়ারই কথা। এ ফের কেটে ওঠাই ভার। শব্দ ভায়াদের আদি উৎপত্তির নির্ণয় করা, সন্ধান পাওয়া একেবারেই দুষ্কর।

তবে এই অসীম শক্তিশালী শব্দ মহাশয়গণ কি সত্য সত্যই আকাশ থেকে নেমেছেন, না, পাতালপুর থেকে উঠে বসেছেন ? কিম্বা সকল সামগ্রীর সৃষ্টি কর্ত্তা আমাদের এই শব্দ সকলকেও তাঁহারই সৃজন-যন্ত্রে, সৃষ্টি করিয়া, মানুষ মানুষীর জিহ্বার সঙ্গে জড়িয়া দিয়াছিলেন।

কি জানি তা ? সৃষ্টি-রহস্য বড়ই দুর্জ্ঞেয়। ভাষা-বিজ্ঞান, ভাষা-রহস্যের অনেক খানিই উদ্ঘাটন করিয়াছেন। তথাচ সর্ব্বাদ্য ভাষা ও তাহার শব্দোৎপত্তি সম্বন্ধে প্রায় নির্ব্বাক বলিলেও হয়। শব্দ জাতি এমনি সাংঘাতিক প্রাচীন যে অনন্ত সময়েরই যেন সম বয়সী। বিজ্ঞান এই জাতির জন্ম-কোষ্টি গণিতে বসিযা কর্ম্মেরই গণনা করেন, জন্ম-লগ্নের ও জন্মের ঠিক করে উঠ্‌তে পারেন না;—জন্মটা এমনি রহস্য-জালে জড়িত। ভাষার উৎপত্তি শব্দের জন্ম সম্বন্ধে, নানা মুনির নানা মত। সে সব মত মানা আর না মানা হউক, জানা চাই। শব্দতেই যখন সংসারের সব, তখন শব্দ বংশের কুর্চি-নামা, কিছু কিছু না জানিলে চলিবে কেন ? সকলেবই সেটা জানা ভাল। আমরা শব্দ জীবী, শব্দের ব্যাপারী সাহিত্যওয়ালা, সেটা জানা আমাদের ত একান্তই গুরুতর গরজ।

আমাদের সে কালের,—ইতিহাসের অতীত অত্যন্ত আগেকার কালের, অতি বুড়ো থুড়থুড়ে মুনি ঋষি মহাশয়-গণ—আচার্য্য ভট্টাচার্য্য ঠাকুরগণও শব্দতত্ত্বের আলোচন—শব্দ-সাগবের মথন করে গিয়াছেন; অন্ত পান নাই। তার পর, চিরকালই, এই মথন আলোড়ন সমানে চলেছে। এখনকার য়ুরোপীয় বড় বড় দিগ্গজ পণ্ডিতগণ দুরবীণ কসিয়া শব্দ সমুদ্রের দিগ নির্ণয়ে রাত্রিদিন রত রয়েছেন।

যে জগৎমান্য জর্ম্মণ আচার্য্য ভারতে ভট্টাক্ষ মহা পণ্ডিত মহাত্মা মোক্ষ মুলবের মৃত্যুতে আজ আমাদের সকলেরই মন খারাপ হযেছে, যাঁর উদার গম্ভীর বিদ্যা-জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির একটী অতি উৎকৃষ্ট উজ্জ্বল প্রতিলিপি আমরা এই "প্রদীপে"ই সে দিন দেখে সুখী হয়েছিলুম,—তিনি আজন্ম কালই শব্দ তত্ত্বের অনুশীলনে অতীব ব্যস্ত ছিলেন। তিনি শব্দতত্ত্বেই এক অত্যাশ্চর্য্য সত্য আবিষ্কার করে, য়ুরোপের সহিত আমাদের জ্ঞাতিত্ব স্থাপন করে গেছেন। শব্দবিজ্ঞানে, তাঁর বৈভবরাশি সমগ্র পৃথিবীকে উপকৃত এবং তাঁর আত্মাকে অমর গৌরবে গৌরবান্বিত করে রেখেছে।

কিন্তু শব্দতত্ত্ব নিরস, খুবই কঠিন কটমট। 'প্রদীপের' মোলায়েম মিঠে আলোকময় সাহিত্য পিযুষাস্বাদী পাঠক পাঠিকার মনে কি তাহা ধরিবে ?—মুখে কি সে রুক্ষ দ্রব্য রুচিবে ? সমস্যা বটে; সন্দেহও ষোল আনা।

কিন্তু সাহিত্যই যদি সরস হয়, তবে শব্দ নিরস হয় কেন ? শব্দই ত সাহিত্য। চিনির শরবৎ মিষ্ট, তা চিনি কি অমিষ্ট ? তা যাই বলুম। শব্দ ছোড়াছোড়ি আই

খানেই আজ তবে শায়। সহাইয়া সহাইয়া কহা ভাল। যদি সয়।

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

জেব্ উন্নিসার কবিতা।

প্রদীপের আশ্বিন সংখ্যায় আমরা সাহজাদী জেব্ উন্নিসার জীবন কাহিনী পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার দিয়াছি। এবারে তাঁহার কয়েকটী কবিতার সমালোচনা ব্যপদেশে—তাঁহার জীবনের আরও কয়েকটী দুঃখজনক কাহিনী অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট করিয়া বলিবার চেষ্টা করিব।

কবিতা অনেক সময়ে কবির মনোভাব প্রকাশ করে। তাঁহার প্রাণের প্রকৃত ভাব রচিত কবিতার সঙ্গে অনেক সময়ে ছায়ার ন্যায় অবস্থান করে। মনের আবেগময়ী উচ্ছ্বাসই যদি কবিতা হয়—তাহা হইলে মনের প্রকৃত ভাব গোপন করা অনেক সময়ে কবির পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। কবিতা কবি-হৃদয়ে দর্পণ স্বরূপ। জেবউন্নিসার হৃদ্গত ভাবও বহুল পরিমাণে তাঁহার কবিতায় প্রতিফলিত হইয়াছে।

শিবাজীর সহিত—জেবউন্নিসার প্রেম—এক স্বর্গীয় ব্যাপার। ঔরঙ্গজেবের সমস্ত অন্তঃপুরিকারা যখন দর্পিত শিবাজির অধঃপতনের ও ভাবী দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া উৎফুল্ল হইতেছিলেন, তখন সাহজাদী জেবউন্নিসা শিবাজির বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ অমঙ্গল আশঙ্কায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। অত বড় বাদসাহ—যাঁহার রোষকটাক্ষ, জয়পুর, যোধপুর, বিকানিয়ার, যশল্মীয়ার প্রদেশের বীর ও সামন্ত রাজগণের পক্ষে ভীতি প্রদায়ক—তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ক্ষুদ্র ভূমিয়া—শিবাজী দর্পিত ভাবে উত্তর করিতেছেন—জেবউন্নিসার নিকট ইহা আমানুষিক বীরত্ব বলিয়া প্রতীয়মান হইল। অত বড় আম-দরবার, তাহার মধ্যে কত ক্ষমতাবান রাজপুত যোদ্ধা, কত বড় বড় মোগল ও পাঠান সৈনিকে সেই দরবার পরিপূর্ণ—সেই দরবারে, হীরা মতি মণি মাণিক্যের অবর্ণনীয় শোভায়, মোগলের ঐশ্বর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত। যে দরবারে মহাহব বিজয়ী বীরবৃন্দের, সমস্ত পদবিক্ষেপ, যে বহুমূল্য তক্তভাউসের একাংশ বিক্রয়ে—শিবাজীর সমগ্র রাজ্যের মূল্য হয় না—সেই তক্তভাউসের উপর উপবিষ্ট রাজন্যবৃন্দ পূর্ণ দরবারে, মহা প্রতাপান্বিত ঔরঙ্গজেবের সম্মুখে সমানভাবে প্রত্যুত্তর করা—একটা মহা দুঃসাহসিক অমানুষিক কার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। কবির হৃদয় অমানুষিক ঘটনাতেই অনেক স্থলে আকৃষ্ট হয়। কাহারই বা না হয়? জেবউন্নিসার হৃদয়ও সেইরূপ হইয়াছিল।

বঙ্কিম বাবু—জেব্ উন্নিসার পার্শ্বে মবারকের ও দরিয়ার চরিত্র স্থাপিত করিয়া কল্পনার সাহায্যে জেব্‌কে অতি বিকৃত করিয়াছেন। উপন্যাসের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য—ঔরঙ্গজেবের কন্যা জেব্ উন্নিসার মুখ দিয়া যে সমস্ত কথা বাহির করিয়াছেন—তাঁহার জীবনকে যেরূপ কলঙ্ক রেখাঘাতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ করিয়াছেন, জেব্ উন্নিসার কবিতাগুলি পড়িলে—তাহা একেবারে মুছিয়া যায়। মেঘান্তরালভেদী পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় জেব্ উন্নিসার চরিত্রের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ সাধারণের চক্ষে ফুটিয়া উঠে।

জেব্ উন্নিসা সে কালের নিয়মে সুশিক্ষিতা ছিলেন। শাস্ত্র জ্ঞান তাঁহার যথেষ্ট ছিল। কোরাণের কূটার্থ সমূহ, তিনি স্বধর্ম্মানুরাগী ঔরঙ্গজেবের নিকট সরলভাবে ব্যাখ্যা করিয়া, অনেক উলমা মৌলভীর মুখ নিষ্প্রভ করিয়া দিতেন। যে ধর্ম্মই হউক না কেন—ধর্ম্মালোচনায়—নর নারীর হৃদয় স্বভাবতই কলুষবর্জ্জিত হইয়া থাকে। অগ্নি যেরূপ—দহ্যমান বস্তুকে সম্যকরূপে মালিন্যহীন করে—নিখাদ সুবর্ণের মত করিয়া দেয়, ধর্ম্মও সেইরূপ প্রকৃতিগত কলূষ দূর করিয়া নর নারীর হৃদয়কে স্বাভাবিক কলঙ্ক হইতে মুক্ত করে। শাস্ত্রানুরাগিনী, স্বধর্ম্মানুসারিণী—বিদুষী সাহজাদী জেবউন্নিসা যে প্রকৃতই বঙ্কিম বাবুর চিত্রের অনুরূপ ছিলেন, এ কথা বিশ্বাস করিতে এই সকল কারণেই আদৌ প্রস্তুত নহি। যে হৃদয় বিশুদ্ধ প্রেম ও ধর্ম্মে পূর্ণ ছিল, তাহা যে পাপের কালিমায় কলঙ্কিত ছিল, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে।

জেবউন্নিসা শিবাজীর প্রতি মনে মনে আসক্তা হইয়াছিলেন। জীবনে কাহাকেও তিনি ভালবাসেন নাই, একমাত্র শিবাজীকে মনে মনে অতি প্রিয় জ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন। মনের কথা কাহাকেও প্রকাশ করিয়া বলেন নাই—কিন্তু তাঁহার পিতার নিকটে অশ্রুপ্লুত চক্ষে—একটী

বার মাত্র সে কথা প্রকারান্তরে জানাইযাছিলেন। যখন বুঝিলেন, বাদসাহ, তাঁহার স্নেহময পিতা—তাঁহার হৃদযের *নিভৃত কোণে, ধীরে ধীরে জাগরিত, অতি সন্তর্পণে লুকাযিত* ক্ষুদ্র বাসনাটীর পরিপোষণে আদৌ সম্মত নহেন, তখন হইতে তিনি আর কাহারও নিকট মনোভাব প্রকাশ করেন নাই। ঘটনাস্থজিত অসম্ভব প্রেমের পবিত্রস্মৃতি, বহু যত্ন-লব্ধ রত্নের ন্যায, দরিদ্রের দ্রবিণের ন্যায, প্রাণের নিভৃত কক্ষে সঞ্চিত করিযা কবরের শীতল গর্ভে সকল জ্বালা মিটাইযাছেন। ধরা না দিযাও তাঁহার মর্ম্মভেদী কবিতাময দীর্ঘ নিশ্বাসে—প্রাণের জ্বালা জগতে প্রকাশ করিযাছেন। শিবাজীর মৃত্যু ও শম্ভোজির প্রাণদণ্ডের পর—শিবাজীর পৌত্র, পবিত্র মারহাঠা বংশের একমাত্র অবশিষ্ট চিহ্ন সাহজীকে বক্ষে ধারণ করিযা জেব্উন্নিসা, প্রাণের তীব্র জ্বালা অনেকাংশে প্রশমিত করিযাছিলেন।

জেব্উন্নিসার কবিতায চাঁদ নাই—বসন্ত নাই, জ্যোৎস্না নাই, মলয নাই, কোকিল কূজন নাই,—সাধারণ নাযিকার হা হতোস্মি নাই—ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা ও ননিনী-দল ব্যজনের ব্যবস্থা নাই—নদী তীরে নিভৃত মিলন নাই—আছে কেবল—দারুণ জ্বালাময নিরাশ প্রেমগীতি। সেই গীতির ছত্রে ছত্রে নিরাশ প্রেম, কথায কথায নীরব আকাঙ্ক্ষা, সুরে সুরে আলেযা, পাহাড়ী ও ভৈরবীর মিশ্র করুণ সঙ্গীত। তাঁহার কবিতা অসংখ্য। আমরা তাহার দুই চারিটী মাত্র এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম। সহৃদয পাঠক তাহার প্রকৃত রসাস্বাদন করিযা জেব্উন্নিসার হৃদযের শ্রেষ্ঠতা অনুভব করিযা সুখী হউন।*

(১) "গর্‌চে মান্ লয্‌লি আসাসম্ দিল্ চো মজনু
দার হাওয়াস্ত্।
(২) সর বসাহরা মি জানম্ লেকিন্ হায়া
জঞ্জির পাস্ত।
(৩) বুল্‌বুল্ আজ্ সাগির্দ দিরম্ হুদ্ হম্ নিশিনে
গুল বরাগ্।
(৪) দার মহব্বৎ কামিলম্ পরওয়ানা হাম্
সাগির্দ্দে মাস্ত্।
(৫) দরনেহা খুনেম্ জাহির গার্‌চ
রঙ্গে নাজকাম্।
(৬) রঙ্গে মন দরমন নেহাঁ চুন রঙ্গে হুরথ্
অন্দার হিলাস্ত্।
(৭) হস্‌কে বারে গাম্ বরু অন্দাথ্‌তাম্
(৮) জামা নীনি ক'বদ্ ইনাঁক্ বিঁকে পুস্তে
উদোতাস্ত্।
(৯) দোথ্‌তারে সাহাম্ ওলেকিম্ রু বসাফর
আওর্ দাঅম্।
(১০) জেব্ ও জিনৎ হস্ হামিনম্ নামে মান
জেব্ উন্নিসাস্ত।"

মূল পারসী কবিতাটী এখানে উদ্ধৃত করিলাম। ইহার ব্যাখ্যার জন্য একটু বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু কবিতাগুলির মর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে লায়লি মজনুর আখ্যাযিকাটী স্মরণ করিবার জন্য পাঠক পাঠিকাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। অনেকেই বোধ হয—লায়লি মজনুর কাহিনী শ্রুত আছেন।

মজনুর আসল নাম "কায়েস্"। ইহাদের প্রেম বড় অদ্ভুত। লায়লি আজীবন অবিবাহিতা ছিল—মজনুকে দেখিয়া মজিয়া ছিল, মজনুতে আপনার সর্ব্বস্ব বিকাইয়া ছিল—কিন্তু মজনুকে পায় নাই। তাহার জন্য কাঁদিযা কাঁদিয়া কবরে শুইযাছিল। লায়লির পিতা মাতা তাহাকে অন্য পাত্রে বিবাহিতা করিবার অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু লায়লি বিবাহ করে নাই। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, নিরাশ প্রেম গীতি, আর আকুল দীর্ঘশ্বাস লইযা সেই সুন্দরী-ললামভূতা জীবনটা কাটাইয়াছিল।

ইহাদের প্রেমটা কিছু অদ্ভুত ধরণের। আজকালকার ভাষায় বলিতে গেলে তাহা রোমাণ্টিক হইয়া দাঁড়ায়। মজনুর কোন অসুখ হইলে লায়লি দূর দেশে থাকিয়াও জানিতে পারিত—তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। সে প্রান্তরে প্রান্তরে আকুল নিশ্বাস ফেলিয়া বেড়াইত—উদ্যানে উদ্যানে উদাস দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। লোকে তাহাদের এই প্রেমকাহিনীর কথা শুনিয়াছিল। এক দিন এক রমনী লায়লিকে বলিল—"লায়লি! তোর মজনু মরিয়াছে" লায়লি হাসিয়া উঠিল—"বলিল তোমার কথা শুনিতে চাহি না—মজনু মরিলে আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত, আমার প্রাণ বলিয়া দিত, সে মরিয়াছে।" এতই বিশ্বাস, এতই প্রাণের আকর্ষণ! এতই তাহাদের পবিত্র প্রেম।

ঘটনাক্রমে মজনু এক দিন—চিরজীবনের মত চক্ষু মুদিল। লায়লির প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। মজনু দূর দেশে। আকুলকুন্তলা—উন্মাদিনী হইয়া লায়লি সেই দেশের সন্ধানে ছুটিল। পথে পরিচিত লোক দেখিলে জিজ্ঞাসা করে—"হাঁ—গা আমার মজনুর সমাধি কি হইয়া গিয়াছে? কোথায়—কোন নগরে তার গোর হইয়াছে তোমরা জান কি?" ইহাদের মধ্যে একজন লায়লির ভালবাসার কথা জানিত—সে বলিল—"লায়লি! তোমার মজনু তো মরে নাই।" স্ত্রীলোকটী লায়লির মন পরীক্ষার জন্যই এইরূপ মিথ্যা কথা বলিয়াছিল। লায়লি তাহা বিশ্বাস করিল না। বলিল "আমার প্রাণ জানিতে পারিয়াছে মজনু মরিয়াছে—তোমাদের সাক্ষ্য আমি গ্রহণ করিতে চাহি না। তোমরা কতদিন আমায় মিথ্যা করিয়া মজনুর মৃত্যু কথা বলিয়াছ, কিন্তু আমি তাহা বিশ্বাস করি নাই। আজ আমার প্রাণ বলিয়া দিতেছে—ওই মুক্ত প্রকৃতি, ওই নীলাকাশ, ওই নির্ঝরিণী, ওই পবনস্বনন্ বলিয়া দিতেছে আমার প্রাণের মজনু আর নাই।"

* বোম্বের গবর্ণর সারজন মেকিণ্টস জেবউন্নিসার, ভগ্ন প্রায় সমাধি দর্শনে—উচ্ছ্বাসময়ী ভাষার বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"ইহা সমাধি নহে—এক পবিত্র হৃদয় দেবীচরিত্রা রমণীর, পবিত্র প্রেমের স্বল্প কথাময় সুন্দর ইতিহাস।" দাক্ষিণাত্যের এই সমাধি ব্যতীত, রাজধানী আগ্রায় জেবউন্নিসার আর একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ ছিল। রাজপুতানা মালওয়া রেলের পথ নির্ম্মাণ সময়ে তাহা নষ্ট হইয়াছে।

উন্মাদিনী লায়লি মজনুর উদ্দেশে—সেই কবরশায়িত চিরনিদ্রিত তুষারশীতল মৃত-দেহের অন্বেষণে দেশে দেশে ঘুরিল ; মজনুর সমাধির সন্ধান পাইল না। একবার জন্মের মত শেষ দেখা, শেষ স্পর্শ করার সুখ, তাহার অদৃষ্টে ঘটিল না। সে আরও কাতর হইয়া—ঘুরিতে লাগিল। চক্ষে অশ্রু, মুখে বিষাদ—নিশ্বাসে ব্যাকুলতা, প্রাণে সন্তাপ লইয়া যেখানে নূতন কবর দেখে তাহাই আঘ্রাণ করিতে লাগিল। শেষ এক স্থানের কবরের নিকট বসিয়া পড়িল। লায়লি এবার ঠিক ধরিয়াছে—যেখানে তাহার প্রাণের প্রাণ মজনু জন্মের মত চক্ষু বুজিয়াছে, সেই কবরের পার্শ্বে বসিয়া উন্মাদিনী বালা—সকল সন্তাপ ভুলিল।

লায়লি মজনুর এই উপাখ্যানের সহিত জেবউন্নিসার কবিতার প্রথম দুইটী চরণের সম্পর্ক আছে বলিয়াই ইহার অবতারণা করা হইল। এখন সমগ্র কবিতাটীর আনুপূর্ব্বিক অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

(১) (২) আমার ইচ্ছা হয়, আমি উন্মাদিনী লায়লির মত, হৃদয়েশ্বরের জন্য প্রান্তরে প্রান্তরে ভ্রমণ করি। কিন্তু তাহা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি সাহজাদী—বাদসাহ-কন্যা, লজ্জা ও সম্ভ্রম আমার পদদ্বয় শৃঙ্খলিত করিয়াছে। আমার মন লায়লির মত, আমার অবস্থা কিন্তু মজনুর মত। অর্থাৎ লায়লি মজনুকে জীবন সমর্পণ করিলেও—সে যেমন নিষ্ঠুরভাবে লায়লির আকুল প্রেম প্রত্যাখান করিয়াছিল—আমার প্রিয়তমও আমার সম্বন্ধে সেইরূপ করিয়াছে। আমি মনে মনে সেই হৃদয়োচ্ছ্বাসের জন্য ব্যাকুল হইয়া জীবন কাটাইতেছি।

(৩) বুলবুল্ গোলাপের কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়ায়।* প্রেমের কথা বলে—কত আদর করে, একদণ্ড তাহাকে ছাড়িয়া যায় না। এই বুলবুল আমার নিকট প্রেম শিক্ষা করিয়াছে।

(৪) এই যে আমার সম্মুখে স্ফটীক দীপাধারের মধ্যবর্ত্তী উজ্জ্বল আলোকের স্নিগ্ধজ্যোতিঃতে বিমুগ্ধ হইয়া কত শত পতঙ্গ অনলে আত্মসমর্পণ করিতেছে—এ আত্মত্যাগ তাহারা আমার নিকট শিক্ষা করিয়াছে।

(৫) (৬) মেহেদি পত্রের বহির্ভাগ সবুজবর্ণ। কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে, গভীর লোহিতাভ বর্ণের সমাবেশ। মেহেদি পাতার আভ্যন্তরিণ বর্ণ যেমন তাহার সবুজ আবরণের অন্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে আছে—আমার বাহ্যপ্রকৃতিতে কোনরূপ আকুলতা লক্ষিত না হইলেও আমার অন্তর দগ্ধ হইয়া মেহেদির আভ্যন্তরিণ আবরণের ন্যায় লোহিত হইয়াছে।

* আমাদের যেমন নলিনী-ভ্রমর, পারসীক কবিতায়—সেইরূপ গোলাপ-বুলবুল।

(৭) (৮) আমার প্রাণের ভার (বেদনা) অত্যন্ত অধিক। এত অধিক যে ইহার কিয়দংশ আমি আকাশকে দিয়াছি, তাই আকাশ নীলবর্ণ ধারণ করিয়াছে ও তাহার ভারে বঙ্কিম ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। (বেশী ভার বহন করিলে, ভারবাহীর মুখ যেরূপ নীলবর্ণ ধারণ করে ও ন্যুব্জ দেহ হইয়া পড়ে—এইরূপ ভাবার্থ)।

(৯) (১০) বাদসাহের কন্যা আমি—কিন্তু এ ঐশ্বর্য্য-দীপ্তি আমার কিছুই ভাল লাগে না। আমি দরিদ্রের মত বিস্মৃতির তিমির গর্ভে থাকি, এই আমার বাসনা। আমার নাম—"জেব উন্নিসা"* অর্থাৎ সুন্দরী শ্রেষ্ঠা। এই গৌরবই আমার পক্ষে যথেষ্ট। ১

(১) হরকস্ দর আমদ্ দরজাঁহা—
আখির ব মতলব হা রসিদ্।
(২) পীর শুদ্ জেবুলন্নিসা চরা
খবিদারে ন সুদ॥

(১) এই পৃথিবীতে যত নরনারী জন্মিয়াছে—সকলেই জীবনের উদ্দেশ্য একটী বা অধিক পরিমাণে সফল করিয়া গিয়াছে।

(২) কিন্তু অভাগিনী জেব উন্নিসা, স্বামী-বিরহিতা হইয়া, এই সৌন্দর্য্যপূর্ণ জগতকে বিদায়াভিবাদন করিতেছে। (অর্থাৎ, নিরাশ জীবন লইয়া সে জন্মের মত বিদায় চাহিতেছে।)

(১) মোবগে দিলরাগুলসানে বেহতার জেকুয়ে এয়ার নিস্ত্।
(২) তালোবে দিদার রা জাতকে গুলু ও গুলজার নিস্ত্॥
(৩) হাবকেরা দবপায়ে দিল্ জাঞ্জির্ আজ জুল্ফেতু নিস্ত্।
(৪) গরচে আঁ মানসুর বাসদ্ মাহরমে আস্‌রার নিস্ত্॥
(৫) গবচে সাব ত পাৎমন্ দারদ্ আস্ত আস্মা সিমানা।
(৬) মিস্‌লে দাবুদে হিজব আজ্ দারদে দিগার আজার নিস্ত্॥
(৭) গুফ্তাম্ আজ্ এশকে বুঁতা আয় দিল চে হাসেল্ কারদাই।
(৮) গুফ্তু মারা হাসেলে জুজ্ নালাহায়ে হাব্ নিস্ত্॥
(৯) নে জে সাদি সাদ্ বাসম্ নে জেগম্ আজোরদা আম্
(১০) পেশ্ আহলে দিদা ফারকে দার গুল্ ও দারখার নিস্ত্।
(১১) চান্দ্ রোজি খুনে দিল মাখ্কি বারায়ে মাহওশাঁ
(১২) রেখ্তান্ বাবখাক্ গুল রা শেবায়ে আৎতার নিস্ত্।

(১) (২) পক্ষীরা সুন্দর উদ্যানকেই আরামের স্থল বিবেচনা করে। প্রেম পাত্রের নিকটবর্ত্তী স্থানই মনরূপ পক্ষীর প্রকৃত আনন্দের স্থান। হে ঈশ্বর! আমি তোমায় ভালবাসি, তোমার চিন্তায় তোমার নিকটবর্ত্তিনী হইতে পাইলেই সুখিনী হই। যে তোমার নিকটস্থ হইতে ইচ্ছা

* জেব—সুন্দরী, উন্নিসা—বহুতর সুন্দরী রমণী, অর্থাৎ যিনি বহুতর সুন্দরীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা বা বরণীয়া।

করে—পৃথিবীর অতি সুন্দর প্রেমপাত্র, বা অতি সুবাসিত উদ্যান তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না।

(৩) (৪) আমাদের অন্তঃপুরে দেখিয়াছি—সুন্দরী স্ত্রীলোকেরা কুঞ্চিত অলককে বড়ই সুন্দর বলিয়া জ্ঞান করে। (পারসীর অনুবাদ কুঞ্চিত জুল্‌ফী) এই কুঞ্চিত অলকের সৌন্দর্য্য দেখিয়া- প্রণয়ীরা আকৃষ্ট হয়—প্রেম-বন্ধনে পড়ে। আমার বিবেচনায় যে তোমার ভালবাসার কুঞ্চিত অলকে (জুলফীতে) আপনার মনকে আবদ্ধ করে নাই—সে মনসুরের মত মহাজ্ঞানী হইলেও আমার চক্ষে পূজনীয় নহে।

(৫) (৬) আমার সমস্ত শরীর দুঃখের তীব্র বেদনায় জর্জ্জরিত। সেজন্য আমি এই রক্তমাংসময় শরীরের সর্ব্বত্রেই বিজাতীয় যাতনা অনুভব করি। আমার শরীরের কোন স্থানে কি কষ্ট তাহা আমি নিজে বুঝিতে পারি। কিন্তু সমস্ত শরীর অপেক্ষা আমার মনের ব্যথাই অধিক। আমি শরীরের সর্ব্বস্থান দেখিতে পাই, কিন্তু মনের অধিকৃত স্থান দেখিতে পাই না, অথচ মনের মধ্যে দারুণ বেদনা অনুভব করি। যে দিন হইতে তুমি আমায় এ পৃথিবীতে পাঠাইয়াছ—সেই দিন হইতে তোমাতে আমাতে বিচ্ছেদ হইয়াছে। আমার মনের ব্যথা—তোমার বিচ্ছেদ জন্য ইহাই এখন বুঝিতেছি।

(৭) (৮) আমি এক দিন কৌতুকচ্ছলে মনকে জিজ্ঞাসা করিলাম—রে মন! তুই কেন লোককে ভালবাসিস্? মন উত্তর করিল—আমি কাঁদিতে ভালবাসি, তাই ভালবাসি। না কাঁদিলে—ভালবাসিতে পারা যায় না। যাহাকে চির দিন কাছে পাওয়া যায়, তাহার জন্য কান্না আসে না। যাহার জন্য চোখের জল ফেলিতে হয়—তাহাকে পাইলেই অনন্ত সুখ। এই জন্য—অশ্রুই মিলনের সেতু। আমি মনের কথার প্রতিধ্বনি লইয়াই তোমায় জানাইতেছি, আমি তোমায় ভালবাসি কেবল কাঁদিবার জন্য। তোমার জন্য আজীবন কাঁদিতে পাইলে আমি তোমায় পাইব এই আশা আমার মনে জাগিয়া উঠে। *

(৯) (১০) লোকের মনে যাহাতে সুখ হয়, আমার তাহাতে সুখ হয় না। লোকের মনে যাহা দুঃখ, আমি তাহা দুঃখ বলিয়া বুঝি না। লোকে ঐশ্বর্য্যকে মহা সুখ, ও তাহার অভাবকে দুঃখ বলিয়া বিবেচনা করে। আমি অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য মধ্যে থাকিয়াও মহাদুঃখ অনুভব করিতেছি। লোকে সুখ ও দুঃখ স্বতন্ত্র পদার্থ মনে করে বলিয়া এত কষ্ট পায়। আমি সুখ ও দুঃখকে এক পদার্থ বলিয়া ভাবি। কারণ এই একটী গোলাপ ফুল—তাহাতে কাঁটা আছে, পাপড়ি আছে, সুবাস আছে, সৌন্দর্য্য আছে, কেশর আছে। সকলগুলির সমষ্টিই গোলাপ। এই বিভিন্ন অংশ পরিপুষ্ট সমগ্র গোলাপ হইতে প্রকৃতপক্ষে তাহার গুটীকতক অংশ বিভাগ করা অসম্ভব। গোলাপ হইতে তাহার সুবাস কণ্টক, পাপড়ি প্রভৃতি একে একে পৃথক করিলে তাহার গোলাপত্ব লোপ হয়। গোলাপের কণ্টকই দুঃখ—সুবাসই সুখ—ইহারা যেমন অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্বন্ধীকৃত, সেইরূপ সুখ হইতে দুঃখকে স্বতন্ত্র করা অসম্ভব।

(১১) (১২) যাহারা আতর তৈয়ারি করে, তাহারা মাটীতে ফুল ফেলিয়া দেয় না- যত্নে সঞ্চয় করিয়া কুড়াইয়া রাখে। রে চক্ষু! তুই এই পৃথিবীর কমনীয় শ্রী সম্পন্ন প্রেম পাত্রের বিরহে অশ্রুত্যাগ করিস কেন? আমার চক্ষু নির্গত অশ্রুরাশি যে সুগন্ধি পুষ্প রাশির সহিত তুলনীয়' যার তার জন্য নিঃসারিত হইয়াঅপব্যয়িত হস্ কেন? তুই যদি ঈশ্বরী প্রীতিরূপ আতর প্রস্তুত করিতে ইচ্ছুক থাকিস্—তাহা হইলে—এই সুগন্ধি অতি পবিত্র অশ্রুরাশির অপব্যবহার করিস্ না।

(১) জায়্ বাতু কায়েম্ ওজুদে আস্‌লে হাব মৌজুদ্ রা।
(২) ওয়্ জেতু রওসন্ চেরাগে গাওহারে মক্‌ছদ্‌রা।
(৩) চুঁ খমিরে তিনাতে মা জানে রাহ্ মাৎ কাবদাই।
(৪) হাম্ বালুতকে খিশ্ গরদাঁ আকেবাৎ মাহ্‌মুদরা।
(৫) খাহ আজ্ ওওফে হারম্ খাহি বয়োঃবানানে দায়ের
(৬) হব্ কুজা মা বাদ্ কুনি আঁজাতুই মাবুদ্ মা।
(৭) নালা হায়ে দিল্ সাহার গাহি কে গায়েরে হুদে আহ্
(৮) নিস্ত্ মোম্‌কিন্ সায়্ কালে আইনায়ে মক্‌ছুদ মা।

* * * * *

(১) হে ঈশ্বর! জগতের যাহা কিছু উৎপত্তি, তোমা হইতেই। এই জগত তোমারই মহাশক্তির বলে স্থায়ী হইয়া আছে।

(২) মানবের মনে তোমার বাসনা রূপ যে অতি আছে তাহার উজ্জ্বলতা তোমার জ্যোতি হইতেই সমুদ্ভূত।

(৩) (৪) হে দয়াময়! তুমি বিশাল জগতের শ্রেষ্ঠ

* মনসুর আরব দেশীয়—অতি প্রাচীন যুগের এক সাধু। তিনি ঈশ্বর প্রেমোন্মত্ত হইয়া—"আমিই সেই ঈশ্বর" এইরূপ বলিয়া উঠিতেন। অন্ধ বিশ্বাসী আরবীয়েরা এই জন্য তাঁহার প্রাণদণ্ড করে।

শিল্পী। শিল্পীরা যেমন কর্দ্দমকে স্বল্প বারিসিক্ত করিয়া অবসাদপূর্ণ মূর্ত্তি গঠন করে, তুমিও সেইরূপ তোমার অনুগ্রহ বারি দ্বারা আমায় সৃজন করিয়াছ। হে প্রভো! যতদিন না আমার জীবনান্ত হয়, ততদিন তোমার সেই অনুগ্রহ রসে যেন তোমার সৃজিত এই দেহ সিক্ত থাকে। আমি যেন তোমার কথা বলিতে বলিতে মরিতে পারি।

(৫) (৬) জানি না—হে প্রভু! হে মহাশক্তিমান্! তুমি কোথায়? তুমি, পবিত্র মক্কাসহরের চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণকারী সংযমী সাধুদিগের মধ্যে, অথবা হিন্দু দেবালয়ে, সংযতচিত্ত, মৌনব্রতধারী সাধুদের উপাস্য স্থানে—যেখানেই থাক না কেন—যে স্থান তোমার পদচিহ্নে সুপবিত্র, তাহা আমার নিকট অতি পবিত্র ও উপাসনার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত।

(৭) আমি প্রাতঃকালে উঠিয়াই যাতনা ব্যঞ্জক—আঃ উঃ—ইত্যাদি শব্দ করি—

(৮) এই দুই কথায় আমার মনের যাতনা প্রকাশ হয়। সমস্ত দিন এইরূপ আক্ষেপোক্তিতে অতিবাহিত করি। কেন করি তাহা আপনি জানেন কি? যাতনা—অন্তরের উষ্মা। তাহা বাহির করিবার সময় লোকে এইরূপ আর্ত্তনাদ সূচক শব্দ করে। কলঙ্কিত দর্পণ গাত্রে—মুখগহ্বর নির্গত উষ্মাক্ষেপ করিলে (অর্থাৎ হাই দিলে) সেই দর্পণ পরিষ্কৃত হয়—তাহার নিষ্কলঙ্ক মার্জ্জিত গাত্রে সুন্দর প্রতিবিম্ব পড়ে। আমার হৃদয় হইতে ক্রমাগতঃ উষ্মা বাহির হইয়া মনরূপ কলঙ্কিত দর্পনকে প্রতিনিয়ত পরিষ্কার করিতেছে। তোমার সেই অনন্ত সুন্দর রূপ—জ্যোতিঃ সেই দর্পণে ধরিয়া প্রাণের জ্বালা নিভাইব—এই জন্য এত কাতর হই। ✕

জেবউন্নিসার রচিত অসংখ্য কবিতার মধ্যে আমি চারিটী মাত্র উদ্ধৃত করিলাম। * মাসিক পত্রের স্বল্প স্থানের মধ্যে এ গুলি উদ্ধৃত করা অসম্ভব। বিশেষতঃ আমি কবিতাগুলির যে অনুবাদ দিয়াছি, তাহা আক্ষরিক বা শাব্দিক অনুবাদ নহে—মর্ম্মানুবাদ মাত্র। পারসী ও আরবী প্রেমকবিতা এত অনুপ্রাস জড়িত, এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কবিতাগুলি মহম্মদীয় শাস্ত্রের এত জটিল উপমা পরিবেষ্টিত যে, তাহার টীকা ও ব্যাখ্যা বিশদরূপে করিতে গেলে—পাঠকের সহিষ্ণুতার উপর অন্যায় আক্রমণ করা হইবে। যাহারা মনে করিবেন—আমি বিদ্যা প্রকাশের জন্য মূল পারসী বচনগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি—তাহাদের নিকট সবিনয় নিবেদন—যেন তাঁহারা আমায় এরূপ অপরাধী বলিয়া বিবেচনা না করেন। আজকালকার বাজারে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিতে গেলে—রাশি রাশি ইংরাজী ফুট নোট না দিলে তাহার বিশেষত্ব হয় না; কিন্তু আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপকরণ ইংরাজী ভাষার কোন *ইতিহাস পুস্তক হইতেই সংকলিত নহে—কাজেই ক্ষেত্রানুসারী* ব্যবস্থায় আমার মূল পারসী কবিতাগুলি পাঠকের বিশ্বাসের জন্য উদ্ধৃত করিতে হইয়াছে। দ্বিতীয় কারণ, যাঁহারা পারসী জানেন—তাঁহারা এ গুলির গূঢ়ার্থ করিয়া ইহার প্রকৃত সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবেন—ইহাই আমার ইচ্ছা।

কবিতা যদি কবি-হৃদয়ের প্রকৃত ভাবের ছায়া হয়, তাহার মনের কথার প্রতিধ্বনি হয়—তাহা হইলে সহৃদয় বিবেচক পাঠক এই কবিতাগুলি হইতেই জেব্ উন্নিসা বেগমের প্রকৃত চরিত্র অনুভব করিতে পারিবেন। জেব্-উন্নিসা যদি প্রকৃত কলঙ্কিনী হইতেন—তাহা হইলে তাঁহার হৃদয় এতদূর ঈশ্বর-প্রেম পূর্ণ হইত না—এত বিরাগপূর্ণ হইত না—এত উদার ভাবময় হইত না। তাঁহার প্রেম-গীতিতে যেমন গভীর নিরাশা, তাঁহার পরমার্থ গীতিতেও সেইরূপ গভীর নিরাশা। সেই নিরাশার মূলে, উভয় স্থলেই, এক পবিত্র প্রেমাকাঙ্ক্ষা। সে প্রেম মানুষের উপর হউক বা ঈশ্বরের উপর হউক, যে দিক্ দিয়া দেখা যায়—তাহা পবিত্র একাগ্রতাপূর্ণ, আবেগময়ী ও উচ্ছ্বাসময়ী। সুগন্ধি গোলাপ হইতে যেমন পূতিগন্ধ বাহির হয় না, দামিনীর উজ্জ্বল জ্যোতিতে যেমন কলঙ্কের চিহ্ন থাকে না—মেঘ বারিতে যেমন পঙ্কিলতা ঘটে না—সেইরূপ পবিত্রও কখনও অপবিত্র হয় না। যে জেবউন্নিসার হৃদয় এত পবিত্র, তিনি কখনই কলঙ্কিনী—অভিসারিকা নহেন। সমগ্র হিন্দুস্থানের প্রতাপান্বিত বাদসা আলমগীরের কন্যার যতটুকু আত্ম সম্ভ্রম থাকা উচিত—তাহা তাঁহাতে ছিল। তিনি

* আমার প্রিয় সুহৃৎ মৌলবী সাহেব—আমায় দ্বাদশটী কবিতা আবৃত্তি করিতে শিখাইয়াছিলেন। যেরূপ ভাবে কবিতাগুলি বাঙ্গালা অক্ষরে গ্রথিত করিয়াছি—তাহা মূল পারসীর প্রকৃত উচ্চারণ হিসাবে ধরিলে নিতান্ত আপত্তিজনক। স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ বা হসন্তাদি ভেদ করিবার কোন উপায় বাঙ্গালা বর্ণমালায় নাই, কাজেই যতদূর পারি প্রকৃত উচ্চারণ বজায় রাখিবার চেষ্টা পাইয়াছি।

প্রকৃত পাপ পথ বিচারিণী হইলে পদোচিত গৌরব রক্ষার্থে, আত্ম সম্ভ্রম রক্ষার্থে—এমন ভাবে পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন যে, বৈদেশিক আশ্রয়-ভিখারি আনুগত্য লাভাকাঙ্ক্ষী, ইউরোপীয় ইতিহাস লেখকেরা তাহার সন্ধান পাইত না। আমরা মেনুসীর মধ্যে জেবউন্নিসার বিরুদ্ধে কোন কথা পাই নাই—মেনুসীর যে কয়েকটী সংস্করণ হইয়াছিল—যদি কোন সংস্করণে এরূপ বিরদ্ধ কথা থাকে তাহা আমার পূজাপাদ—সাহিত্য গুরু বঙ্কিমচন্দ্রই জানেন। মেনুসী যে ঔরঙ্গজেবের কোপকটাক্ষে পড়িয়া দাক্ষিণাত্যে প্রাণ লইয়া পলায়ন করেন এটা ঐতিহাসিক সত্য। তিনি যদি দুই একটা বিরদ্ধ কথা কোথাও বলিয়া থাকেন তাহাই প্রামাণ্য, আর জেবউন্নিসার পবিত্র জীবন—তাহার তুলনায় কিছুই নয়—ইতিহাসের খাতিরে এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

ঔরঙ্গজেবের সহস্র দোষ থাকিলেও, তিনি যে স্বধর্ম্মানুরাগী ছিলেন—ঈশ্বরে অতি বিশ্বাসী ছিলেন—তাহার আর সন্দেহ নাই। এই অতিরিক্ত ঈশ্বরানুরক্তি তাঁহাকে স্বধর্ম্মের গোঁড়া করিয়া তুলিয়াছিল।* এই গোঁড়ামির জন্য তিনি হিন্দু সমাজের চক্ষে অত্যাচারী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন। তিনি পিতাকে অবরুদ্ধ করেন—ভ্রাতাদের শমন সদনে প্রেরণ করেন—অন্যথা উপায়ে সিংহাসনাধিরোহণ করেন, এটা ইংরাজের লিখিত ইতিহাসের কথা। মুসলমানের লিখিত ইতিহাস হইতে এমন কতকগুলি প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়, যাহাতে এই পিতৃদ্রোহ ও ভ্রাতৃবিনাশ প্রভৃতির সমর্থন করা যাইতে পারে। ভবিষ্যতে প্রদীপেই তাহার আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

ঔরঙ্গজেব কন্যাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। কন্যার বুদ্ধিমত্তার জন্য নহে—পিতৃবৎসলতার জন্য নহে—তাহার ধর্ম্মানুরাগের জন্য। পিতা পুত্রীতে বসিয়া অনেক সময়ে প্রার্থনা করিতেন—শাস্ত্রালোচনা করিতেন—ঈশ্বরের গুণগান করিতেন।* কন্যার মৃত্যুর জন্য ঔরঙ্গজেব অত্যান্ত শোকসন্তপ্ত হন। ইহা যদি সম্ভব হইত যে, তাঁহার প্রধান শত্রু শিবাজী বশ্যতা স্বীকার করিয়া জেবউন্নিসার হস্ত প্রার্থনা করিতেন—তাহা হইলেও তিনি সাহজাদীকে পাইতেন না। জেবউন্নিসাও যদি শিবাজীর গুণে মুগ্ধ না হইয়া—অন্য কোন রাজপুত রাজের বা রাজকুমারের হস্ত প্রার্থনা করিতেন—ঔরঙ্গজেব তাহাতে বোধ হয় অসম্মত হইতেন না। পরাক্রান্ত শিবাজী ঔরঙ্গজেবের প্রধান শত্রু—যাহার উচ্ছেদসঙ্কল্পে তিনি আজীবন সংগ্রাম করিয়াছেন—তাহার হস্তে কন্যা দান—ঔরঙ্গজেবের ন্যায় দাম্ভিক বাদসাহের পক্ষে অসম্ভব। এই জন্যই জেবউন্নিসা আজীবন নিরাশভাবে জীবন কাটাইয়াছেন—তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত কন্দরের প্রতিধ্বনিত এই অভিনব প্রেমগীতি তাঁহার প্রাণের মধ্যে গুপ্তভাবে প্রতিধ্বনিত হইয়া তাঁহার সহিত সমাধিস্থ হইয়াছে।

বেগমপুরে মহা সমারোহে—ঔরঙ্গজেব অশ্রুপূর্ণ নয়নে কন্যাকে সমাধিস্থ করেন। আগ্রাতে ইহার অনুরূপ আর একটী সমাধি ছিল। রাজপুতানা-মালব-রেলপথ প্রস্তুতের সময়—রেল কোম্পানী তাহার উচ্ছেদ সাধন করিয়া আগরা হইতে জেবউন্নিসার স্মৃতি লোপ করিয়াছেন।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যা

* ঔরঙ্গজেব এতদুর সংযতচিত্ত হইয়া একাগ্রমনে প্রার্থনা করিতেন যে, সে সময়ে তাঁহার বাহ্য প্রকৃতির সহিত সমস্ত সম্পর্ক লোপ হইত। এক দিবস—দেওয়ান খাসের নিভৃত মহলে—সান্ধ্য আজান শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রার্থনা আরম্ভ করেন। দীর্ঘকালব্যাপী প্রার্থনায় তাঁহার চিত্ত ঈশ্বর প্রেমে এতদুর মগ্ন হয় যে, তাঁহার পাদমূলে এক বিষধর বৃশ্চিক দংশন করিলেও তাহার যন্ত্রণা তখন অনুভব করিতে পারেন নাই। কিন্তু প্রার্থনাশেষে বড়ই কাতর হইয়া পড়েন।

দেবাবির্ভাব

রজনীতে

দুরন্ত আহবে ইংরাজ বুয়র মেতেছে ভৈরব বেশে,
নর-রক্ত-নদী বহিছে গর্জ্জিয়া ট্রান্সভাল অরেঞ্জ দেশে।
গর্জ্জিছে কামান ভৈরব আরাবে, ধূমে অন্ধকার দিশি ;
অযুত উলঙ্গ কৃপাণ খেলিছে বিদ্যুৎ প্রভায় মিশি।
ভীম আগ্নেয়াস্ত্র শক্তিশেল শত বজ্র বেগ জিনি ছুটে,
সহস্র সতীর সংসার-সৌভাগ্য পলকে যেতেছে টুটে।
আরক্ত-নয়ন উন্মত্ত অধীর দুরন্ত কৃতান্ত নাচে,
নৃমুণ্ড খর্পরে পিশাচ পিশাচী নর রক্ত সুরা যাচে।
ন্যায়, ধৈর্য্য, ধর্ম্ম, দয়া, মায়া, ক্ষমা সেথায় নাহিক কেউ,
শোণিত-তরঙ্গ শোণিত-পিপাসা শোণিতের মহা ঢেউ।
শার্দ্দূল জিনিয়া হিংস্রক মানব, নরত্ব গিয়াছে ঘুচি,
নররক্তে হায় নরের পিপাসা, নরমাংসে হেন রুচি।
লাজে ভয়ে ত্রাসে সহস্র কিরণ পশ্চিমে ঢাকিল মুখ,
ঢাকিতে এ পাপ তমোরাশি আসি ছাইল ধরায় বুক।
আজিকার তরে ইংরাজ বুয়র ক্ষান্ত করি রণখেলা,
কলঙ্কিত কর, শোণিতাক্ত দেহ, যে যার শিবিরে গেলা।

অর্দ্ধ নিশাভাগে সুপ্ত সৈন্য মাঝে একি হলো আচম্বিত,
সহসা বহিল অপূর্ব্ব সৌরভ, সুগন্ধে পুরিল ভিত
অমনি খুলিল স্বরগের দ্বার, জ্যোতিতে পুরিল দেশ—
শত সূর্য্যতেজে ভাসিল গগন, নাহি অন্ধকার লেশ।
সে জ্যোতির মাঝে জ্যোতির্ম্ময় হয়ে দাঁড়াল পুরুষ এক,
স্কন্ধে ক্রুশ ভার, মস্তকে মুকুট, হস্ত পদে বিদ্ধ প্রেক।

(আমি) তোদেরই তরে নিদারুণ ক্রুশে করেছি দেহপাত,
তোদেরই তরে ধরেছিনু বুকে দারুণ শেলের ঘাত।
তোদেরই তরে অশেষ লাঞ্ছনা সহিছিনু আমি ধীরে,
তোদেরই তরে কাঁটার মুকুট পরেছিনু আমি শিরে।
তোদেরই তরে মরতে নামিয়া পাইনু যতেক ক্লেশ,
তোদেরই তরে দেহ বিকাইয়া এই কি ফলিল শেষ?



সুষুপ্তির মাঝে ইংরাজ যুবক চাহিল সে মূর্ত্তি পানে,
স্বর্গ হইতে গাহিলা দেবতা ব্যথিত কাতর প্রাণে।

এক গণ্ডে কেহ করিলে আঘাত অন্য গণ্ড দিবে ফিরে,
স্বরগের এই সার ধর্ম্মকথা তোদের বলিনি কি রে?

মানব ভ্রাতারে করিলে আঘাত সে আঘাত আমি পাই,
আমার প্রাণের নিগূঢ় এ কথা তোদের কি বলি নাই ?
আমার ক্রুশের যাতনার কথা তোরাই গাহিস্ মুখে,
শত ক্রুশ সম সঙ্গীনের ঘায় বিঁধিস্ আমার বুকে।
হায় রে আমি কি শস্যবীজরাশি পাষাণে ছড়ায়েছিনু,
হায় রে আমি কি মুকুতার মালা শূকরের গলে দিনু।
মাটির বদলে মাণিক বেচিলি, সুধা বেচে নিলি বিষে,
জীবন বেচিয়া মরণ কিনিলি, হৃদয় জুড়াবি কিসে ?
এখনও আমি ক্রুশ কাষ্ঠ ভার বহিছি তোদের তরে,
এখনও আমি প্রসারিয়া বাহু দাঁড়ায়ে গগন 'পরে।
ছাড়ি' পাপকায়া অনুতাপ জলে ধো'য়ে যে'ত পাপরাশি,
স্বরগের ফুল মরতে ভাতিয়া—স্বরগে আবার হাসি।
থামিল বচন, প্রতিধ্বনি তার ছাইল আকাশময়,
দিগঙ্গণাগণ গাইল উল্লাসে জয় যেশু জয় জয়।
সমস্ত রজনী ইংরাজ বুয়র দেখিল সে মূর্ত্তিখানি,
সমস্ত রজনী ঝড় স্বর মাঝে শুনিল সে দৈববাণী।

প্রভাতে

ইংরাজ বুয়র রক্তে রঞ্জিত যেন কলেবর,
প্রভাতে লোহিত রাগে সমুদিত দিবাকর।
দারুণ পাপের চিত্র দেখাতে নরক-খেলা,
ধীরে ধীরে অন্ধকার আপনি সরিয়া গেলা।
প্রকাশিল রণক্ষেত্র, কি ভীষণ চিত্র হায়,
কার না শিহরে প্রাণ হৃদি ফাটে মমতায়।
কত যতনের নিধি, কত বুক চেরা ধন,
ধূলায় লুণ্ঠিত হায় চির নিদ্রা নিমগন।
বাজিলে স্বর্গের ভেরী মহা বিচারের দিন,
জাগিবে খ্রীষ্টান তনু যতেক সমাধি লীন।
আহা সে খ্রীষ্টান দেহ স্বর্গের অমূল্য নিধি,
কাক শৃগালের তরে হায় সৃজিলা কি বিধি ?
নিহতের পূতিগন্ধ, আহতের আর্ত্তনাদ,
বিয়োগীর দীর্ঘশ্বাস, রোগীর সে অবসাদ,
দিবসের মহারণ, বিপক্ষের ভীমারাব,
রজনীর জ্যোতির্ম্ময় দেবতার আবির্ভাব,
ভাবিতে ভাবিতে চিত্ত নানা ভাবে হ'ল ভোর,
ইংরাজ বুয়র সৈন্য ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর।
স্বর্গের সে কথাগুলি এখনও বাজিছে কাণে,
ক্রুশের যাতনা ভার এখনো জাগিছে প্রাণে।
অর্দ্ধ ভগ্ন প্রাণ লয়ে যেমনি ভাঙ্গিল ঘুম,
অমনি কামানরাশি গর্জ্জিল গুড়ুম গুম্।
সহসা উত্তপ্ত রক্তে ধমনী হইল স্ফীত,
উন্মত্ত দানবদল বিস্মরিল হিতাহিত।
বাজিল সংহার ভেরী—কৃতান্তের নিমন্ত্রণ,
সাজিল সংগ্রাম সাজে ইংরাজ বুয়রগণ।
বিদারি আকাশতল আবার আলোক-রেখা,
আবার আলোক-মাঝে দেবতা দিলেন দেখা।
হানি মেঘ-মন্দ্র কামান-গর্জ্জন ঢাকি রণবাদ্য উঠিল ধ্বনি,
"আজি হ'তে আমি ত্যজিনু তোদের—
তোদের প্রতিভূ তোরা আপনি।"

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ।

সেকালের ছাত্র।

এ কালের এক দল ছেলে আমাদের সে কালের ছাত্র জীবনটাকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করেন, আমি সে কালের মনুষ্য, আমার কাছে সে কালের ছাত্র জীবন এ কালের ছাত্র জীবন অপেক্ষা অধিক পরিমাণে সজীব বলিয়া বোধ হইত, সে কালের পল্লীবাসী ছাত্রগণের মধ্যে জীবনের লক্ষণটা কিছু অতিরিক্ত পরিমাণেই বর্ত্তমান ছিল।

সে কাল বলিতে আমি এক শতাব্দী পূর্ব্বেকার কথা বলিতেছি না, আমি বলিতেছি চল্লিশ বৎসর আগেকার কথা, কিন্তু এই চল্লিশ বৎসরই কি কম দিন ? দিন যতই হউক, পরিবর্ত্তনটা বড়ই অতিরিক্ত বলিয়া মনে হয়, মনে হয়—এ যেন আর এক দেশ, আর এক সমাজ, আর এক রকমের জীবন যাত্রা; কালেজের কলে ফেলিয়া, ইংরাজী কেতার ছাঁচে ঢালিয়া ছেলেগুলিকে একটা নির্দ্দিষ্ট আকারে প্রস্তুত করা হইতেছে, লক্ষণ খুব ভাল, কিন্তু এত ভালো মানুষের মধ্যে দুই চারিটা দুরন্ত, অশান্ত শিষ্টাচারের গণ্ডির প্রতি লক্ষ্যহীন ছেলে না থাকিলে—সেটা সে কেলে লোকের চক্ষে নিতান্ত খাপছাড়া দেখায়, চসমার ভিতর দিয়া বোধ হয়, এ কালের সুগণ্য ছাত্রবৃন্দ একটা কটিনের জীবন্ত সংস্করণ মাত্র, অতিরিক্ত পরিমাণে 'জেণ্টলম্যান।'

সেই চল্লিশ বৎসর আগে, আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের সে কালে, কলিকাতা প্রভৃতি সহরের অবস্থা কিরূপ ছিল বলিতে পারি না, বোধ করি খুব ভালই ছিল, কিন্তু তখন আমাদের পল্লীগ্রামের পাড়ায় পাড়ায় এম, এ, এবং ঘরে ঘরে বি, এ, অবতীর্ণ হইয়া পল্লীগৃহ ধন্য করেন নাই। তখন দুই চারিজন মাত্র বি, এ, পাশ করিয়া পল্লীবাসিগণের নিকট দেবতার শ্রেণীতে 'প্রমোশন' পাইয়াছিলেন।

সুতরাং বলা বাহুল্য যে তখন সবে মাত্র আমাদের পল্লীগ্রামে ইংরাজী শিক্ষার সুকোমল উত্তাপ প্রবেশ করিতেছে, সে উত্তাপ পাঠশালা ও বাঙ্গালা স্কুলের শিক্ষাশৈত্যের মধ্যে যতই প্রীতিকর হউক, আমাদের থার্ড মাষ্টার মহাশয়ের মেঘমন্দ্র ছয়টি ঋতুতেই আমাদের নিকট সমভাবে বর্ষাকালের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিত, এবং যখন তাঁহার করচ্যুত অপ্রতিহত অশনি কাহারও পৃষ্ঠে পড়িত, তখন সে বেচারীকে যে ঝাঁকুনি সহ্য করিতে হইত তাহা এ কালের বৈদ্যুতিক ঝাঁকুনি অপেক্ষা লঘুপাক নহে।

এই মাষ্টারটির নাম বেণী চক্রবর্ত্তী। চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রত্যহ কিঞ্চিৎ পরিমাণে অহিফেন সেবন করিতেন, কাহারও কাহারও মুখে শুনিয়াছি কাঁচাতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না, পাকার প্রতিও তাঁহার আসক্তি ছিল; বলিতে পারি না, কারণ কোন দিন "তোড়জোড় মেরুদণ্ড" সমেত তাঁহাকে হাতে কলমে ধরিতে পারি নাই, তবে তাঁহার 'কাঁচার' কল্যাণে সময়ে সময়ে আমাদিগকে যে রকম ভুগিতে হইত তাহা এখনও ভুলিতে পারি নাই; এখনও যদি কেহ বলে মনের মধ্যে যমের একটা চেহারা কল্পনা কর, কেন বলিতে পারি না, তৎক্ষণাৎ বেণী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মূর্ত্তি চিত্তপটে চিত্রিত হইয়া উঠে। আমাদের মনোরাজ্য হইতে যমকে নির্ব্বাসিত করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় সেখানে এমনই প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেন।

থার্ড মাষ্টার মহাশয় আমাদের ভূগোল মুখস্থ লইতেন। তাঁহার ঘূর্ণ্যমান চক্ষু দেখিলে কোন ছেলের মুখ দিয়া কথা সরিত না। অতি ভাল ছেলেরও না। বিপিন আমাদের ক্লাশের মধ্যে খুব ভাল ছেলে ছিল, এখন সে মুন্সেফ; বিপিন একদিন বেঞ্চির ধারে দাঁড়াইয়া উত্তর আমেরিকার হ্রদগুলার নাম মুখস্থ বলিতেছে, বিপিনের স্মরণ শক্তি বরাবরই বেশ প্রখর; সে সমস্ত গুলি হ্রদের নাম তাহাদের চতুঃসীমার হিসাব দিয়া প্রায় বলিয়াছে, দুটি কি একটি বাকি আছে, এমন সময়ে, দেখা গেল, মেশায় মাষ্টার মহাশয়ের চক্ষু দুটি সন্ধ্যার কমলদলের ন্যায় ক্রমে মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে, এবং তিনি

ধীরে ধীরে তাঁহার মস্তকটি নিজের অজ্ঞাতসারে সম্মুখদিকে নত করিতেছেন। সহসা তিনি তন্দ্রাত্যাগ করিয়া মাথা তুলিলেন এবং চক্ষু দুটি বিকশিত করিয়া বলিলেন, "কি বল্লি? ফের্ বল"।—আর ফের্ বল! মাথার মধ্যে সমস্ত হ্রদ গোলমাল হইয়া বঙ্কুবরের চক্ষুর সম্মুখে মাষ্টার মহাশয়ের আতঙ্কজনক প্রলয়ঙ্কর মূর্ত্তি জাজ্জল্যমান হইয়া উঠিল। বিপিন বজ্রাহতের স্থায় নির্ব্বাক ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, মাষ্টার মহাশয় কণ্ঠস্বর চতুর্গুণ ভীষণ করিয়া হাঁকিলেন "বেতখানা কৈ রে।"

বেতখানা তখন চতুর্থ শ্রেণীতে কোন প্রথিত নামা বালকের শাসন-কার্য্যে নিযুক্ত ছিল; সুতরাং আমাদের মাষ্টার মশাইকে মিনিট দুই বিলম্ব করিতে হইল। সেই দুই মিনিট কাল মাষ্টার মহাশয় তাঁহার বিকট মূর্ত্তিতে যে রৌদ্র রসের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহা যে না দেখিয়াছে সে কিছুতেই কল্পনা করিতে পারিবে না, এবং যে দেখিয়াছে সে কখন ভুলিতে পারিবে না, কিন্তু আমরা তাহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। যাহা হউক বেত আসিল। বিপিনের হাতে পিঠে মাথায় সর্ব্বাঙ্গে শপাশপ বেত্র বর্ষণ হইতে লাগিল, একে ত এই প্রকার বর্ষণ তাহার উপর মেঘ গর্জ্জনের স্থায় হুঙ্কার। আমাদের অদৃষ্টাকাশের কোন দিকেও একটু পরিষ্কার দেখা যাইত না।

বেণী মাষ্টারের প্রহারের একটি অসাধারণ গুণ ছিল,তাহাতে দেহ-চর্ম্ম ত ক্রমে স্থূল হইতই, সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের সঙ্কোচ ভয়ও অন্তর্হিত হইত। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ছিল, আমাদের অন্যতম সহাধ্যায়ী কৈলাশ। কৈলাশ আমাদের সঙ্গেই পড়িত, বয়সে সে আমাদের অপেক্ষা আট দশ বৎসরের বড় ছিল, নামের সহিত দেহের কিছু ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাই কেহ কেহ তাহাকে কৈলাশ পর্ব্বত বলিয়া ডাকিত; কৈলাশ আমাদের পল্লীগ্রামের 'এন্ সাইক্লো পিডিয়া ব্রিটানিকা' ছিল, কেবল লেখা পড়া টা বাদ। তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে তাহার পিণ্ড রক্ষার আয়োজন মহা-সমারোহ সম্পন্ন হইয়াছিল, সে ক্লাশের মধ্যে বসিয়া তাহার বাসর ঘরের রসালাপের মনোহর কাহিনী বর্ণনা করিত, আর আমরা দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক প্রেম-স্বর্গের সুধাস্বাদন বঞ্চিত হতভাগা মানবক সেই মর্ত্ত্য নন্দনে অনন্ত সুখের অশ্রান্ত কল্পনায় আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতাম। কৈলাশ লাঠৌষধি সেবনেই যে কেবল আমাদের ক্লাশে অগ্রগণ্য ছিল, তাহা নহে, লাড়ু গোপাল হইবার যোগ্যতাও সে ক্লাশের মধ্যে সকল অপেক্ষা অধিক পরিমাণে লাভ করিয়াছিল। এমন তাহাকে লাড়ু গোপাল করিবার জন্য 'স্পেসাল' বন্দোবস্ত ছিল, অর্থাৎ হাটু গাড়িয়া বসাইবার পূর্ব্বে তাহার হাঁটুর নীচে ইটের কুচি ও প্রসারিত উভয় হস্তে আধ ডজন শ্লেট রক্ষিত হইত, অবস্থাটি যে বিশেষ আরাম জনক নহে তাহা বলাই বাহুল্য, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহা সত্ত্বেও কৈলাশের চক্ষে নিদ্রাদেবীর আবির্ভাব হইত, কেবল আবির্ভাব নহে, সেই সর্ব্ব সন্তাপহারিনী দেবীর করুণায় বিহ্বল হইয়া কৈলাশ সর্ব্ব সমক্ষে ধরণী-তলে নিপতিত হইত, এবং বেণী মাষ্টারের বেত্রের অবিরল স্পর্শ কিছু-কালের জন্য তাহার উপর 'ষ্টিমুলান্টের' কাজ করিত।

পূর্ব্বে চতুর্থ শ্রেণীর যে ছাত্রটির কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার নাম মদনমোহন, পিতা মাতা বিশেষ আদর করিয়াই তাহার প্রতি এই নামটা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার এই নাম তাহার দেহের সঙ্গে কোন রকমে সন্ধিস্থাপন করিতে পারে নাই। তাহার দেহ দীর্ঘ, উদর স্থূল, বর্ণ কৃষ্ণ, কেশ গুচ্ছ কদম্ব কেশরের স্থায় ঊর্দ্ধ মুখ। মদনমোহনের দন্ত অতি বৃহৎ কি ওষ্ঠাধর অতি ক্ষুদ্র ছিল তাহা বলা কঠিন, তবে দেখা যাইত তাহার দন্তগুলি স্বমহিমা প্রকাশে কখন উদাসীন ছিল না। এবং ওষ্ঠ হইতে লালা নিস্কৃত হইয়া তাহার হস্তস্থিত শ্লেট ও পুস্তক পবিত্র করিত। লেখা পড়ার প্রতি মদনমোহনের অসাধারণ অনুরাগ ছিল, এজন্য পুস্তক খুলিলেই তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইত, এবং শ্লেটে অঙ্ক কসিতে গেলেই তদ্বাংশগুলি ঘোটক কিম্বা হস্তী চিত্রে রূপান্তরিত হইত; এজন্য অনেক বার তাহার পৃষ্ঠে বেত্রধারা বর্ষিত হইয়াছে, কিন্তু সেই ধারাপাতে মদন-মোহন চিরদিনই অবিচল ছিল, সহস্র বেত্রাঘাতেও কেহ তাহার চক্ষে বিন্দুমাত্র জল দেখিতে পাইত না, তৎপরিবর্ত্তে তাহার ওষ্ঠ লালার সঞ্চার হইত; বিধাতার এমনই বিচিত্র বিধান।

এক দিন বেণী মাষ্টার চতুর্থ শ্রেণীতে অঙ্ক কসাইতেছেন, ছেলেরা অঙ্ক কসিয়া শ্লেট বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া আছে, মাষ্টার মহাশয় এ.ক.একে সকলের শ্লেট পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন, ক্রমে তিনি মদন মোহনের শ্লেটের কাছে আসিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন মদন, অঙ্ক হয়েছে ত?"—"আজ্ঞে।" বলিয়া মদন শ্লেটখান বুকের মধ্যে ভাল করিয়া লুকাইল। মাষ্টার মহাশয় জোর করিয়া শ্লেটখান ছাড়াইয়া লইয়া অঙ্ক দেখিতে গেলেন, যে অঙ্ক দেখিলেন তাহাতে তাঁহার চক্ষুস্থির। তিনি দেখিলেন শ্লেটে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে:—

হেড্ মাষ্টর মদে কামড়
তার নীচেতে নবনে বানর,
নবনে বানর বেড়ায় গাছে
বেণী বাঘ তার নাচে আছে।
বেণী বাঘের দাঁত খিটমিটি
ফোর্থ মাষ্টার বামা টিকটিকি,
গুপে পণ্ডিত নষ্টের গোড়া
বিদ্যা বুদ্ধি কচু পোড়া।"

গ্রামের ছাত্রবৃন্দের মধ্যে মদনমোহনের কবিত্ব শক্তির খ্যাতি ছিল। গুণ বর্ণনাও যে অতি চমৎকার হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু বেণী মাষ্টার এমন মনোহর কবিতাটি কিছুমাত্র "এপ্রিসিয়েট" করিতে না পারিয়া কবিতা সমেত মদনমোহনকে হেড্ মাষ্টারের সম্মুখে হাজির করিলেন। হেড্ মাষ্টার স্বয়ং কেবল ফরিয়াদী নহেন, বিচারকও। সুতরাং তাঁহার বিচারে মদনমোহনের প্রতি পিনালকোড দুর্লভ দণ্ডের আদেশ হইল। প্রথমে একবার তাহার হাত পা বাধিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ বিছুতিলতার দ্বারা ঝাড়িয়া দেওয়া হইল, তাহার পর হেড্ মাষ্টার বলিলেন, সাতদিন পর্য্যন্ত তাহাকে স্কুলের বারান্দায় রৌদ্রে দুই ঘণ্টা ধরিয়া লাড়ু গোপাল হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে, দুই হাতে লাড়ুর পরিবর্ত্তে এগার ইঞ্চি লম্বা খান ইট ধারণ করিতে হইবে।—মদনমোহন সকল শাস্তি নির্জ্জল-চক্ষে গ্রহণ করিল।

তিন দিনের দিন মদনমোহনের মাথায় চট করিয়া একটা ফন্দি আসিয়া হাজির হইল। স্কুলের চাকর ত্রৈলোক্য বেলা চারিটার সময় ইস্কুলঘর বন্ধ করিয়া গিয়াছিল, সন্ধ্যার পূর্ব্বে মদনমোহন ইস্কুল ঘরের বারান্দায় আসিয়া একটা লম্বা পেরেকের সাহায্যে একটা দরজা খুলিয়া ফেলিল, তাহার পর প্রথমে লাইব্রেরী ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রাচীর বিলম্বিত পৃথিবীর মানচিত্রের পূর্ব্ব গোলার্দ্ধ ও পশ্চিম গোলার্দ্ধ ছিঁড়িয়া পৃথক করিয়া যথাক্রমে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকের দেওয়ালে ঝুলাইয়া রাখিল। এই কার্য্য সম্পন্ন হইলে বেঞ্চির উপর টুল চাপাইয়া ব্র্যাকেট হইতে ঘড়িটা পাড়িল, এবং তাহা ইস্কুলঘরের পাশে একটা চিতার ঝোপের মধ্যে তাহার ঢাকনী খুলিয়া ফেলিয়া রাখিয়া গেল। কেন বলা যায় না, সেই অরণ্যে বসিয়া থাকিতে অসম্মত হইয়া ঘড়িটা তীব্রস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, ক্রমাগত শব্দ হইতেছে ঠং ঠং ঠং। ইস্কুলের সেক্রেটারী জমিদার ভুবনবাবু ইস্কুলের নিকটস্থ সদর রাস্তা দিয়া সেই সময়ে সান্ধ্যবায়ু সেবনে বাহির হইয়াছিলেন, সঙ্গে দণ্ডধারী অনুচর রামফল পাঁড়ে। জঙ্গলের মধ্যে ঘড়ির ঠনঠনি শুনিয়া ভুবনবাবু রাম-ফলকে ব্যাপারটা কি দেখিয়া আসিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন, তখন সন্ধ্যা বেশ ঘনাইয়া আসিয়াছিল, রামফল ডাল রুটি খায়, প্রকাণ্ড জোয়ান, কিন্তু তাহার ভোজন দক্ষতার অনুরোধে ভগবান তাহাকে নির্ভীক প্রকৃতি প্রদান করেন নাই। তাহার আহার ও সাহস এই দুইটি

জিনিষের মধ্যে 'ইনভারস্ রেসিও' বর্ত্তমান ছিল। রামফল ইহা একটা ভৌতিক ব্যাপার বলিয়া মনে করিল, সুতরাং অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। অবশেষে কর্ত্তাবাবুর যৎপরোনাস্তি উৎসাহবাক্যে ভরসা পাইয়া সে জন্তুটার সন্নিকটবর্ত্তী হইল এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভীতি বিহ্বল-চিত্তে সেখানে দণ্ডায়মান থাকিয়া ঝোপের অন্তরালে অদৃশ্য ঘটিকা যন্ত্রের উপর তাহার পাঁচ হাত লম্বা তৈলপক্ক দরোয়ানি বংশদণ্ডের প্রচণ্ড আঘাত করিল। ঘড়ির কাষ্ঠাবরণ সেই আঘাত সহ্য করিতে পারিল না, তাহার আর্ত্তনাদ থামিয়া গেল। তখন রামফল সেই অর্দ্ধ-চূর্ণ ঘটিকা-দেহ কুড়াইয়া আনিয়া 'কর্ত্তাবাবু'র সম্মুখে স্থাপন করিল, দেখিয়া তিনি নির্ব্বাপিত অগ্নিরাশির ন্যায় একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গেলেন।

পরদিন প্রত্যূষে ইস্কুলঘরে মহা হুলস্থূল উপস্থিত হইল। সেক্রেটারি রাগ করিয়া হেড্ মাষ্টারের কৈফিয়ৎ তলব করিলেন, ইস্কুলের চাকর বলিল আমি রীতিমত দরজা বন্ধ করিয়া গিয়াছি, ঘরে চোর আসিলে আমি কি করিব? মদনমোহনের প্রকৃতি গ্রামে কাহারও অজ্ঞাত ছিল না, তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি কিছু জানিনে মশাই।" মদনমোহন কিছুতেই একরার করিল না, হেড্ মাষ্টার থার্ড মাষ্টারকে বলিলেন, 'যেমন করিয়া পার রাস্কেলকে কনফেস্ করাও।' একরার করাইতে বেণী মাষ্টারের পুলিসের দারোগার মত বিশেষ দক্ষতা ছিল।

মদনমোহনের উপর বেণী মাষ্টারের বড় রাগ ছিল, আজ তিনি সেই রাগটা পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ করিবার অবসর পাইলেন। বেণী মাষ্টারের বিশ্বাস ছিল সুধা উৎপন্ন করিবার জন্য সত্যযুগে দেবগণ যেমন সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন, সেইরূপ ছাত্রগণের হৃদয়ে জ্ঞানসুধা উৎপন্ন করিবার জন্য কলিযুগে মাষ্টার মহাশয়দিগেরও ছাত্রকুলের দেহ মন্থন করা আবশ্যক, সুতরাং তিনি মন্দর পর্ব্বতের পরিবর্ত্তে কখন বাঁশের বাখারি, কখন বা আধ শুকনো বেতের গোড়া মন্থন দণ্ডরূপে ব্যবহার করিতেন, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই তাহাতে অমৃত উৎপন্ন না হইয়া কেবল হলাহলের উৎপত্তি হইত; মন্থনের ফলে এবারও হলাহল উৎপন্ন হইল এবং নীলকণ্ঠ না হইলেও তাহা তাঁহার ভাগে পড়িল। কথাটা আগাগোড়া বলিতে হইতেছে।

বেণী মাষ্টার হেড্ মাষ্টারের কথায় অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া জলের ঘরে প্রবেশপূর্ব্বক তামাকে দম দিলেন, তাহার পর ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে ক্লাশে আসিয়া বলিলেন, "মদনমোহন, নীল ডাউন অন্ দি বেঞ্চ।"

তখন অঙ্কের ঘণ্টা, মদনমোহন শ্লেটখানি হাতে লইয়া বলিল, "নীল ডাউন হব কেন, মাষ্টার মশাই?"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "আমার হুকুম।"

মদনমোহন বাপের একমাত্র আদুরে ছেলে, তাহার উপর, বিধবা পিসিমার নয়ন-মণি; অকারণে নীলডাউন হওয়া সে অনাবশ্যক জ্ঞান করিল, বলিল, "শুধু শুধুই হুকুম দেবেন, আমি আপনার করেছি কি?"

"আবার আমার সঙ্গে মুখো মো, ইষ্টুপিড, ফুল, ব্লকহেড্, নীল ডাউন অন দি বেঞ্চ, আই সে (I say)"—হুঙ্কারে মেঘ গর্জ্জন হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে মদনমোহনের পৃষ্ঠে বজ্রাঘাত হইল, বজ্রটা অবশ্য বেত্ররূপেই নিপতিত হইয়াছিল। বিদ্যুতেরও অভাব ছিল না, বেণী মাষ্টারের 'দন্তরুচি কৌমুদী'র খ্যাতি ছিল।

মদনমোহন আর বাক্যব্যয় না করিয়া বেঞ্চির উপর লাড্ডুগোপাল হইল, সে জানিত বেণী মাষ্টারের হুকুমের বিরুদ্ধে আপিল করিয়া কোন ফল নাই, আরজি পেশমাত্র তাহা ডিস্মিশ হইবে। বেণী মাষ্টারও ইলিয়ট সাহেব বাঙ্গালার মসনদে বসিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই 'No conviction, no promotion' নামক থিয়োরীতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন—যদিও চাকরী ত্যাগ-কাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রমোশনের জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছিল। হেডমাষ্টারের সহযোগীতা করিয়া তিনি এক বিষয়ে প্রমোশন পাইয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করা যায় না, সে প্রমোশন থার্ড মাষ্টারী হইতে সেকেণ্ড মাষ্টারীতে নহে, আফিং হইতে মদে। বৃদ্ধ বয়সে বেণী মাষ্টার সুরাপানের অত্যন্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন, সে সকল অবান্তর কথা, এখন আসল কথা বলা যাউক।

ক্লাসের সকল ছাত্রই অঙ্ক কষিবার জন্য হাতে শ্লেট লইয়াছিল, বেণী মাষ্টার চেয়ারে বসিয়া বলিতে লাগিলেন, ইলেভন সিলিংস, সেভেন পেন্স, থ্রি ফারদিংস যদি এক হণ্ড্রেড ওয়েট—পাশ হইতে একটি ছেলে মদনমোহনের শ্লেটখানি খপ করিয়া টানিয়া লইয়া মাষ্টার মহাশয়ের হস্তে প্রদান করিল—শ্লেট দেখিয়া মাষ্টার মহাশয় মুখখানি হণ্ড্রেড্ ওয়েট অপেক্ষা অনেক অধিক ভারি করিয়া সেই শ্লেটের কাঠ দ্বারা লাড্ডুগোপাল অবস্থায় উপবিষ্ট মদনমোহনকে নির্দ্দয়রূপে পিটাইতে আরম্ভ করিলেন। এবার মদনমোহন এক লম্ফে গাত্রোত্থান করিল, তাহার পর বেণী মাষ্টারের বুকের উপর গিয়া পড়িয়া তাঁহার হাত হইতে সবলে শ্লেটখানি ছিনাইয়া লইল এবং চক্ষুর নিমিষে তাহার দপ্তর তুলিয়া লইয়া সবেগে ইস্কুল পরিত্যাগ করিল। বেণী মাষ্টার ক্রোধে অন্ধ হইয়া স্কুলের চাকরকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, 'ত্রৈলোক্য, শীঘ্র ছোঁড়াকে ধর, এখানেই আমি ওর গোর দেব।' ত্রৈলোক্য মদনমোহনের নিকট দোলে রথে পার্ব্বণী লাভ করিত, বিশেষতঃ সে তাহার পিতার বাধ্যে, তাহার অগ্রসর হইবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না, সাহসেও কুলায় নাই। সুতরাং মদনমোহন অবাধে ইস্কুল ত্যাগ করিয়া ইস্কুলের আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইল, এবং স্পর্দ্ধাভরে যাহা বলিল তাহার মর্ম্ম এই যে, যে কোন নিকট কুটুম্ব তাহাকে ধরিতে আসিবে, তাহার চতুর্দ্দশ পুরুষের পৈত্রিক ভিটায় শর্ষপ নামক শস্য বপন করিবে। তাহার পর সে নিরাপদে গৃহে চলিয়া গেল। ক্রোধে ক্ষোভে বেণী মাষ্টার অন্তর্নদীরস্থ মাতঙ্গের ন্যায় চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ক্লাশের অনেক নিরপরাধ ছাত্র সে দিন তাঁহার হস্তে নিপীড়িত হইল।

ইস্কুলের ছুটির পর আমি বাড়ী গিয়া জল খাইতেছি, এমন সময় মদনমোহনের পিসিমার নিকট হইতে এত্তেলে লইয়া হরিমতি ঝি আমাদের বাড়ী আসিয়া হাজির হইল, বলিল, পিসিমা আমার তলব দিয়াছেন। ব্যাপার কিছু কিছু বুঝিতে পারিলাম, মদনমোহনের বাড়ী আমাদের বাড়ী হইতে বেশী দূর নয়, খড়ম পায়ে দিয়া পিসিমার সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম রাগে তিনি আগুণ হইয়া বসিয়া আছেন। মদনমোহনের মুখে তাহার প্রতি অত্যাচারে কথা শুনিয়া পিসিমা বেণী মাষ্টারের বিরুদ্ধে রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই রায়ে বেণী মাষ্টারের পিতা মাতা এবং তাঁহার বংশের উপর অনেক গুরুতর দোষারোপ করা হইয়াছিল। পিসিমাকে শান্ত করিবার চেষ্টা আমার বৃথা হইল, জ্বলন্ত তৈলে জল ঢালিলে যেমন তাহা অধিক পরিমাণে জ্বলিয়া উঠে, সেইরূপ আমার সান্ত্বনাবারি বর্ষণে পিসিমার জ্বলন্ত ক্রোধ সমধিক জ্বলিয়া উঠিল, সে ঝাঁঝ সহ্য করিতে না পারিয়া আমি তফাতে সরিয়া দাঁড়াইলাম।

মদনমোহনের অপরাধটা কি ইস্কুলে তাহার কতক কতক আভাস পাইয়াছিলাম, ঠিক সংবাদ জানিবার জন্য মদনমোহনের ঘরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার শ্লেটখানা টানিয়া বাহির করিলাম, দেখিলাম তখনও বেণী মাষ্টারের মুখ নিঃসৃত সেই ইলেভেন সিলিংস, সেভেন পেন্স থ্রি ফারদিং পরিবর্ত্তে একটি অনিন্দ্য সুন্দর সম্পূর্ণ অরিজিনাল কবিতা লেখা রহিয়াছে—

"ফোর্থ কেলাসে থার্ড মাষ্টার থার্ড জানুয়ারী
করে দিলে বেঞ্চির উপর মোহন বংশিধারী;
বেণী মাষ্টার মানুষ বাঘ সদাই থাকে চোটে,
চক্ষু দুটি মুদিত, সদা পাছে নেশা ছোটে।
আর জন্মে বোলতা ছিল বেণী মাষ্টার ক ক,
এ জন্মে তার হুলের বিষে প্রাণটা ঝালাপালা।"

পিসিমা কবিতা শুনিয়া একেবারে জল। একগাল হাসিয়া বলিলেন, "বেশ হয়েছে, যেমন লোক তার উপযুক্ত লেখা হয়েছে, বাবা মদনের আমার কত বুদ্ধি, এখন বেঁচে থাকলে হয়। ছেলেকে এমন করেও কি কেউ ঠেঙ্গায়? মেরে হাতের নুলোটা একেবারে ফুলিয়ে দিয়েছে, ঐ মারের জন্যেই ত তার বাড়ীতে পড়াতে আসা বন্ধ করে দিয়েছি, লক্ষ্মীছাড়া, হতভাগা, হাড়হাবাতে মিন্‌সে!"—পিসিমা এক নিশ্বাসে কতকগুলা অভিধান বহির্ভূত বিশেষণে বেণী মাষ্টারকে বিভূষিত করিলেন।

মদনমোহনের বাপ বিষ্ণু বাবু ফৌজদারী আদালতে মোক্তারী করিতেন, জমীদারীও কিছু কিছু ছিল। তিনি অপরাহ্নে কাছারী হইতে বাসায় ফিরিয়া চাপকানের বোতাম খুলিতে না খুলিতে পিসিমা তাঁহার উপযুক্ত পুত্রের প্রতি বেণী মাষ্টারের অত্যাচার কাহিনী বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া বিষ্ণু বাবুর বড় রাগ হইল, তিনি নিজেকে একেলে লোক বলিয়া মনে করিতেন, সুতরাং সেকেলে প্রহার প্রথার উপর তাঁহার আন্তরিক বিতৃষ্ণা ছিল; তিনি সন্ধ্যার সময় হেড মাষ্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি মশাই আপনার বেণী মাষ্টারকে সাবধান ক'রে দিবেন, যদি তিনি এভাবে ছেলে ঠেঙ্গান, ত তাঁকে এ মুলুক ছেড়ে পলাতে হবে, পেয়াদা পাড়ার দুটো মুসলমান পাইককে লেলিয়ে দেব, তারা তাঁর হাড় কখানা হাউলের জলে রেখে আসবে।"

হেড মাষ্টার কিছু ভীরু স্বভাবের লোক ছিলেন, একে তিনি পল্লী-গ্রামে অপ্রচলিত সুধাপান প্রথায় অভ্যস্ত ছিলেন, তাহার উপর স্কুলের সেক্রেটারী ভুবন বাবুর সহিত বিষ্ণু বাবুর ভয়ঙ্কর ভাব, বিষ্ণু বাবু ভুবন বাবুর দক্ষিণ হস্ত বলিলেই হয়, পরামর্শদাতা, আমমোক্তার, পাশার নৈশ আড্ডার প্রধান এয়ার ইত্যাদি সমস্ত। হেড্ মাষ্টার ভয়ে আধখানা হইয়া বেণী মাষ্টারকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন; এ কথা শুনিয়া বেণী মাষ্টারের মনে কিরূপ ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা বলা যায় না, কিন্তু তাহার পর দিন হইতে মদনমোহনের প্রতি তাঁহার ক্রোধের কোন লক্ষণ বর্ত্তমান রহিল না। সমস্ত অপমান তিনি বেমালুমভাবে পকেটস্থ করিয়া সহিষ্ণুচিত্তে তাহাকে বিদ্যাদান করিতে লাগিলেন।

মদনমোহনের বুদ্ধি কখন সোজা পথে চলিত না। একবার মাঘ মাসে সরস্বতী পূজার পূর্ব্ব দিন রাত্রে মদনমোহন ডাক মুন্সীর ফুল বাগানে গাঁদাফুল চুরী করিতে গিয়াছিল। গাঁদাগুলি খুব বড়, ডাক মুন্সীর বড় সখের ফুল। ফুল চুরী যাইবার ভয়ে তিনি দুজন ডাক রণারকে বাগানের পাহারায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন; মদনমোহন তাহা জানিত না, কতকগুলি ফুল তুলিবার পর 'রনার' দ্বয় তাহাকে গ্রেপ্তার করিল। ডাকমুন্সী উমাশঙ্কর বাবু দেখিলেন, এটি বিষ্ণু বাবুর সুযোগ্য বংশধর, তাহাকে অধিক শাসন করা নিরাপদ নহে, সুতরাং তিনি মদনমোহনের কর্ণ মর্দ্দন করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। মদনমোহন অত্যন্ত ভাল মানুষের মত ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিয়া আসিল, কাহাকেও কোন কথা বলিল না। কিন্তু এ অপমান সে সহজে ভুলিল না, তাহার মাথা বেশ পরিষ্কার ছিল, অতি অল্প চিন্তাতেই পোষ্ট মাষ্টারের প্রদত্ত শাস্তির প্রতিবিধান প্রদানের পন্থা আবিষ্কার করিয়া ফেলিল।

প্রায় এক সপ্তাহ পর এক দিন প্রভাতে একজন পিয়ন ডাকবাক্স খুলিয়া দেখে তাহার ভিতর একখানি পত্রও নাই, টিকিটওয়ালা, বেয়ারিং (তখন পোষ্ট কার্ডের প্রচলন হয় নাই) সমস্ত পত্রই মহাদেবের ক্রোধানলে দগ্ধীভূত রতিপতির ন্যায় ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছে। কখন কোন্ দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া মদনমোহনের ক্রোধানল টিকার আগুন রূপে সেই ডাকবাক্সের হৃদয় মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক এই অনর্থপাত করিয়াছিল তাহা মদনমোহনই বলিতে পারে, কিন্তু এই ব্যাপারের পৌনঃপুনিক অভিনয়ে নিরীহ ডাকমুন্সীটিকে অগত্যা গ্রাম হইতে বদলী হইতে হইল।

মদনমোহনের এইরূপ বাল্যলীলা অনেক ছিল, আরও দুই একটির উল্লেখ না করিলে তাহার চরিত্রমাধুর্য্য সম্যক উপলব্ধি হইবে না।

একবার গ্রামে শৃগালের উপদ্রব হয়। সেই উপদ্রব প্রশমনের জন্য মদনমোহন তাহার বয়স্যবৃন্দের সহায়তায় এক শিয়ালমারা ফাঁদ নির্ম্মাণ করে। ফাঁদটি তাহাদের বাড়ীর কাছে বাগানের মধ্যে পাতা হইল। একালের নগরবাসী পাঠকগণের নিকট সেই ফাঁদের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। প্রথমে মাটিতে একটা ছোট গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে কিছু খাবার রাখা হয়, গর্ত্তটি বেষ্টন করিয়া একটা খুব শক্ত দড়ি এভাবে পাতিয়া রাখা হয় যে, গর্ত্তের খাদ্য দ্রব্যে মুখ স্পর্শ করিবামাত্র সেই ফাঁস শৃগালের গলায় আটকাইয়া যায়। কিন্তু এখানেই শেষ নহে, ফাঁসটা একটি লম্বা দড়ির সঙ্গে বাঁধা, এই দড়ি একগাছি সমুন্নত বংশের অগ্রভাগের সহিত আটকানো, দড়ির দৈর্ঘ্য এরূপ যে তাহার টানে বাঁশের মাথা অনেকখানি নোয়াইয়া থাকে। শৃগালের গলায় ফাঁস বাধিবা মাত্র বাঁশ সজোরে, সোজা হইয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে সেই দড়িতে আবদ্ধ হইয়া শৃগাল মহাশয়কেও ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া শূন্যে ঝুলিতে হয়। কিন্তু শৃগালেরা এতই বুদ্ধিমান জন্তু যে কোন গ্রামে ফাঁদে একটা শেয়াল পড়িলে, অন্য শেয়ালেরা আর সে দিকে অগ্রসর হয় না; কিন্তু সেজন্য মদনমোহন কিম্বা তাহার বন্ধুবর্গের চেষ্টার ত্রুটী ছিল না, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই ফাঁদের কাছে বসিয়া ভাত, পাকা আম, কাঁঠালের ভুতুড়ি প্রভৃতি শৃগাল জাতির লোভবৃদ্ধিকর বহু পদার্থ ফাঁদের গর্ত্তে রাখিয়া শৃগাল মেধ-যজ্ঞের সুদীর্ঘ আয়োজন চলিতে লাগিল।

এই সময়ে বেণী মাষ্টার কিছুদিনের জন্য মদনমোহনের 'প্রাইভেট টিউটার' নিযুক্ত হইয়াছিলেন। একদিন সকালবেলা তিনি মদনমোহনকে পড়াইতে আসিয়া ক্রমাগত ডাকিয়াও তাহাকে পাইলেন না, হীরে খানসামা সংবাদ দিল, শ্রীমান বাগানের মধ্যে বসিয়া শৃগাল বধের আযোজন করিতেছে। ছাত্রের অবাধ্যতায় বেণী মাষ্টারের মনে মহা ক্রোধের সঞ্চার হইল, তিনি স্বয়ং সরজমিনে উপস্থিত হইয়া মদন-মোহনকে উপযুক্ত শিক্ষা দান করিবেন স্থির করিয়া রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইলেন; তাঁহাকে অদূরে দেখিয়াই বিনোদ, বিপিন, চূণী, মতি, নেপাল প্রভৃতি মদনমোহনের সখাবৃন্দ ফাঁদের অদূরে বাঁশ বনের আড়ালে গিয়া লুকাইল, নিকটে একটা আতা গাছ ছিল, মদনমোহন এক লম্ফে তাহার শাখায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। মাষ্টার মহাশয় সক্রোধে ফাঁদের সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন, ফাঁদের মহিমা বোধ করি তিনি পূর্ব্বে অবগত ছিলেন না। "হতভাগা ছোঁড়ারা একেবারে উচ্ছন্নে গেল, ফাঁদ পেতে আবার খেলা!"—বলিয়াই তিনি সেই ফাঁদের মধ্যে পদাঘাত করি-লেন।

অচেতন ফাঁদ, শৃগাল হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলের প্রতিই তাহার সমান ব্যবহার। বেণী মাষ্টারের পদ স্পর্শ মাত্র ফাঁদের ফাঁস তাঁহার শ্রীচরণে বাধিয়া গেল, নত মস্তক বাঁশখানা সোজা হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহাকে পনর হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া ফেলিল, তিনি নতমস্তকে লম্বমান হইয়া শক্ত দড়িতে ঝুলিতে ঝুলিতে গভীর আর্ত্তনাদে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন।—তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া মদনমোহন ও তাহার বন্ধুবর্গের ভয় ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না, মদনমোহন আতা গাছ হইতে নামিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল, বাঁশ ঝাড়ের আড়াল হইতে তাহার সঙ্গীগণও অদৃশ্য হইয়া গেল। প্রায় দশ বার মিনিট পরে দুই তিনজন চাকর ও প্রতিবেশী ছুটিয়া আসিয়া বেণী মাষ্টারকে ফাঁদের কবল হইতে রক্ষা করিল।

গোলমাল শুনিয়া গ্রামের শিরোমণি ঠাকুর মদনমোহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কিসের গোলমাল রে মদনা?" মদন একদিন শিরোমণি মহাশয়ের মেটে কোঠার উপরে আশ্রয় গ্রহণের জন্য ছুটিয়াছিল; মদন বলিল,—"ফাঁদে জানোয়ার পড়েছে, পণ্ডিত দাদা।"

"কি জানোয়ার রে! শিয়াল?"

"না পণ্ডিত দাদা, একটা বাঘ।"

"বাঘ? বলিস্ কিরে! দিনের বেলা ফাঁদে বাঘ পড়লো কি করে? এ যে ঘোর কলি উপস্থিত!"

মদনমোহন হাসিয়া বলিল, "এ বাঘ দিনের বেলাতেই পড়ে পণ্ডিত দাদা, এ বনের বাঘ নয়, আমাদের স্কুলের বাঘ, বেণী মাষ্টার।"

শিরোমণি ঠাকুর "রাম, রাম" বলিয়া ব্যাঘ্র সন্দর্শনাকাঙ্ক্ষায় যাত্রা করিলেন।

মদনমোহনের মাথাটা খুব ক্রিয়ার ছিল স্বীকার করিতেই হইবে, তবে মন্দ বিষয়ের আবিষ্কারেই সেটা ঘুরিত।—একদিন মাঘ মাসের প্রভাতে মদনমোহন এক লাঠি ঘাড়ে লইয়া একাকী এক বাঘের খাঁচা দেখিতে গিয়াছে। দিন কত হইতে বারুই পাড়ায় বাঘের বড় উপদ্রব হইয়াছিল। তাই গ্রামের লোক বনের ধারে একটা সংকীর্ণ রাস্তার পাশে একটা বাঘের খাঁচা বসাইয়া রাখিয়াছিল। ব্যাঘ্রকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য একটি ছাগ শিশুও সেই পিঞ্জর মধ্যে সংরক্ষিত হইয়াছিল। মদনমোহন দেখিল বাঘ খাঁচায় পড়ে নাই, ভীত ছাগ শিশু একটা ছোট কুঠরীতে দাঁড়াইয়া শীতে কাঁপিতেছে। মদনমোহন বাড়ী ফিরিয়া যাইবে, এমন সময়ে দেখিল গোঁসাই পাড়ার নিতাই দাস বৈরাগী ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে, তাহার মস্তকে একটি গঙ্গিফ্রকের টুপি, হস্তে করতাল, গাত্রে একখান লাল বনাত, বহির্ব্বাস খানি তাহাতেই ঢাকা।

মদনমোহন জিজ্ঞাসা করিল, কি, নিতাই দাস যে! এত সকালে কোন দিকে যাওয়া হচ্চে?

নিতাই দন্তোন্মীলন পূর্ব্বক হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞে এই ভিক্ষেয় বেরিয়েচি, একবার অধিকারী পাড়ার দিকে যাব।"

"ভিক্ষেয় যাচ্ছ? আমি তোমাকে এখনি এক টাকা ভিক্ষে দিতে পারি, কিন্তু যদি একটা কাজ কর।"

নিতাই প্রলুব্ধ চিত্তে বলিল, আজ্ঞে করুন, আমি ত আপনাদের খেয়েই মানুষ।"

মদনমোহন বলিল, "ঐ ঝোপের আড়ালে একটা বাঘের খাঁচা আছে, একবার তার মধ্যে যেতে হবে।"

নিতাই বলিল, "হরে কৃষ্ণ, তাকি পারি?" বাঘে খেয়ে ফেলবে যে!"

মদনমোহন বলিল, "বাবাজি ক্ষেপেচ, ওর মধ্যে বাঘ থাকলে কি আর তোমাকে যেতে বলি। খাঁচার মধ্যে বাঘটাগ নেই। একটা পাঁঠা আছে, সেও আর একটা কুঠরীতে, পাঁঠাকে ভয় কি, বাবাজী? পাঁঠাত তোমাদের কাছে গরু!"

বাবাজী কর্ণে হাত দিয়া বলিলেন, রাধেকৃষ্ণ!—তা টাকাটা দেবেন ত?"

মদনমোহন একটি চক্চকে টাকা বাহির করিয়া বাবাজীকে দেখাইয়া বলিল, "আলবৎ দেব, বিশ্বাস না হয় এটা তুমি হাতে করে নিয়ে খাঁচার মধ্যে ঢুকে পড়। বাঘের খাঁচায় মানুষ গেলে খাঁচার কেমন শোভা হয় তা দেখ্তে আমার বড় ইচ্ছে, আবার এখনি বেরিয়ে আস্‌বে!"

বাবাজীর গ্রহ! সে প্রত্যহ ভিক্ষা করিয়া বড় জোর দুগণ্ডা পয়সার চাউল সংগ্রহ করে, আজ প্রভাতে উঠিয়াই একটি চক্চকে টাকার মুখ দেখিতে পাইল, এত বড় একটা প্রলোভন সে কি করিয়া ত্যাগ করে? টাকাটি হস্তগত করিয়া বাবাজী ব্যাঘ্র পিঞ্জরে প্রবেশ করিল, তৎক্ষণাৎ মহাশব্দে পিঞ্জর দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল।

মদনমোহন আর সে অঞ্চলে নাই! একেবারে গ্রামের বাজারে আসিয়া ঘোষণা করিল খাঁচার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড বাঘ পড়িয়াছে।—শুনিয়া দলে দলে লোক বাঘ দেখিবার জন্য বারুই পাড়ার দিকে ছুটিয়া চলিল, কিন্তু মনুষ্যাকার ব্যাঘ্র দেখিয়া তাহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এদিকে মদনমোহনের বন্ধুবর্গ সমস্ত গ্রামের মধ্যে রটাইয়া দিল, নিতাই বাবাজী রাত্রে গোপনে পাঁঠা চুরি করিতে আসিয়া খাঁচার মধ্যে আটক পড়িয়াছে। বাবাজীর এতক্ষণে চৈতন্যোদয় হইয়াছে। সে রাগে লজ্জায় অধীর হইয়া খাঁচার মধ্যে লম্ফ ঝম্ফ করিতে লাগিল, কিন্তু হায়! ভিতর হইতে তাহা খুলিয়া বাহির হইবার উপায় নাই। গ্রাম্য দর্শকগণের হস্তে বাবাজী দীনবন্ধু বাবুর 'হোঁদল কুৎকুতের'—অবস্থা প্রাপ্ত হইল। মাঘ মাসের শীতে তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম ছুটিতে লাগিল, বাবাজী কাঁদিয়া বলিল, "হে নারায়ণ, হে মধুসূদন হরি, রক্ষা কর। আমার এ কলঙ্ক মোচন কর।"

কিন্তু নারায়ণ তাঁহার লুব্ধ ভক্তের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। গ্রামের প্রধান জমীদার ত্রিলোচন বাবু যুবা পুরুষ, তাহার উপর তিনি একজন প্রচণ্ড শাক্ত। তিনি বাবাজীর এই বিপদ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াই বহু অনুচর সঙ্গে সেখানে পদার্পণ করিলেন, বাবাজীর অবস্থা দেখিয়া তাঁহার বড়ই আমোদ বোধ হইল, তাঁহার অনুমতি ক্রমে বিশ পঁচিশজন বেহারা খাঁচা সমেত বাবাজীকে স্কন্ধে লইয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল।

মদনমোহনের কবিতা কাহাকেও মার্জ্জনা করিত না, পাড়ায় পাড়ায় ছড়া আরম্ভ হইল:—

"বোষ্টম টম টম
পাঁঠা খাবার লোভে
বাঘের খাঁচায় আগমন।
ঝোলার মাঝে মালা রেখে
পাঁঠা খাবার যম।"

একাল হইলে এই গ্লানিকর ছড়ার জন্য একটা মানহানির মামলা রুজু হইত, এরূপ আশা করা যায়।

কিন্তু সুখের কথা এই যে এই দুর্দ্দান্ত বালক মদনমোহনের পরকাল নষ্ট হয় নাই। মদনমোহন মফস্বল আদালতের একজন খুব বড় মোক্তার। এখন তিনি অত্যাচারীর শত্রু ও নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, গ্রাম্য সমাজে মদনমোহনের বাল্য প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে এবং যদিও তাঁহার বাল্যকালে বেণী মাষ্টার তাঁহার হস্তে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন, তথাপি আমরা আশা করি সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বর মদনমোহনের সেই শিশুসুলভ দুষ্টামি মার্জ্জনা করিয়াছেন। বেণী মাষ্টারের বিধবা পত্নী যতদিন জীবিতা ছিলেন ততদিন মদনই তাঁহার প্রতিপালন ভারগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং একালে মদন যে সকল সৎকার্য্য করেন, সংবাদপত্রে তাহার আলোচনা না হইলেও তাঁহার ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হইবার পথে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় না।

তরু আর তারু।*

কলারাজ্যে দুটি রাণী;
প্রতিভার বুঝি যমক কন্যা রমা আর বীণাপাণি
একজন তারি,— রূপেরে নিঙ্গাড়ি
আঁকে স্বর্ণ-তুলি ল'য়ে;
অন্যে কথা কয় স্বপনের সনে বাঁশরীর তান-লয়ে।

স্বদেশী ভকত কবি
মায়ারাজ্যে পশি দেখিয়া লয়েছে তোমাদের ছায়া-ছবি

* রামবাগানের ৺গোবিন্দচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পরলোকগতা কন্যাদ্বয়।



স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া।

KUNTALINE PRESS



চতুর্থ ভাগ। } মাঘ, ১৩০৭। { ২য় সংখ্যা।

সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি।

মনুষ্যের সৌন্দর্য্য-বুদ্ধির বিকাশ হইল কিরূপে ইহা একটা উৎকট সমস্যা। বড় বড় পণ্ডিতে এই সমস্যার মীমাংসা করিতে গিয়া হারি মানিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রসঙ্গ এই বিষয়ের আলোচনা মাত্র, মীমাংসার কোন আশা দিয়া পাঠককে প্রতারিত করিব না।

অন্যান্য মানবধর্ম্ম প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে বিকাশ লাভ করিয়াছে বুঝা যায়। ইংরাজীতে যাহাকে ইউটিলিটি বলে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন তাহাই দেখিয়া চলে। ইউটিলিটির বাঙ্গালায় অর্থ হিতকারিতা, উপকারিতা, উপযোগিতা, কাজে লাগা। যাহা কিছু কাজে লাগে, যাহা জীবনের পক্ষে হিতকর, যাহা জীবন সংগ্রামে অনুকূল, কোন না কোনরূপে জীবন সংগ্রামে যাহা সাহায্য করে, প্রকৃতি তাহাই নির্ব্বাচিত করিয়া অভিব্যক্ত করেন। মানুষ দুই পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে, মানুষের মাথায় একরাশি মস্তিষ্ক আছে, মানুষের হাত দুই খানা অস্ত্রনির্ম্মাণ ও অস্ত্রব্যবহারের উপযোগী, মানুষ দল বাঁধিয়া বাস করে, মানুষ স্পষ্ট ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া পরস্পর মনোভাব জ্ঞাপন করে, এ সমস্তই মানুষের জীবন রক্ষার উপযোগী ও অনুকূল। সুতরাং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে এ সকল ধর্ম্মই মানুষ ক্রমশঃ প্রাপ্ত হইয়াছে।

মানুষের গায়ের জোর কম, কাজেই বুদ্ধির জোরে সেটা পোষাইয়া লয়। কাজেই মানুষের বুদ্ধিমত্তা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে উৎপন্ন। মানুষের গায়ের জোর কম, কাজেই তাহাকে দল বাঁধিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়; কাজেই মানুষের সামাজিকত্ব; পরের মুখ চাহিয়া ও ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া মানুষকে আত্মসংবরণ করিতে হয়। বর্ত্তমান আকাঙ্ক্ষা, লালসা প্রবৃত্তি প্রভৃতি দমনে রাখিতে হয়, এই জন্য মনুষ্যমধ্যে নীতি ধর্ম্মের উদ্ভব। ইহাও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কাজ। কেন না, যাহা কিছু জীবনরক্ষার সাহায্য করে তাহাই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফল। ব্যক্তিগত জীবন রক্ষা ব্যতীত জাতিগত জীবন রক্ষা বা বংশ রক্ষা আছে; বংশরক্ষার অনুকূল ধর্ম্ম সকল ডারুইনের মতে যৌন নির্ব্বাচনে অভিব্যক্ত হয়। ফলে যৌন নির্ব্বাচন প্রাকৃতিক

নির্ব্বাচনেরই প্রকারভেদ মাত্র। ওয়ালাস প্রভৃতি জীবতত্ত্ববিৎ কেন যৌন নির্ব্বাচন লইয়া এত হাঙ্গামা করিতে যান, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। উভয়ের মধ্যে আপাততঃ বিরোধ থাকিলেও মূলতঃ কোন বিরোধ নাই।

যাবতীয় মানবধর্ম্ম প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে উৎপন্ন স্বীকার করা যাইতে পারে। এমন এক দিন ছিল যখন মনুষ্য মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, তাহার বানরজাতীয় পূর্ব্ব পুরুষে পশুত্ব মাত্র বর্ত্তমান ছিল। কালক্রমে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বিবিধ মানব ধর্ম্ম তাহাতে বিকশিত করিয়া তাহাকে মানব পদবীতে স্থাপিত করিয়াছে। বেশ কথা, কিন্তু সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি একটা মানব ধর্ম্ম। মানব ধর্ম্ম এই হিসাবে, যে মানবেতর প্রাণী এই সৌন্দর্য্যবুদ্ধিতে একেবারে বঞ্চিত। ইতর জীবের সৌন্দর্য্যবোধ একেবারে নাই। ইংরাজীতে যাহাকে fine art বলে, বাঙ্গালাতে যাহাকে সুকুমার কলা বলা পদ্ধতি দাঁড়াইয়াছে, আমি সেই সৌন্দর্য্যের কথা বলিতেছি। ইংরাজীতে যাহাকে ইসথেটিক বৃত্তি বলে, বঙ্কিম বাবু যাহার চিত্তরঞ্জনী বৃত্তি নাম দিয়াছেন, তাহারই সহিত এই সৌন্দর্য্যের কারবার। ইতর জীবের মধ্যেও এক রকম সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা আছে, কিন্তু তাহা সাধারণ জীবধর্ম্ম; তাহাকে বিশিষ্ট মানব ধর্ম্ম সহিত এক পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। যেমন বিহগ গান গাহিয়া বিহগীর মন ভুলায়, কপোত মণিতানুকারী ধ্বনির দ্বারা কপোতীর মন ভুলায়, ময়ূর কলাপশোভা বিস্তার করিয়া কেকারব সহকারে নাচিয়া ময়ূরীর মন ভুলায়। এই শ্রেণীর সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা, সাধারণ জীবধর্ম্মের অন্তর্গত। ডারুইন দেখাইয়াছেন যে, যৌন নির্ব্বাচনে উহার উৎপত্তি। জীবের বংশরক্ষা বিষয়ে এই সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার উপযোগিতা আছে। এই সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা জাতিরক্ষা ও বংশরক্ষা বিষয়ে আনুকূল্য করে। ময়ূরের সৌন্দর্য্য ও ময়ূরীর সেই সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরাগ, উভয়ই জীবন রক্ষা বিষয়ে হিতকর। ব্যক্তিগত জীবনরক্ষায় না হউক, জাতীয় জীবন রক্ষায় অর্থাৎ বংশরক্ষায় হিতকর। সুতরাং যৌন নির্ব্বাচনে উহার অভিব্যক্তি; এবং যৌন নির্ব্বাচন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনেরই প্রকারভেদ। মনুষ্যের মধ্যেও এই রূপ সৌন্দর্য্যের ও এই রূপ সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার অসদ্ভাব নাই। নারী দেহের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ইহা হইতেই উৎপন্ন, এবং সেই সৌন্দর্য্যের প্রতি পুরুষের অনুরাগ বা আকর্ষণ তাহাও এই যৌন নির্ব্বাচনে উৎপন্ন। কেন না, এক পক্ষে সৌন্দর্য্যবিকাশ, অন্য পক্ষে সেই সৌন্দর্য্যের প্রতি আকর্ষণ, মানব বংশ রক্ষার অনুকূল। কিন্তু তদ্ভিন্ন মনুষ্য যেখানে সেখানে অকারণে সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়। তুমি আমি যেখানে মুগ্ধ হইবার কোন কারণ দেখি না, কবি ও ভাবুক সম্পূর্ণ অকারণে সেইখানে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। কবিকুল এইজন্য বিজ্ঞসমাজে নিন্দিত। কালিদাস মারুতপূর্ণরন্ধ্র কীচকধ্বনিতে অর্থাৎ বাঁশবনে বাতাসের ডাকে বনদেবতাগীতি শুনিতে পাইতেন; ওয়ার্ডসোয়ার্থ কোকিলের ডাক শুনিয়া অশরীরী আত্মার সন্ধানে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেন; এই শ্রেণীর অদ্ভুত সৌন্দর্য্য-বোধ অপর সাধারণের হৃদ্গত হয় না। এবং এই সৌন্দর্য্য-বোধের জীবনরক্ষায় কোন কার্য্যকারিতা আছে, তাহাও বোধ হয় কেহ প্রমাণ করিতে যাইবেন না। বরং ইহাতে জীবনের প্রতিকূলতা করে। যিনি এইরূপ সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা লইয়া সংসারে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার সাংসারিক বিষয়বুদ্ধি সর্ব্বথা প্রশংসনীয় হয় না। চিত্রশিল্পী পটের উপর পাঁচ রকমের বর্ণের বিন্যাস করিয়া অপরূপ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেন; কলাবৎ নানা রকমের স্বর বিন্যাস দ্বারা বিবিধ ভাবের উদ্বোধন করিয়া সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেন; কারুশিল্পী প্রস্তরে পাঁচ রকম দাগ কাটিয়া সৌন্দর্য্য সৃষ্টির পরাকাষ্ঠা দেখান। এই সকল সুন্দর পদার্থের সৌন্দর্য্য কোথা হইতে কিরূপে কেন উৎপন্ন হইল, তাহা কেহ বুঝাইয়া দিতে পারে না; সকলের চোখ কোথায় সৌন্দর্য্য রহিয়াছে, তাহার আবিষ্কারেও সমর্থ হয় না; অথচ যিনি ভাবগ্রাহী বা সমজদার, তিনি এই সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখিয়া পুলকিত ও মোহিত হইয়া পড়েন। কেন তাঁহার এই মোহ, তাহা বুঝান যায় না। জীবনসংগ্রামে এই মোহ কোনরূপ আনুকূল্য করে, বলিতে গেলে বাতুলের প্রলাপ হইবে। কাজেই এই সৌন্দর্য্যবোধের উৎপত্তির প্রাকৃতিক হেতু নির্দ্দেশ এক রকম অসম্ভব হইয়া পড়ে।

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন রূপ মহামন্ত্রের অন্যতর ঋষি আলফ্রেড রসেল ওয়ালাস এইজন্য নিরাশ হইয়া বলিয়াছেন, মনুষ্যের সৌন্দর্য্যবোধের উৎপত্তির ব্যাখ্যা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে নাই। কিন্তু এই সৌন্দর্য্যবোধ যখন মানবত্বের

একটা প্রধান লক্ষণ, হয়ত অনেকের মতে মানবত্বের সর্ব্ব প্রধান লক্ষণ, সৌন্দর্য্যবুদ্ধিবর্জ্জিত মনুষ্যকে যখন পূর্ণ মানবত্ব দিতে পারা যায় না, তখন মানবত্বই যে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনপ্রসূত একথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ হয়। অতএব পূর্ণ মানবত্বের অভিব্যক্তি প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফল বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। মানবত্বের অভিব্যক্তির জন্য অন্য কোন কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। প্রাকৃতিক শক্তি ব্যতীত কোন অতিপ্রাকৃত শক্তি হয়ত মানবত্বের অভিব্যক্তির মূলে বিদ্যমান রহিয়াছে, আমরা তাহা জানি না। ডারুইন তাঁহার Descent of Man নামক পুস্তকে মনুষ্যকে যে প্রাকৃতিক ও যৌন নির্ব্বাচন এতদুভয়ের ফলে বানর হইতে উৎপন্ন প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা পণ্ডশ্রম হইয়াছে। এ বিষয়ে ডারুইনের মত গ্রহণ করিতে পারা যায় না। মানবোৎপত্তি সম্বন্ধে ওয়ালাসের চরম সিদ্ধান্ত কতকটা এইরূপ।

ওয়ালাসের এই চরম সিদ্ধান্ত অন্যান্য পণ্ডিতে গ্রহণ করিতে রাজি হয়েন নাই। কিন্তু সৌন্দর্য্যবুদ্ধির যখন জীবনসংগ্রামে কোন কার্য্যকারিতাই নাই, তখন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন এই সৌন্দর্য্যবুদ্ধি জন্মাইতে পারে, এই কথা স্পষ্টতঃ বলিতেও কাহারও সাহসে কুলায় নাই। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ব্যতীত অন্য কোন কারণে এই সৌন্দর্য্য বুদ্ধির উৎপত্তি ঘটিয়াছে, ইহাই দশাইবার জন্য বিবিধ চেষ্টা হইয়াছে। বলা বাহুল্য এই সকল চেষ্টা বিশেষ সন্তোষজনক হয় নাই। একটা চেষ্টার এখানে উল্লেখ করিব।

পক্ষিজাতি সৌন্দর্য্যের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। ময়ূরের কলাপশোভা কাহার না মনোহরণ করে? স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ময়ূরপুচ্ছের মোহন চূড়া বাঁধিয়া গোপাঙ্গনাদের মনোহরণ করিতেন। ভক্ত বৈষ্ণব আজ পর্য্যন্ত সেই মোহন চূড়ার কল্পনায় দিশাহারা হইয়া যান। তেমনি অন্যান্য পক্ষীও দেহসৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত। স্ত্রী পক্ষী অপেক্ষা পুরুষ পক্ষী অধিক সুন্দর; ময়ূরী অপেক্ষা ময়ূর সুন্দর; কপোতী অপেক্ষা কপোত সুন্দর। ডারুইনের মতে এই সৌন্দর্য্যের কারণ যৌন নির্ব্বাচন। স্ত্রী পাখী সৌন্দর্য্যে ভুলিয়া আপনার সহচর নির্ব্বাচন করিয়া লয়। পুরুষ পাখীর মধ্যে যে অধিক সুন্দর, তাহারই সহচরী জুটে, তাহারই বংশ রক্ষা ঘটে। যাহার সৌন্দর্য্যের অভাব, সে অপমানিত ও বিকৃত হইয়া সহচরী লাভে বঞ্চিত হয়। তাহার বংশরক্ষা ঘটে না। এইরূপে বংশপরম্পরায় পুরুষ পাখী ক্রমশঃ সৌন্দর্য্য লাভ করে; এইরূপে পুরুষ পাখীর মধ্যে ক্রমশঃ রূপের বিকাশ ঘটিয়াছে। ইহারই নাম যৌন নির্ব্বাচন। কিন্তু জীবতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের মধ্যে সকলে ডারুইন-নির্দ্দিষ্ট এই যৌন নির্ব্বাচনের ব্যাপারটা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, এই সৌন্দর্য্যটা একটা bye-product of evolution জাতীয় অভিব্যক্তির একটা আকস্মিক ফল মাত্র। পাখীর সৌন্দর্য্য পাখীর ব্যক্তিগত জীবন রক্ষায় অর্থাৎ তাহার জীবন সংগ্রামে বিশেষ কোন কাজে লাগে না, ইহা স্বীকার্য্য, তবে তাহার জাতিগত জীবন রক্ষায় অর্থাৎ বংশরক্ষায় যে বিশেষ কাজে লাগে, তাহারও তেমন প্রমাণাভাব; ডারুইন যে সকল প্রমাণ দিয়াছেন, তাহা সমীচীন বা সম্পূর্ণ নহে। সুতরাং এই সৌন্দর্য্যে পাখীর কোন লাভ নাই। তাহার নিজের ব্যক্তিগত লাভ নাই, তাহার বংশেরও কোন লাভ নাই। তবে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে তাহার শারীরিক অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে, জীবন রক্ষার অনুকূল বিবিধ ধর্ম্ম তাহাতে বিকাশ পাইয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে এমনও দুই একটা ধর্ম্ম বিকাশ পাইয়াছে, যাহার জীবনে কোন প্রয়োজন নাই। শরীরের এক অংশে একটা কোন বিকৃতি বা পরিবর্ত্তন ঘটিলে, অন্য অংশে অন্যরূপ বিকৃতি বা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। এই সকল আকস্মিক বা আনুষঙ্গিক পরিবর্ত্তন জীবন রক্ষার অনুকূল না হইতেও পারে, জীবন রক্ষার প্রতিকূল না হইলেই হইল। তেমনি পক্ষিজাতির অভিব্যক্তি সহকারে, তাহার শরীরে নানাবিধ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অধিকাংশ পরিবর্ত্তনই তাহার জীবন রক্ষার অনুকূল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হয়ত কোন জৈবিক নিয়মবশে আর পাঁচ রকম পরিবর্ত্তনও ঘটিয়া থাকিবে, যাহা জীবন রক্ষায় তেমন কার্য্যকারী না হইতেও পারে। পাখীর যে সৌন্দর্য্যের কথা বলা যাইতেছে, তাহা এইরূপ আকস্মিক আনুষঙ্গিক পরিবর্ত্তন মাত্র। তবে ইহাতে তাহার যে সৌন্দর্য্য বাড়াইয়াছে তাহা দৈবক্রমে। তাহাতে তাহার লাভ এমন কিছু নাই, তবে আকস্মিক ভাবে ঘটিয়া গিয়াছে এই পর্য্যন্ত।

মনুষ্যের সৌন্দর্য্য বুদ্ধিটাও এইরূপ একটা আকস্মিক

লাভ মাত্র; জীবন রক্ষার অনুকূল বিবিধ মানবধর্ম্মের বিকাশের সহকারে দৈবক্রমে এই বুদ্ধিটারও সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে তাহার অন্য লাভ কিছুই নাই; কেবল বিনা কারণে খানিকটা আনন্দলাভের উপায় ঘটিয়াছে মাত্র। মনে কর, সুখাদ্য ভোজনে, সুপেয় পানে, মানুষের আনন্দ ঘটে; তাহা বেশ বুঝা যায়, কেন না এই আনন্দ জীবনের অনুকূল; এই আনন্দানুভব শক্তি প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফল। কিন্তু মদ খাইয়া তাহার নেশাতেও মানুষের এক রকম তীব্র আনন্দলাভ ঘটে; এ আনন্দে মানুষের কোন লাভ নাই, বরং লোকসান আছে; এই আনন্দলাভ-শক্তি জীবন রক্ষার প্রতিকূল; এবং মনুষ্য পদে পদে এই অহিতকর প্রবৃত্তির জন্য অনিষ্ট ভোগ করিতেছে। অথচ আর পাঁচটা হিতকর প্রবৃত্তির সহকারে এই সম্পূর্ণ অনিষ্টকর প্রবৃত্তিটাও মানুষের জন্মিয়া গিয়াছে। তাহার উপায় নাই। মানুষের সৌন্দর্য্যানুরাগও এইরূপ একটা নেশা, ইহার কোন উপকারিতা নাই; তবে অন্য নেশার মত জীবনের বিশেষ অপকার করে না; বরং সময়ে সময়ে আনন্দ জন্মাইয়া উপকার করে। অন্যান্য নেশার মত এ নেশাটাও দৈবক্রমে মানুষের মনুষ্যত্ব লাভের আনুষঙ্গিক আকস্মিক ফল মাত্র। ইহার জন্য মনুষ্য প্রকৃতির নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে ইচ্ছা করে করুক। তাহাতে বিশেষ আপত্তি নাই। কিন্তু সংসারের ভীষণ দ্বন্দ্বক্ষেত্রে যাহার ছেলে খেলায় সময় কাটাইবার অবসর নাই, যে বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান্ ও বিষয়বুদ্ধিবিশিষ্ট, যাহার কোকিলের পিছু ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইবার অবকাশ নাই, এবং বিরহজ্বর-সন্তপ্ত হইয়া চন্দ্রকিরণকে গালি দিবার সময় নাই, সে প্রকৃতিদেবীর এই সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বদান্যতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশে একটু ইতস্ততঃ করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কুক্কুটের মাথায় শিখার মত যেমন পুরুষ মানুষের মুখমণ্ডলে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক দাড়ি গোঁপ গজাইয়াছে,—ডারুইন হয়ত বলিবেন যাহার উদ্দেশ্য নারীজাতির মনোরঞ্জন, তথাপি যাহার অনাবশ্যকতা প্রতিপাদনের জন্য নাপিতের ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইয়াছে,—তদ্রূপ স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির মধ্যেই এই অনর্থক সৌন্দর্য্য নেশাটার উৎপত্তি হইয়াছে। তবু ভাল যে সংসারের সকলেই এই মদের মাতাল নহে। সকলেই সংসারের কাজ ছাড়িয়া জোনাকি, আর ফুল, আর ভ্রমর, আর বিরহ লইয়া জীবন কাটায় না।

ফলে ইউটিলিটি লইয়া যখন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কারবার, এবং ইউটিলিটির সহিত কবিত্বের যখন সনাতন বিরোধ, তখন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা মনুষ্যের কবিত্বের স্ফূর্ত্তি, বা সৌন্দর্য্য বোধের অভিব্যক্তির ব্যাখ্যার প্রয়াস পণ্ডশ্রম বলিয়াই মনে হইতে পারে। কিন্তু এইখানে একটা ভাবিবার আছে; জীবন রক্ষায় যে কিসে কিরূপে সাহায্য করে, তাহা সাহস করিয়া বলা কঠিন। ইংরাজিতে একটা কথা আছে, যে ভাবের প্রমাণ অপেক্ষা অভাবের প্রমাণ সর্ব্বদাই কষ্টসাধ্য। এই বিষয়টাতে আমার কোন উপকার নাই, কখনও উপকার হইতে পারে না, ইহা জোর করিয়া বলা নিতান্ত দুঃসাহসিকের কাজ। সৌন্দর্য্যবুদ্ধিও মানবজীবনে আনুকূল্য করে না, একবারে এত বড় কথাটা বলিয়া ফেলিবার পূর্ব্বে একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। এবং যদি মানবজীবনে ইহার কোন উপকারিতা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারা যায়, তাহা হইলে অমনি ইউটিলিটির দোহাই দিয়া প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনকে আনিয়া ফেলা যাইতে পারে। এই বিষয়টা যে এখনও আলোচনার সীমা অতিক্রম করিয়াছে বোধ হয় না। প্রসঙ্গান্তরে আলোচনার চেষ্টা করা যাইবে।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

জাব-কীট বা পিপীলিকা-ধেনু।



ব-পোকা বা এই কীটের নামান্তরের সহিত বোধ হয় পাঠকপাঠিকাগণ পরিচিত আছেন,—ইহাদের অসংখ্যক সুবৃহৎ উপনিবেশগুলির আহার সংস্থানের জন্য প্রতি বৎসর যে কত অপক্ক শস্য ও কত নবোদ্গত বৃক্ষাঙ্কুর ধ্বংস হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করাও কঠিন। আমাদের দেশে শীতকালে জাব-কীট দেখিতে পাওয়া যায় না; ফাল্গুনের প্রারম্ভে বৃক্ষ সকলের নব পত্রোদ্গম আরম্ভ হইলেই, মুকুল ও অঙ্কুরের কোমলাংশ উক্ত কীট দ্বারা আবৃত হইয়া যায়।

মশকের ন্যায় ইহাদের ক্ষুদ্র হুল থাকে, সেগুলি বৃক্ষাঙ্গে প্রবিষ্ট করাইয়া ইহারা নিশ্চিন্তভাবে রস শোষণ করিতে আরম্ভ করে। তাহার পর আক্রান্ত অংশটী রসহীন ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলে, কীটগুলি সরস অঙ্কুরান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে থাকে। ইহাদের এই প্রকার কার্য্য, বসন্তকাল হইতে আরম্ভ করিয়া শরৎকালের কিয়দংশ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা আম্র-মুকুলের একটা ভয়ানক শত্রু। মুকুলোদ্গমকালে যে আম্র কাননে এই কীটের প্রাচুর্য্য দেখা যায়, তথায় মুকুল ফলশালী হওয়ার আশা অতি অল্পই থাকে। উদ্যানপ্রিয় পাঠকপাঠিকাগণ জাব-কীটের অনিষ্টকারিতার সহিত অবশ্যই বিশেষ পরিচিত আছেন;—কার্ত্তিক মাসে শিশু কপি গাছগুলিকে এবং ফাল্গুন মাসে শাক সব্জি ও নানা পুষ্প মুকুলসকলকে ইহাদের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য, তামাকের জল প্রয়োগাদি নানা ব্যবস্থা করিয়াও উদ্যানপালকগণ ইহাদের অত্যাচার হইতে ত্রাণ পায় না। পার্শ্বস্থ ১ম চিত্রে একটী গোলাপ কোরক এই কীট দ্বারা কি প্রকারে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহা অঙ্কিত হইল। উদ্ভিজ্জ-জীবি কীট পতঙ্গের ন্যায় জাব-কীটের বর্ণ সবুজ বলিয়া, নবোদ্গত



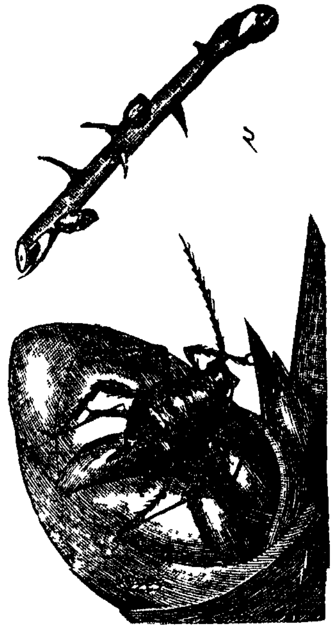
হরিৎ পত্রাদিতে ইহাদের অস্তিত্ব সহসা নয়ন-গোচর হয় না। এই জন্য পক্ষী ইত্যাদির কবল হইতে, ইহারা অনেক সময় আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

পাঠকপাঠিকাগণ জাব-কীটের "পিপীলিকা ধেনু" আখ্যা দেখিয়া বোধ হয় বিস্মিত হইয়াছেন;—কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, গাভী দুগ্ধদানে যে প্রকার মানবজাতির অশেষ উপকার সাধন করিয়া থাকে, জাব-কীটও বাস্তবিক কয়েক জাতীয় পিপীলিকাকে তদ্রূপ "দুগ্ধ-ননী-সর" অকাতরে দান করিয়া থাকে। পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় দেখিয়া থাকিবেন, গ্রীষ্মকালে জাব-কীট অধ্যুষিত আম্রাদি বৃক্ষের পত্র এক প্রকার 'আঠাল' স্বচ্ছ পদার্থে লিপ্ত দেখা যায়,—ইহাই জাব কীটদিগের শরীরনিগত পিপীলিকাভোগ্য দুগ্ধ বা মধু। পত্রাদিলিপ্ত মধুবৎ পদার্থের সহিত জাব কীটের যে এতদুর নিকট সম্বন্ধ বর্ত্তমান, তাহা আমরা সহসা বুঝিতে পারি না, এজন্য এটাকে একটী স্বতন্ত্র জিনিস ভাবিয়া উক্ত পদার্থলিপ্ত পত্রকে আমরা সাধারণতঃ "মধু লাগা-পাতা" বলিয়া থাকি। *

ক্ষুদ্র জাবকীটের ক্ষুদ্র জীবনের ইতিহাস আমুল অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনাপরম্পরায় পূর্ণ। ইহাদের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও মৃত্যু প্রভৃতি সকলই অদ্ভুত। স্বার্থান্বেষী মানব সমাজে ইহারা অনিষ্টকারী ও ঘৃণিত হইলেও সত্যান্বেষী প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট ইহাদের জীবন বড়ই আদরের সামগ্রী। এইজন্য মানব-সুখ-স্বচ্ছন্দতার একটা প্রধান অন্তরায় জাব কীটের অদ্ভুত জীবনাখ্যায়িকা আজ "প্রদীপের" পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার দিব।

জাবকীটের জীবনের আরম্ভ কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাস হইতে আরম্ভ হয়। শীতের আধিক্য প্রযুক্ত অচিরাৎ সমগ্র কীটের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী দেখিয়া, পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত পক্ষহীন স্ত্রীকীটসকল বসন্তাগমে বৃক্ষাদির যে অংশ হইতে প্রথম মুকুল বা পত্রাঙ্কুর উদ্গত হইবার সম্ভাবনা, তথায় ডিম্ব প্রসব করিতে থাকে,—২য় চিত্রে ইহার একটী প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইল। জাব কীটের একটা বিশেষত্ব এই যে, স্ত্রীকীট মাত্রেরই অণ্ড-প্রসব-শক্তি থাকে না,—উদ্ভিদের পত্রোদ্গমের ন্যায় এক অদ্ভুত পদ্ধতিক্রমে কুমারী মাতার শরীর হইতে প্রতি মুহূর্ত্তে সহস্রাধিক পিতৃহীন কীট প্রসূত হইতে দেখা যায়। এই অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন জাবকীট প্রায়ই বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে জন্মগ্রহণ করে;—শরদাগমে শৈত্যতা প্রযুক্ত কীটসংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিলে, যে সকল কীট উৎপন্ন হয়, সাধারণ পতঙ্গের ন্যায় তাহাদের যৌন নির্ব্বাচন শক্তি থাকে। পূর্ব্বে যে স্ত্রী কীটের অণ্ড প্রসব

* যে কীটের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল,—নদীয়া জেলার নিকটবর্ত্তী প্রদেশে তাহা "জাব-কীট" নামে পরিচিত। বঙ্গদেশের বিভিন্নাংশে ইহার নামান্তর প্রচলিত থাকার সম্ভাবনা,—আশা করি উপরোক্ত বিবরণ পাঠে, লেখকের বিবৃত কীটটী কি, তাহা পাঠকপাঠিকাগণ বুঝিতে পারিবেন।



করার কথা বলা হইল —তাহা এই শরৎ-কালীন কীট।

দ্বিতীয় চিত্রের উর্দ্ধাংশে অবিকশিত পত্রাঙ্কুরে যে সকল অতি ক্ষুদ্র বিন্দু দৃষ্ট হইতেছে, সেগুলি জাব কীটের ডিম্ব,—এগুলি বাস্তবিকই এত ক্ষুদ্র যে নগ্ন চক্ষুতে দেখিলে তাহাদিগকে কতক গুলি ক্ষুদ্র কৃষ্ণবিন্দু ব্যতীত আর কিছুই বলিয়া বোধ হয় না। শীতকালে সমগ্র জাব-কীট ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে, বসন্তাগমে উক্ত ডিম্বসকল ফুটিয়া নূতন জাব-কীট উৎপন্ন করে। শীত ঋতুর ভয়ানক শৈত্য, প্রশাখার অঙ্কুর-মধ্যবর্ত্তী অণ্ডের কীটোৎপাদন শক্তির বিশেষ কোনও হানি করিতে পারে না। ২য় চিত্রের উর্দ্ধাংশস্থ কোন একটী অঙ্কুরকে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রসাহায্যে বহ্বায়তন-বিশিষ্ট করিয়া চিত্রের নিম্নার্দ্ধে অঙ্কিত হইয়াছে। আসন্ন মৃত্যুর বিভীষিকায় কাতরা এবং বংশরক্ষার উদ্বেগে ক্লিষ্টা একটী স্ত্রীকীট সহস্র সহস্র ডিম্ব প্রসবজনিত অবসাদ উপেক্ষা করিয়া কি প্রকারে মৃত্যুর পূর্ব্ব ক্ষণেও মাতৃকর্ত্তব্য পালন করিতেছে, ইহাতে পাঠক পাঠিকাগণ তাহা চিত্রিত দেখিতে পাইবেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শীতকালে জাব-কীট মাত্রেই এক কালীন লোপ প্রাপ্ত হয়, তারপর ফাল্গুন মাসে নাতি-শীতল দক্ষিণ বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিলে, তিন মাস পূর্ব্বেকার সেই ডিম্বসকল বৃক্ষ অঙ্গে পরিণতি লাভ করিয়া প্রচুর কীট উৎপাদন করিতে থাকে। সদ্য-জাত ক্ষুধিত কীটের খাদ্যের অভাব হয় না;—বৃক্ষের যে অঙ্গ হইতে প্রথমেই কোমল প্রশাখা বহির্গত হইবার সম্ভাবনা, ভবিষ্যৎদর্শী সন্তান-বৎসল মাতা বহুপূর্ব্বে কীটোৎ-পাদক ডিম্বগুলিকে সেই স্থানেই সঞ্চিত রাখিয়া দেয়,—কাজেই মাতৃহীন শিশু কীট প্রচুর খাদ্য লাভ করিয়া লালন পালনাভাবেও শীঘ্রই স্ফূর্ত্তিসম্পন্ন হইয়া পড়ে।

এই নবজাত জাব-কীটের জাতি সম্বন্ধে একটা বড় অদ্ভুত ব্যাপার দৃষ্ট হইয়া থাকে। ডিম্বোৎপাদক শরৎ-কালীন কীটদিগের মধ্যে যেমন একটা স্ত্রী পুরুষ ভেদ দেখা যায়,—তদুৎপন্ন বাসন্তী কীটে সেই ভেদ অণুমাত্র দৃষ্ট হয় না। সকলেই ভ্রাতৃহীনা ভগ্নী ও পতি-হীনা কুমারী প্রভৃতি হইয়া জন্মগ্রহণ করে। আর এক বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, পুরুষ সঙ্গীর সাহায্য ও প্রাথ-মিক ডিম্ব প্রসব ব্যতীত, ইহাদের প্রত্যেকের দেহ হইতে সহস্র সহস্র শিশু কীট প্রসূত হইতে থাকে। এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলে,—শারদীয় জাব-কীটের স্ত্রী পুরুষ ভেদ ও ডিম্বপ্রসব প্রভৃতি কার্য্য একটা নৈমিত্তিক বিধান বলিয়া বোধ হয়,—কীট বংশকে দুরন্ত শীতের প্রকোপ *হইতে রক্ষা করিবার ইহাই একমাত্র উপায়।* এক জাতীয় অণ্ডজ কীট হইতে পুং কীটের সাহায্য ব্যতীত নিরও কীটের উৎপত্তি, প্রাণিবিজ্ঞানের একটা অতি দুর্ল্লভ ঘটনা। উদ্ভিদের পত্রোদ্গমের সহিত ইহার কতকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়—একই শাখার অংশ বিশেষ হইতে যেমন নানা প্রশাখা ও পত্র মুকুলাদি উদ্গত হয়, জাব কীটের সন্তান জনন কার্য্যটাও কতকটা তদ্রূপ।



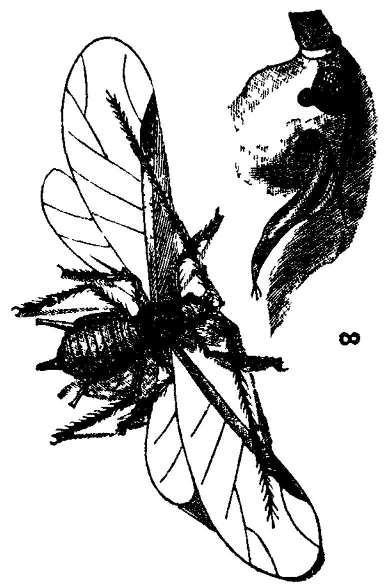
একটী কীট হইতে কি প্রকারে বহু কীট উৎপন্ন হয়, পার্শ্বস্থ ৩য় চিত্রে তাহা অঙ্কিত হইল। বলা বাহুল্য এস্থলেও অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে কীট ও তদাশ্রিত বৃক্ষের অংশটী বহ্বায়তন বিশিষ্ট করা হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নূতন কীট সকল প্রসূত হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহা-দের অতি সূক্ষ্ম শুণ্ড বা হুল বৃক্ষের কোমল অঙ্গে প্রবেশ করাইয়া, রস শোষণ করিতে থাকে। এই উপায়ে কীটশিশুসকল সবল ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, তাহারাই আবার সহস্র সহস্র জাব-কীটের জননী হইয়া

দাঁড়ায়। আমরা যে বহু চেষ্টাতেও উদ্যানবৃক্ষস্থ জাব-কীটের সংখ্যা হ্রাস করিতে পারি না,—তাহার কারণ ইহা-দের এই অদ্ভুত বংশবৃদ্ধি ব্যতীত আর কিছুই নয়। গ্রীষ্ম বা বসন্ত কালের একটী কীটের কন্যা দৌহিত্রী ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়া তাহার পরিবারস্থ কীট সংখ্যা কত হইয়া পড়ে, তাহা অনুমান করাও কঠিন,—বলা বাহুল্য জাব কীটের সন্তানপ্রাচুর্য্য ইহাদের শরীর পোষক খাদ্যের প্রাচুর্য্যের উপর অনেকটা নির্ভর করে।

জীব স্বীয় অস্তিত্ব অক্ষত রাখিবার জন্য যতই প্রয়াস করে, তাহার আদিম সংস্কার কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির ততই উৎকর্ষতা সাধিত হইয়া থাকে। জীব-বিজ্ঞানের এই চিরন্তন সত্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ, প্রাণিশ্রেষ্ঠ মানব হইতে আরম্ভ করিয়া অতি নিকৃষ্ট জীবেও দেখা গিয়া থাকে। প্রচুর আহার্য্য ও জীবন নির্ব্বাহের অপরাপর প্রয়োজনীয় পদার্থ সম্মুখে আজীবন সঞ্জীকৃত পাইলে অধ্যবসায় ও উদ্যমশীল অতি উন্নত জীবও দুই এক পুরুষের মধ্যে সংসার সংগ্রামের সম্পূর্ণ অনুপযোগী অতি নিকৃষ্ট অলস প্রাণীতে পরিণত হইয়া পড়ে। তৃতীয় চিত্রের উর্দ্ধাংশস্থ কীটটী সেই ডিম্বপ্রসূত একটী প্রথম বাসন্তী কীটের প্রতিকৃতি, ঐটী উদ্যমশীল কার্য্যক্ষম পিতামাতার উপযুক্ত বংশধর—কাজেই ইহার প্রাথমিক জীবনে উচ্চ শ্রেণীর পতঙ্গোচিত নানা গুণ দেখিতে পাওয়া যায়—আবার ডিম্ব হইতে বহির্গত হওয়ার পর সর্ব্বাঙ্গ-পুষ্ট সপক্ষ কীটে পরিণত হওয়া পর্য্যন্ত সময় মধ্যে রেশম কীটের ন্যায় ইহার দেহের নানা পরিবর্ত্তনও দেখা গিয়া থাকে, কিন্তু প্রচুর আহার্য্য প্রাপ্ত হইয়া পতঙ্গ সুলভ গুণাবলীর প্রয়োগাভাবে ইহা ক্রমেই অপকৃষ্ট জীবে পরিণত হইয়া পড়ে। ইহাদেরই সন্তানাদি যে ক্রমে আরও অবনতি প্রাপ্ত হইয়া শেষে সন্তানোৎপাদন ব্যাপারে উদ্ভিদ্ পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িবে এবং সঞ্চিত খাদ্য নিঃশেষিত করিবার জন্য পূর্ণাবয়ব সম্পন্ন অসংখ্যক অলস সন্তান প্রসব করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

বসন্তকাল হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রীষ্মের মধ্যকাল পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ সময় মধ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে সকল কুমারী-গর্ভজাত পিতৃহীন স্ত্রী জাব-কীট উৎপন্ন হয় তাহাদের আর একটা বিশেষত্ব আছে,—ইহাদের অধিকাংশেরই পক্ষ থাকে না। জন্মক্ষণেই তাহারা জাতস্থানে অতি সূক্ষ্ম শুণ্ড প্রবিষ্ট করাইয়া বৃক্ষের রস পান করিতে থাকে, তা'র পর কয়েক সহস্র সন্তান প্রসব করিয়া, যথা সময়ে দেহত্যাগ করে,—কাজেই ইহাদের পক্ষ ব্যবহারেও বিশেষ আবশ্যকতা দেখা যায় না। এই সহস্র সহস্র কীটের মধ্যে যে কয়েকটী পক্ষবিশিষ্ট হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমনাগমন করিয়া উদ্যানস্থ বৃক্ষ মাত্রেই জাব-কীটের উপনিবেশ স্থাপন তাহাদের জীবনের কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। ৪র্থ চিত্রে একটী পক্ষ বিশিষ্ট পুষ্ট জাবকীটেরপ্রতিকৃতি অঙ্কিত হইল। ইহার শরীরের পশ্চাদর্দ্ধের প্রায় প্রান্তদেশে যে দুইটী শৃঙ্গের ন্যায় অংশ দৃষ্ট হইতেছে, ইহাই সেই পূর্ব্বোক্ত পিপীলিকা-ভক্ষ্য দুগ্ধ বা মধুর ক্ষরণ পথ। চিত্রের উর্দ্ধাংশে কীট শরীরের যে অংশটা বহ্বায়তন বিশিষ্ট করিয়া অঙ্কিত আছে, সেটী জাব-কীটের রস শোষণ যন্ত্র বা শুণ্ড। ইহাতে একটী নলাকার কোষমধ্যে চারিটি সূক্ষ্মাগ্র নল আবদ্ধ থাকে। জাব-কীটসকল বৃক্ষত্বক্‌ভেদোপযোগী শোষক দ্বারা বৃক্ষরস পান করিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত মধুক্ষরণ নলিকাযুগল ও রস-শোষক শুণ্ড কেবল চিত্র লিখিত সপক্ষ কীটেই যে সঞ্জীকৃত থাকে, এ কথা পাঠকপাঠিকাগণ মনে করিবেন না,—এই উভয় যন্ত্র জাব-কীট মাত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। একটী ক্ষুদ্র অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা একখানি স্থূল-মধ্য কাচখণ্ড (magnifying glass) দ্বারা বৃক্ষত্বক্‌লগ্ন জাব কীট পরীক্ষা করিলে, সদ্যজাত কীট রস শোষণ করিয়া কি প্রকারে অতি অল্পকাল মধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কৌতূহলী পাঠকপাঠিকাগণ তাহা সহজে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন।



৩

প্রকৃতির শাসন পদ্ধতিতে, আমরা প্রতিপদেই সাম্যের

লক্ষণ দেখিতে পাই। প্রকৃতিদেবী কোন এক জাতীয় সন্তানের প্রতি অসম্ভাবিত স্নেহ বর্ষণ করিয়া, অপর সন্তান-গুলির জীবন কণ্টকিত করিতেছেন, এ প্রকার ঘটনার উদাহরণ সংসারে অতীব দুর্লভ। প্রকৃতি, যে প্রাণীদিগের সংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষে যত অনুকূল, তাহাদের অবাধ অস্তিত্বের পক্ষে তিনি ততই প্রতিকূল। প্রকৃতির রাজ্যে যে জাতির বৃদ্ধির যত সুব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ক্ষয়ের জন্য সেই প্রকার সহস্র নৈসর্গিক উপায় দেখা গিয়া থাকে। জাব-কীটের জীবনেতিহাসে এই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচার হয় নাই,—প্রকৃতিদেবী একটী ক্ষুদ্র কীট হইতে কোটী কোটী কীটের উৎপত্তির সুব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন নাই। যাহাতে এই ক্রমবর্দ্ধমান অসংখ্যক কীট শত শত বলবান্ শত্রুর কবলিত হইয়া, সংসারে আবর্জ্জনার হ্রাস করিতে পারে, স্নেহময়ী প্রকৃতি তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। জাব-কীটের অত্যাচারে উত্তক্ত উদ্যানপালকগণ কীটাধ্যুষিত বৃক্ষে তাম্রকূটবারি সিঞ্চনাদি উপায়ে যে পরিমাণ কীট নাশ করিতে সমর্থ হয়,—প্রাকৃতিক শত্রু দ্বারা তদপেক্ষা অনেক অধিক কীট ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কয়েক জাতীয় পতঙ্গ ও কীট জাব-কীটের পরম শত্রু,—তন্মধ্যে এক উৎকুন জাতীয় পরভুকের (Parasite) সহিত ইহাদের জাত-শত্রুতা দেখা যায়। এই পরভুক্ গুলির আসন্নপ্রসবা মাতা কোন প্রকারে জাব-কীটের শরীরাভ্যন্তরে ডিম্ব প্রসব করিয়া রাখে। তা'রপর যথা সময়ে ডিম্বগুলি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গ উৎপন্ন হইয়া, আশ্রয়-দাতা কীটের দেহ ক্রমশঃ উদরসাৎ করিতে আরম্ভ করে। ৫ম চিত্রের নিম্নাংশে এক পরভুক্পূর্ণ স্ফীতোদর জাব-কীটের প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইল, এবং তাহারই ঊর্দ্ধাংশে সেই কীটেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম চিত্রিত আছে। পাঠকপাঠিকাগণ দেখিতে পাইবেন, ইহাতে পরভুক্সকল হতভাগ্য জাব-কীটের দেহাভ্যন্তরীণ সমগ্র কোমলাংশ ভক্ষণ করিয়া, তন্মধ্যে একটী মৃত জাব-কীটের অন্তঃসার শূন্য দেহাবরণ ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়াছে।



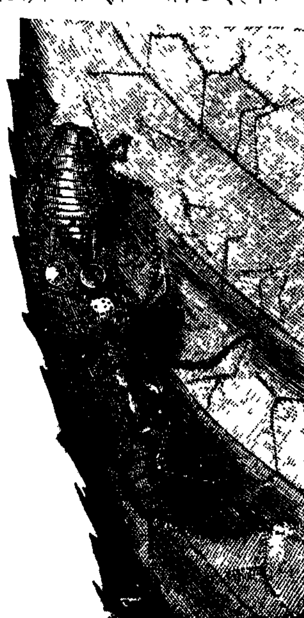
এতদ্ব্যতীত আকাশের আকস্মিক অবস্থা পরিবর্ত্তন, বারি ও তুষারপাত এবং ক্ষুদ্র বোল্তা জাতীয় কয়েকটী পতঙ্গ জাবকীটের পরম শত্রু। ডিম্ব হইতে বহির্গত হইয়া প্রজাপতি ও বোল্তা প্রভৃতির যে প্রকার আকার হয় সেই আকারেই এক বোল্তা-শিশু কি প্রকারে জাব-কীট ভক্ষণ করে—৬ষ্ঠ চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে পাঠক পাঠিকাগণ তাহা অনুমান করিতে পারিবেন। এই বোল্তা শিশুগুলি এত ভোজন-প্রিয়, যে ইহাদের প্রত্যেক ঘণ্টায় ১২০টী জাব-কীট অনায়াসে উদরসাৎ করিতে পারে। দেহের পশ্চাৎস্থিত পূর্ব্ব-বর্ণিত নলদ্বয় সাহায্যে ইহারা কি প্রকারে মধু-ক্ষরণ করে, চিত্রের নিম্নাংশে তাহাও দৃষ্ট হইবে।



এখন দেখা যাউক পিপীলিকার প্রিয় ভক্ষ্য কীট-শরীরজ সেই মধুর ব্যাপারটা কি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আম্র বৃক্ষাদি জাব কীট দ্বারা অধ্যুষিত হইলে তাহার পত্রকাণ্ডাদি যে এক প্রকার নির্য্যাসবৎ রসে লিপ্ত দেখা যায়, তাহাই সেই কীট-শরীরজ মধু। এই মধুই প্রথমতঃ প্রাণিতত্ত্ব-বিদ্গণের দৃষ্টি ক্ষুদ্র জাব-কীটের প্রতি আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং ইহারই উৎপত্তি স্থির করিতে গিয়া তাঁহারা এই অদ্ভুত কীটের অদ্ভুত জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য্যই আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন। প্রাণিতত্ত্ববিদ্গণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন,—জাব-কীটের মধুক্ষরণ ব্যাপার, গাভীর দুগ্ধ দানের ন্যায় নিঃস্বার্থ কার্য্য নয়, আপনার শারীরিক স্বাস্থ্য বিধানের জন্যই কীট সকল মধুক্ষরণ করিয়া থাকে। পাঠক

পাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন, প্রাণিদিগের শরীর পোষণের জন্য নাইট্রোজানের বিশেষ আবশ্যক ;—এইজন্য মৎস্য, মাংস, ডাল ইত্যাদি নাইট্রোজানবহুল খাদ্য জীব শরীরের বিশেষ পুষ্টিকর। জাব কীটগণের এক মাত্র খাদ্য বৃক্ষরসে উক্ত নাইট্রোজান অতি অল্পই মিশ্রিত থাকে—ইহাতে শর্করার উপাদান অঙ্গার (Carbon) এবং জলজানেরই (Hydrogen) প্রাচুর্য্য দেখা যায়। জাব-কীটসকল ভুক্ত খাদ্য হইতে শরীর পোষণের সম্পূর্ণ অনুপযোগী শর্করা নিষ্কাশিত করিয়া, সেই অত্যল্প নাইট্রোজানকে কার্য্যকরী করিবার জন্য, উদ্বৃত্ত অঙ্গার ও উদজানকে মধুর আকারে শরীর হইতে নির্গত করে। ইহাই সেই পিপীলিকাভোগ্য মধু।

কীট-শরীর-নির্গত উক্ত পদার্থটী শর্করা-বহুল ও আঠাল বলিয়া, ইহা পত্রাদি বা বৃক্ষত্বকে ক্ষরিত হইলে, কীটদিগেরই যাতায়তের অসুবিধাকর হইবে ভাবিয়া ইহারা সহসা পত্রাদিতে মধুক্ষরণ করে না,—মধুপ্রিয় পিপীলিকাদির সমাগম প্রতীক্ষা করিতে থাকে। পিপীলিকাগণ মধুদোহন ব্যাপারে বেশ অভ্যস্ত। যথাসময়ে জাব-কীটদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া তাহারা মধু নিঃসারক নলদ্বয়ের নিকটস্থ কীটদেহ ধীরে ধীরে স্পর্শ করিতে থাকে। ইহাতে কীটসকল পিপীলিকার অস্তিত্ব অনুভব করিয়া মধুক্ষরণ করিতে আরম্ভ করে এবং পিপীলিকাগণ আকণ্ঠ মধুপান করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতে থাকে। ৭ম চিত্রে পিপীলিকার মধুদোহন কার্য্যের প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইল।



যথেচ্ছা মধুপানতৃষা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য বৃক্ষবিহারী পিপীলিকাগণ এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। আমরা আবশ্যকমত দুগ্ধপ্রাপ্তির জন্য যে প্রকার গো-পালন করিয়া থাকি, পিপীলিকাগণও বাস্তবিকই তদ্রূপ জাবকীট পালন করিয়া থাকে। কতকগুলি পিপীলিকা দলবদ্ধ হইয়া—এক দল কীটকে আয়ত্তাধীন রাখে এবং তজ্জাত মধু স্বীয় সম্প্রদায় মধ্যে বণ্টন করিয়া লয়। ইহারা এত সতর্কভাবে সেই জাব-কীটদিগের প্রহরীর কার্য্য করে যে, একটী কীটও দলভ্রষ্ট হইতে পারে না,—কীট লইয়া দুই দল পিপীলিকার মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়া থাকে। জগৎ বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ সার্ জন্ লবক্ (Lubbock) পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন—জাতি অনুসারে পিপীলিকারা একত্র হইয়া এক এক নির্দিষ্ট জাতীয় জাব-কীট পালন করিতে ভালবাসে। উদ্যানবিহারী কৃষ্ণ পিপীলিকাগণ, পত্র ও প্রশাখাবলম্বী জাব কীটের কিছু পক্ষপাতী, আবার হরিদ্রা ও বাদামী রঙ্গের পিপীলিকাগণ যথাক্রমে মূল ও ত্বক্ বিহারী জাব-কীট পালনে ব্যস্ত থাকে।

পিপীলিকাগণ এত কীট মধুপ্রিয় যে ভবিষ্যতে কাহার ভাগ্যে কতগুলি জাব-কীট আসিয়া জুটিবে, এই অনিশ্চয়তার মধ্যেও তাহারা থাকিতে চায় না। শীতাগমের পূর্ব্বে অর্থাৎ আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে পত্রাঙ্কুরে জাব কীটের অণ্ড সঞ্চিত হইলেই, পিপীলিকাগণ দলবদ্ধ হইয়া ডিম্বগুলি অধিকার করিয়া ফেলে এবং সমগ্র শীতকাল সেগুলিকে নিরাপদে রাখিয়া বসন্তাগমমাত্রেই উষ্ণতর সৌরকিরণ সংস্পর্শে সেগুলি হইতে যাহাতে শীঘ্র কীট বহির্গত হইতে পারে তাহারও চেষ্টা দেখিতে থাকে। পিপীলিকার উচ্চ বুদ্ধির পরিচায়ক এই সকল কৌশল এবং দূর ভবিষ্যৎ-জ্ঞান বড়ই বিস্ময়কর। গো, মেষ, মহিষ ও অশ্বাদি কয়েকটীমাত্র জীবকে বশীভূত করিয়া মানুষ গার্হস্থ্য কার্য্যের সুবিধা বিধান করিতেছে—অধ্যাপক লবক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, পিপীলিকাগণ অন্যূন ৫৮৪ জাতীয় ক্ষুদ্র পতঙ্গ ও কীটাদিকে বশীভূত করিয়া তাহাদের এক একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

জাব কীটগণ পূর্ব্বোক্তপ্রকারে রসশোষণ, মধুদান ও সন্তানপ্রসব করিয়া ফাল্গুন হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত অতিবাহন করে। তার পর অগ্রহায়ণ মাস উপস্থিত হইলেই ইহাদের প্রসূত তৎকালিক সন্তানগুলির একটা বিশেষত্ব দেখা গিয়া থাকে. পূর্ব্বে বলা হইয়াছে গ্রীষ্মোৎপন্ন জাবকীটের মধ্যে পুরুষ কীট প্রায়ই দেখা যায় না, কীটমাত্রেই স্ত্রী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াই আবার পূর্ণাবয়বসম্পন্ন স্ত্রীকীট প্রসব করিতে থাকে। কিন্তু অগ্রহায়ণমাসজাত কীটে এই

পদ্ধতি আর দেখা যায় না,—এই সময়ে পতঙ্গ কীটগুলির মধ্যে কতকগুলি পক্ষবিশিষ্ট পুরুষ ও কতক পক্ষহীন স্ত্রী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। পক্ষবিশিষ্ট পুরুষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে, নানা স্থানে যথেচ্ছা উড়িয়া স্বীয় মনোমত পত্নী নির্ব্বাচন করিয়া লয়, এবং কিছুকাল মহাসুখে বিচরণ করিয়া গর্ভিণী পত্নী রাখিয়া দেহত্যাগ করে। স্নেহময়ী গর্ভিণী কীট তার পর সেই প্রথমোক্ত প্রথায় শীতত্রাণোপযোগী পত্রাঙ্কুরে ভবিষ্য সন্তানের বহু অণ্ড সঞ্চিত রাখিতে আরম্ভ করে, এবং অল্প দিন মধ্যে কঠোর মাতৃকর্ত্তব্যে অবসন্ন হইয়া পতির পথ অনুসরণ করে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।



৺কালীকান্ত চক্রবর্ত্তী

স্বর্গীয় কালীকান্ত।

সে আজ ২৩ বৎসর পূর্ব্বের কথা, কালীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঢাকাতে ডিটেক্‌টিভ পোলিষ ইন্‌স্‌পেক্টর ছিলেন। তিনি কার্য্য হইতে অবসর ও পেন্‌শান্ গ্রহণ করিয়া কাশীধাম যান, এবং জীবনের অবশিষ্ট কুড়ি বৎসরকাল সেই স্থানেই অতিবাহিত করেন। তিনি এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন, সেও আজ তিন বৎসর। যদিও তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ এ দেশ ছাড়া ছিলেন, এবং এই ২৩ বৎসরের মধ্যে যদিও এ দেশের কেহ তাঁহাকে দেখেন নাই, তথাপি তাঁহার সেই সুনাম, সেই সাধু চরিত্রের বিষয় এ পর্য্যন্ত কেহ বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। এ অঞ্চলের কি ছোট, কি বড়, কি ভদ্র, কি অভদ্র, স্ত্রী পুরুষ সকলের নিকটই "কালী দারোগা" এই নামটী চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। যুবকগণ ডিটেক্‌টিভের গল্পে, প্রৌঢ়গণ পোলিষ চরিত্র সমালোচনায়, বৃদ্ধগণ সাধুতার দৃষ্টান্তে সর্ব্বদাই কালীকান্তের নাম উল্লেখ করেন। ফলতঃ পোলিষ বিভাগে কর্ম্ম করিয়াও সাধু চরিত্র গুণে কালীকান্ত যে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অতি অল্প লোকের অদৃষ্টেই ঘটে। আজ আমরা এই মহাত্মার আদর্শ জীবন সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

বঙ্গাব্দ ১২২০ সনের ১৪ই আশ্বিন তারিখে বিক্রমপুর আকসা গ্রামে কালীকান্ত জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺রামজয় চক্রবর্ত্তী। রামজয় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মাধবচন্দ্র, কমলাকান্ত, রঘুনাথ, কালীকান্ত ও স্বরূপ চন্দ্র এই পাচ পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। তিনি একজন সংস্কৃতজ্ঞ বিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। সাধুতা, পরোপকার, নিষ্ঠা প্রভৃতি বিবিধ গুণের জন্য লোকে তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি ও সম্মান করিত। ইঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস

মুরসিদাবাদ। নবাব আলীবর্দীখাঁর সময়ে ইঁহাদের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ এ দেশে আগমন করেন। কতক ব্রহ্মোত্তর জমী পাইয়া ও বিবাহ করিয়া তিনি এ দেশে অবস্থান করেন। সেই অবধি ইঁহাদের বাসস্থান এ দেশে। রামজয় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। যে সমস্ত ব্রহ্মোত্তর জমি তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিল, একবার গৃহদাহে গৃহস্থিত দ্রব্য সামগ্রী ও জমীর দলীলাদি তাবৎ একবারে নষ্ট হয়। তাহাতে অধিকাংশ ব্রহ্মোত্তর জমী হইতে বঞ্চিত হইয়া তিনি অতি কষ্টে কাল যাপন করেন।

তৎকালীক প্রথানুসারে কালীকান্ত ভ্রাতৃগণ সহিত গ্রাম্য পাঠশালায় পড়িতেন। বাল্যকাল হইতেই তাহার অসাধারণ প্রতিভা ছিল। লেখা পড়ার প্রতি বিশেষ মনোযোগ ছিল এবং তিনি যাহা কর্ত্তব্য বোধ করিতেন তাহা সম্পন্ন করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব দেখিয়া গ্রামবাসী প্রাচীন ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ, কালীকান্ত সময়ে যে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হইবে, এই অনুমান করিয়াছিলেন। গ্রাম্য পাঠশালার পড়া শুনা সমাপন করিয়া কালীকান্ত ঢাকাতে আসেন। বাটীর অবস্থা শোচনীয়, ঢাকাতে সাহায্যকারী আত্মীয় বন্ধু বান্ধব কেহই নাই; এইরূপ অবস্থায় ঢাকা আসিয়া তিনি প্রথমে অতিশয় কষ্টে পতিত হন। এই সময় বিক্রমপুর বেতকানিবাসী ডিপুটী কালেক্টার হরিশ্চন্দ্র বসু মহাশয় ঢাকাতে ছিলেন। তিনি বহুতর দরিদ্র ভদ্র সন্তানের প্রতিপালন করিতেন। কালীকান্তের দুরাবস্থার বিষয় অবগত হইয়া তিনি তাঁহাকে নিজ বাসায় আশ্রয় দিলেন এবং গ্রাসাচ্ছাদনের ভার গ্রহণ করিলেন। ডিপুটী বাবুর বাসায় থাকিয়া কালীকান্ত পার্সী ও উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ৭০ বৎসর পূর্ব্বে এ দেশে ইংরেজী ভাষার তাদৃশ আদর ছিল না; কলিকাতা ভিন্ন অন্যত্র ইংরেজী শিক্ষা করিবার সুবিধাও ছিল না। রাজকীয় তাবৎ কার্য্য পার্সী ভাষাতেই সম্পাদিত হইত।

১২৪৪ সনে গবর্ণমেণ্ট সেটেল্‌মেণ্ট আফিসে ৫৲ টাকা বেতনে কালীকান্ত প্রথমে মোহরের কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং অল্পকাল পরেই ১০৲ টাকা বেতনে মহাফেজ হ'ন। কার্য্যতৎপরতা ও সাধুতা তাঁহার জীবনের প্রথম হইতেই ছিল। এই সমস্ত গুণের কথা অবগত হইয়া মাজিষ্ট্রেট্ আর্-এবার্ ক্রম্বি সাহেব কালীকান্তকে ফৌজদারীর নায়েব নাজীর কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ক্রমে ১০০৲ টাকা বেতনে জিলার প্রথম শ্রেণীর দারোগা পদে কালীকান্ত উন্নতি লাভ করেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে প্রায় ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। সে সময়ের পোলিষ কর্ম্মচারীদিগকে বর্ত্তমান সময়ের লোকে "সে কেলে পোলিষ কর্ম্মচারী" বলিয়া থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবেই সে সময়ের সঙ্গে বর্ত্তমান সময়ের অবস্থার অনেক পার্থক্য হইয়াছে। সে সময় পোলিষের উৎকোচ গ্রহণ ততটা নিন্দার বিষয় ছিল না। তখন এত সংবাদ পত্রের ছড়াছড়ি ছিল না, কাজেই পোলিষ একটা অন্যায় কার্য্য করিলেও তাহা প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা অতি অল্পই ছিল। কোন লোকের বাটীতে তদন্ত উপলক্ষে দারোগা উপস্থিত হইলে সে বাটীতে ধূমধাম পড়িয়া যাইত। চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় ইত্যাদির দ্বারা দারোগা বাবুর রসনা তৃপ্তির জন্য গৃহস্বামীকে ব্যস্ত হইতে হইত। সঙ্গে সঙ্গে ভোজন দক্ষিণাটীর ব্যবস্থাও উন্নত প্রণালীর ছিল। এখনকার মত সংক্ষেপে কার্য্য নির্ব্বাহ হইত না। তবে এখন যেমন কোন কোন কর্ম্মচারী বাদী বিবাদী উভয় পক্ষ হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া হস্তকে বিশেষরূপে কলঙ্কিত করেন, পরিশেষে প্রকৃত সাহায্যের সময় কোন পক্ষেরই সাহায্য করিতে সাহসী হন না, নিরপেক্ষ সাক্ষী গোপালটীর মত থাকেন, তখন প্রায় এইরূপ ছিল না। দারোগা-পূজার বন্দোবস্ত কঠিন ছিল বটে, কিন্তু কষ্টে স্রষ্টে একবার পূজা করিতে পারিলেই পূজকের কিছু না কিছু উপকার হইত। মফঃস্বলে দারোগার এতাদৃশ প্রতাপ ছিল, লোকে জানিত যে দারোগাই এক মাত্র হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা। বোধ হয় এই জন্যই একটী বৃদ্ধা স্ত্রী খুনি মোকদ্দমায় অভিযুক্ত তাহার পুত্রের মুক্তি সংবাদ শুনিয়া জজ্ সাহেবকে দারোগা হইতে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল। কোন কোন কর্ম্মচারীর এইরূপ নিয়ম ছিল যে, তাঁহারা ন্যায় পক্ষ অবলম্বন করিতেন এবং ঐ পক্ষ হইতে যে কিছু পূজা গ্রহণ করিয়া সে দিকে সাহায্য করিতেন। ন্যায় চক্ষে যদিও ইঁহারা দোষী-কিন্তু প্রলোভন-পূর্ণ পোলিষ বিভাগে ইঁহারা যে অপেক্ষাকৃত হৃদয়বান্ ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ উৎকোচগ্রাহী হইলেও ইঁহাদের দ্বারা সত্যের অপলাপ ঘটে নাই।

কালীকান্তের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকারের ছিল। ন্যায় পক্ষই হউক কি অন্যায় পক্ষই হউক, কাহারও নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করা তিনি মহাপাপ বলিয়া মনে করিতেন। তদন্ত উপলক্ষে মফঃস্বলে কাহারও বাটীতে উপস্থিত হইতে হইলে তিনি আহার্য্য তাবৎ সামগ্রী সঙ্গে লইয়া যাইতেন। মোকদ্দমা সংসৃষ্ট কাহারও বাটীতে পান তামাক খাওয়াতেও তাঁহার সম্পূর্ণ আপত্তি ছিল। ক্রমে জন সাধারণের মধ্যে এই সাধু ব্যবহার ও নিরপেক্ষ তদন্তের বিষয় এতদূর প্রচারিত হইয়া পড়িল যে, কোন কঠিন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, তদন্তের ভার কালীকান্তকে দিবার জন্য উৰ্দ্ধতন কৰ্ম্মচারিগণের নিকট লোকে দরখাস্ত করিত।

কালীকান্তের চরিত্রের বিষয় উৰ্দ্ধতণ কৰ্ম্মচারিগণও অবগত ছিলেন। লএল্, এফ্ বি-সিমসন্, আর-এবার-ক্রম্বি, রামপেনী, এ-এবার ক্রম্বি, জর্জ্জ গ্রেহাম, পডি, চার্লস্ প্রভৃতি কমিশনার, জজ্, মাজিষ্ট্রেট্ সকলেই কালীকান্তকে সাধু ও প্রধান ডিটেক্টিভ কৰ্ম্মচারী বলিয়া তাঁহাকে মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করিতেন।

লেপ্টানেন্ট গবর্ণর সার উইলিয়ম গ্রে মহোদয় যখন পরিদর্শনার্থে ঢাকাতে আগমন করেন, সেই সময় কালীকান্তের কৃতকার্য্যতা ও সাধু চরিত্রের বিষয় অবগত হইয়া তিনি তাঁহাকে ঢাকা জিলার ডিটেক্‌টিভ পুলিষ ইন্‌স্পেক্টার পদে উন্নীত করিয়া যান। তখন বেতন ২০০৲ টাকা হয়। সেই সময় হইতে কালীকান্তের আর পোলিষের পোষাক পরিধান করিতে হয় নাই ও সাধারণ কোন তদন্তে যাইতে হয় নাই। বিশেষ বিশেষ সরকারী কৰ্ম্মোপলক্ষে চোগা, চাপকান, শামলা ইত্যাদি ব্যবহার ভিন্ন সৰ্ব্বদা ধুতি চাদর ব্যবহার করিয়া কার্য্য করিতে হইত। খুনি, ডাকাতি, জাল, জুয়াচুরি প্রভৃতি মোকদ্দমা অথবা যে সমস্ত মোকদ্দমার তদন্ত অপর কোন কৰ্ম্মচারী দ্বারা নিষ্পত্তি হইত না, সেই সমস্ত কঠিন কঠিন স্থলে যাইতে হইত।

মোকদ্দমা তদন্ত করিয়া সত্য নির্ণয় করিবার শক্তিও কালীকান্তের যথেষ্ট ছিল। কৃতকার্য্যতার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে কখন ৫০৲ টাকা, কখন ১০০৲ টাকা, কখন ৫০০৲ টাকা এইরূপ পুরস্কার তিনি বহুবার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ফকির, বৈষ্ণব, চাষা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বেশ ধারণ করিয়া যে সমস্ত কৌশল অবলম্বন পূৰ্ব্বক তিনি মোকদ্দমার সত্য নির্ণয় করিতেন, তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিলেও এমত কয়েকটী ঘটনার অবতারণা করিতে হয় যাহাতে কয়েকটী ডিটেক্‌টীভের সুন্দর গল্প হইতে পারে। দুঃখের বিষয় এই যে স্থানাভাবে পাঠকবর্গকে এই সমস্ত গল্প আমরা উপহার দিতে সমর্থ হইলাম না।

তখন ছোট বড় সকলেই অবগত ছিলেন যে, কালীকান্ত যে মত প্রকাশ করিবেন, জিলার কমিশনার, জজ, মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি সকলেই তাহাতে দ্বিধা না করিয়া সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন। এইজন্য বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি মাত্রেই কালীকান্তকে স্বপক্ষে রাখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। ধনিগণ,— হাজার, দশ হাজার, বিশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত উপস্থিত করিতেন। ধন্য কালীকান্তের হৃদয়ের বল! ধন্য দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানের নির্লোভতা! যদি তিনি এই সাধুতার দৃষ্টান্ত না দেখাইতেন, তবে তাহার পুত্র তরণীকান্তকে ধনী করিয়া যাইতে পারিতেন বটে, উচ্চ অট্টালিকাবাসী লক্ষপতি করিয়া যাইতে পারিতেন বটে, কিন্তু আজও কি লোকে "কালীকান্ত" নাম লইত? আজও কি লোকে তাঁহার জন্য কাঁদিত? তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে তখন ভিক্ষুকেরা পর্য্যন্ত দ্বারে দ্বারে গান করিত—

*　　*　　*　　*

"যিনি হাজারে হাজার　　রিসুফৎ কতবার
ঠেলিয়া ফেলিলেন পায়॥

*　　*　　*　　*

দেখ জঘন্য নগন্য　　আমলা কত জন
ঘুস খেয়ে সদা কাজ করে।
বাবু পুরীষ সমান　　এই সব জ্ঞান
করিতেন নিরন্তরে॥

*　　*　　*　　*

দেখ দশ মুদ্রা বেতনে　　কত অভাজনে
পাকা দালান গড়িতেছে।
বাবু এত মোশরায়*　　হেরি সমুদায়
যেমনি প্রায় তেমনি আছে॥"

কালীকান্ত চরিত্রবান্ লোক ছিলেন। চরিত্রদোষ তাঁহার শরীরে এক দিনের জন্যও স্পর্শ করে নাই। অহঙ্কার কাহাকে বলে তিনি জানিতেন না। জীবনে কখনও কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করেন নাই। কোন গুরুতর অপ-

* মাসিক বেতন।

রাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতিও যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিতেন। ভারতেশ্বরীর রাজ্যে শত দোষী ব্যক্তি অব্যাহতি পাউক, কিন্তু একজন নির্দ্দোষও যেন দণ্ডিত না হয়, এই ভাব মনে রাখিয়া তিনি সর্ব্বদা কার্য্য করিতেন। এইজন্য ছোট বড় সকলেই তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। ঢাকার নবাব আব্দুল গনি কে, সি, এস্, আই, ভাওয়ালের রাজা কালীনারায়ণ রায় বাহাদুর, ভাগ্যকুলের রাজা শ্রীযুত শ্রীনাথ রায় বাহাদুর ও এতদ্দেশীয় যাবতীয় জমীদারের সঙ্গেই তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব ছিল।

দরিদ্র দীন দুঃখীর প্রতি কালীকান্তের বিশেষ সহানুভূতি ছিল। কোন দরিদ্র সন্তান কার্য্যপ্রার্থী কি সাহায্যার্থী হইয়া তাঁহার নিকট আসিলে তিনি পার্য্যমাণে কাহাকেও বিমুখ করিতেন না। উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণের নিকট অনুরোধ করিয়া কার্য্যের সংস্থান করিয়া দিতেন। পাঠার্থী অনেক দরিদ্র ভদ্র সন্তানকে বাসায় রাখিয়া ভরণ পোষণ করিতেন। এইজন্য জীবনে কিছু মাত্র অর্থ সংস্থান করেন নাই এবং প্রয়োজনও বোধ করেন নাই। ন্যায়োপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা লোকের উপকার করাই পরম ধর্ম্ম মনে করিতেন। তাঁহার আশ্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই পোলিষ বিভাগে কার্য্য করিয়া বর্ত্তমানে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন ও কেহ কেহ পোলিষ ইন্স্পেক্টার পর্য্যন্ত হইয়াছেন।

১২৮৫ সনে কালীকান্ত ৪১ বৎসর কার্য্য করিয়া ৬৫ বৎসর বয়সে কার্য্য হইতে অবসর ও পেন্শান্ গ্রহণ করেন। অনেক দিবস পূর্ব্ব হইতেই অবসর গ্রহণ করিবার মনন করিয়া আসিতেছিলেন। ঐ সময় পর্য্যন্ত তাঁহার পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী জীবিতা ছিলেন। কালীকান্ত পেন্শান্ গ্রহণ করিবে, এই কথা শুনিলে মাতাঠাকুরাণী অত্যন্ত কাঁদিতেন, কারণ তাঁহার ধারণা ছিল যে, পেন্শান্ লইলে কালীকান্ত আর বেশী দিন বাঁচিবে না। এইজন্য মাতাঠাকুরাণী যে পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন, সে পর্য্যন্ত কালীকান্ত পেন্শান্ লওয়ার মত প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী ১০৫ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করিলে পর তিনি পেন্শান্ গ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি আর এদেশে বেশী দিন থাকেন নাই। তাঁহার পরিচিত বন্ধু বান্ধবের মধ্যে যাঁহারা সমৃদ্ধিশালী, তাঁহারা অনেকেই তাঁহাদের জমীদারীর ম্যানেজার হইয়া থাকিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু কালীকান্ত তাহা স্বীকার করেন নাই। বৈষয়িক দুশ্চিন্তা, সাংসারিক ব্যাপার হইতে দূরে থাকিয়া পরমার্থ চিন্তার জন্য, পেন্শান্ নেওয়ার কয়েক মাস পরেই, কাশীধামে চলিয়া যান।

জীবনের অবশিষ্ট ২০ বৎসর কাল কাশীতেই অতিবাহিত করেন। এই ২০ বৎসরের মধ্যে তিনি এ দেশে বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে বহু লোকের অনুরোধে কয়েক দিবসের জন্য একবার মাত্র আসিয়াছিলেন, আর আসেন নাই। জীবনের অবশিষ্ট কাল অত্যন্ত নিরীহ ভাবে যাপন করিতেন। আহারাদি বেশ ভূষা যৎসামান্য, শরীর ধারণোপযোগী মাত্র ছিল। এক মাত্র পুত্র তরণীকান্ত তখন নাবালক। সংসারে উপার্জ্জনশীল আর কেহ ছিল না। তিনি পেন্শানের টাকার অর্দ্ধাংশ ঢাকাতে সাংসারিক খরচ বাবদ পাঠাইতেন। অপর অর্দ্ধাংশ হইতে নিজের গ্রাসাচ্ছাদানোপযোগী যৎসামান্য রাখিয়া অবশিষ্ট দীন দরিদ্রদিগকে দান করিতেন। তীর্থ পর্য্যটন উপলক্ষে অথবা অন্য কোন কারণে এতদ্দেশীয় লোক কাশীধাম গেলে প্রায় সকলেই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিতেন। তিনিও দেশীয় লোক দেখিলে অত্যন্ত সুখী হইতেন। ঐ স্থানের অবস্থা ও লোকের রীতি নীতি অবগত করাইয়া ও তাঁহাদের বাসের জন্য নিরাপদ স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিতেন। সময় সময় এতদ্দেশীয় কোন কোন লোক কাশীধামে গুণ্ডার হাতে পড়িয়া বিপদ্গ্রস্ত হইতেন। তিনি জানিতে পারিয়া, ঐরূপ অনেক লোককে এই ভীষণ বিপদ হইতে মুক্তিদান করিয়াছেন। তত্রত্য পোলিষ বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারিগণ সকলেই কালীকান্তকে চিনিতেন এবং বেরোয়া পোলিষ কর্ম্মচারী বলিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। নিরপেক্ষ ও নির্লোভ বলিয়া কাশীধামেও তাঁহার বিলক্ষণ সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল।

কালীকান্ত জীবনে সুখী হইতে পারেন নাই। শৈশবে দরিদ্রতা, পিতৃবিয়োগ, ক্রমে ভ্রাতৃগণের অভাব, ক্রমান্বয়ে দুই বিবাহ ও দুই স্ত্রীর অভাব, অকালে জ্যেষ্ঠ পুত্র বিয়োগ, দৌহিত্র বিয়োগ, কনিষ্ঠা কন্যা ও দৌহিত্রীর অকাল বৈধব্য ইত্যাদির জন্য তিনি শোকে জর্জ্জরিত ছিলেন। বৈষয়িক জীবনেও সুখী হইতে পারেন নাই, কঠিন কঠিন তদন্ত উপলক্ষে সর্ব্বদাই জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে

হইত। যাঁহার পরোপকারের বিষয় মনে করিয়া অসংখ্য লোকে যাঁহার নাম প্রাতে স্মরণ করে, যাঁহার নির্লোভতা ও সাধু ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া লোকে যাঁহার জন্য এখনও ক্রন্দন করে, ভগবান তাঁহাকে কেন সুখী করিলেন না, তিনিই জানেন।

১৩০৫ সনের ১৬ই বৈশাখে কালীকান্ত ৮৫ বৎসর বয়সে স্বর্গধাম গমন করেন। দুই দিবস পূর্ব্বে সামান্য জ্বর হয়, দ্বিতীয় দিবস জ্বর ভোগ করিয়া সন্ধ্যার সময় এ নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন।

মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার যে ফটো তোলা হইয়াছিল, সেই প্রতিমূর্ত্তি এখানে দেওয়া গেল।

অভাগিনী।

১

কেন অন্ধকার হইল সংসার ?
আকাশে ছাযিল জলদ জাল।
জনক চিন্তিত, জননী শঙ্কিত,
আইল আমার বিবাহ-কাল।

বৃদ্ধা মাতামহী গর্জ্জে যেন অহি,
নয়নে নয়নে সতত রাখে ;
নদীর কিনারে বাগানের ধারে
কে কোথায় যদি লুকায়ে থাকে।

***

ঝম্ ঝম্ ঝম বরষা বিষম,
পলে পলে যেন আকাশ গলে।
চপলা ছলিছে, কুলিশ খলিছে,
দাপটে ঝাপটে ঝটিকা চলে।

দিক আকুলিয়া মেঘ ঘনাইয়া,
ভিজে দাঁড়াইয়া তরুর সারি।
কলসী লইয়া বন পথ দিয়া
ধীরে ধীরে যাই আনিতে বারি।

ছি ছি ছি, কুমার, কি রীতি তোমার,
আমি তব ক্ষুদ্র প্রজার মেয়ে।
এমন করিয়া আঁচল ধরিয়া
টানিতে কি আছে একেলা পেয়ে ?

"কি ভয, সুন্দরী, এই পথ ধরি
চল দেশান্তরে পলায়ে যাই—"
ছাড়, কাজে যাব, এখনি চেঁচাব,
ছি ছি ছি তোমার সরম নাই।

***

মেঘ পরিষ্কার, শুভ্র চারি ধার,
নীরব নিসুপ্তি গভীর যাম।
মরি ভয়ে লাজে, কেন বাঁশী বাজে
শ্বসিয়া শ্বসিয়া আমার নাম।

দূরে পিকবর, শেফালি সৌরভ,
জোছনা হাসিছে আকাশময়।
জাগে যদি আই কি বলিবে ছাই,
ছি ছি অপমানে নাহি কি ভয় ?

"কৌট ভরপুর এনেছি সিন্দূর—"
কি বিষম জ্বালা হইল মোর।
"হরিণী-নয়না", তুমি তো জান না
কত করী-বল নয়নে তোর।

"তোমারি লাগিয়া জাগিয়া জাগিয়া
ভাবিয়া ভাবিয়া জীবন আছে—"
যাও, ঘরে যাও, একি—যেতে দাও,
কালি জানাইব রাজার কাছে।

***

অমা-অন্ধকার, স্তব্ধ চারি ধার,
ধরণী আবৃত কুয়াসা-বাসে ;
আকাশ মলিন, ঝরিছে তুহিন,
শিশু ভাই দুটি ঘুমায় পাশে।

বহে হুহু ঘন তীখণ পবন,
রোগে শীতে আই বিকল-প্রায় ;
রুদ্ধ বাতায়নে সেই ক্ষণে ক্ষণে
মৃদু করাঘাত—ছি ছি কি দায় !

কেন এত ছল— করিবে পাগল,
দেশে কি থাকিতে দিবে না ছাই ?
"রোষ পরিহরি দেখ লো সুন্দরি,
মরিবার মম বিলম্ব নাই।"

বল, কিবা চাও ? না না, ঘরে যাও,
পাগলের মত বকিছ কেন ?
দিব্য দেবতার — এই পথে আর
কভু যদি এসো, মরিব জেনে ।

***

ফুলে ফুলময় দিক সমুদয়,
মধুর মলয় বহিছে ধীরে ,
শির্ শির্ শির ঝরিছে শিশির,
কালো মেঘ আলো শিখরী শিরে ।

ভ্রমর গুঞ্জন, খঞ্জন-নর্ত্তন,
নবীন তপন আরক্ত আঁখি ,
চারিদিকে মত্ত কুহু কুহু কুহু
নারী-কুলমান গরবে রাখি ।



বনে বনে বুলি, ফুল তুলি তুলি
গাঁথিয়া গাঁথিয়া কবরী বেড়ি ,
বসি নদী-কূলে ভুলে ভুলে ভুলে
আপনার ছায়া আপনি হেরি ।

লতার দোলনে দুলি আনমনে,
কভু পথপানে চাহিয়া থাকি ,
চেয়ে চেয়ে চেয়ে, গেয়ে গেয়ে গেয়ে
কে জানে কখন সজল আঁখি ।

দীর্ঘ অতি দিন, তরু পুষ্পহীন,
নীরস বিবশ লতিকা কায় ,
পিক ভগ্নস্বর, অরণ্য ধূসর,
শ্বসিয়া দহিয়া বহিছে বায় ।

সাদা মেঘরাশ ভরিছে আকাশ,
তপন কিরণ প্রখর অতি ,
হরিণী শ্বসিছে, শকুন ভাসিছে,
বহিছে তটিনী অলস-গতি ।

কবে রণ শেষ । এসগো, প্রাণেশ,
কত ছলে আর আপনে ছলি !
মরমে মরিয়া কাঁদি গুমরিয়া
কারে ডাক ছেড়ে এ জ্বালা বলি !

এত বুঝ রণ, শাসন পালন,
রমণীর মন বুঝ না নাথ !
মুখে বলে যাক, প্রাণে বলে থাক,
আকুল আহ্বান ভ্রূকুটি সাথ ।

২

আইল বরষা চাতকী ভরসা,
ছুটিল তটিনী গভীর রোল
জলদ গর্জ্জিছে, ঝরিছে, থামিছে,
ফিরিছে কুমার পড়িল গোল ।

ফিরিছে বিজয়ী নববধূ লয়ি,
গলে মুক্তামালা, কিরীট শিরে ।
কাতারে কাতার ঘেরিয়া দুধার
গজ বাজি সেনা চলিছে ধীরে ।

সাজিয়া সুবেশে সবে দ্বারদেশে,
কেহ বা মঙ্গল কলস ল'য়ে ,
বাজে শঙ্খ ঘন, পুষ্প বরিষণ,
কেহ বা দেখিছে অবাক্ হ'য়ে ।

দুখে অভিমানে, কি জানি কি প্রাণে,
দাঁড়ায়ে বালিকা তরুর তলে।
নবীন দম্পতী প্রীতিফুল্ল অতি,
চড়ি শ্বেতকরী গরবে চলে।

কহিল কুমার বধূরে তাহার—
"দেখ প্রাণপ্রিয়া", দেখিল রাণী।
সকলে প্রণমে, নীরবে সম্ভ্রমে
বালিকার গেল বুড়িয়া পাণি।

"এই সে রমণী!" কি কঠোর ধ্বনি!
প্রতিধ্বনি বুকে শিহরে ত্রাসে।
শুকাইল মুখ, প্রভাত কিংশুক,
নয়নের জল উছলি আসে।

কি দৃষ্টি ভীষণ!— জ্বলিছে নয়ন।
কি ঘৃণার হাসি অধর ভরি!
স্তব্ধ সমীরণ, বিলুপ্ত তপন,
পদতলে ধরা যেতেছে সরি।

কাঁপে থর থর নীরস অধর,
হৃদয়ের রক্ত মাথায় ছুটে।
"ক্ষম, মহারাণি!" ফুটিল না বাণী,
শ্বসিল গভীর, পড়িল লুটে।

***

কখন বকুল, এক রাশি ফুল
একখানি ছায়া বিছায়ে দিল!
কে জানে কখন, বিষণ্ণ পবন
শ্লথ কেশ বাস গুছায়ে দিল!
কে জানে কখন সায়হ্ন তপন
কপোলের অশ্রু মুছায়ে দিল!

***

চলেছে দম্পতী প্রীতিফুল্ল অতি,
গজ বাজি সেনা চলিছে ঘেরি;
উঠে জয়নাদ, শুভ আশীর্ব্বাদ,
উড়িছে নিশান, বাজিছে ভেরি।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

আবহ ও চন্দ্র সূর্য্য।

গত কার্ত্তিক মাসের "প্রদীপে" "বায়ুনভো-বিদ্যা" নামক একটি প্রবন্ধের নাম পড়িয়া, উহা কি বিদ্যা, তাহা জানিবার ইচ্ছা হয়। সমস্ত প্রবন্ধটি পড়িয়া তৎসম্বন্ধে দুই এক কথা লিখিতে প্রবৃত্তি জন্মিতেছে।

আমাদের দেশে স্থলবিশেষে এই প্রবৃত্তি বিপত্তি জন্মায়। কেহ কেহ মতবৈষম্য আদৌ সহ্য করিতে পারেন না, এবং তাঁহাদের কোন মত লইয়া তর্ক করিলে তাঁহারা মনে করেন যে, তাঁহাদিগকে অশ্রদ্ধা করা হইতেছে। ইহা যে সম্পূর্ণ ভুল, আশা করি তাহা বায়ুনভোবিদ্যা-লেখকও স্বীকার করিবেন।

এই ভূমিকা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, বায়ুনভোবিদ্যা-লেখকের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত মত প্রকাশ করিতে যাইতেছি। অন্ততঃ লেখকের অনেক উক্তিতেই সন্দেহ করিতেছি।

প্রথমে, "বায়ুনভোবিদ্যা" নামটাতেই আপত্তি। জানি, বাঙ্গালায় কোন বৈজ্ঞানিক বিষয় লিখিতে গেলেই বাঙ্গালা পারিভাষিক শব্দের অত্যন্তাভাব বোধ করিতে হয়। অনেক স্থলে নুতন শব্দ রচনা করিতে হয়, কিংবা যাহা এক শব্দে ব্যক্ত হইত, তাহা প্রকাশের নিমিত্ত অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া বলিতে হয়। বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ রচনা করা আদৌ সহজ নহে। ইংরাজি পড়িয়া পড়িয়া এক একটা শব্দ আমাদের এমন হইয়া গিয়াছে যে, মনে হয় যেন তাহার কোন বাঙ্গালা প্রতিশব্দ হইতে পারে না। অথচ বাঙ্গালা প্রতিশব্দ চাই। নূতন শব্দ রচনার সময় রচয়িতার দায়িত্ব মনে পড়ে। দায়িত্ব-জ্ঞান-হীন হইয়া সমাজে ভাববিশেষ প্রবেশ করাইতে নাই, তেমনই বিশেষ ভাব ব্যঞ্জক শব্দ প্রবেশ করানও উচিত নয়। এক শব্দ "বায়ু" জানি, অপর শব্দ "নভ:" জানি। কিন্তু উভয়ের সমবায়ে উৎপন্ন বায়ু-নভঃ কি বস্তু, তাহা জানি না। প্রবন্ধটি পড়িয়া বুঝিতেছি, 'বায়ুনভোবিদ্যা' অর্থে লেখক আবহবিদ্যা করিয়াছেন। এই নামটাও নুতন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে আমার রচিত নহে। প্রাচীনেরা আবহ অর্থে atmosphere বুঝিতেন। উহার নামান্তর ভূবায়ু, সামান্যতঃ বায়ু।

প্রবন্ধের প্রথম পংক্তিতেই আবার আর দুইটি শব্দ পাইলাম। "বায়ু ও আকাশের উচ্ছৃঙ্খল পরিবর্ত্তন"—বায়ু কি, আকাশ কি? বোধ হয় লেখক নভস্ শব্দের প্রতিশব্দ আকাশ ব্যবহার করিয়াছেন। তাহা হইলে, বায়ুনভোবিদ্যা অর্থে বায়ু ও আকাশ বিষয়ক বিদ্যা বুঝিতে হইবে। কিন্তু শূন্য আকাশ বিষয়ে কি বিদ্যা হইয়াছে, জানি না। অবশ্য এখানে আকাশ অর্থে পাশ্চাত্য ঈথর হইতে পারে না। যাহাই হউক, উহাদের "উচ্ছৃঙ্খল পরিবর্ত্তন" লিখিতে লিখিতে এক পংক্তি পরে লেখক বলিতেছেন, "চির নিয়মিত বিশ্বের কার্য্যের এই বিশৃঙ্খলা."

"পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে দুইবার পূর্ণাবর্ত্তন করিয়া"—এস্থলে প্রাচীনেরা আবর্ত্তন শব্দ প্রয়োগ করিতেন না। আবর্ত্তন অর্থে rotation, পরিবর্ত্ত ও প্রদক্ষিণ অর্থে revolution আছে।

"নির্ম্মল শারদীয়া রজনীতে পূর্ণচন্দ্রের আবির্ভাবে বাতব্যাধিক্লিষ্টের বেদনা বৃদ্ধি" হয়। বাতব্যাধি অর্থে কবিরাজ মহাশয়েরা আক্ষেপ, পক্ষাঘাত প্রভৃতি বহুবিধ পীড়া গণনা করেন। যাহা হউক, যদি সামান্য বাতের (আমবাত) পীড়া ধরা যায়, তাহা হইলেও "নির্ম্মল, শারদীয়া রজনীর" পূর্ণিমা তিথিতেই যে ঐ রোগের বৃদ্ধি হয়, এমন ত নয়। শরৎকালের কেন, বর্ষাকালের মেঘাচ্ছন্ন পূর্ণিমাতেও নাকি বৃদ্ধি হয়। পূর্ণিমা কেন, অমাবস্যা তিথিতেও নাকি বৃদ্ধি হয়। আমি চিকিৎসক নই, এবং কোন্ তিথিতে ঐ রোগের বৃদ্ধি বা ক্ষতি হয়, বলিতে পারি না।

"বিষুব প্রদেশে" দুইটী বৃহৎ বায়ুপ্রবাহ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে।



শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার বড়াল।

KUNTALINE PRESS.

এখানে বোধ হয় লেখক নিরক্ষ প্রদেশ মনে করিয়াছেন। বিষুবন্ মণ্ডল আকাশে, নিরক্ষ মণ্ডল ভূপৃষ্ঠে। বিষু—দিবারাত্রির সমতা হয় বলিয়া বিষুবন্ ; অক্ষ—ক্ষিতিজ (horizon) হইতে অক্ষোন্নতি (elevation of the polar axis) থাকে না বলিয়া নিরক্ষ। উপরের ভুলটি অনেকে করিয়া থাকেন, অথচ তাঁহারাই অক্ষাংশ শব্দটি ঠিক প্রয়োগ করেন।

এই সকল শব্দ বিচার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে করিতে দিয়া এখন মত বিচার করা যাইতেছে। লেখক বলেন, "দুই বৎসর পূর্ব্বে বর্ষাকালে, ভারতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়াছিল।" এ বৎসর ১৩০৭ সাল। দুই বৎসর পূর্ব্বে ১৩০৫ সালে (১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে) "ভারতে" যদি প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়াছিল, তবে মধ্যভারতের দুর্ভিক্ষের কারণ কি ছিল? অবশ্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হইলেও শস্য হানি হইতে পারে। শস্যের নিমিত্ত বৃষ্টিপাত প্রচুর হইলেই চলে না, সাময়িক হওয়া চাই। নতুবা গত পূজার সময় যে ঘোর বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে বঙ্গদেশের শস্যের অমঙ্গল না হইয়া মঙ্গল হইত। কেবল বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইলেও বঙ্গদেশের কৃষকেরা সন্তুষ্ট হয় না। আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে দুই এক পসলা না হইলে ধানের ক্ষতি হয়! বস্তুতঃ আবশ্যক সময়ে, আবশ্যক পরিমাণে বৃষ্টি না হইলেই দেশে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হয়। এ বৎসর বঙ্গদেশে মোটের উপর বৃষ্টি কম হয় নাই, অথচ লেখক বলেন, "এ বৎসর প্রচুর বর্ষাভাবে লোকে দুর্ভিক্ষের বিভীষিকা দেখিতেছে।" এখানে লেখক বঙ্গদেশ ছাড়িয়া সমগ্র ভারতখণ্ড মনে করিয়াছেন কি না, বলিতে পারি না।

লেখক বলেন, "স্মরণীয শারদীয়া পঞ্চমীতে প্রলয় সহচর ঝঞ্ঝাবাতের ভীম হুহুঙ্কারে বঙ্গদেশ কেন স্তম্ভিত হইয়াছিল, কিছুকাল পূর্ব্বে বিজ্ঞানবিদ্গণ এই সকল সরল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেন না।" কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এখনই কি উত্তর দিতে পারিয়াছেন? আবহবিদ্যা এখনও বিজ্ঞান পদবীতে উঠিতে পারে নাই। গত বৎসর শারদীয়া পঞ্চমীতে বঙ্গদেশে ঝড় হয় নাই ; এ বৎসর কেন হইল, তাহা কে বলিতে পারিয়াছেন? প্রশ্নটা সরল হইলে এতদিন উত্তর পাওয়া যাইত। "আধুনিক দার্শনিকগণ" (বোধ হয়, বাঙ্গালায়, বৈজ্ঞানিকগণ) কোন উত্তর দিতে পারিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। জানি না, কোন্ "দার্শনিকগণ" বর্ষাবাতাদির সূক্ষ্ম কার্য্য কারণ অবগত হইয়া আগামী বর্ষের বর্ষাবাতাদির সম্ভাবনা বলিয়া দিতে পারেন। অন্ততঃ দুই চারি জনের নাম পাইলেও আশা হইত। লেখক কিন্তু নিজেই সন্দিহান্ আছেন। তাই লিখিয়াছেন, "বায়ুনভোবিদ্যার বোধ হয় অদ্যাপি শৈশবকাল উত্তীর্ণ হয় নাই।"

লেখক বলেন, "অমাবস্যা বা পূর্ণিমার নিকটবর্ত্তী তিথিতে" মেঘ বা বৃষ্টি হইলে আকাশ শীঘ্র পরিষ্কার হয় না। তাঁহার মতে, এই বিশ্বাসে কৃষিজীবিগণ "তৎকালে" হল চালনা করে না। ইহা ঠিক কি? আমাদের বার মাসে তের পার্ব্বণ,—এই পার্ব্বণের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই কি? এ বৎসরের পাঁজিতে দেখিতে পাই, হলচালনার নিমিত্ত মোটে ১৯টি দিনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বঙ্গদেশে পূর্ণিমা তিথিতে হল চালনা হয় কি না, স্মরণ হইতেছে না। ওড়িশা দেশে পূর্ণিমা তিথি গ্রাহ্য হয় না, কেবল অমাবস্যা দিনে কৃষকেরা হল চালনা করে না। কিন্তু তেমনই কৃষ্ণ ও শুক্ল একাদশীতেও হল চালনা নিষিদ্ধ। দেশভেদে বিধি ব্যবহার প্রভেদ হইতে পারে। এবিষয়ে কৃষি পারাশারি কি বলেন, তাহা ভাবিবার বিষয়।

লেখক বলেন, বায়ুনভোবিদ্গণের মতে চন্দ্র যখন রবি মার্গে আসেন, তখনই বায়ুর জলীয় বাষ্পের উপর চন্দ্রের প্রভাব স্পষ্ট লক্ষিত হয়।—কি প্রকারে এই প্রভাব লক্ষিত হইতে পারে, লেখক তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। বলিলে, এদেশের আবহের প্রতি চন্দ্রের প্রভাব লক্ষ করিতে চেষ্টা করা যাইত। প্রতি মাসে অন্ততঃ দুইবার এই প্রভাব লক্ষ করিবার কথা। সুতরাং পাঁজির সহিত আবহের জলীয় বাষ্পের অবস্থা তুলনা করা কঠিন হইত না। আশা করি, লেখক এই বিষয়টা আরও স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন, কিংবা জলীয় বাষ্পের উপর চন্দ্রের প্রভাব অন্ততঃ এদেশে দেখা যায় কি না, তাহার অনুসন্ধান করিবেন। আমি কতক কতক বিশ্বাস করি, তিথির সহিত আবহের কিছু সম্বন্ধ আছে। কিন্তু এই সম্বন্ধ অনুসন্ধান করিবার সুযোগ বা অবসর পাই নাই। এদেশের অনেকের নিকট এই প্রকার সম্বন্ধের কথা শুনিতে পাই। কিন্তু প্রমাণসহ সম্বন্ধের বিশ্লেষণ পাই না। তাই বিশ্বাস অবিশ্বাসের মূল্য কিছু নাই।

লেখক বলেন, "ক্রান্তিপাত সময়ে"—(বিশুদ্ধ দিনে) চন্দ্রের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। তাহা হইলে ২১ মার্চ্চ ও ২২ সেপ্টেম্বর দিবসে আবহের কিছু না কিছু উৎপাত ঘটিবার সম্ভাবনা। কিন্তু ইহার কি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে? বোধ হয়, ভুল বুঝিলাম। লেখক বলেন, বিশুদ্ধ দিনে "চন্দ্র রবি মার্গস্থ হইলেই, আকাশের অবস্থা পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।" তাহা হইলে ত চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ সম্ভাবনা হইবে। অতএব চৈত্রে আশ্বিন মাসে গ্রহণ সময়ে ঐ প্রভাব লক্ষ করিবার কথা। কিন্তু কি লক্ষ্য, তাহাই বুঝিলাম না। সমুদ্রের জোয়ার ভাটা দেখিয়াই মনে হয়, চন্দ্র কর্তৃক আবহেরও জোয়ার ভাটা হইয়া থাকে ; কিন্তু মনে করা এক, আর প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা সিদ্ধ করা আর এক। সমুদ্রের জোয়ার ভাটা প্রতিদিনই দেখিতে পাই, আবহের জোয়ার ভাটার কোন নিদর্শন পাই না। বায়ু চাপের দৈনন্দিন হ্রাস বৃদ্ধির সহিত চন্দ্রের স্থিতির সম্বন্ধ আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিছু না কিছু সম্বন্ধ আছে, তাহা অবশ্য বিশ্বাস করিতে হইবে। কিন্তু ফল কতটুকু ও কি প্রকারের, তাহা না জানিলে বিশ্বাসটা অন্ধবিশ্বাসের প্রায় তুল্য হয়। এই সম্বন্ধ স্বীকারের বিরুদ্ধে একটা প্রধান আপত্তি এই যে, একই সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র না হউক, অন্ততঃ বহু স্থানে চন্দ্রের ফলে আবহের অবস্থা এক হইত। কিন্তু এ পাড়ায় বৃষ্টি হইলে ও পাড়ায় হইবে, এমন কথা নাই ; মান্দ্রাজ উপকূলে ঝড় বহিলে নিকটবর্ত্তী ওড়িশায় ঝড় বহিবে, এমন দেখা যায় না। এখানে অমাবস্যার দিন ঘোর বৃষ্টি হইলে, ওখানে হইবে এমন নিয়ম দেখা যায় না। অথচ অমাবস্যা এখানেও বটে, ওখানেও বটে। বস্তুতঃ লেখক বিষয়টি যত সহজ বা সরল মনে করিয়াছেন, আমি তত দুরূহ ও জটিল মনে করিতেছি।

লেখক বলেন, বিজ্ঞানবিদ্গণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, সূর্য্য হইতে দুই জাতীয় তেজঃ বিকীর্ণ হইতেছে। সেই দুই জাতীয় তেজের ধর্ম্ম বিভিন্ন।—কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্গণের কথা না তুলিয়া জানিতে চাই কোন্ বৈজ্ঞানিক সূর্য্য কিরণকে এমন বিশ্লেষণ করিয়াছেন? দুই জাতীয় কি বহুজাতীয়,—তাহারই বা কি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে?

সূর্য্য হইতে বিকীর্ণ কিরণের হ্রাসবৃদ্ধি দেখা যায়। কিন্তু তাহা উষ্ণতামান যন্ত্র ব্যতীত দূরবীক্ষণে জানা যায় বলিয়া শুনি নাই। সে যাই হউক, সূর্য্যবিম্বে কখন কখন কৃষ্ণ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল চিহ্নের কারণ যাহাই হউক, উহাদের আবির্ভাবের সহিত "প্রাকৃতিক উৎপাতের" সম্বন্ধ সকলে স্বীকার করেন না। যতদূর মনে হইতেছে, প্রথমে উল্ ফ (Wolf) সাহেব সৌর কলঙ্কের আবির্ভাব কালের সহিত ঝড় বৃষ্টির সম্বন্ধ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন, প্রতি ১১ বৎসর অন্তর সৌর বিম্বে কলঙ্কের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। কিন্তু এই আনুমানিক নিয়ম (?) গত ও বর্ত্তমান সৌরকলঙ্কের হ্রাসের সময় ভঙ্গ হইয়াছে। অর্থাৎ যে সময়ে কৃষ্ণচিহ্ন না দেখিবার কথা, সে সময়ে দেখা গিয়াছে। মোটামুটি হিসাবে বোধ হয় নিয়মটা ঠিক। কিন্তু উপরে বলিয়াছি, সৌর কলঙ্কের দৃশ্যতাদৃশ্যতার সহিত আবহের ভিন্নতা সকলে স্বীকার করেন না। স্বীকার না করিবার কারণ আছে, পরে বলা যাইবে।

লেখক বলেন, "বায়ু প্রবাহের উৎপত্তি ও বর্ষণাদি ব্যাপার বায়ুচাপ দ্বারাও কতকটা নিয়ন্ত্রিত হয়।"—আমরা কিন্তু বাল্যকাল হইতে

শুনিয়া আসিতেছি যে, বায়ুচাপবৈষম্যই বাতাসের কারণ। তবে, বায়ুচাপ সকল সময় কেন সমান থাকে না, তাহা মোটামুটি জানা থাকিলেও সূক্ষ্মরূপে জানা নাই। লেখকের ভাষায়, "শারদীয়া পঞ্চমী তিথি আসিল নীরবে ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিতেছে, গ্রহ নক্ষত্র পর্ব্বত সাগরাদির অবস্থানের ত কোন বৈলক্ষণ হয় নাই,—তবে কেন সেই স্মরণীয় শারদীয়া পঞ্চমীতে প্রলয়-সহচর ঝঞ্ঝাবাতের ভীম হুহুঙ্কারে বঙ্গদেশ স্তম্ভিত হইয়াছিল?" আমিও সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। সেই শারদীয়া পঞ্চমী তিথিতেই কি সৌরকলঙ্ক বহির্গত হইয়াছিল? তাহা হইলে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই "ঝঞ্ঝাবাতের ভীম হুহুঙ্কারে স্তম্ভিত" হয় নাই কেন? আশ্বিন শুক্লপঞ্চমী ২৯ সেপ্টেম্বর গিয়াছে। কিন্তু সে দিন ত কোন সৌরকলঙ্ক দেখা যায় নাই। যখনই সৌরবিম্বে কলঙ্ক প্রকাশিত হয়, তখনই কিংবা তাহার পরেও ত "ঝঞ্ঝাবাতের ভীম হুহুঙ্কারে বঙ্গদেশ স্তম্ভিত হয় না। সেপ্টেম্বর শেষ হইয়া অক্টোবর মাসের ৭ই তারিখে নিষ্কলঙ্ক সৌরবিম্বে অনেক দিনের পর কলঙ্ক দৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু কই গত অক্টোবর মাসে ঝড় বৃষ্টির ত চিহ্নমাত্র দেখা যায় নাই। ১৬ই অক্টোবর আবার আর কতকগুলি কলঙ্ক প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু তখনও ঝড় বৃষ্টির সংবাদ পাই নাই।

চুম্বক শলাকার একটু আধটু বলন (variation) প্রতিদিন হইয়া থাকে, কিন্তু সৌরবিম্বে ত প্রতিদিন কলঙ্ক দেখিতে পাই না। চুম্বকশলাকার বলনের কারণ সম্বন্ধে, বোধ করি, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও 'যে তিমিরে সেই তিমিরেই' আছেন। অন্ততঃ কোলাবা মানমন্দিরের অধ্যক্ষগণ সৌর কলঙ্কের আবির্ভাব তিরোভাবের সহিত চুম্বকশলাকার দৈনন্দিন বলনের কোন সম্বন্ধ খুঁজিয়া পান নাই। "অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈবী উৎপাত" সকলের মূলে যে সৌরশক্তি বর্ত্তমান তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। কিন্তু সৌরশক্তি প্রকৃত কি বিকৃত, তাহা বিপর্য্যস্ত চৌম্বক শক্তি, কি তাড়িত শক্তি, কি অন্য কোন অজ্ঞাত শক্তি, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় কি? লেখক বলেন, "অনিয়মিত প্রবল ঝটিকা ও আকস্মিক ঘূর্ণাবর্ত্তের উৎপত্তিতত্ত্বও স্থিরীকৃত হইয়াছে।" যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে জানিতে চাই ঢাকার প্রসিদ্ধ ঘূর্ণী ঝড়ের (tornado) কারণ কি ছিল? আবও দেখুন, বিক্রমপুরে দুইবার ঘূর্ণী ঝড় বহিয়া গেল, কিন্তু বঙ্গদেশের অনেক স্থানে একবারও বহিল না।

শেষে লেখক লিখিয়াছেন, "ভারত গবর্ণমেণ্টও আমাদের কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের মঙ্গলার্থ কয়েকজন পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া যাহাতে আকাশের ভবিষ্যাবস্থা, উল্লিখিত পদ্ধতিক্রমে পূর্ব্বেই স্থিরীকৃত হইয়া সাধারণে প্রচারিত হয়, তাহার সুব্যবস্থা রাখিয়াছেন।"—কিন্তু জানি, এক কোলাবা মানমন্দির ব্যতীত ভারতের অপর কোন আবহ মানমন্দিরে পৃথিবীর চৌম্বকত্বের পরিমাণ বিষয়ে কোন চেষ্টা হয় না, এবং নিযুক্ত পণ্ডিতগণও চৌম্বকত্বের উপর নির্ভর না করিয়া পুরাতন উষ্ণতামান বায়ুচাপমান প্রভৃতি যন্ত্রাদি সাহায্যে "আকাশের ভবিষ্যাবস্থা" স্থির করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। জানি না, অধ্যাপক ইলিয়ট সাহেব সম্প্রতি এ বিষয়ে মনোযোগ করিয়াছেন কি না, চুম্বক শলাকার বলন কিংবা সৌরবিম্বে কলঙ্ক প্রকাশের সম্ভাবনায় তিনি ভারতের "আকাশের ভবিষ্যাবস্থা" পূর্ব্বেই স্থির করিতে পারেন কি না।

খ্রীঃ ১৮৫২ অব্দে স্যর ই, সেবাইন (Sir E. Sabine) পৃথিবীর অনেক স্থানের চৌম্বকত্ব তুলনা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, উহার হ্রাস বৃদ্ধির একটা কালানুক্রম (period) আছে। তদবধি বহু পরিদর্শনে জানা গিয়াছে যে, সৌরবিম্বে বৃহৎ কৃষ্ণ চিহ্ন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর চৌম্বকত্ব সংক্ষুব্ধ হয়। এই প্রকার সম্বন্ধ দেখিয়া কোন কোন বৈজ্ঞানিক (Meldrum, Balfour Stewart) মনে করেন যে, সৌরকলঙ্কের সহিত বাত্যাবর্ত্ত বৃষ্টিপাত আবহের উষ্ণতা চাপ ও আনুষঙ্গিক বন্যা দুর্ভিক্ষ দুর্ভিক্ষাদিরও সম্বন্ধ আছে।

কিন্তু উহাদের সহিত সৌরকলঙ্কের নিত্যসম্বন্ধতা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না। উপরে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা গিয়াছে। গত আশ্বিন মাসে কেবল বঙ্গদেশে ঝড় বৃষ্টি বন্যা হয় নাই, ভারত ছাড়িয়া ফ্রান্সের মধ্য ও দক্ষিণস্থ প্রদেশে সেই প্রকার প্রবল ঝড়, বন্যা ও জলপ্লাবন হইয়াছিল। অষ্ট্রিয়াতে, আইসলাণ্ডে ঝড়, ইটালীতে ঝড় বন্যা হইয়াছিল। বলিতে গেলে পৃথিবীর অনেক খানি স্থানে আবহের অবস্থা হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু এখন সৌরকলঙ্কাধিক্যের কাল নহে। যদি একাদশ বৎসর অন্তর কলঙ্কাধিক্য কাল ধরা যায়, তাহা হইলে ডাঃ উল্ফের নির্দ্দেশানুসারে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে এইরূপ আধিক্যকাল গিয়া ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে আবার আসিবার কথা। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সৌরকলঙ্কের প্রবল আবির্ভাবের লক্ষণ পাওয়া যাইতেছে না। এবৎসর যদি সৌরকলঙ্ক অধিক দেখা যাইত, তাহা হইলে ঝড় বৃষ্টি ও কলঙ্কের সম্বন্ধ কতকটা প্রমাণিত হইত। তাই বলি, ডাঃ স্কটের (Dr. Scott F. R. S.) কথাই ঠিক। ইনি ইংলণ্ডের আবহবিদ্যা সভার সম্পাদক ছিলেন। ইনি লিখিয়াছেন, "It can scarcely be said that the close relation between solar and terrestrial phenomena is capable of accurate demonstration."

অবশ্য এমন কেহ বলিবেন না যে, যাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, তাহা নাই বা হইতে পারে না। কোন বিষয় সত্য হইতে পারে, অথচ তাহার প্রমাণ দেওয়া সহজ হয় না। অন্ধ আলোর বর্ণভেদ দেখিতে পায় না বলিয়া বর্ণভেদ মিথ্যা হয় না। অবশ্য অন্ধের পক্ষে বর্ণভেদ নাই। এইরূপ কোন কোন বিষয় কাহারও নিকট সত্য, কাহারও নিকট মিথ্যা বোধ হইতে পারে। কিন্তু জড় বিজ্ঞানে এই প্রকার যুক্তি চলে না। প্রত্যক্ষসিদ্ধ ফল ব্যতীত ইঁহার উঁহার মত বা অনুমানকে বৈজ্ঞানিক মত বলিতে পারা যায় না।

আর একটি কথার উল্লেখ করিয়া এই বিষয় শেষ করা যাইতেছে। ইংলণ্ডে এমন কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা রবি শশী ছাড়িয়া অন্যান্য গ্রহের স্থিতি অনুসারে পার্থিব ব্যাপারের পরিণাম গণনা করিতে প্রয়াসী। পূর্ব্বকালে সকল দেশেই বোধ করি, জ্যোতিষ সংহিতা কোন না কোন আকারে বর্ত্তমান ছিল, এবং সেই ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত বিশ্বাস এখনও সকল দেশ হইতে লুপ্ত হয় নাই। আমাদের বরাহমিহির এ বিষয়ের অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার বৃহৎ সংহিতায় ও অন্যান্য জ্যোতিষীর সংহিতাগ্রন্থে পার্থিব ব্যাপারে গ্রহগণের প্রভাব সবিস্তরে বর্ণিত আছে। নক্ষত্র বিশেষে শুক্রের সঞ্চারে বৃষ্টি হয়, ইহা বৈদিক কাল হইতে এ পর্য্যন্ত অনেক লোক বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন। রোহিণী যোগ, আষাঢ়া যোগ, স্বাতী যোগ সম্বন্ধেও অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। একটি কথায় সকলে মনোযোগ করেন নাই। প্রাচীনেরা সৌরকলঙ্কের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন, এবং কেবল বিশ্বাস নহে, তাহার ফলাফলও লিখিয়া গিয়াছেন। বরাহমিহির লিখিয়াছেন, "সূর্য্যবিম্বে তামস কীলকের উদয়ে পানীয় জল কলুষ ও আকাশ ধূলিব্যাপ্ত হয়, এবং ধূলিময় পবন এমন প্রচণ্ড বহিতে থাকে যে, পর্ব্বত বৃক্ষাদির শিখর লুণ্ঠিত হইতে থাকে। তরুসমূহ ঋতু বিপরীত হয়, অর্থাৎ ঋতু অনুসারে ফল পুষ্প প্রসব করে না, আরণ্য পশু পক্ষী আকাশাভিমুখে পরুষরব করিতে থাকে, সূর্য্যোদয়াস্তকালে দিগ্‌দাহ অর্থাৎ আকাশ রক্তবর্ণ হয়, এবং বজ্রপাত ভূকম্পাদি উৎপাত ঘটিতে থাকে।" ইত্যাদি *

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

* প্রাচীনেরা তামসকীলক দ্বারা যে সূর্য্যবিম্বের কলঙ্ক বুঝিতেন, তাহা প্রতিপাদন করিবার অবসর এখানে নাই। এতদ্বিষয় মল্লিখিত "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" নামক গ্রন্থের প্রাকৃত জ্যোতিষ প্রস্তাবে আলোচনা করা গিয়াছে। গ্রন্থখানির মুদ্রণ এখনও শেষ হয় নাই।

ছায়াময়ী।

(গল্প)

১



প্রমোদরঞ্জন আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন। বহরমপুর কালেজ হইতে বি, এ, পাশ করিয়া এম, এ, পরীক্ষার জন্য তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন, সেই সময়ে তাঁহার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। তাহার পর উভয়ে অনেক দিন একত্র Law lecture শুনিতাম। সে অনেক দিনের কথা, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছিলাম, এমন সদাশয়তাপূর্ণ মধুর প্রকৃতি সচরাচর দেখা যায় না ; আমার সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হইয়াছিল।

অতঃপর অদৃষ্ট-স্রোত আমাদের দুজনকে দুদিকে লইয়া গেল। অবশেষে যৌবন-মধ্যাহ্ন আগত-প্রায় হইলে, দীর্ঘকাল পরে আমাদের উভয়ের পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইল ; প্রমোদরঞ্জন মুন্সেফ হইয়া বহরমপুরে আসিলেন, আমি তখন সেখানে ওকালতির ব্যবসায় খুলিয়া বসিয়া ছিলাম।

এতদিন পরে দেখা হইলেও আমাদের সেই পূর্ব্ব বন্ধুত্ব-বন্ধন শিথিল হয় নাই। আমাদের অতীত জীবনের পুরাতন কাহিনীর মধুর আলোচনায় আমরা কর্ম্মশ্রান্ত-দিবার অবসানে কত কর্ম্মহীন সন্ধ্যার আনন্দ অবসর ক্ষেপণ করিয়াছি। জননীর স্নেহময় ক্রোড়ে শয়ন করিয়া স্তন্য পানরত শিশুর যে আনন্দ ও তৃপ্তি, আমাদের সেই মধুর স্মৃতিচর্চ্চার আনন্দ ও তৃপ্তি তাহা অপেক্ষা অল্প ছিল না। কিন্তু তথাপি, সেই সুখ ও আনন্দের মধ্যেও প্রমোদকে মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত অন্যমনস্ক দেখিতাম, কোথা হইতে যেন কোন গুপ্ত চিন্তা আসিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া তুলিত। সে চিন্তা কি, তাহা আমি কোন দিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই ; পাছে তাঁহার হৃদয়ে কোন আঘাত লাগে এই ভয়েই জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হয় নাই।

বর্ষাকালে এক দিন সন্ধ্যার সময় অল্প অল্প বৃষ্টির মধ্যেই আমি প্রমোদ রঞ্জনের বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। এমন একটা নেশা জমিয়া গিয়াছিল যে—ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, মাথার উপর আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ুক, সন্ধ্যার সময় প্রমোদের সঙ্গে একটু আলাপ না করিলে সমস্ত দিনের পরিশ্রমটা যেন বুকের উপর জমাট বাঁধিয়া থাকিত, বন্ধুগৃহে গল্প ও গুড়ুক ভিন্ন সে শ্রান্তি বাষ্পজলে অপসারিত হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

হিন্দুস্থানী ভৃত্য রামদিন সংবাদ দিল বাবু তাঁহার শয়ন কক্ষে বিশ্রাম করিতেছেন। এমন সময় ত তিনি কোন দিন শয়ন কক্ষে থাকেন না! ব্যাপার কি বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু প্রমোদের কোন কক্ষ আমার নিকট দুর্গম ছিল না, বিশেষতঃ প্রমোদের স্ত্রী পদ্মাবতী তখন সেখানে ছিলেন না ; বহরমপুরে আসিয়া পদ্মাবতী হিষ্টীরিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমেই খারাপ হইয়া উঠিতেছিল, তাই প্রমোদ তাঁহাকে অল্পদিন মাত্র কাছে রাখিয়াই বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

আমি প্রমোদের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখি, তিনি বাতায়ন সন্নিকট শয্যার উপর বসিয়া উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছেন! সহসা তাঁহার এমন কি দুঃখ বা বিপদ হইল বুঝিতে না পারিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, বাহিরের দুর্য্যোগ অপেক্ষা ভিতরের দুর্য্যোগ আমার নিকট অধিকতর অপ্রীতিকর বোধ হইতে লাগিল। আমি কতক্ষণ চিত্রার্পিতের ন্যায় নিশ্চল রহিয়া অবশেষে সহানুভূতি পূর্ণ, উদ্বেগ বিচলিত কণ্ঠে বলিলাম, "প্রমোদ, তোমার মনে এমন কি গভীর দুঃখ ভাই? মনুষ্য জীবন দুঃখময়, কিন্তু সে দুঃখ সহ্য করাই মনুষ্যত্ব। আমি তোমার বন্ধু, তোমার দুঃখ কি আমার আছে প্রকাশ করিবার নহে? আমি মধ্যে মধ্যে তোমাকে আত্মবিস্মৃত হইতে দেখি, আমি বুঝিতে পারি ইহার কোন গুরুতর কারণ আছে।"

"আমার শোচনীয় কাহিনী শত্রুর নিকটও প্রকাশের অযোগ্য নহে।"—নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রমোদ বলিলেন, "আমি মহা অপরাধী, যৌবনের মোহে ভুলিয়া আমি একটি হতভাগিনী বালিকার নারীজীবন ব্যর্থ করিয়াছি, তাই সেই

* সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

অভাগিনী এতদিন পরেও ছায়াময়ী মূর্ত্তিতে প্রতিদিন আমার সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া নিরাশার আগুণে দগ্ধ হইতেছে, সে অদৃশ্য অগ্নির উত্তাপ অসহ্য ;—আমি ত ভাই আর বহরমপুরে বাস করিতে পারি না, আমার মস্তিষ্ক ক্রমেই বিকৃত হইয়া উঠিতেছে।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "ব্যাপার কি খুলিয়া বল। কিছু বুঝিতে পারিলাম না।"

একটা চাকর ঘরের মধ্যে বাতি জ্বালিয়া দিয়া গেল। বাহিরে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, ঝড় বৃষ্টির বেগ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। প্রমোদ সেই বর্ষা সলিল সিক্ত মুক্ত বাতায়ন পথে শত বজ্র ধ্বনিতে মেঘমণ্ডিত আকাশের দিকে চাহিয়া দেবলোকবাসিনী কোন পুণ্যময়ীর প্রেম জ্যোতির প্রত্যেক তরঙ্গ উদ্বেগম্লান নেত্রপুটে গ্রহণ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন ঃ—

২

"আমার বাবা অনেক দিন পূর্ব্বে এই জেলার কালেক্টরের সেরেস্তাদার ছিলেন। সেকালে কালেক্টরের সেরেস্তাদারগণই প্রকৃত প্রস্তাবে কালেক্টর ছিলেন, কালেক্টরগণ তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত হইতেন। বাবার অর্থ এবং ক্ষমতার অভাব ছিল না ; কাল পূর্ণ হইলে যখন তিনি পেন্সন লইয়া বাড়ী আসিয়া বসিলেন, তাহার বছর দুই পরে আমি আমাদের গ্রামের স্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স পাশ করিলাম।

বহরমপুরে আমাদের একটা বাসা ছিল, সেখানে থাকিয়া আমার এল, এ পড়িবার বন্দোবস্ত হইল। একালের মত সে সময়ে মফস্বলের সহরে এত 'মেস' ছিল না ; বিশেষতঃ আমার বাবার আত্ম সম্মানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল, আমাকে কোন বন্ধুর গৃহে রাখিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। চাকর ও পাচক ব্রাহ্মণ লইয়া আমি আমাদের বাসায় থাকিয়া পড়িতে লাগিলাম।

আমি যখন প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, সেই সময়ে একদিন এক জেলেনী আমাদের বাসায় মাছ বিক্রয় করিতে আসিল, আমার চাকর তখন বাসায় ছিল না। আমি তখন ঘরের মধ্যে বসিয়া ছিলাম, বাতায়ন পথে দেখিলাম জেলেনীর সঙ্গে বার তের বৎসরের একটি বালিকা, মেয়েটি পরম সুন্দরী। তাহাকে দেখিয়া আমার মনে অত্যন্ত কৌতূহলের সঞ্চার হইল ; বাহিরে আসিয়া কথা প্রসঙ্গে আমি জেলেনীকে মেয়েটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। জেলেনী বলিল, "ও আমার মেয়ে, হরিমতি।"

জেলের মেয়ে এত সুন্দরী ! কিছুতেই বিশ্বাস হইল না যে সে জেলের মেয়ে ; মনে হইল ভিতরে কিছু রহস্য আছে। কিন্তু কি রহস্য তাহা ভেদ করিতে পারিলাম না। জেলেনী মাছ দিয়া মাছের যে দাম চাহিল তাহাই বিনা প্রতিবাদে তাহাকে প্রদান করিলাম। জেলেনী বুঝিয়া ছিল, সুন্দর মুখের সর্ব্বত্র জয় ; হাসিয়া আমাকে বলিল, "বাবু আমি রোজ আপনাকে মাছ দিয়া যাইব, আমার এ বোয়াল মারির বিলের মাছ, বড় সুস্বাদ।"—আমি বলিলাম, "আসিও।"

তাহার পর হইতে জেলেনী প্রতিদিন আমাদের বাসায় মাছ বিক্রয় করিতে আসিত, মেয়েটিও তাহার সঙ্গে আসিত ; তাহার মুখে এমন একটা সরলতা, পবিত্রতা ও সুমিষ্ট ভাব ছিল যে, আমার সেই নবীন যৌবনে আমার চপল হৃদয় মোহাকৃষ্ট ভূজঙ্গমের ন্যায় তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। অবশেষে এমন হইল যে প্রতিদিন আমি হরিমতির পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিতাম, প্রত্যহ দু মিনিটের জন্যেও তাহাকে দেখিলে মনে হইত আমার দিন সার্থক হইল।

জেলেনী প্রত্যহ মাছ বিক্রয় করিতে আসিত, আমিও তাহাকে তাহার প্রদত্ত মাছের দ্বিগুণ মূল্য দান করিতাম। এক এক দিন সে মাছের ঝোড়া নামাইয়া রোয়াকে বসিয়া তাহার অকিঞ্চিৎকর জীবনের নানা গল্প বলিতে আরম্ভ করিত। আমি তাহার গল্প শুনিতাম বটে, কিন্তু তাহার একটা কথাও আমার মনে স্থান পাইত না। আমি একদৃষ্টে হরিমতির সুন্দর মুখ খানির দিকে চাহিয়া থাকিতাম। প্রথম প্রভাতের অরুণ কিরণ-সংস্পর্শে অর্দ্ধস্ফুট নলিনী যেমন ধীরে ধীরে তাহার সুকুমার হৃদয়দ্বার মুক্ত করে, বালিকা হরিমতিও সেইরূপে ক্রমে ধীরে ধীরে আমার সঙ্গে দুই একটি করিয়া কথা বলিতে লাগিল। কিছু দিনের আলাপে তাহার সঙ্গে আমার কিছু ঘনিষ্টতা জন্মিল। আমাকে অপরাধী মনে করিতে হয় কর, কিন্তু তাহার সরলতাপূর্ণ কোমল কণ্ঠস্বর সুপ্ত নিশীথের হৃদয় বিমোহন বীণাধ্বনির ন্যায় আমার কর্ণে প্রবেশ করিত। পথশ্রান্ত তৃষ্ণাতুর পথিক যেমন সুশীতল নির্ঝরধারা ব্যগ্রভাবে অঞ্জলি ভরিয়া পান করে, আমিও সেইরূপ ব্যগ্রভাবে শ্রবণ ভরিয়া তাহার বাক্য সুধাপানে আমার তৃষিত চিত্ত পরিতৃপ্ত করিতাম।

এই ভাবে প্রায় তিন মাস অতীত হইল। ফাল্গুনের বাতাসে যেমন প্রস্ফুটিত চ্যূত মুকুলের সৌরভ বনস্থলী আমোদিত করে, সেইরূপ বালিকার সুমধুর সম্ভাষণে আমার সেই আত্মীয়-স্বজন-শূন্য মরুময় প্রবাস জীবন প্রেমের সৌরভে পুলকিত হইয়া উঠিল।

অবশেষে হঠাৎ একদিন জেলেনী আমাদের বাসায় আসিল না, হরিমতিরও দেখা নাই। হরিমতির জন্য আমার বড় চিন্তা হইল, আমি জানিতাম বিনা কারণে সে অনুপস্থিত হইবে না; কিন্তু দুই দিন অপেক্ষা করিয়াও তাহার দেখা পাইলাম না। তখন একদিন সন্ধ্যাকালে জেলেনীর গৃহের সন্ধানে আমি গোরাবাজারের দিকে চলিলাম। শুনিয়াছিলাম গোরাবাজারে জেলেনীর ঘর।

কিন্তু গোরাবাজারের কোন্ অংশে জেলেনীর ঘর তাহা জানিতাম না। সে কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা বোধ হইতে লাগিল; বিফল মনোরথ হইয়া চিন্তাকুল হৃদয়ে বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম।

এই ঘটনার তিন চারি দিন পরে হঠাৎ একদিন অপরাহ্নে সেই জেলেনী আমাদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে দিন আর সে মাছ বিক্রয় করিতে আসে নাই। সে ব্যাকুলভাবে বলিল, তাহার মেয়ের কয়দিন হইতে জ্বর হইয়াছে, জ্বর এখন বিকারে দাঁড়াইয়াছে, আমি যদি একবার তাহার গৃহে শ্রীচরণের ধূলা দিয়া তাহার কন্যাকে দেখিয়া আসি, তাহা হইলে তাহাদের মনে একটু সাহসের সঞ্চার হয়। বুঝিলাম, হরিমতি হয়ত আমাকে একবার দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে; তদ্ভিন্ন তাহাদের কিছু অর্থাভাবও থাকিতে পারে, জেলেনীর অবস্থা খুব সচ্ছল নহে, তাহা জানিতাম। হরিমতির জন্য সর্ব্বস্ব ব্যয়েও আমার আপত্তি ছিল না।

বলা বাহুল্য আমি অবিলম্বে হরিমতিকে দেখিতে চলিলাম। আমি মহাসম্ভ্রান্ত কুলীন ব্রাহ্মণের পুত্র, আর হরিমতি এক মৎস্য-নারীর কন্যা, স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে যে ব্যবধান—আমাদের উভয়ের মধ্যে সেই ব্যবধান বর্ত্তমান। কিন্তু হৃদয়ের প্রেম স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের ব্যবধান দূর করে, আমি হরিমতিকে ভাল বাসিতাম, তাহার পীড়ার সংবাদে আমার উৎকণ্ঠার সীমা রহিল না, আমি তাহাকে দেখিবার জন্য ছুটিয়া চলিলাম।

নিজের প্রতি প্রবল বিশ্বাস ছিল, সুতরাং একবারও মনে হইল না যে আমি মোহে ভুলিয়া নিজের এবং এক অভাগিনীর জীবন ব্যর্থ করিবার সাধনায় রত হইতেছি। এ পৃথিবীতে প্রণয়ে সুখ নাই, ধন, মান যশেও হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না, কিন্তু সে কথা পরে জানিতে পারিয়াছি।

৩

"মেছুনীর কুটীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম সত্যই হরিমতির জ্বর। প্রবল জ্বর বিকারে বালিকা বৃন্তচ্যুত রৌদ্র-দগ্ধ যূথিকার ন্যায় শুকাইয়া উঠিয়াছে, তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, ওষ্ঠ বিবর্ণ, বিশীর্ণ ধমনীতে অগ্নি স্রোত প্রবহমান। আমি তাহার শয্যা প্রান্তে উপবেশন পূর্ব্বক তাহার যন্ত্রণা জর্জ্জরিত বেদনাবিদ্ধ ললাটে হস্তার্পণ করিলাম। হরিমতি ধীরে ধীরে আমার মুখের দিকে চাহিল, বোধ হয় সে কোন কথা বলিবার ইচ্ছা করিতেছিল, কিন্তু মুখে কথা ফুটিল না; কেবল তাহার ওষ্ঠাধর একটু কম্পিত হইল, তাহার উভয় চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া মলিন উপাধান সিক্ত করিল। আমি আবেগের সহিত বলিলাম, "হরিমতি, তোমার এত অসুখ, তা আমাকে এতদিন খবর পাঠাও নাই কেন?" আমার হৃদয়ের ব্যাকুলতা মুখে প্রকাশ করিতে না পারিয়া প্রাণের পুঞ্জীভূত আগ্রহের সহিত নতনেত্রে তাহার উত্তপ্ত মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলাম!

পূর্ব্বেই কবিরাজ লাগান হইয়াছিল, আমি হরিমতির সুচিকিৎসার বিশেষ বন্দোবস্ত করিলাম। আমার অর্থের অভাব ছিল না, মায়ের কাছে আমি ইচ্ছানুরূপ টাকা পাইতাম, এতদিনে তাহার কতকটা সদ্ব্যবহার হইল; হরিমতি ধীরে ধীরে বাঁচিয়া উঠিল। আমি আবার আমার পাঠে মনসংযোগ করিলাম।

কিন্তু ক্রমে নিজের পরকালের চিন্তা অপেক্ষা হরিমতির ইহকালের চিন্তাই আমার নিকট প্রবল হইয়া উঠিল। যদি বাঁচিল, তবে এমন একটি কুসুম কোমল পবিত্র জীবন কি ব্যর্থ হইয়া যাইবে?—জানিতাম এমন অনেক জীবন মানুষের পাপ প্রবৃত্তির তাড়নায়, সমাজের উপেক্ষায়, অর্থ লালসায় চিরদিনের জন্য কলঙ্ক সাগরে নিমজ্জিত হইতেছে, তাহাদিগের দুর্ভাগ্যের কথা কয়জন চিন্তা করে? তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার সামর্থ্যই বা কয়জনের আছে? না থাক, আমি হরিমতিকে ভাল বাসিয়াছিলাম, তাহার সর্ব্বনাশ

ঘটিতে দিব না, পাপের খরস্রোতে নিক্ষেপ করিবার জন্যই কি তাহাকে মৃত্যুকবল হইতে উদ্ধার করিলাম? জেলেনীকে আমি বেশ চিনিয়াছিলাম, সে হরিমতির মা হোক আর না হোক, তাহার সর্ব্বনাশ সাধনের যে প্রথম সোপান সে বিষয়ে আমার কিছু মাত্র সন্দেহ ছিল না। জেলেনী হরিমতিকে তাহার অনাগত সৌভাগ্যের দ্বার স্বরূপ মনে করিত; রূপসী হরিমতি তাহার অর্থ লালসা বহ্নির আহুতি স্বরূপ হইয়া বসন্তের মনোলোভা কুসুমশোভিতা মলয়বিকম্পিতা লতিকার ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল।

আমারও মনে তখন মোহের সঞ্চার হইয়াছিল। জেলেনী আমাকে বোধ হয় তাহার শিকার বলিয়া মনে করিতেছিল, শিকারের লোভেই বুঝি সে হরিমতি-ফাঁদ পাতিয়াছিল; সে ভাবিয়াছিল, আমি যখন ফাঁদে পা দিয়াছি, তখন আর আমার রক্ষা নাই। কিন্তু তাহার একটা ভুল হইয়াছিল; হরিমতির প্রতি আমার প্রেম-লালসার ধূমায়মান বহ্নি নহে, তাহা সে বুঝিত না। আমার তখন বিংশতি বৎসরের নবীন যৌবন, আশায় উৎসাহে, আলোকে পুলকে, সুখে সম্পদে তাহা প্রথম অরুণের কোমল-কিরণ সংস্পর্শে নির্ম্মল নীহার বিন্দুর ন্যায় ঝক্ ঝক্ করিতেছিল, হরিমতির নব যৌবন-বিকশিত লাবণ্য জ্যোতিই আমার সেই অনাবিল হৃদয় শিশির বিন্দুর সমুজ্জ্বল অরুণ লেখা। সে জেলেনীর কন্যা, অতি নীচবংশে তাহার জন্ম; তাহাতে ক্ষতি কি? 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি'—ভাবিলাম, সমাজ ত্যাগ করিতে হয় তাহাও স্বীকার, পঙ্কিল সলিলে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া এ পদ্ম চিরজীবনের জন্য হৃদয়ে ধারণ করিতে কুণ্ঠিত হইব না।—মিসনারী বালিকা বিদ্যালয়ে হরিমতি লেখাপড়া শিখিতেছিল, সুশিক্ষার গুণে তাহার হৃদয় মার্জ্জিত হইতেছিল। ক্রমে তাহার জ্ঞান ও বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার উপর জেলেনীর প্রভাব খর্ব্ব হইতে লাগিল, নারী জীবনের দায়িত্ব ও পবিত্রতার মহিমা ধীরে ধীরে তাহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল, আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম।

কিন্তু নিঃসন্দেহ হইতে পারিলাম না, বুঝি প্রেমের তাহা ধর্ম্ম নহে। সন্দেহের যে কোন কারণ ছিল না, তাহাও নহে। আমি হরিমতির সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধির জন্য অর্থ ব্যয় করিতাম, তাহাতে আমার অন্তরাত্মা পরিতৃপ্ত হইত, কিন্তু আমার মনে হইত আমিই হরিমতির অদ্বিতীয় নির্ভর নহি। জেলেনীর অবস্থা ভাল ছিল না, তবে আর কে কোন্ উদ্দেশ্যে তাহাকে অর্থ সাহায্য করে? তাই আমার সন্দেহ হইত, কোনরূপ মুগ্ধ পতঙ্গ কি সেই রূপবহ্নিতে ঝাঁপ দিয়াছে? আমার এ সন্দেহ কেন? তাহা হইলে আমিও কি সত্যই দগ্ধপক্ষ তৃষাতুর পতঙ্গ মাত্র। কেবল সেই আলোক বেষ্টনের চতুর্দ্দিকে উন্মত্তের ন্যায় ঘুরিতেছি। সত্যই কি আমি হৃদয়ে অতৃপ্ত পিপাসা ও নয়নে সুতীব্র রূপানল জ্বালা সঞ্চয় করিয়া আমার নব যৌবন-পথে অন্ধ আবেগে, দ্রুতবেগে মরীচিকা অভিমুখে ছুটিয়া চলিযাছি?

৪

"এক দিন হরি মতিকে বলিলাম, "হরি তোমার কাছে আমার মনের ভাব লুকাইব না। তোমাকে আমি বিবাহ করিতে চাই, তুমি সম্মত আছ কিনা বল!"

হরিমতি একবার স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিলাম, সে আমার অন্তরের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিয়া মুখ নত করিল।

আমি আবার বলিলাম, "আমি সত্য কথা বলিতেছি; তোমার মত জানিতে চাই।"

হরিমতি আমার কথায় বিন্দু মাত্র উৎসাহ, কিছু মাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না, অতি স্বাভাবিক স্বরে বলিল, "তুমি জান আমি নীচ জাতীয়া, তুমি ব্রাহ্মণ। তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হওয়া অসম্ভব।"

আমি বলিলাম, একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই বলিলাম, "অসম্ভব নহে, তবে শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ বটে, কিন্তু তুমি জান প্রণয় জাতিভেদের দাস নয়।"—কে জানিত সামান্য মৎস্যনারীও আমার ন্যায় ধনবান কুলীন ব্রাহ্মণ তনয়কে এ ভাবে উপেক্ষা করিবে? তাই কথা কয়টি বলিবার সময় বিস্ময় দমন করিতে পারি নাই।

আমার কথা শুনিয়া হরিমতি হাসিল, মিছরীর ছুরির মত সে হাসি মিটে কিন্তু হৃদয় ভেদী, হাসিয়া বলিল, "প্রণয় জাতিভেদের দাস নয় তা জানি, কিন্তু তোমার সমাজও ত প্রণয়ের দাস নয়।"

আমি বুঝি তখন সত্যই উন্মত্ত হইয়াছিলাম, বলিলাম—"হরিমতি তুমি আমার সর্ব্বস্ব, আমি তোমার জন্য সমাজ ত্যাগ করিব।'

হরিমতি এবার চঞ্চল দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল,

বলিল, "ছিঃ, এই অসার রমণী যৌবনের জন্য মা বাপ, ভাই বোন, সংসারের সকলকে ছাড়িবে? তুমি কি স্বার্থপর!"

আমি বলিলাম, "আমি তোমার যৌবনের মোহে মুগ্ধ নই, তুমি রূপসী আমি স্বীকার করি, কিন্তু তোমার মত এত গুণবতী নারী আমি আর দেখি নাই, রমণী কুলে তুমি রত্ন।"

হরিমতি নিষ্ঠুর, অতি অপ্রেমিকা, সে অনায়াসে বলিল, "প্রমোদ, আত্ম প্রবঞ্চনা করিও না, আমাকে ভাল বাসিয়া তুমি অনেকের পরিতাপের কারণ হইবে, তোমার উদ্দেশ্যে অনেকের অভিসম্পাতের অশ্রু বর্ষিত হইবে, তাহার ফল কখন মঙ্গলদায়ক হইবে না।

আমি অপ্রসন্নভাবে বলিলাম, "হরিমতি তুমি আমাকে ভালবাস না। তোমার মন পাইবার মত আমার কিছু নাই স্বীকার করি, কিন্তু আমি সত্যই নিস্বার্থভাবে তোমাকে ভালবাসি, নতুবা তোমাকে বিবাহ করিবার জন্য আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইতাম না।"

হরিমতি বলিল, "আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি। তুমি আমার জন্য এত করিয়াছ, আমার জীবনের এ পরিবর্ত্তনই তোমা হইতে, আমি কি তোমার এত দয়া ভুলিয়া যাইব? নিজের সুখের জন্য তোমার জীবন বিষময় করিব?—যদি বিবাহ করিয়া আমাদের কখন ছেলেপিলে হয়, তাহারা জারজ সন্তানের মত সকলের নিকট ঘৃণিত হইবে।

আমি বলিলাম, "হিন্দুসমাজ যখন আমাদের প্রেমের প্রতিবাদী, তখন না হয় খৃষ্টান সমাজে প্রবেশ পূর্ব্বক তোমায় বিবাহ করিব।"

"আর এই প্রেমের অনুরোধে যাহা তুমি নও, তুমি যে তাহাই এই কথা জগৎকে বুঝিতে দিবে? ধিক্ প্রবঞ্চনা! কেন তুমি আমাকে বাঁচাইয়াছিলে?"

অন্য সময় হইলে হয়ত রাগ করিতাম, কিন্তু আজ সঙ্কল্প স্থির করিয়া আসিয়াছিলাম, বলিলাম, "তুমি যে কষ্ট সহ্য করিতে পার না, আমাকে তাহা সহিবার জন্য অনুরোধ করিতেছ কেন?"

হরিমতি সুস্পষ্ট স্বরে বলিল, "তুমি পুরুষ। নিজের সুখের জন্য যদি তোমরা সংসারে বিশৃঙ্খলা ঘটাও, তাহা হইলে আমরা সংযম শিখিব কোথা হইতে? আমি না হয় চিরদিন কাঁদিয়া মরিব। তাহাতে সংসারে কাহার কি ক্ষতি? আমার কথা শোন, মা বাপকে অসুখী করিও না, তোমার সোণার সংসারে আগুণ জ্বালিও না, সমাজের নিয়ম ভাঙ্গিবার জন্য তোমার কূটতর্ককে অভ্রান্ত মনে করিও না। নিজের সুখ সকলেই খুঁজিয়া মরে, পরের সুখের দিকে চাহিয়া যে মরিতে পারে সে দেবতা। তুমি দেবতা হও, আমাকে ভুলিয়া যাও, হৃদয়কে সংযত কর।"

হরি, হরি, এই কুসুম কোমলা বালিকার হৃদয় বজ্র কঠোর, সে অনায়াসে আমার মস্তকেই বজ্রাঘাত করিল। ভারি রাগ করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

৫

"সংক্ষেপে সব কথা বলিয়া যাই। হৃদয়ের ভার দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে। মা বাবা পুনঃ পুনঃ আমাকে বিবাহের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, আমি তাঁহাদের সে অনুরোধ পালন করিতে পারিলাম না। আমি বিবাহ করিলে তাঁহারা সুখী হইবেন সত্য, কিন্তু বিবাহ করিয়া আর একটী নারীকে অভাগিনী ও অসুখী করিব কেন? হরিমতি আমার হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা ব্লটিং কাগজের মত শুষিয়া লইয়াছিল।

অবশেষে হঠাৎ একদিন এক টেলিগ্রাম পাইলাম—মা'র ভয়ানক পীড়া, অবিলম্বে বাড়ী গিয়া না পৌঁছিলে তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবার আশা নাই।

বাড়ী ছুটিলাম। পৃথিবীর সর্ব্বত্র কপটতা, পিতা মাতার স্নেহের মঙ্গল কলস যখন কপটতার বিষে ভরিয়া উঠে, তখন জীবনও বিড়ম্বনা পূর্ণ বোধ হয়। বাড়ী গিয়া দেখিলাম, বাবা বিবাহের সকল আয়োজন করিয়া বসিয়া আছেন, সকলে আসিয়া আমাকে ধরিলেন, বিবাহ না করিলে নাকি একটী অনাথা বিধবার জাতি রক্ষা হয় না, বাবা তাঁহার জাতি রক্ষার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছেন। মা বাপের বিগলিত অশ্রু আমার মর্ম্ম স্পর্শ করিত। পদ্মাবতীকে বিবাহ করিয়া বাড়ী রাখিয়া আসিলাম। পরার্থে হৃদয় বলিদান করা ভিন্ন আমার উপায় ছিল না, তাহাই করিয়াছি, নিজের সুখের জন্য আর ব্যস্ত হইলাম না; হরিমতির চিন্তা সর্ব্বান্ত হৃদয় হইতে দূর করিলাম। সেইবার আমার বি এ পরীক্ষা।

বহরমপুরে আসিয়া আর হরিমতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করি-

লাম না। হবিমতি আমাব কে? কেহ নয়, জীবনে তাহাব সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। মনেব ভুলে একবাব তাহাব কণ্ঠে আমাব জীবন কুসুমে বিবচিত মাল্যদাম সমর্পণ কবিতে গিযাছিলাম, সে তাহা অবহেলা ভবে ছিঁডিযা পদ-তলে দলিত কবিযাছে, বিদীর্ণ হৃদযে আমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিযা ফিবিযা আসিযাছি। প্রতিজ্ঞা কবিলাম আব সে পথে যাইব না। যাহাকে বিবাহ কবিযাছি তাহাকেই সুখী কবিবাব চেষ্টা দেখিব, এ হৃদয সংযত কবিব, বিস্মৃতিতেই আমাব সুখ, তাহাতেই আমাব পবিতৃপ্তি। হৃদয বিদীর্ণ হইতেছিল, কিন্তু উপায ছিল না।

এই ভাবে দু মাস কাটিযা গেল। হবমতিব মা, সেই জেলেনী, মধ্যে মধ্যে আসিযা আমাকে বিবক্ত কবিতে লাগিল, কিন্তু আমি তাহাব কথা কানে তুলিতাম না। তখন পবীক্ষা সাগব পাব হইবাব জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম, অবসবও অধিক ছিল না।

শেষে 'মহম্মদই পর্ব্বতেব নিকট আসিল', হবিমতি আমাকে একখানি পত্র লিখিল। তাহাকে একবাব দেখা দিবার জন্য সে কাতবভাবে আমাকে অনুবোধ কবিযা পাঠাইল। আবাব তাহাব কাতবতা কেন? সে ত ইচ্ছা কবিযাই আমাব প্রেম প্রত্যাখান কবিযাছে। একদিনত আমি তাহাব হস্তে আমাব জীবন যৌবন, আমাব ধনমান, আমাব সর্ব্বস্ব সমর্পণেব জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলাম। একদিন আমি পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন, সমাজ বন্ধন সমস্ত তুচ্ছ জ্ঞান কবিযা তাহাকে লাভ কবিবাব জন্য অধীব হইযাছিলাম, কিন্তু হবিমতিব পাষাণ হৃদয বিচলিত কবিতে পাবি নাই, মৎস্য নাবীব কন্যা পর্য্যন্ত আমাব দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছিল! এখন মোহ ছুটিযা গিযাছে, যে সুখেব স্বপ্ন আমাব প্রথম যৌবন আচ্ছন্ন কবিযা বাখিযাছিল তাহা ছুটিযা গিযাছে, পৃথিবীব মহত্তব কর্ত্তব্য সম্পাদনেব জন্য আমাব দেহ ও মন নিয়োজিত কবিয়াছি—এখন সেই মাযাবিনী প্রেমের শিকলী হস্তে আমার পশ্চাৎ ছুটিযা আসিতেছে কেন? পূর্ব্বকৃত ভ্রমেব জন্য যথেষ্ট অনুতাপ করিয়াছি, আর কেন? আমি হবিমতির পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। সংক্ষেপে উত্তর লিখিলাম, "আমি তোমার উপদেশ অনুসারেই কাজ করিতেছি; তোমাকে লাভ করিবার আশা ছাড়িয়াও যখন বাঁচিয়া থাকিতে হইয়াছে তখন সংসাবী হওযা ভিন্ন অন্য উপায দেখিলাম না, তাই বিবাহ কবিযা সংসাবী সাজিযাছি। আমাব পিতা মাতা, সমাজ সংসাব সব আপনাব হইযাছে, তোমাব যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ কবিযাছি, দুদিনেব স্বপ্ন ভুলিয়া যাও, তোমাব আমাব পবিচযেব কথা বিস্মৃত হও, তুমি স্বহস্তে যে আগুণ নিবাইযা ফেলিযাছ, তাহা পুনঃ প্রজ্জ্বলিত কবিবাব চেষ্টা কবিও না। তোমাব সঙ্গে আব দেখা হইবে না।"

মাসখানেক পবে শুনিলাম হবিমতিব বড জ্বব। বিকাব ঘোবে সে বাত্রিদিন কেবল আমাবই নাম কবিতেছে। জেলেনীব একটি বিধবা প্রতিবেশিনীব মুখে এ সংবাদ পাইলাম। জেলেনী নিজে আসে নাই, সে প্রতিজ্ঞা কবিযা গিযাছে আমাব মত পাষণ্ডেব বাডীব মাটি দলাইবে না। সংবাদ পাইলাম যদি একবাব গিযা হবিমতিকে না দেখিযা আসি তাহা হইলে আব দেখা হইবে না, তাহাব জীবন-দীপ নির্ব্বাণ প্রায। একবাব আমাব সঙ্গে দেখা কবাই তাহাব অন্তিম কালেব একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। তাহাব অন্তিম আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ বাখিবাব শক্তি আমাব নাই, সেই দিন সন্ধ্যাকালে অত্যন্ত বিচলিত হৃদয়ে আমি হবিমতিব গৃহেব দিকে অগ্রসব হইলাম। সেই সন্ধ্যাকালে জনপূর্ণ বাজপথ দিযা চলিতে চলিতে আমাব মনে হইল আমি আমাব প্রথম যৌবনেব সুখ স্মৃতিব শ্মশান অভিমুখে ধাবিত হইযাছি।

৬

হবিমতিব জীবনেব আশা ছিল না। আমি একেবাবে তাহাব মাথাব কাছে গিযা বসিলাম, সে একটা কথাও বলিতে পবিল না, কেবল তাহাব চক্ষু দুটি অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিল। তাহাকে সান্ত্বনাদানেব জন্য আমিও কোন কথা খুঁজিয়া পাইলাম না, কথা বাহিব হইতেছিল না, কি বলিব? আমিই তাহার প্রাণ নষ্ট কবিলাম। এতদিন সত্যই তাহাকে বুঝিতে পারি নাই, যখন বুঝিলাম তখন আমার আব ফিবিবাব উপায় ছিল না, তাহাকেও ফিরাইবার পথ ছিল না। কেবল বুঝিলাম, আমার চিন্তাতেই হরিমতিব এ বোগ, আর তাহাতেই সে মরিতে বসিয়াছে।

বি, এ, পরীক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায় চলিলাম। আট দশ দিন পরে বহরমপুরে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম হরিমতি আর ইহলোকে নাই। শুনিয়া মন বড় চঞ্চল হইল, বাসায় স্থির থাকিতে পারিলাম না। সন্ধ্যাকালে গঙ্গার

ধারে বেড়াইতেছি এমন সময় হরিমতির মা, সেই জেলেনী কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া আমার পদতলে আছড়াইয়া পড়িল, ক্রন্দ্যমান কণ্ঠে বলিল,—"আমিই তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছি, আমিই হরিমতির মৃত্যুর কারণ, আমার উপর ব্রহ্মহত্যার পাতক স্পর্শিয়াছে!"

অতি মাত্র বিস্মিত হইয়া আমি বলিলাম, "হরিমতি ব্রাহ্মণ কন্যা? তুমি বল কি! এতদিন একবারও ত তুমি সে কথা আমার কাছে ভাঙ্গিয়া বল নাই, তোমার কন্যা বলিয়াই পরিচয় দিয়াছ, হরিমতি কি জানিত যে সে জেলের মেয়ে?"

জেলেনী বলিতে লাগিল, "হরিমতির কাছেও কোন দিন তাহার জন্ম বৃত্তান্ত প্রকাশ করি নাই, কাহারও কাছে করি নাই, কিন্তু আজ আর তাহা লুকাইব না। কাশীধামে কোন ব্রাহ্মণ বংশীয়া বিধবা রাজনন্দিনীর গর্ভে হরিমতির জন্ম হয়। আমি সে সময়ে কাশীধামে ছিলাম, মেয়ের মায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, তিনি মেয়েটিকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। আমিও মেয়েটিকে নিজের মেয়ের মত প্রতিপালন করিতে লাগিলাম, সে একটু বড় হইলে, তাহার মায়ের অনুরোধে আমি এখানে আসিলাম। আমি গরীব মানুষ, মাছ বিক্রয় করিয়া দিন পাত করি, কিন্তু হরিমতির জন্য আমার কোন ভাবনা ছিল না, তাহার মা তাহার প্রতিপালনের জন্য গোপনে আমাকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিতেন। একটি ভাল ছেলের সঙ্গে যাহাতে হরিমতির বিবাহ হয়, তাহাকে জীবনে যাহাতে কষ্ট পাইতে না হয়, রাজ কন্যার তাহাই একান্ত ইচ্ছা ছিল। আমি চেষ্টাতেই ফিরিতেছিলাম, গোপনে তোমার পরিচয় পাইয়া তোমাকে ভুলাইয়াছিলাম, তুমিও ভুলিয়াছিলে, হরিকে ভাল বাসিয়াছিলে, শেষে তাহারই সর্ব্বনাশ করিলে। বাছা আমার, তোমাকে ভাল বাসিয়া তোমাকে না পাইয়া অকালে আমার ঘরের সোণার প্রদীপ নিবাইয়া চলিয়া গেল। তুমি তাহাকে ভালবাসিলে ত বিবাহ করিলে না কেন? যদি জানিতে বিবাহ করিবার তোমার সাহস নাই, তবে তাহাকে ভালবাসিলে কেন? তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ, একটি বালিকার জীবন নষ্ট করিয়াছ; ভাবিয়াছ তুমি সুখী হইবে? উপরে ভগবান আছেন, নীচে ঐ দেখ মা গঙ্গা, দেখিবে তুমি জীবনে কেমন সুখ ভোগ কর!"

বাঁধা ঘাটের পাথরের উপর বসিয়া আমি আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম! আকাশে চাঁদ উঠিল, মাঝিরা ঝুপ ঝুপ্ করিয়া দাঁড় ফেলিয়া নৌকা বাহিয়া চলিতে লাগিল, দেব মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া বাজিয়া থামিয়া গেল, নদীর অপর পারে অরণ্যের অন্তরালে শৃগালের দল সমস্বরে চীৎকার করিল; সন্ধ্যার আত্মসমাহিত গম্ভীর ভাব কিছুকালের জন্য বিলুপ্ত করিল। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, আমার করতলে কয়েক বিন্দু তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। আশৈশব মাতৃক্রোড় বঞ্চিতা, পিতামাতার স্নেহস্বর্গবিচ্যুতা, পরগৃহে প্রতিপালিতা, অনাথা বালিকাকে সুখী করিবার অধিকার ভগবান আমার হস্তে দান করিয়াছিলেন, আমি তাহাকে মৃত্যুদান করিলাম। পরমেশ্বরের নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা করিবারও আমার সাহস হইল না।

৭

"এই ঘটনার পর অনেক দিন চলিয়া গেল। কি ভাবে গেল সে কথা বলিবার কোন আবশ্যক দেখি না। পাঁচ সাত বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন স্থানে মুনসেফী করার পর আজ প্রায় ছয় মাস হইল, এখানে বদলী হইয়া আসিয়াছি তাহা জান। বহরমপুরের বাল্যস্মৃতি সুখকর, সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার জীবন নাটকের একটা অতি শোচনীয় অঙ্কের এখানে অভিনয় হইয়া গিয়াছে, সে কথা এতদিন পরেও আমি ভুলিতে পারিতেছি না, সে স্মৃতি যেন জলন্ত লৌহ শলাকা দ্বারা আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া আছে।

কেন বলিতে পারি না, এখনও সেই দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা দিবারাত্রি আমার নয়ন সমক্ষে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত দেখিতেছি। আমার স্ত্রী যতদিন এখানে ছিলেন, এক দণ্ডও তিনি নিরুদ্বেগে থাকিতে পারেন নাই; রাত্রে কতদিন তিনি ছাদের উপর কাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছেন, তাহার নিবিড় কৃষ্ণ কুন্তলজাল আগুল্ফ লম্বিত, পরিধানে শুভ্র বস্ত্র; কতদিন তাহার চঞ্চল চরণধ্বনি পদ্মাবতীর কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার বালা ও চুড়ীর ঠুন্ ঠুন্ শব্দ বায়ুস্রোতে ভাসিয়া আসিয়াছে; ভীত চিত্তে পদ্মাবতী সেই অপরূপ নারীমূর্ত্তি দেখিবার জন্য আমাকে ডাকিয়াছেন, আমি ছুটিয়া গিয়া দেখি—কেহ কোথাও নাই, মূর্ত্তি অপসৃত হইয়াছে। পদ্মাবতী সভয়ে বলিতেন—

"গেল, গেল, ঐ দেখ আকাশে চাঁদের সঙ্গে মিশিয়া গেল।" চন্দ্রের স্নিগ্ধ শুভ্র হাস্য আমার নিকট বিকট বিদ্রূপচ্ছটা বলিয়া বোধ হইত।

একদিন সন্ধ্যাকালে পদ্মাবতী বাসার বাগানের মধ্যে পুষ্করিণীতে গা ধুইতে গিয়াছিলেন, তখন সন্ধ্যা বেশ গাঢ় হইয়াছিল, সেই অন্ধকারের মধ্যেই তিনি দেখিতে পাইলেন, একটী রমণী চারিগাছি মল বাজাইতে বাজাইতে ঝম ঝম শব্দে জলে নামিল। পদ্মাবতীর প্রথমে বিশ্বাস হইয়াছিল, হয়ত কোন পল্লীবধূ গা ধুইতে আসিয়াছে, কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার ভ্রম দূর হইল। তিনি দেখিলেন, যুবতী জলের উপর দিয়া দ্রুতপদে পুষ্করিণীর অপর পারে গিয়া উঠিল, একটি আম্র বৃক্ষ মূলে দাঁড়াইয়া ঘাটের দিকে মুখ ফিরাইয়া হা হা করিয়া হাসিল, অন্ধকারের মধ্যেও তাহার দুই পাটি দন্ত ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল, তাহার চক্ষুদ্বয় দুইটি অগ্নিময় গোলকের ন্যায় দীপ্যমান হইল। অঞ্চলের অভ্যন্তর হইতে তাহার শীর্ণ হস্ত প্রসারিত করিয়া সে পদ্মাবতীকে ডাকিল, "আয়, আয়।" পদ্মাবতী চীৎকার শব্দে শানের উপর পড়িয়া গেলেন, সেইদিন হইতেই তাহার হিষ্টিরিয়ার সৃষ্টি হইল।

তাহার পর প্রায় প্রতিদিনই তাঁহার হিষ্টিরিয়া হইত। একাকী থাকিলেই তিনি ভয় পাইতেন। হু হু করিয়া বাতাস বহিলে, সাঁ সাঁ করিয়া আকাশ পথে পাখীর ঝাঁক উড়িয়া গেলে, পদ্মাবতী ব্যাকুলভাবে বলিতেন,—"ঐ কে আসিতেছে, ঐ শোন কে আমাকে ডাকিতেছে।"—রাত্রে তাঁহার ভাল নিদ্রা হইত না, সুপ্তি ঘোরে তিনি মধ্যে মধ্যে চমকিয়া উঠিতেন। চিকিৎসকগণ রোগের আনুপূর্ব্বিক অবস্থা শুনিয়া তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা দিলেন; আমি পদ্মাবতীকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলাম।

অনন্তর আমি সে বাসা ত্যাগ করিয়া এ বাসায় আসিলাম। প্রথম দুই চারি দিন কিছু বুঝিতে পারিলাম না, তাহার পর হইতে বোধ হইতে লাগিল যেন কোন অশরীরি আত্মা, কোন দেহহীন ছায়া ক্রমাগত আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে। আমি কাহাকেও দেখিতে পাই না, কিন্তু সে যে সর্ব্বদা আমার কাছে কাছে রহিয়াছে তাহা অনুভব করিতে পারি, কাছারী হইতে সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর বাসায় আসিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে হরিমতির সেই রোগ-কাতর পাণ্ডুবর্ণ মুখখানি আমার মনে পড়িয়া যায়, যেন তাহার প্রাণময়ী ছায়া এই সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের বৃষ্টি ধারা ধৌত, চিরবিস্মৃত, অঙ্গার-চিহ্ন-বর্জ্জিত শ্মশান ভূমি ভেদ করিয়া উঠিয়া নির্ণিমেষ চক্ষে আমার দিকে চাহিয়া আছে। তাহার রক্ত বিহীন অস্থিময় শীর্ণ অঙ্গুলী হেলাইয়া যেন আমাকে কোন রহস্যময় জগতে তাহার অনুসরণ করিবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছে। রাত্রে দীপ নিভাইয়া শয়ন করিয়াছি, সহসা কোথা হইতে নানা জাতীয় সদ্যোবিকশিত কুসুমের সুমধুর গন্ধে গৃহ আমোদিত হইয়া উঠে, দীপ জ্বালিয়া দেখি শয্যাতলে নব প্রস্ফুটিত পুষ্পরাশি বিস্তীর্ণ রহিয়াছে! আবার এক এক দিন গভীর রাত্রে আমি হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গে আমার কপোলদেশে কাহার অগ্নিময় উত্তপ্ত নিশ্বাস অনুভব করি, আমার ললাটে কাহার দুই এক বিন্দু অশ্রু বর্ষিত হয়, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাই না। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া কে যেন আমার শয়ন কক্ষে, আমার মশারীর চারি পাশে কিসের সন্ধানে ব্যাকুলভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। এই কয় মাস কাল আমি সুনিদ্রা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি, অল্প নিদ্রাকর্ষণ হইলেই আমি ভয়ানক স্বপ্ন দেখি, দেখি রক্তের নদী খর বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহার মধ্যে অর্দ্ধ উলঙ্গিণী গৌরুদামানা রমণী মূর্ত্তি, আলু থালু বেশ, মুক্ত কেশ, তাহার ললাটে রক্ত চন্দনের ফোটা, কণ্ঠে রক্ত জবা-মালা, তাহার দীর্ঘ কেশ পাশ ধরিয়া এক কৃষ্ণবর্ণ ভীষণ দর্শন দৈত্য এক খানি সুশাণিত খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক তাহার শিরশ্ছেদনের উপক্রম করিতেছে, রমণী ভয়বিহ্বল নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে বলিতেছে, "ওগো আমাকে রক্ষা কর, আমাকে উদ্ধার করিয়া তোমার কাছে লইয়া যাও, তুমি ভিন্ন পৃথিবীতে আমি আর কাহা কেও জানিতাম না, পৃথিবীর পর পারেও আমি আর কাহাকেও জানি না, কাহাকেও চিনি না; নরকের এই পূতি গন্ধময় রক্ত-নদী, নরকের এই ভীষণ দানব, আমি অনাথা একাকিনী, এ ঘোর বিপদে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি, অনাথাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর।"—আমি চীৎকার শব্দে ঘর্ম্মাপ্লুত দেহে শয্যাতলে উঠিয়া বসি, কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাই না, কিন্তু সেই 'রক্ষাকর' 'রক্ষাকর' স্বর যেন বহুদূর হইতে আসিয়া তখনও আমার শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করিতে থাকে; সেই স্বর লহরী অনন্ত নীলাম্বরের নৈশ নিস্তব্ধতার মধ্যে বিলুপ্ত হয় না, আমি

একাকী শয্যায় বসিয়া নীরব সুপ্তিমগ্ন অন্ধকারাচ্ছন্ন শর্ব্বরীর মর্ম্মভেদী কণ্ঠস্বরের ন্যায় সেই দূরাগত আর্ত্তনাদ চিনিতে পারি—তাহা হরিমতির কণ্ঠস্বর!

আবার এক এক সময়ে স্বপ্ন দেখি, আমি সমুদ্রতটে পরিভ্রমণ করিতেছি, এক দিকে অনন্ত বীচিমালা সংক্ষুব্ধ সুনীল মহাসমুদ্র, বহুদূরে সমুদ্রজল ও আকাশ পরস্পরের আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ, অন্য দিকে সুবিস্তীর্ণ সৈকত ভূমি, শুভ্র বালুকা কণা মধ্যাহ্ন সূর্য্যকিরণে ঝক্ ঝক্ করিতেছে, বালুকারাশি প্রতিবিম্বিত প্রচণ্ড সূর্য্যাকর চক্ষু ঝলসাইয়া দিতেছে, উত্তপ্ত বালুকায় পদতল জ্বলিয়া যাইতেছে, ভীষণ উত্তাপে সর্ব্বাঙ্গ হইতে ঘর্ম্মধারা ঝরিতেছে, নিশ্বাস পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে; আমি কাতর ভাবে উর্দ্ধদিকে চাহিতেই দেখি নবীন নীল নীরদ জাল সৌরকর প্রদীপ্ত আকাশ পথে ভাসিয়া চলিয়াছে, তাহার উপর হরিমতির ছায়াময়ী মূর্ত্তি, তাহার হস্তে বীণা কিন্তু সে বীণা হইতে ক্রমাগত বজ্র নির্ঘোষ ধ্বনিত হইতেছে, তাহার হাস্য বিদ্যুচ্ছটার ন্যায় মেঘের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিচ্ছুরিত হইতেছে, তাহার কৃষ্ণ কুন্তলরাশি মেঘের সঙ্গে মিশিয়া তাহার আসন রূপে বিস্তীর্ণ রহিয়াছে, আর আকাশের বহু উর্দ্ধে মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের জ্যোতির্বিম্ব তাহার মস্তকের উপর জ্যোতির্ম্ময় মুকুট রূপে প্রতিভাত হইতেছে। সপ্তবর্ণ সমুজ্জ্বল রামধনু তাহার কণ্ঠে বিচিত্র বর্ণের পুষ্প নির্ম্মিত নিরুপম মাল্যদামের শোভা পাইতে থাকে; হরিমতির জলদ গম্ভীর স্বর সমুদ্রের শব্দ কল্লোল, ঝটিকার ভীষণ গর্জ্জন, বহুদূরবর্ত্তী জীব জগতের মিশ্র কোলাহল মগ্ন করিয়া আমার কর্ণে পুনঃপুনঃ ধ্বনিত হয়। আমি শুনিতে পাই সে ক্রমাগত আমাকে ডাকিতেছে "প্রমোদ, প্রমোদ, প্রমোদ!' ঐ শোন—"

কড় কড় শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, মুষলধারে বারি বর্ষণ আরম্ভ হইল, ঝটিকাবেগে সমস্ত প্রকৃতি ক্রন্দমান কণ্ঠে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল, বাতায়ন পথে হঠাৎ উদ্দাম বায়ুর একটা ঝট্‌কা আসিয়া গৃহের দীপ নির্ব্বাণ করিয়া দিল। বর্ষার সেই সলিলসিক্ত বিরস সন্ধ্যার অন্ধকারময় কক্ষে বসিয়া বহিঃ প্রকৃতির সুবিস্তীর্ণ বক্ষে অবিরল ধারাপাতের দিকে লক্ষ্য করিয়া আমি গবাক্ষ পথে শূন্যে চাহিয়া রহিলাম। প্রমোদ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "ঐ শোন হরিমতি আমাকে ডাকিতেছে, আমি তাহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছি, তাহার ঐ হাসি,—বিদ্যুচ্ছটা দেখিতেছ না? কি তীব্র! আমি আর সহ্য করিতে পারি না, আমি পাগল হইয়া যাইব, স্বপ্নে, জাগরণে, অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র হরিমতির সেই ছায়াময়ী মূর্ত্তি; আমি কি করিব, কোথায় গিয়া শান্তি পাইব ভাই, বলিয়া দাও।"

প্রমোদ আবার উভয় হস্তে চক্ষু আচ্ছাদন করিলেন।

আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; সমস্ত ব্যাপার একটি রহস্যের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনেক ক্ষণ চিন্তার পর আমি নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলাম, "হরিমতিকে তুমি সত্যই ভাল বাসিতে, তাহার অকাল মৃত্যুতে তোমার হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিয়াছিল, তাহার পর বহরমপুরে আসিয়া সেই পুরাতন স্মৃতি আবার জাগিয়া উঠিয়াছে, তাই তুমি এই সকল অসম্ভব ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছ, বস্তুতঃ ও সকল কল্পনার বিকার ভিন্ন আর কিছুই নহে।"

বলিলাম বটে, কিন্তু বুঝিলাম বহরমপুর না ছাড়িলে প্রমোদের মঙ্গল নাই, তাহার যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি তাহাতে এখানে দীর্ঘকাল বাস করিলে তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, সুতরাং তিনি যাহাতে অন্যত্র বদলী হইতে পারেন তাহার চেষ্টা করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম।

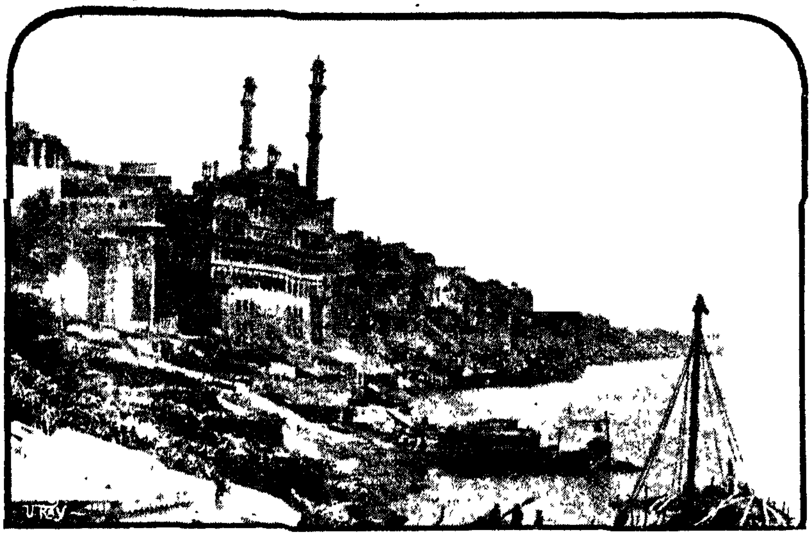
এই ঘটনার দুই সপ্তাহ পরে প্রমোদ চট্টগ্রামে বদলী হইলেন। সেখান হইতে তিনি আমাকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। লিখিয়াছিলেন যে হরিমতির ছায়াময়ী মূর্ত্তি তাঁহার সন্ধানে ততদূর পর্য্যন্ত ধাবিত হয় নাই। এবং তাঁহার দেহ ও মন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুস্থ আছে।

তাহার পর এই তিন বৎসর আর তাঁহার কোন সংবাদ পাই নাই।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বারাণসীর পথে।

গৃহ-মার্জ্জার প্রকৃতি-বিশিষ্ট বাঙ্গালী পূজার সময় দেশ ছাড়িয়া বিদেশে যাইতে চাহে না। যে যেখানে দূরে অদূরে থাকে, এই সময়ে বাড়ীতে আসিয়া জুটে। শরতের মধুর ছবির সহিত প্রকৃতির মধুর পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে মিশিয়া



কাশী— বেণীমাধবের ধ্বজা।

যখন বাঙ্গালার গৃহে গৃহে আনন্দ কোলাহল জাগাইয়া দেয়, পরিজনবর্গের বিষণ্ণ মুখে হাসির রেখা ফুটাইয়া দেয়—প্রকৃতি যে সময়ে নব প্রস্ফুটিত স্থলপদ্ম, সুগন্ধি শেফালির অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া বর্ষার বিষণ্ণতা ও স্থির গম্ভীর ভাব ভুলিয়া আনন্দে হাসিতে থাকেন—সুনীল আকাশে যখন পূর্ণ শশী ষোল কলা লইয়া ফুটিয়া উঠিয়া রজত ধারা বৃষ্টি করে—সমগ্র বৎসরের সুখের স্মৃতি যে সময়ে বাঙ্গালীর হৃদয়ে পরিস্ফুট হইয়া উঠে, আমি সেই সুন্দর শোভাশালিনী পূর্ণচন্দ্রালঙ্কৃতা যামিনীতে পরিজনবর্গের নিকট বিদায় লইয়া বিদেশ যাত্রা করিয়াছিলাম। সে দিনের সকল কথা ভুলিতে পারি, কিন্তু পরিজনবর্গের স্নেহবিপ্লুত গণ্ডবাহী পবিত্র অশ্রুধারা, হৃদয়ের বিজন কন্দরে স্নেহের ঘাত প্রতিঘাতে উত্থিত আকুল অথচ মৃদু দীর্ঘশ্বাস—আর প্রবাসীকে কিছু দীর্ঘ দিনের বিদায় দিবার আশঙ্কায় একটা ব্যাকুলভাব, এগুলি ভুলিতে পারিব না।

সেই সুন্দর রজনীতে—নীলাকাশে নিষ্কলঙ্ক শারদচন্দ্রমা হাসিতেছে—প্রকৃতি হাসিতেছে—আর একটী সুন্দর মুখ দ্বারান্তরালে অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া, হৃদয়ে দীর্ঘ শ্বাস লইয়া মনে মঙ্গলকামনা পোষিত করিয়া, নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। এ ভাবটা বড়ই বিরুদ্ধ বোধ হইল। তবু প্রকৃতির হাসি—চাঁদের হাসি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। জানি না, বাহ্য প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের সহিত মানব হৃদয়ের কি গূঢ় ঘনিষ্ট আকর্ষণ! আবার অন্য পক্ষে সেই অশ্রুপ্লাবিত সুন্দর মুখখানি, তাহার হৃদয়ের অতি নিভৃতে উদিত ও বিলয় প্রাপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাসটীও মন হইতে মুছিয়া ফেলা অসম্ভব হইল। যাত্রা ত করিতে হইবে—অত ভাবিয়া ফল কি? গাড়ীতে ইতিপূর্ব্বেই আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি উঠিয়াছিল;—আমি বাহিরে গিয়া গাড়ীতে উঠিলাম।

গাড়ীর মধ্যে দেখি—মিঃ পিঃ—আগে হইতেই উঠিয়া বসিয়াছেন। পাঠক মিঃ পিঃ—আমার দীর্ঘ প্রবাসের অনুগত সঙ্গী। কায়া হইতে ছায়া যেরূপ পৃথক করা অসম্ভব, দুগ্ধ হইতে জল পৃথক করা যেরূপ অসম্ভব—মিঃ পিঃ হইতেও আমার দীর্ঘ প্রবাস পথে বিচ্ছিন্ন হওয়াও সেইরূপ অসম্ভব। তাঁহাকে "মিষ্টার" বলিয়া সম্বোধন করিলাম, ইহাতে পাঠক হয়তঃ মনে করিতে পারেন তিনি বিলাত ফেরত—বা তদনুরূপ আর কিছু। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে—তিনি সাত সমুদ্র তের নদী পার না হইয়া এই শস্য শ্যামলা সুফলা মলয়জ শীতলা, বাঙ্গলা দেশে থাকিয়াই "মিষ্টার" বনিয়াছেন। আমাদের দেশী "মিষ্টার"দের গায়ে কিছু ছাপ থাকে না। পোষাকের জোরেই—চাল চলনের জোরেই তাঁহারা জাহির হন। এ দিক দিয়া ধরিতে গেলে মিঃ পিঃ—র কোন অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি ছিল না। ধপ্‌ধপে উঁচু কলার—তাহার পার্শ্বে বাঁধা রেশমী নেকটাই, সার্জ্জের ওয়েষ্ট কোট, কোট ও প্যাণ্ট, তার উপর দেড় মণ ভারি একটা কাশ্মীরার অলষ্টার, মাথায় নাইট ক্যাপ্, চোখে সোণায় বাঁধান চস্‌মা, সেই চস্‌মার মধ্য দিয়া উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইয়া, চুরুটের ধূমোদ্গার ও সেই সঙ্গে সঙ্গে ছড়ি ঘুরান—বাঁকা হিন্দুস্থানীতে চাকর বাকরের সহিত কথা—প্রভৃতি যত কিছু অনুষ্ঠান—সবই মিঃ পি'র সাধ্যায়ত্ব হইয়াছিল। তার উপর তিনি আমার প্রবাস যাত্রার সঙ্গী। তিনি অনেকবার পশ্চিম গিয়াছেন—আমি প্রথম যাইতেছি। তজ্জন্য তাঁহার একটা মস্ত অভিজ্ঞতার

ভাগ, আর তাহার উপর সাহেবী পোষাক, আমায় বড় অভিভূত করিয়া তুলিল। আমি, আর্য্যাবর্ত্ত, দাক্ষিণাত্য, পঞ্জাব, মধ্য ভারতবর্ষ, মধ্য প্রদেশ, রাজপুতানা, ভরতপুর, এবং উত্তর পশ্চিমের যেখানে যেখানে গিয়াছি—মিঃ পিঃ ছায়ার ন্যায় আমার অনুসরণ করিয়া আমার সকল বিষয়ে অযাচিত উপদেশ দিয়া, অসহনীয় মুরুব্বিয়ানা দেখাইয়া—আমায় হাড়ে হাড়ে জ্বালাইয়াছেন। তিনি এখন সুদূর পঞ্জাবের সীমান্ত প্রদেশে। বাঙ্গলা মাসিক পত্রে তাঁহার চরিত্রের তীব্র সমালোচনা পড়িয়া, সেখান হইতে যে ভ্রূকুটি করিবেন, তাহাতে আমার বড় একটা ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আমি জানি তিনি আমায় যথেষ্ট ভালও বাসেন, কাজেই আমার ভীত হইবার ততটা প্রয়োজন নাই।

হাবড়ায় পৌঁছিলাম। মিঃ পিঃ গাড়ী হইতে বিদ্যুৎ গতিতে সাহেবদের মত লাফাইয়া পড়িয়া প্লাটফরমে প্রবেশ করিলেন। আমি "নেটিভত্বের" পুরা ভোগটা দাঁড়াইয়া ভুগিলাম। সব জিনিস পত্র কুলী দিয়া নামাইয়া দ্বারে প্রবেশ করিতে গিয়া দেখি—এক তুষারশুভ্র, হুইস্কি-সেবিত ইংরাজ দৌবারিক গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ করিতেছেন "Not this way Babu." কথাটা শুনিয়া বড় রাগ হইল। বলিলাম—"সাহেব সেকেণ্ড ক্লাশে যাইতে হইলে কোন্ পথে যাইব বলিয়া দাও।" তখন ব্রিটন-সন্তান আর আপত্তি করিলেন না—আমি টিকিট ঘরের কাছে গেলাম।

সেখানে মিঃ পিঃ ওষ্ঠাধর টিপিয়া হাসিতেছেন দেখিয়া হাড় জ্বলিয়া গেল। তাঁহার সেই স্বাঙ-কলারের সোণা বাঁধান চস্‌মার মধ্যগত, তীব্র অথচ সরস দৃষ্টি যেন বলিতেছে "কেমন—আমায় সাহেব বলিয়া যে ঠাট্টা কর—হাতে হাতে নেটিভত্বের সুখ পাইয়াছ ত?" আমি রাগ করিলাম বটে, কিন্তু মনে মনে বুঝিলাম—রেলওয়ে রাজ্যে "নেটিভত্ব" মহানিগ্রহ। মিঃ পিঃ জোর করিয়া আমায় ট্রাঙ্কের মধ্যে এক সুট সাহেবী পোষাক পুরিয়া দিয়াছিলেন—কিন্তু সং সাজিতে হইবে বলিয়া তাহা প্রথমে ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক হই নাই। এখন মনে হইল—অবসর পাইলেই—সুটটী পরিয়া সাহেব সাজিব।

ষ্টেশনে অত্যন্ত জনতা। কর্ড-মেল ছাড় ছাড় হইয়াছে। স্বর্গের পরীর ন্যায়, শ্বেতকায় ইংরাজ মহিলারা আত্মীয় স্বজনের সহিত বিদায়কালীন অস্ফুট সংক্ষিপ্ত বাক্যালাপে মনোনিবেশ করিয়াছেন। প্লাট ফরমের শেষে দুরন্ত রাক্ষসকায় এঞ্জিনটা, যুদ্ধের ঘোড়ার ন্যায় ভয়ানক চঞ্চল হইয়া যেন আভ্যন্তরীণ তেজ লুকাইয়া রাখিতে না পারিয়া ধাবমান হইবার অপেক্ষা করিতেছে। কুলিদের ছুটাছুটি—হিন্দুস্থানীদের হাকাহাঁকি, গার্ড ও টিকিট কলেক্টারের ধীর পদবিক্ষেপ—আর প্লাট ফরমের বিমিশ্র কোলাহল, এই সব উপভোগ করিতে করিতে গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। আলস্য পূর্ণ ব্যস্ততা বিহীন বাঙ্গালী জীবনে ষ্টেশনের এই সজীব বিরাট ব্যস্তভাব দেখিয়া প্রাণটা যেন ক্ষণিক উত্তেজনায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

সব থামিল। শেষ ঘণ্টা পড়িলে ট্রেণখানি দ্রুতবেগে হুস্ হুস্ করিয়া ছুটিল। আমরা একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িতে উঠিয়াছিলাম। বড়ই সুখের বিষয়, তাহা একখানি ফার্ষ্ট ক্লাশের অর্দ্ধাংশ এবং তাহাতে ইংরাজ যাত্রী ছিল না। আমার সঙ্গী ক্ষুদ্র বাঙ্গালী ইংরাজটী দেখি—ইতিমধ্যে চুরুট ধরাইয়া গম্ভীর হইয়া গদীর উপর অঙ্গ ঢালিয়াছেন। আমি তখন গায়ের ঝাল ঝাড়িতে লাগিলাম—মিষ্টার পিঃ হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন।

হুগলী ছাড়াইলাম—কামরায় আর কেহ উঠিল না। দেখিতে দেখিতে বৰ্দ্ধমান ছাড়াইল। বাল্যকালের সেই "বৰ্দ্ধমানের রাঙ্গা মাটির" কথাটা মনে পড়িল। মিঃ পিঃ "রাঙ্গা মাটির" কথা ভাবিয়াছিলেন কিনা জানি না—কিন্তু সেই অতি শুভ্র, সুমিষ্ট সীতাভোগ, আর বড় বড় দানাদার মতিচুরগুলি, যে ক্ষণকালের জন্য তাঁহার সাহেবী খানার স্বাদ ভোজী রসনায় উপর আধিপত্য করিয়া তাহা একটু রসসিক্ত করিয়া দিয়াছিল তাহা বেশ বুঝিলাম। কেন না তিনি আমায় বলিলেন—"ভায়া! গাড়ী এখানে বেশীক্ষণ থামিবে, কিছু মতিচুর ও সীতাভোগ কিনিয়া লও। পাঁউরুটিখানার সদ্গতি করিবার সময় বড় কাজে লাগিবে।" সীতাভোগ সংগ্রহ করা হইলে মিষ্টার পিঃ—অতি প্রফুল্লভাব ধারণ করিলেন। তাঁহার অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য যেন তাপমান যন্ত্রের পারদের ন্যায় দুই চারি ডিগ্রী নীচে আসিয়া পৌঁছিল।

আসানসোলে যখন গাড়ী পৌঁছিল—তখন রাত্রিটা বাহিরের প্রকৃতির কোল হইতে, অধিক পরিমাণে শীতল বাতাস আনিয়া যেন কামরার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিল।

আমি স্ফটিক জানালাগুলি তুলিয়া দিলাম। মিঃ—পি, এক পেয়ালা চা খাইবার জন্য—এক খানসামাকে ডাকিলেন।

সেই শীতের রাত্রে, সেই কন্‌কনে মাঠের হাওয়ার মধ্যে, এক পেয়ালা উষ্ণ চা,—মিঃ পিঃ'র পক্ষে বড়ই সুখকর বোধ হইল। তিনি আমার জন্য আর এক পেয়ালা আনিবার হুকুম করিলেন, কিন্তু আমি আবশ্যক বোধ না করায় ফিরাইয়া দেওয়া হইল। আসানসোলে এঞ্জিন বদ্‌লান হয়, ব্রেক্‌সম্যান ও গার্ড বদলী হয়, কয়লা লওয়া হয়—এ সকল কারণে একটু দেরীও হয়। আসানসোলেই আমরা উপবের শয্যা আশ্রয় করিলাম। রাত্রি অধিক হইয়াছে, নিদ্রাও একটু দরকার।

রাণীগঞ্জ হইতে আসানসোলের পথে দেখিলাম, মাঠের মধ্যে সেই নিশীথ অন্ধকারের জমাট ভাব একটু শিথিল করিয়া দিয়া, শ্রেণীবদ্ধভাবে অসংখ্য অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। কোথাও একটা, কোথাও বা দুই চারিটা—কোথাও বা দশ বারটা একত্রে জ্বলিতেছে। যেন নিভৃত চিন্তায় উপবিষ্ট সন্ন্যাসীর দল—গভীর রাত্রে মাঠের মধ্যে "ধুনী" জ্বালাইয়া শীতের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতেছে। অন্ধকার সমুদ্রে আলোকবিকাশের এ দৃশ্যটী দেখিতে বড়ই সুন্দর। মিঃ পিঃ বলিলেন—কোক্ কয়লা প্রস্তুত করিবার জন্য পাথুরিয়া কয়লার স্তূপে অগ্নিসেক করা হয়—তাহাতেই জলন্ত অগ্নিস্তূপের সৃষ্টি।

রাণীগঞ্জ হইতেই বাঙ্গালার সমতল ভূমির যেন একটু পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। হুগলী বর্দ্ধমান প্রভৃতি বিভাগের মধ্য পথে যেমন সমতল ক্ষেত্র দেখিয়া আসিয়াছি রাণীগঞ্জ ছাড়াইবার পর তাহার যেন বিরাম হইয়াছে। রাত্রি দুইটার পর মধুপুরে পৌছান গেল। মধুপুর ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের করুণায়, এখন একটী ছোট খাট নগরে পরিণত হইয়াছে। বাঙ্গালী ও সাহেবেরা অনেক বাঙ্গলা তৈয়ার করিয়া মধুপুরে বাস করিতেছেন। এখানকার জল হাওয়া খুব ভাল।

এখন আকাশ একটু পরিষ্কার। গাড়ী অবিরাম গতিতে চলিতেছে। মাঝে মাঝে যদি এক একটি ষ্টেসনে না থামিত তাহা হইলে হয়ত মনে হইত, অক্লান্ত গতিতে যেমন গ্রহ নক্ষত্রাদি কক্ষে কক্ষে পরিভ্রমণ করে, ট্রেনখানা তাহাদেরই মত গতি বিশিষ্ট হইয়া কে জানে—কোন্ অলক্ষ্য পথে চলিয়াছে। উষার অস্ফুট আলোকে, রজনীর শেষভাগে, সিমুলতলা, নওয়াদি, প্রভৃতি স্থানের ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। সেই নিস্তব্ধ রজনীতে দ্রুতগামী ট্রেণের দর্পিত গতির ঘাত প্রতিঘাতে, সেই ক্ষুদ্র পাহাড়ের মধ্যে এক সুন্দর প্রতিধ্বনি উঠিতে ছিল। আমি ইহার পরে যে সমস্ত বড় বড় পাহাড় দেখিয়াছি তাহার তুলনায় নওয়াদির সীমা বেষ্টিত পাহাড় কিছুই নহে।

বেনারস ও হাবড়ার মধ্যে দুইটী বড় বড় পুল পার হইতে হয়। একটী লক্ষীসরাইএর ও অপরটী শোণের। শোণের পুলটী সর্ব্বাপেক্ষা বড়। আর্য্যদিগের প্রাচীন "সুবর্ণভদ্রার" আর সে শক্তি নাই—সে তরঙ্গ ভঙ্গময়ী প্রবল স্রোত নাই। এখন কেবল বালুকারাশি নদী গর্ভের আদ্যোপান্ত অধিকার করিয়া রৌদ্রালোকে চিক্ চিক্ করিতেছে। নদীর কলেবর, ক্রমশঃ ম্যালেরিয়া রোগীর মত বিশীর্ণ হইয়া কলিকাতার টালিস্ নালার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। আগে নাকি শোণের বালুকামিশ্রিত জলস্রোতের সহিত সোণার গুঁড়া ভাসিয়া আসিত, তাই আর্য্যেরা সাধ করিয়া ইহার সুবর্ণভদ্রা নাম দিয়াছিলেন। শোণ ও নর্ম্মদা এক ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন। একটানা স্রোতে গা ঢালিয়া সুবর্ণভদ্রা আপন মনে চলিয়াছে। সুবর্ণভদ্রার সে প্রাচীনকালের তেজ নাই, তরঙ্গায়িত বক্ষে দুকূল ভাঙ্গিবার সামর্থ্য নাই। রেল কোম্পানী এই পুল বাঁধিতে অনেক টাকা খরচ করিয়াছেন। চারি দিক হইতে ছোট বড় অনেক খাল কাটাইয়া মাঠের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়া শোণের স্রোত-বেগ কমান হইয়াছে। এখন শোণের শীর্ণ বক্ষের আশে পাশে, বামে দক্ষিণে বালুকাময় চড়া। চড়ার উপর বালিরাশি, আর হীনতেজ তরঙ্গগুলির প্রতিঘাত জনিত শুভ্র ফেণধারা। কোথাও সেই শুভ্র ফেণধারা—স্রোতমুখে পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছে। শোণের উপরে পুল, সর্ব্বোপরি নীলাকাশ, ও নদবক্ষে সুধা ধবল ফেণরাশি দেখিয়া আমার মনে সহসা—

বৈদেহি পশ্যা মলয়াৎ বিভক্তং
মৎসেতুনা ফেনিলম্বুরাশিম্।
ছায়াপথেনের শরৎ প্রসন্নম্
আকাশমাবিষ্কৃত চারুতারম্॥

এই শ্লোকটী জাগিয়া উঠিল। কল কল শব্দে, দ্রুতবেগে,



কাশী—দশাশ্বমেধ ঘাট।

সেণমালা গলায় পরিয়া, নাচিতে নাচিতে শোণ প্রবাহ উন্মত্তের ন্যায় বালুকারাশির উপর দিয়া চলিতেছে—আর তাহার উপর সূর্য্য কিরণ পড়িয়া চিক্‌মিক্ করিতেছে। কোথাও বা ধীবরের দুই একখানি ক্ষুদ্র নৌকা ভাসিয়া যাইতেছে, কেহ বা করুণকণ্ঠে সেই নৌকায় বসিয়া গান গাহিতেছে, এ দৃশ্য অতি মনোরম।

গাড়ী ক্রমে পাটনায় আসিয়া পৌঁছিল। পাটনা ষ্টেসনের পথের দুই পার্শ্বে অতি কুৎসিত মৃণ্ময় কুটীরাশি, মাঝে মাঝে কোটা দালান দেখিয়া অবশ্য আমাদের মনে সে প্রাচীন "পাটলীপুত্র" বা গ্রীকদিগের "পালিবত্রা"র কথা মনে পড়িল না। পাটনার একটু প্রাচীন বিবরণ দেওয়া আবশ্যক। পাটলীপুত্র খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে অজাতশত্রু কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। ইহার পূর্ব্বে প্রাচীনকালে "রাজগৃহ" মগধের রাজধানী ছিল। অজাতশত্রুর পর ইহা যথাক্রমে নন্দবংশের চন্দ্রগুপ্তের ও অশোকের রাজধানী হয়। পাটনা দেখিয়া আমাদের মনে "মুদ্রারাক্ষসের" কথা জাগিয়া উঠিল। অশোকের সময়ে পাটনার অবস্থা অতি সমৃদ্ধি-সম্পন্ন। পথি পার্শ্বে ছায়াময় বৃক্ষরাশি, মধ্যে মধ্যে সুগভীর কূপ, ও জলাশয়,—বাহিরের স্থানে স্থানে সাধারণ উদ্যান ও পান্থশালা—এ সমুদায়ই তাঁহার সময়ে নগরীর শোভা বর্দ্ধন করিত। তাঁহার সাধের "কুসুমপুর" এখন কাল স্রোতে ভাসিয়া বর্ত্তমান শ্রীহীন "পাটনায়" আসিয়া উপনীত হইয়াছে। আমাদের বর্ণনা প্রণালী দেখিয়া কেহ যেন না মনে করেন, বর্ত্তমান পাটনার স্থানে অতীতের পাটলীপুত্র ছিল। মিগাস্থিনিশ বলিয়াছেন, "পাটলীপুত্র দীর্ঘে আট মাইল, প্রস্থে সার্দ্ধেক মাইল। নগরীর চারি দিকে সুগভীর খাত, উচ্চ প্রাচীর ও চারি পার্শ্বে ঘুরিলে চতুঃষষ্ঠি বাজতোরণ ও দুই শত গৃহচূড়া লক্ষিত হইত।" কোথায় বা সেই "মহাবলী" ও "সুগাঙ্গ্য" প্রভৃতি রাজ প্রাসাদ, আর কোথায় সেই মহাকীর্ত্তিমান হিন্দু নরপতি অশোক!—এখন পাটনার নামে কেবল অবহর ও ছোলার কথা মনে পড়ে। অশোকের সেই মনোহর স্তূপাবলী এখন কাল গর্ভে বিলীন। থাকিবার মধ্যে পাটনার গবর্ণর রাজা রাম নারায়ণের কেল্লার ভগ্নাবশেষ—আর

মীরকাশিমের কলঙ্কময় কীর্ত্তি কাহিনী—"পাটনার হত্যা-কাণ্ডের স্মৃতি।"

পাটনার সিবিল ষ্টেসন বাঁকিপুর। মিলিটারি ষ্টেসন দানাপুর। বাঁকিপুরে পুলিশ, কাছারি ইত্যাদি আছে—লোকজনও অনেক—বাঙ্গালীও যথেষ্ট। নিজ পাটনা সহরে মুসলমানের ভাগ বেশী। আর দানাপুরে—সবকারী গোরাবারিক, বা ক্যাণ্টনমেণ্ট। দানাপুরের চৌদ্দ মাইল উত্তরে ভাগিরথী ও শোণের সম্মিলন স্থান।

দানাপুরের পর ডুমরাওন ও বক্সার বিশেষ রূপে উল্লেখ-যোগ্য। ফিরিবার সময় আমরা ডুমরাওনে নামিয়াছিলাম—সুতরাং এতদসম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিলে আপত্তি হয় না। ডুমরাওনে এখানকার মহারাজার রাজধানী। বেহারী জমীদারদের ডুমরাওনের মহারাজা একজন খুব গণ্য মান্য। ভাগীরথী তীরে পুরাতন রাজবাটী। সহরটী দেখিতে শুনিতে নেহাত মন্দ নয়। ডুমরাওনের "সতী মন্দির" আজও রাজপুরীর সান্নিধ্যে—পাতিব্রত্য ধর্ম্মের কীর্ত্তি নিদর্শনরূপে প্রতিস্থাপিত। পুরাকালে এই ডুমরাওন রাজবংশেই কোন কুললক্ষ্মী মৃত পতির—সহমৃতা হইয়াছিলেন। মন্দিরের মধ্য ভাগে একটী প্রস্তরময় ক্ষুদ্র বেদী। বেদীর উপর দুইটী ক্ষুদ্র শিলা খণ্ড। এই দুই শিলা খণ্ডের মধ্যে দক্ষিণ দিকেরটীর গাত্রে এক উপবীত, ও বামটীর শিরোদেশে সিন্দুর চিহ্ন। এখানে একজন ব্রাহ্মণ অবস্থান করেন। তিনি প্রতিদিন এই প্রস্তরময় দম্পতীর আরতি ও পূজা করিয়া থাকেন। রাজ পরিবার-ভুক্ত যে কোন ব্যক্তিই হউন না কেন—এমন কি স্বয়ং মহারাজ পর্য্যন্ত—এ বাড়ীতে আসিয়া সর্ব্বাগ্রে সতীমন্দির দর্শন করেন। যে ভারতবর্ষ পুণ্যব্রত ধারিণী—সাধ্বী ধর্ম্ম-পরায়ণা কুল মহিলাদের জন্য—"ধর্ম্মের ক্রীড়াভূমি" বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল—আজ তা নরকের পুতিগন্ধে পরিপূর্ণ। মিঃ পিঃর সহিত ডুমরাওনের ভূত পূর্ব্ব মন্ত্রী রাজা জয়প্রকাশ লালের পরিচয় ছিল। তিনি আমাদের যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিলেন। রাজপুরীর আবশ্যকীয় ও দর্শনীয় স্থান গুলি তাহার সহায়তায় খুব ভাল করিয়া দেখা হইল। তিনি আমাদের দুই এক দিন থাকিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কার্য্য গতিকে তাহা হইল না। অত বড় একটা রাজ্যের মন্ত্রী, সর্ব্বময় কর্ত্তা, বেহারিদের মা বাপ তিনি, কিন্তু তাহার নম্রতা যেন বালকের মত।

ইংরাজ রাজত্বে বক্সার একটী আবশ্যকীয় স্থান হইয়া উঠিয়াছে। আজকাল আবার প্লেগের মাহাত্ম্যে বক্সার পরীক্ষা ক্ষেত্রের প্রবেশ-তোরণ। এখানে গাড়ী পৌঁছিলেই মনে হয় "ঐ চৌসা আসিতেছে।" এই স্থান হইতে আরোহীর মন চৌসার আতঙ্কে আকুলিত হয়। এই বক্সারের অনতি দূরে বিশ্বামিত্রের আশ্রম ক্ষেত্র। এখন সে রাম নাই, অযোধ্যা নাই, ত্রেতা নাই, বিশ্বামিত্র নাই, ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা নাই,—আছে কেবল আশ্রম স্থান অধিকার করিয়া একটী ক্ষুদ্র মন্দির। মন্দিরের মধ্যে একখানি প্রস্তর ফলক। এই প্রস্তর খণ্ডই নাকি মহর্ষির যোগাসন। প্রস্তর ফলক দেখিয়া সেই দর্পিততেজ ক্ষত্রিয় রাজের "ব্রাহ্মণত্ব" লাভের ঘোর সাধনার কথা মনে পড়িল। সেই দানসাগর, ভিখারি রাজ রাজেন্দ্র হরিশ্চন্দ্রের কথা মনে পড়িল। সেই নবদুর্ব্বাদলশ্যাম রাজীবলোচন রামচন্দ্রের কথা মনে পড়িল। হায় রে! ভারতের সে সব সুখের দিন কোথায়।

প্রাচীন বক্সার দুর্গের সন্নিকটে "রামরেখাঘাট।" রাম-চন্দ্র ঋষিদিগের বিঘ্নোৎপাদিনী তাড়কাকে নিধন করিয়া বিশ্বামিত্রের আশ্রমে প্রত্যাগমন করেন। তিনি তূণীর সংলগ্ন রুধির ধারা মুছিয়া ফেলিবার জন্য মৃত্তিকাতে যে রেখাপাত করেন—তাহা হইতেই এই "রামরেখা" নামের উৎপত্তি। এইজন্য সমীপবর্ত্তী নহরের (খালের) নাম "রামরেখা" হইয়াছে। এই খালের উপরের ইষ্টকময় সেতু দিয়া নগরে যাওয়া যায়।

ইংরাজ রাজত্বে, বক্সারের কোন একটা বিশেষত্ব নাই। পাঠানী আমলের সেই হুমায়ুনের প্রধান শত্রু বাদসাহ শেরসাহের কবর এই বক্সার হইতে চারি পাচ মাইল দূরে সাসিরামে। কাছে আর একটী বৌদ্ধ মন্দিরও আছে, কিন্তু কাহার আমলে নির্ম্মিত হইয়াছিল স্থির করা গেল না। এই বক্সারে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা, যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। পলাশীর যুদ্ধে বিজয়শ্রী লাভ করিয়া ইংরাজ বাঙ্গালায় প্রবেশাধিকার লাভ করেন। আর সুজাউদ্দৌলাকে পরাভব করিয়া উত্তর পশ্চিমে প্রবেশ করেন। বলিতে গেলে—একদিকে বক্সার ও অপর দিকে পলাশী, এই ভারতে ইংরাজ রাজ্য-প্রবেশ-দ্বার স্বরূপ।

বক্সার হইতে মিঃ পিঃর সহিত আমার বিচ্ছেদ হইল। ডুমরাওন রাজবাড়ীতে তাঁহার কি কাজ আছে, তজ্জন্য তিনি থাকিয়া গেলেন। তিনি এলাহাবাদে আমার সহিত মিলিত হইবেন এ আশ্বাসে কতকটা মন বাঁধিলাম। আমি কাশার ঠিকানা তাহাকে দিয়া আসিয়াছি, তিনি সেখানেও আসিতে পারেন।

দিল্‌দারনগর পার হইয়াই দেখি রেলের পথ আর যেন শেষ হইতে চাহে না। গাড়ি ক্রমাগতই চলিয়াছে। হুস্ হুস্, চটাপট্ শব্দের আর বিরাম নাই। কিন্তু সময় কাহারও অপেক্ষায় থাকে না। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে মোগলসরাই পৌঁছিলাম। তখন রাত্রি সাড়ে দশটা।

তখন, বোম্বে মেল, পঞ্জাব মেল, ছিল না। বেঙ্গল নাগপুর রেল তখনও হয় নাই। সে আজ পনের বৎসরের কথা। তখন মোগলসরাই হইতে বরাবর রাজঘাটে যাইতে হইত। এখন মোগলসরাই হইতে কাশী পর্য্যন্ত সপাসর যাওয়া যায়। আউধ—রোহিলখণ্ড কোম্পানির ব্যয়ে এখন বারাণসী পার্শ্ব প্রবাহিতা সুরধুনী পুলের বাঁধনে, পথিকের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন।

সেই তামসী রাত্রে গঙ্গা পার হওয়া বড় দুঃসাহসিক ব্যাপার মনে করিলাম। নূতন যাত্রী, বারাণসীর পথ ঘাট তত জানা নাই, আর মাঝিদেরই বা বিশ্বাস কি? দেখিলাম আরও দুই চারি জন ওপারের যাত্রী ছিলেন। তাঁহারা সে রাত্রে পার না হইয়া ষ্টেসনের বারান্দায় দরী বিছাইয়া আড্ডা গাড়িলেন। Discretion is the best part of valour, এই ভাবিয়া আমিও আশ্রয় স্থান খুঁজিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলাম।

দুঃখের স্মৃতি সহজে যায় না। সে রাত্রে অনেক কষ্ট পাইয়াছিলাম। সে কষ্টের কথাটা আজও মনে আছে—কারণ আমার কষ্টের মূল কারণ আমারই একজন স্বদেশী। এই পুরুষপুঙ্গব—রাজঘাটের ষ্টেসন মাষ্টার। আমার কাছে দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট। কাজেই প্লাটফরমে সামান্য মুসাফিরের মত সতরঞ্চ বিছাইতে বড় ঘৃণা বোধ হইল। "ওয়েটিংরুম" খুঁজিতে গিয়া দেখি—সব ঘরে চাবি বন্ধ। ষ্টেসন মাষ্টার বাবু বাঙ্গালী জানিয়া, তাহার সঙ্গে দেখা করিলাম। কিন্তু এই মনুষ্যত্বশূন্য বাঙ্গালী, কোন ক্রমেই ঘর খুলিয়া দিল না। তাহার আপত্তি কি তাহা বুঝিলাম না। কেবল একটা প্রভুত্ব দেখান তাহার উদ্দেশ্য। একটা ভদ্রলোক পরিবার লইয়া তাহার এ খাম খেয়ালির জন্য সারারাত বাহিরে কাটাইলেন। পরে এই ঘটনা আমরা D. T. S. সাহেবকে জানাই। তাহাতে এই ষ্টেসন বাবুটী সাত ঘাটের জল খাইয়াছিলেন। ঘটনাটা কি শুনুন। কাশীতে আমাদের এক বন্ধুর বাটীতে তাস পাসা খেলা হইতেছে। দেখি বাবুটী সহসা উপস্থিত। আমার সেই বন্ধুটী পরিচয় করাইয়াদিলেন—ইনি রাজঘাটের ষ্টেসন মাষ্টার। সে শ্রীমুখ দেখিয়া তখনই চিনিতে পারিলাম। তিনি আমায় দেখিয়া একটু থতমত খাইলেন। আমি শেষ সকলের সম্মুখে হাটে হাড় ভাঙ্গিয়া দিলাম। বাবুটী আমাদের নিকট মার্জ্জনা চাহিয়া বলিলেন—"মহাশয়, সব ভুলিয়া যান। আপনারা যে একটা খোঁচা দিয়াছেন তাহাতেই আমায় বদলী হইতে হইল।" একথা শুনিয়া বড় দুঃখ হইল।

এ সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। দুর্দ্দিনও থাকিল না। মেঘ চলিয়া গেল, বৃষ্টি গেল, প্রভাতে ধরণী সুবর্ণময় সূর্য্য কিরণে স্নাত হইল। আমরা সৈকতভূমিতে গিয়া সর্ব্ব প্রথমে সূর্য্যালোক ঝলসিত মেঘশূন্য নির্ম্মল আকাশের নীচে, সুরধুনীপারপ্রতিষ্ঠিতা—সেই সোনার কাশীর অর্দ্ধ চন্দ্রাকার ঐশ্বর্য্যময় মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। পর পার হইতে প্রভাতী হাওয়ায় ভৈরবীর সুর বহিয়া আনিতেছে—বড় মিঠাসুরে নবরৎ বাজিতেছে, দামামার মৃদু ধ্বনি উঠিতেছে, কলকল ছলছল শব্দে ভাগিরথীর একটানা স্রোত শব্দ করিতে করিতে চলিয়াছে। গঙ্গা বক্ষে নৌকা গুলি ধীর পবনে দুলিতে দুলিতে এদিক ওদিক চলিতেছে। ও পারের প্রস্তরময় দশাশ্বমেধ ঘাটে কাশীবাসী, নর নারীগণ প্রাতঃ স্নান করিয়া পবিত্র হইতেছে—এ দৃশ্য বড় সুন্দর লাগিল। এই স্বপ্ন রাজ্যের মনোমোহন দৃশ্যে অতীতের কষ্ট ভুলিলাম, প্রবাসের কষ্ট ভুলিলাম—মনে স্বর্গীয় শান্তির আবির্ভাব হইল।

নৌকায় উঠিলাম। সলিল রাশির উপর নাচিতে নাচিতে তরঙ্গ মাখা হইয়া আমাদের নৌকা খানি পাল তুলিয়া ধীর গতিতে পর পারে চলিল। সেই অদূরশ্রুত ভৈরবী সুরে সানাইয়ের আওয়াজ আরও পরিস্ফুট হইয়া কাণে বাজিতে লাগিল। হাওয়ার উপর জাহ্নবী বক্ষে সুরের তরঙ্গ ছুটিতে লাগিল। গৃহের উপর গৃহ—ঘাটের উপর ঘাট, চূড়ার উপর চূড়া, লোকের পাশে লোক—বোধ

হইল এমনটী আর কোথাও দেখি নাই। বারাণসীর শোভা দেখিয়া কত কালের সাধ পূর্ণ হইল।

পর পারে বেণীমাধবের ধ্বজা কত উর্দ্ধে বায়ুস্তর ভেদ করিয়া সেই হিন্দুকীর্ত্তিনাশক ঔরঙ্গজেবের কলঙ্ক কাহিনী প্রকাশ করিতেছে। পর পারে দশাশ্বমেধ ঘাটে নানা রঙ্গের বস্ত্র পরিয়া কত কুল মহিলা জাহ্নবী সলিলে দেহ প্রক্ষালন করিতেছে। এ জীবনে যাহা দেখি নাই তাহা দেখিলাম। আগামী বারে বারাণসীর অন্যান্য কথা বলিব।

রাজ্ঞীরাজত্বের অবসানে।

চিররবিকরোদ্ভাসিত, মহাদেশত্রয়-বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী ভিক্টোরিয়া এখন লোকান্তরিতা। সভ্যজগতের রাজন্যবর্গ তাঁহার মৃত্যুতে ব্যথিত, তদীয় নানাদিকদেশবাসী অসংখ্য প্রজাপুঞ্জ শোকার্ত্ত। শোক-তরঙ্গ দুস্তর আতলান্তিক পার হইয়া কেনেডায়, প্রশান্ত সমুদ্র অতিক্রম করিয়া অষ্ট্রেলিয়ায়, ভারত সাগর বাহিয়া আফ্রিকায় ও ভারতে আসিয়া লাগিয়াছে কি ইংলণ্ডীয়, কি কেনেডীয়, কি অষ্ট্রেলীয়, কি আফ্রিকীয়, কি ভারতীয় সকল হৃদয়ই উদ্বেলিত। শুধু দুর্দ্দণ্ড ব্রিটিস প্রতাপের কেন্দ্র বলিয়া ত ভিক্টোরিয়া সম্মানীতা নহেন, শুধু অগণিত প্রকৃতি পুঞ্জের ভাগ্যনিয়ন্ত্রীরূপে সমাদৃতা নহেন, পিতৃমাতৃপরায়ণা কন্যারূপে, পতিপ্রাণা সতীরূপে, আদর্শ জননীরূপে, পরদুঃখকাতরা রমণীরূপে, রাজধর্ম্মপরায়ণা রাণীরূপে পূজিতা। এ হেন রমনীর মণি রাণীর বিয়োগে যে দিগন্ত ব্যাপিয়া শোকোচ্ছ্বাস দেখা দিবে খুবই স্বাভাবিক।

এই মহীয়সী রমণীর দীর্ঘ জীবন ত পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ বা শুধু জাতিবিশেষের ভাগ্যের সহিত সম্বদ্ধ নহে, বিবিধ জাতির নিয়তির সহিত জড়িত! যে গুরুতর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যপালনে পুরুষের পুরুষকার হার মানে, যিনি কোমলহৃদয়া নারী হইয়াও আপন মহত্বগুণে তাহা সুচারু-রূপে সম্পন্ন করিয়া গেলেন, তিনি শুধু বিস্তীর্ণ ভূভাগের নয়, মানবহৃদয়েরও রাণী। মানবইতিহাসে তাঁহার রাজত্ব চির-প্রতিষ্ঠিত রহিল। ভিক্টোরিয়ার রাজধর্ম্ম পালন দেখিয়া মনে হয় বুঝি বা রাজলক্ষ্মী স্বয়ং নরলোকে অবতীর্ণ হইয়া সে ধর্ম্ম আপনি আচরণ করিয়া মানুষকে শিখাইয়া গেলেন। তাঁহার রাজত্বকালে ইংরেজের যে সর্ব্বতোমুখী জাতীয় উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে, ইংরেজ তাহা কখন ভুলিতে পারিবে না। ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের প্রাক্কালে ইংলণ্ডের অবস্থা কি দেখি? ইংরেজ রাজদরবার দুর্নীতির পরাকাষ্ঠায় উপনীত, আর ইংরাজসমাজে পাপের স্রোত অপ্রতিহত। ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠতাত রাজা চতুর্থ জর্জ্জের দরবার, দুর্নীতি-পরায়ণতায়, রাজা দ্বিতীয় চার্লসের দরবারের সমকক্ষ ছিল। রাজা চতুর্থ উইলিয়মের নীতিও কলুষিত ছিল। তবে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া একটু সাবহিত হইয়াছিলেন মাত্র। রাজার ও রাজদরবারের কুদৃষ্টান্ত দেখিয়া ও সংস্পর্শে আসিয়া ইংরাজ অভিজাতবর্গের মধ্যেও নীতির বন্ধন অত্যন্ত শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। বর্ত্তমান রাজদরবার ও ইংরাজ সমাজের অবস্থার সহিত সেই অবস্থায় তুলনা করিলে দেখি স্বর্গ নরক প্রভেদ। ভিক্টোরিয়ার দরবারের দ্বার ছিন্নবিবাহ-বন্ধন পুরুষ কি রমণীর পক্ষে চিররুদ্ধ। তাঁহার পবিত্র সিংহাসন-তলে কলুষিতচরিত্রের জন্য সূচাগ্র ভূমিরও অসদ্ভাব। মরকত ভূমে রাজোপম প্রভাবসমন্বিত অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন পার্নেলের বিড়ম্বনা ও ডিল্কীর ক্ষমতাবিপর্য্যয়ে ইংরাজের যে বিশোধিত নীতির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার মূল উৎস ভিক্টোরিয়ার শুভ্র নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের কাঞ্চনশৃঙ্গে। পতিত পাবনী সুরধুনীর ন্যায় ভিক্টোরিয়া চরিত্রসম্ভূতা নীতি অর্দ্ধ শতাব্দাধিক কাল ইংরাজ সমাজে প্রবাহিত হইয়া ইংরাজ রুচিকে মার্জ্জিত ও ইংরাজ নীতিকে বিশোধিত করিয়াছে।

এই ত গেল নীতির কথা। রাজনীতিতেই বা কি দেখি? ভিক্টোরিয়া রাজত্বের পূর্ব্বে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক অবস্থা কালিমাময় ও শোচনীয়। রাজা তৃতীয় জর্জ্জের রাজত্বের প্রারম্ভে দেখা যায় মন্ত্রীদলই সর্ব্বেসর্ব্বা, রাজার ক্ষমতা ও প্রজার স্বত্ব তাঁহাদের হস্তে ক্রীড়নকমাত্র। পার্লেমেণ্ট জাতি-সাধারণের নহে, দেশের প্রধানবর্গেরই মুখপাত্র। তাহার সভাপদ অর্থ বিনিময়ে ক্রীত বিক্রীত হইতেছে। রাজকর্ম্মচারী নিয়োগব্যপদেশে মন্ত্রিগণ স্বীয় স্বীয় দলের লোকে মহাসভাপূর্ণ করিতেছেন। ইহাতে অনু-গত প্রতিপালনও হইতেছে, আবার মহাসভায় তাঁহাদের প্রতাপ দীর্ঘকাল একচ্ছত্র ও প্রভুত্ব অটুট থাকিয়া যাইতেছে। উৎকোচের সাহায্যে ওয়ালপোলের বিংশতি বৎসরব্যাপী মন্ত্রীত্ব ও পার্লেমেণ্টের নেতৃত্ব সর্ব্বজন-বিদিত। কথিত আছে প্রস্তাব বিশেষের অনুরোধে স্বীয়

ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সার রবার্ট ওয়ালপোল একজনকে পাঁচ হাজার এবং অন্য একজনকে চারি হাজার মুদ্রা উৎকোচ স্বরূপ দেন। কিছুকাল পরে দেখিতে পাই সুচতুর তৃতীয় জর্জ্জ আপন বুদ্ধিজাল বিস্তার করিয়া, কখন অর্থের লোভ দেখাইয়া, কখন বা বিরুদ্ধমতাবলম্বী লোক সমবায়ে মন্ত্রীদল গঠিত করিয়া পদে ভেদ নীতির সাহায্যে তাঁহাদিগকে হীনবল ও উপেক্ষার বস্তু করিয়া ফেলিয়াছেন। রাজানুগতবর্গের ক্ষমতা মহাসভায় অপ্রতিহত, পার্লেমেন্টে মন্ত্রীদল শিখণ্ডিত্ব প্রাপ্ত। কোন্ প্রস্তাব সমর্থন আবশ্যক, কোন্ প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ প্রয়োজন রাজা স্বয়ং তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। মন্ত্রীদলের কে কোন বিভাগের মন্ত্রী হইবেন তাহা রাজাজ্ঞা সাপেক্ষ। রাজশক্তির আত্যন্তিক প্রাবল্যে প্রজাশক্তি ক্ষীণ ও নিয়মতন্ত্র কঙ্কালমাত্রে অবশিষ্ট, ততোধিক রাজতন্ত্রের ভূতাবিষ্ট। বাগ্মীবর বার্ক, ফক্স প্রভৃতি জন কয়েক উদারমতি জাতিসাধারণের স্বত্ব ও স্বাধীনতা সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর। কিন্তু রাজচক্রান্তে তাঁহারা বিফল-যত্ন। রাজা তৃতীয় জর্জ্জ ছলে বলে স্বাভিষ্ট সাধনে রত। বৈধাবৈধ বিচার নাই। কখন বা ভয় দেখাইতেছেন, কখন বা বলিতেছেন তদনভিপ্রেত প্রস্তাব গৃহীত হইলে তিনি ইংলণ্ড ছাড়িয়া যাইবেন, কদাপি বা তাঁহার মন্ত্রি-গণকে এই বলিয়া শাসাইতেছেন যে তিনি তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পার্লেমেন্টে বিধি বদ্ধ আইনে স্বাক্ষর করিবেন না। এই কি নিয়মতন্ত্র শাসন?

চতুর্থ জর্জ্জ পিতার ন্যায় ক্ষমতাশালী না হইলেও সুযোগ পাইলে যথেচ্ছাচার করিতে ছাড়িতেন না। তিনি তাঁহার মন্ত্রীদিগকে ঘৃণা করিতেন এবং মন্ত্রীরাও তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন।

রাজা চতুর্থ উইলিয়ম তাঁহার অশ্বক্রীড়ারত অগ্রজের অপেক্ষা রাজকার্য্যে অনেক অধিক মনোযোগী ছিলেন সন্দেহ নাই। তিনি প্রজার স্বত্ব ও পার্লেমেন্টের ক্ষমতা লোপ করিতে বিধিমত প্রয়াস পান নাই সত্য, কিন্তু তিনিও সময় সময় পার্লেমেন্টের মতামতের অপেক্ষা না করিয়া সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছা পরিচালিত হইয়া মন্ত্রীপরিবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রথমতঃ রিফর্ম্ম বিলের সমর্থন করিয়া পরিবারবর্গের ও অবৈধ সন্তানগণের কুপরামর্শে বিরুদ্ধাচরণ করেন। ভিক্টোরিয়া-রাজত্বের রাজনৈতিক অবস্থার সহিত তুলনায় সেই রাজনৈতিক অবস্থা আসমান জমিন তফাৎ। মন্ত্রীগণ কাইসরপত্নীর ন্যায় সন্দেহের অতীত স্থানে অবস্থিত। প্রজার স্বত্ব সুরক্ষিত, রাজ ক্ষমতা সুব্যবহৃত। তাই বলি ভিক্টোরিয়া রাজত্বের নির্ম্মলতা, উদারতা, সুখ স্বচ্ছন্দতা, শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা ইংরাজ ভুলিতে পারিবে না। যতকাল ইংরাজ-জাতি থাকিবে ততকাল ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি হৃদয়ে পোষণ করিবে। ভিক্টোরিয়া নাম কণ্ঠের হার করিয়া রাখিবে।

ইংলণ্ড ছাড়িয়া এবার ভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত করি। ভিক্টোরিয়ার মত ন্যায়ধর্ম্ম পরায়ণা রাণী সিংহাসনাধিরূঢ়া না থাকিলে ভারতভাগ্যে কি ঘটিত জানি না। সিপাহী বিদ্রোহের অবসানে অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য যখন প্রতিহিংসায় ক্ষিপ্তপ্রায় ইংরাজকুল "রক্তের পরিবর্ত্তে রক্ত" বলিয়া বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল, মনে হইল বলদৃপ্ত ইংরাজের কোপদাবানলে পুড়িয়া এদেশ ছারখার হইয়া যাইবে। দয়ার অবতার লর্ড ক্যানিং শত চেষ্টায় এ অনল নির্ব্বাপিত করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া ইংরাজ গবর্ণমেন্টকে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার উত্তর দিতে যাইয়া রাণী লিখিতেছেন—"ভারতবাসীদিগের প্রতি এবং বিশেষতঃ —দোষী, নির্দ্দোষী, শত্রু মিত্র এবং সৎ অসৎ নির্ব্বিশেষে সিপাহীগণের প্রতি ইংলণ্ডের জন সাধারণেও অখৃষ্টানভাব প্রকাশ করিতেছে দেখিয়া সম্পূর্ণরূপে লর্ড ক্যানিংএর মত মহারাণীর প্রাণে যে যাতনা ও ক্রোধের উদয় হইতেছে ইহা তিনি সহজেই বিশ্বাস করিবেন। কিন্তু সম্ভবতঃ এই ভাব অধিক দিন স্থায়ী হইবে না। নিরপরাধিনী অবলা এবং কোমলমতি শিশুগণের উপর যে অকথ্য অত্যাচার হইয়াছে, তাহার বিবরণ শুনিয়াই লোকের মনে এই ভীষণ ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছে। এই সকল ভীষণ নিষ্ঠুরতার অনুষ্ঠাতৃ-গণের পক্ষে কোন দণ্ডই অযথারূপে কঠোর হইতে পারে না, এবং এইরূপ কঠোর দণ্ডবিধান করিবার সময় প্রাণে ক্লেশ হইলেও সমুদায় দোষী ব্যক্তিদিগকে ন্যায়ের কঠোরী-তম শাসনে শাসিত করিতে হইবে। কিন্তু জাতি সাধারণের প্রতি—দেশের শান্ত অধিবাসিগণের প্রতি—যে সকল সুহৃদ্ ভারতবাসী আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন, ইংরাজ পলাতকদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন, এবং আমাদের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন—তাঁহাদিগের সকলের প্রতি যার পর নাই সদয় ব্যবহার করিতে হইবে। তাঁহাদিগকে জানিতে দেওয়া

উচিত যে, তাম্র ত্বকের প্রতি আমাদের কোনও ঘৃণা নাই, বিন্দুমাত্রও নাই। কিন্তু তাহাদিগকে সুখী, সন্তুষ্ট এবং বর্দ্ধিষ্ণু দেখাই তাঁহাদের রাজ্ঞীর প্রাণের ঐকান্তিকী ইচ্ছা।"

কি মহত্ত্ব! কি উদারতা! কি বিচক্ষণতা! কোমলতা ও দৃঢ়তার কি অপূর্ব্ব সমাবেশ! ভিক্টোরিয়া! ভিক্টোরিয়া! তুমি কি ভারতের দুর্দ্দিনের বন্ধু, অসময়ের সহায় হইবে বলিয়াই ভারতের বিধাতৃকর্ত্তৃক প্রেরিতা ও রাজপদে অভিষিক্তা হইয়াছিলে? বংশপরম্পরায় ভারতবাসী তোমার এই করুণা কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। কিন্তু এই কি সব? তা ত নয়। বিদ্রোহান্তে সাক্ষাৎ ভাবে স্বহস্তে ভারতশাসনভার গ্রহণ উপলক্ষে যে ঘোষণা পত্র প্রচারিত হইল, যে স্বত্বের সনন্দকে আমরা কি কংগ্রেসমঞ্চে কি সংবাদপত্রস্তম্ভে আমাদের 'ম্যাগনা কার্ট' বলিয়া সগর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়া থাকি, তাহাতেও যে রাণীরই হস্তাঙ্ক পরিলক্ষিত হয়। মন্ত্রিগণরচিত ঘোষণাপত্রের পাণ্ডুলিপির ভাব ও ভাষা তাঁহার নিকট আপত্তিজনক ও ক্ষেত্রানুপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইল। তিনি জর্ম্মাণ প্রবাসে থাকিয়াও লর্ড মামসবারীর দ্বারা মন্ত্রীবর লর্ড ডার্ব্বীকে লিখিয়া পাঠাইলেন।

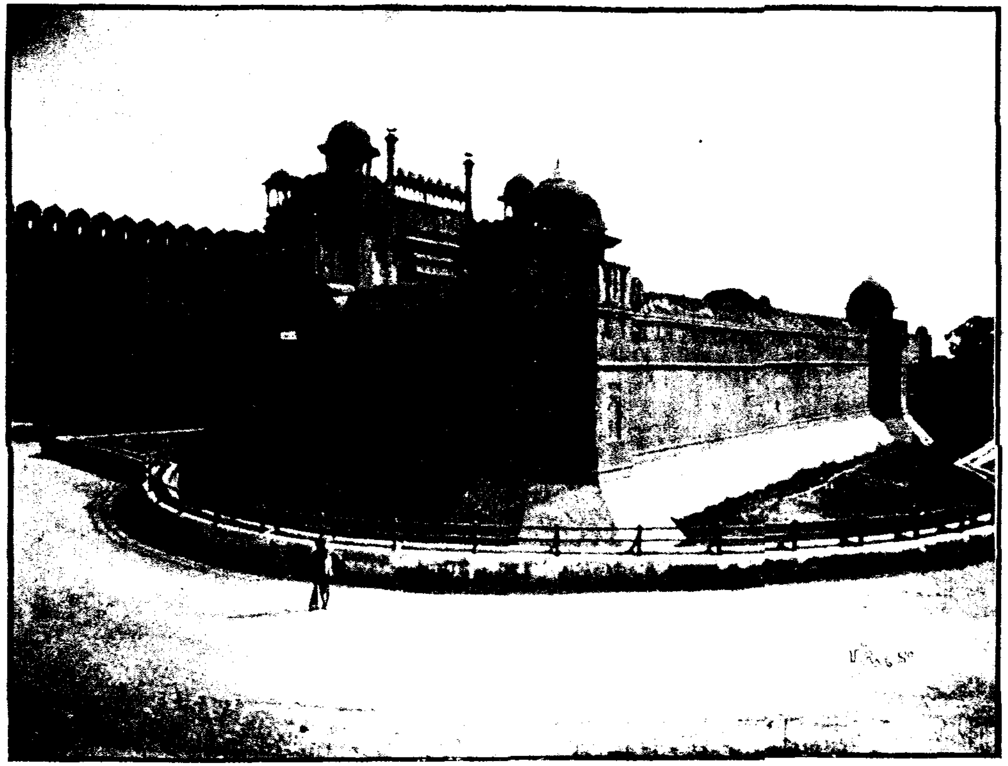
"ভারতের ঘোষণা পত্রের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে মহারাণীর কি কি আপত্তি আছে, তৎসমুদায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লর্ড ডার্ব্বীকে জ্ঞাপন করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। লর্ড ডার্ব্বী স্বয়ং তাঁহার সুমার্জ্জিত ভাষায় এই ঘোষণা পত্রখানি রচনা করিলে মহারাণী অত্যন্ত আহ্লাদিত হইবেন। দেশব্যাপী ভীষণ আত্মদ্রোহের অবসানে, সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহাদের মাতৃভূমির শাসনভার গ্রহণ করিবার সময়, মহারাণীর রাজত্বের ভাবীকালে যে সমুদায় প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, সেই সকল প্রতিজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিয়া কি রীতি অবলম্বনে তিনি রাজ্য শাসন করিবেন, তাহা বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য, তাঁহার কোটি কোটি পূর্ব্বদেশীয় প্রজাবর্গের নিকটে এই ঘোষণা পত্র প্রচারিত হইতেছে, এই সকল কথা উজ্জ্বলরূপে স্মরণ রাখিয়া যেন এই পত্রখানি রচনা করা হয়। বিশেষতঃ এই ঘোষণা পত্র একজন রমণীর নামে প্রচারিত হইতেছে, এই কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখিয়া ইহা লিখিত হয়, মহারাণীর এই বিশেষ অনুরোধ! এইরূপ একটি ঘোষণা পত্রের প্রতি পংক্তির মধ্য দিয়া উদারতার এবং ধর্ম্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার ভাব বহির্গত হওয়া প্রার্থনীয় এবং এতদ্বারা যে ভারতবাসিগণ মহারাণীর ইংরাজ প্রজাবর্গের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সমান অধিকার ভোগ করিয়া, সভ্যতার পদাঙ্কচারী সর্ব্বপ্রকারের সুখ সম্পদ লাভ করিবে, এই ঘোষণা পত্রে অতি সুস্পষ্ট ভাষায় ইহা তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।"*

রাণীর এই ইঙ্গিত অনুসরণে ও তদীয় ভাবাবলম্বনে বর্ত্তমান ঘোষণা পত্র রচিত। এই শিলাভিত্তির উপরেই ইংরাজের ভারতরাজ্যের বিশাল সৌধ প্রতিষ্ঠিত। ইহাতেই আবার ভারতের রাজন্যবর্গের সিংহাসন ও প্রকৃতিপুঞ্জের ভদ্রাসন সুরক্ষিত। এই সেদিনকার মণিপুর হত্যাকাণ্ডের শোণিতাবর্ত্তে পড়িয়া মণিপুর সিংহাসন কোথায় লুকাইত কেহ খুঁজিয়াও পাইত না। কিন্তু এই ঘোষণা পত্র সেতুস্বরূপ হইয়া ইহাকে রক্ষা করিয়াছে। ড্যালহৌসীর সর্ব্বগ্রাসিনী লোলজিহ্বা করাল কালী নীতির স্থলে ইহা অভয়দা, শুভদা বরদা, রক্ষাকালীরূপে বিরাজমানা। ইহাতে ভারতে অনিয়ন্ত্রিত শক্তিযুগের অবসান করিয়া সুনির্দ্দিষ্ট স্বত্বযুগের সূচনা করিয়াছে। অনিশ্চয়তার উদ্বেগ নাই, অরাজকতার বিশৃঙ্খলতা নাই। দেশে পরমা শান্তি বিরাজিতা। সাধে কি ভারতবাসী মহারাণী বলিতে রাজভক্তিতে গদগদ! দেশব্যাপী এই শান্তির ক্রোড়ে মূর্ত্তিমতী জাতীয় আশা ও আকাঙ্ক্ষারূপিণী জাতীয় সমিতির জন্ম। ভারতে ভিক্টোরিয়া রাজত্বের এ কি সামান্য গৌরব! রাম রাজ্যে, যুধিষ্ঠিরের একচ্ছত্রে, অশোকের সময়ে বা আকবরের আমলে যাহা সম্ভব হয় নাই ভিক্টোরিয়া রাজত্বে তাহা সম্ভাবিত হইল। এ কীর্ত্তির নিকট সেতুবন্ধ ও শিলালিপি, ইন্দ্রপ্রস্থ ও আগ্রা হার মানিয়াছে। প্রচলিত মুদ্রার ন্যায় ভারতের নবজীবনে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মূর্ত্তি মুদ্রিত রহিল। ভারত ইতিহাস চিরকাল ভৃগুপদচিহ্নের ন্যায় এ মুদ্রাঙ্ক সাদরে আপন বক্ষে ধারণ করিবে। ভারতের সুদূর ভবিষ্যৎ বংশীয়েরাও 'পুণ্যশ্লোক ভিক্টোরিয়া' বলিয়া রাণীর পবিত্র ও মহৎ নাম উচ্চারণ করিবে। তাহার উদ্দেশে শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করিয়া পিতৃগণের ন্যায় তাঁহার তর্পণ করিবে। মহালয়ায় এই মহামায়ারূপিণী মহিয়সী রমণীর মূর্ত্তি ও স্মৃতি বিস্মৃত হইবে না।

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র সোম।

* উদ্ধৃত অংশগুলি আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল প্রণীত ভিক্টোরিয়া চরিত হইতে গৃহীত।—লেখক।

২০ নং স্কট্‌স্ লেন, জ্ঞানমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত ও ২০৮।২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস দ্বারা প্রকাশিত।



দিল্লীর দুর্গ—লাহোর দ্বার।

KUNTALINE PRESS.



চতুর্থ ভাগ। } ফাল্গুন, ১৩০৭। { ৩য় সংখ্যা।

দাঁড়াও।

দাঁড়াও সুন্দরি! চক্ষের সম্মুখে ছায়াবাজিপ্রায়
এই বিবর্ত্তিত ব্রহ্মাণ্ড জগৎ এসে চলে যায়—
তার মাঝে তুমি দাঁড়াও সুন্দরি!
একবার দেখি দুটি নেত্র ভরি,'
প্রেমের প্রতিমা, প্রিয়ে, প্রাণেশ্বরি!
দাঁড়াও হেথায়।

আমি তরঙ্গিত আবর্ত্তসঙ্কুল উন্মত্ত জলধি,
উচ্ছৃঙ্খল,—কবি তোমারে সতত নিপীড়ন যদি,
তুমি স্নেহশ্যামা ধরিত্রী!—নীরব,
সহ্য কর, বক্ষ প্রসারিয়া, সব
লাঞ্ছনা, ও অপমান, উপদ্রব,
লহ নিরবধি—।

নিষ্ঠুর সংসার স্বার্থপর,—স্বার্থে নিমগ্ন থাকুক;
তুমি দাও প্রেম, তুমি দাও শান্তি, স্নেহ, এতটুক;
শূন্য অবসাদে, এস মাথা রাখি
ও কোমল অঙ্কে, এস চেয়ে থাকি
ও আনত নেত্রে, তুমিই একাকী
ফিরায়োনা মুখ।

সব দুঃখ হ'তে, সব পাপ হ'তে, অন্তর ফিরাই
তোমা পানে যেন, সেথা যেন সদা তোমারেই পাই!
তব ব্রত হোক, প্রীতি পুণ্যভরা,
ওগো শান্তিময়ী, ওগো শ্রান্তি হরা—
শুধু ভালবাসা, শুধু সেবা করা,
নীরবে সদাই।

যত অপরাধ, যত অত্যাচার, যাহা করি নাক,
সব কর ক্ষমা; হাস্যমুখে দেবী তুমি চেয়ে থাক।
পাতকী নারকী আমি যদি হই,
তবু ভালবাস তুমি প্রেমময়ি!
এ অধমে তবু সোহাগে চুম্বয়ি
বুকে করে রাখ।

* * *

স্বর্গীয় দিগম্বর সান্ন্যাল।

স্বদেশ তাড়িত।

পাবনার অন্তর্গত গাঁড়দহ গ্রামে মাতুলালয়ে দিগম্বর সান্ন্যাল মহাশয় ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পৈতৃক নিবাস ভূমি রাজসাহীর অন্তঃপাতী সোমস কলসী গ্রাম এবং ইঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। পিতা ৺রাজীব চন্দ্র সান্ন্যাল মহাশয় একটি খুনের মোকদ্দমায় পড়িয়া পলাতক হন। সান্ন্যাল পরিবার অতি বৃহৎ ছিল, এই দুর্ঘটনায় সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল। সহসা পরিবারস্থ অনেক ব্যক্তির মৃত্যু হয় এবং নানারূপে বিপন্ন হওয়া রাজীবচন্দ্র সান্ন্যাল মহাশয়ের স্ত্রী জগদম্বা দেবী স্বগ্রামের ভদ্রলোকগণের সাহায্য প্রার্থিনী হন। সাহায্য লাভ করা দূরে থাকুক, তাঁহারা এই সুযোগে সান্ন্যালদিগের অবশিষ্ট সম্পত্তিটুকু গ্রাস করিয়া বসেন। জগদম্বা দেবী চিরকালের জন্য দেশ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পিত্রালয়ে আগমন করেন। মাতার নিষেধে দিগম্বর স্বীয় পৈত্রিক গ্রামে আর জীবনে পদার্পণ করেন নাই। মাতুলবর্গ অবস্থাপন্ন ছিলেন, কিন্তু শিশু দিগম্বর ও তাঁহার মাতাকে তাদৃশ আদর দেখান নাই। তেজস্বিনী মাতা সেই গ্রামে পৃথক্ এক খানি ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই স্থানে দিগম্বরের ফেরার পিতা ছদ্মবেশে যাতায়াত করিতেন ও অতি কষ্টে যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিয়া পাঠাইতেন, তদ্দ্বারা কষ্টেসৃষ্টে সংসার চলিয়া যাইত।

আঘাতে আঘাতে লৌহ ইস্পাত হয়, উপর্য্যুপরি বিপৎপাতে দিগম্বরের চরিত্রবল ও মনের তেজ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

এক আনা বেতন মাপ।

দিগম্বর গ্রামের পাঠশালায় পড়িতেন, ও তথায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া গণ্য ছিলেন, কিন্তু পাঠশালার /০ আনা বেতন চালাইতে পারিতেন না। কয়েক মাস ক্রমাগত বেতন না দেওয়াতে পণ্ডিত মহাশয় দিগম্বরকে একদিন বিশেষ ভর্ৎসনা ও বেত্রাঘাত করেন। দিগম্বর বলিলেন, "গুরু মহাশয় আমি কোন রূপেই এক আনা বেতন চালাইতে পারি না, আমাদের দুটি সন্ধ্যা ভাতই চলে না," বলিতে বলিতে শিশু দিগম্বর হৃদয়াবেগে কাঁদিয়া ফেলিলেন। পণ্ডিত মহাশয় তদবধি তাঁহার মাহিয়ানা লইতেন না।

আশ্রয় চ্যুত।

এই অবস্থায় তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ৪৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন এবং পড়িবার জন্য বহরমপুরে উপস্থিত হন। এখানে গাঁড়দহ নিবাসী প্রেমলাল নাগ নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দিগম্বরকে আশ্রয় দান করেন। দিগম্বর বৃত্তির চারিটি টাকা মাতাকে পাঠাইয়া দিতেন। স্কুলে বিনা বেতনে পড়িতেন এবং প্রেম বাবুর বাসায় দুটি খাইতে পাইতেন, কিন্তু এ সুখ তাঁহার ভাগ্যে বেশী দিন রহিল না। প্রেম বাবুর বাসায় অনেকগুলি ছাত্র থাকিয়া পড়া শুনা করিত। তন্মধ্যে বাবুর নিতান্ত আত্মীয় একটি ছাত্রপ্রবর গণিকালয়ে চুরি করিয়া অপরাধগ্রস্ত হওয়ায় নাগ মহাশয় নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বাসার সমস্ত ছাত্রকেই তাড়াইয়া দেন। কেবল দুঃখের সহিত দিগম্বরকে বলেন —"দিগম্বর, শুধু তোমাকে অন্যত্র যাইতে বলিতে আমার বড় কষ্ট হইতেছে, তুমি বড ভাল ছেলে; কিন্তু কি করিব, আমি এরূপ অবস্থায় পড়িয়াছি যে, এক জনকে তাড়াইয়া অপর কাহাকেও আমার রাখিবার উপায় নাই।"

সহাধ্যায়ীর সহানুভূতি

অন্যান্য বালক যে যাহার স্থানে চলিয়া গেল, নিঃসহায় দিগম্বর স্কুলের পুস্তক কয়েকখানি লইয়া প্রাতে বাহির হইয়া গেলেন ও এদিক সেদিক ঘুরিয়া স্কুলের সময় স্কুলে উপস্থিত হইলেন। যথাসময়ে স্কুল ছুটি হইল, সারাদিন উপবাস করিয়া দিগম্বর নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বেলা অবসানে দিগম্বর চতুর্দ্দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিতে লাগিলেন, কে তাঁহাকে আশ্রয় দিবে? এতদবস্থায় শীর্ণ ও শুষ্ক মুখে তাঁহাকে রাস্তায় বেড়াইতে দেখিয়া তাঁহার একজন অবস্থাপন্ন সহপাঠী তাঁহাকে বলিল, "দিগম্বর, তুমি স্কুলের পর বাসায় যাও নাই? তোমায় এমন দেখাইতেছে কেন?" দিগম্বর নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কষ্টের সহিত অশ্রু সম্বরণ করিয়া তাঁহাকে সমস্ত অবস্থা বলিলেন। সহপাঠী শুনিয়া দুঃখিত হইলেন এবং বলিলেন—"তোমার কোন কষ্ট আর ভোগ করিতে হইবে না, এস আমাদের বাড়ীতে

থাকিবে।" বন্ধু অতি যত্নে তাঁহাকে হাত ধরিয়া নিজের বাড়ীতে লইয়া আসিলেন, এবং তাঁহাকে বিশেষ আদরে তথায় রাখিলেন। দিগম্বরের আহারের ও থাকিবার সমস্ত সুবিধাই হইল।

যে ঘরে দিগম্বর শুইতেন, সেই ঘরে তাঁহার সহাধ্যায়ীও একটি বড় বিছানায়, অপর পার্শ্বে, শুইতেন। একদিন দিগম্বর প্রাতঃকালে তাঁহার শয্যার অনতিদূরে একটি বড় মুক্তার মালা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বিস্মিত বালক ঝিকে মুক্তার মালা দেখাইয়া বলিলেন, "একি?" ঝি মৃদু হাস্যে রহস্য চাপা দিয়া "আমাকে দাও" বলিয়া মুক্তার মালাটি লইয়া চলিয়া গেল। দিগম্বর অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হইলেন, ভৃত্যটিকে এই ঘটনার গূঢ় মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করাতে সে এক জঘন্য অভিনয়ের বৃত্তান্ত তাঁহাকে অবগত করাইল। সেই বাড়ীর পার্শ্বে তাঁতি বাবুদের বাড়ী ছিল, তাহারা আঢ্য লোক ও তাঁহাদের একটি বউ দুশ্চরিত্রা ছিল। সহাধ্যায়ী বন্ধু-প্রবরের এই কীর্ত্তি অবগত হইয়া দিগম্বর দুঃখিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলেন, "দেখ ভাই, আমি অতি গরিবের ছেলে, আমার ভাত জোটে না। তোমরা বড় মানুষ, তোমাদিগকে সকলই সাজে। তবে যে পথে চলেছ, সে পথ ভাল নহে, উহা ত্যাগ কর। আমি বড় ভীত হইয়াছি, এখানে থাকা আমার সাহসে কুলায় না; আমায় ক্ষমা করিও, আমি চলিলাম।" বন্ধুবরের নানারূপ অনুনয় বিনয় উপেক্ষা করিয়া দিগম্বর আহারাদি না করিয়াই পুঁথি কয়েকখানি লইয়া আবার রাস্তার উপর দাঁড়াইলেন। কে কোথায় স্থান দিবে, আহার দিবে, এ চিন্তা বালকের মনে একবারও হয় নাই; যে ধর্ম্মনীতিপ্রসূত ভীতি ও সাবধানতা তাঁহার চরিত্রটিকে সমাজের ভূষণস্বরূপ করিয়াছিল, তাহা, তাঁহাকে বিপদ ও দুঃখ তুচ্ছ করিয়া বিলাসের গৃহ হইতে বাহিরে লইয়া আসিল। সারাদিন স্কুলে পড়া শুনা করিয়া অনাহারে অবসন্ন অবস্থায় দিগম্বর সন্ধ্যাকালে এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে যাইয়া বলিলেন, "মহাশয় আমি একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছাত্র। কোথায়ও থাকিতে স্থান না পাইয়া আসিয়াছি। যদি মহাশয় দয়া করিয়া বাসায় আশ্রয় দেন।" অনুসন্ধানে গৃহস্বামী জানিলেন, দিগম্বর স্কুলের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ছেলে, সুতরাং যত্নের সহিত তাহাকে বাসায় রাখিলেন। এ বাসায় আহারের বড় অসুবিধা ছিল, রাত্রি ১২টা কি ১টার সময় রান্না প্রস্তুত হইত। বাসার অপরাপর সকলে নিজ পয়সায় খাবার খাইতেন। দিগম্বর কিছুই খাইতেন না, পরন্তু বালক ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া রাত্রি ১০টার মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িতেন। কেহ তাহাকে জাগাইত না, এ অবস্থায় অনেক দিন রাত্রিকালে দিগম্বরকে উপবাসে যাপন করিতে হইত। যে হাঁপানি কাশিতে দিগম্বর ভবিষ্যতে অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, এই উপবাসজনিত কষ্টেই তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল। এক দিন বালক স্কুল হইতে আসিয়া ঝিকে বলিল "ঝি, আজ আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে আমায় কিছু খাবার দিতে পার?" ঝি বলিল "কি দিব বাছা? কিছুই নাই, রাত্রে রান্না হইলে খাইবে।" অনাহারে শুষ্ক মুখে পড়িতে পড়িতে দিগম্বর ঘুমাইয়া পড়িলেন, কেহ তাঁহাকে জাগাইয়া খাওয়াইল না। পরদিন প্রাতে দিগম্বর দাঁড়াইতে পারেন নাই,—ঝিকে বলিলেন "আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, আমায় চারিটি চাল দেও, আমি রান্না করিয়া খাই।" ঝি চারিটি চাল দিল, দিগম্বর তাহা চড়াইয়া দিয়া মনে করিলেন, বাসার গাছে বড় বড় করমচা হইয়াছে, তাহার কয়েকটা ভাতে দিলে খাইতে পারিবেন। এই মনে করিয়া করমচা ভাতে পাক করিলেন। আহার করিতে বসিয়া ঝির নিকট একটুকু লবণ চাহিলেন। ঝি বলিল "নুন বাসায় নাই, বাজার হইতে আনিতে দেরি হইবে।" দিগম্বর ভাত খাইতে আরম্ভ করিয়া দেখিলেন, লবণাভাবে ভাত অত্যন্ত বিস্বাদ হইয়াছে। নুন পাইবেন না জানিলে তিনি করমচা ভাতে দিতেন না। এখন আর খাইতে পারেন না। উপবাসী দিগম্বরের ভাত মুখে তুলিতে চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। ভাত আর খাওয়া হইল না। সেই দিন বড় কষ্ট হইল, দিগম্বর পুঁথি কয়েকখানি লইয়া আবার তাঁহার প্রথমকার আশ্রয়, আদি মুরব্বি প্রেম লাল নাগ মহাশয়ের নিকট যাইয়া কাতরভাবে বলিলেন, "আমার কোন স্থানে থাকিবার সুবিধা হইল না, আমাকে আশ্রয় দিন্।" প্রেম বাবু সাশ্রুচক্ষে দিগম্বরকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বাছা তোমাকে তাড়াইয়া দিয়া আমি বড়

মুক্তার মালা-রহস্য।

নূতন আশ্রয়।

করমচা ভাতে।

বদান্য প্রেম লাল নাগ মহোদয়।

অনুতপ্ত হইয়াছি, তুমি আমার এইখানেই থাক।"* এই অবধি দিগম্বরের বাসস্থানের কষ্ট দূর হইল।

লুচি ভাজায় বিঘ্ন।

দিগম্বর এই সময় পূজার ছুটিতে একবার মাতুলালয় গিয়াছিলেন। তিনি লুচি ভাজায় অতি সুদক্ষ ছিলেন। মাতুল মহাশয় একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "দিগম্বর, কল্য প্রাতে তোমায় লুচি ভাজিতে হইবে, সকাল সকাল স্নান করিয়া প্রস্তুত হইও।" প্রাতে একটুকু মেঘ হওয়াতে রৌদ্র উঠে নাই, দিগম্বর কাপড় খানি পরিয়া স্নান করিয়া চাদর খানি পরিলেন ও কাপড় শুকাইবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রৌদ্র না উঠাতে বিলম্ব হইতে লাগিল, দেখি দেখিয়া মাতুল মহাশয় দিগম্বরকে খুঁজিতে বাহির হইলেন; দূর হইতে মাতুলকে দেখিতে পাইয়া দিগম্বর অতি তাড়াতাড়ি অর্দ্ধ সিক্ত কাপড় খানি পরিয়া ফেলিলেন এবং মাতুল মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। মাতুল মহাশয় কাপড়ে হাত দিয়া বুঝিলেন, উহার অনেকটাই শুকায় নাই ও ভিজা কাপড় ত্যাগ করিতে বলিলেন। দিগম্বর নিরুত্তর রহিলেন; মাতুল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ক খানি কাপড়?" বারংবার জিজ্ঞাসা করাতে দিগম্বর বলিলেন, "আমার এক খানি কাপড় ও একখানি চাদর।" ইহাই তাহার স্কুলে যাওয়ার ও সর্ব্বদা পরিবার সম্বল এবং ইহাতেই তাঁহার বৎসর কাটে। মাতুল মহাশয় হৃদয়াবেগে দিগম্বরের গলা জড়াইয়া শিশুর ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন এবং তখনই নিজে বাজারে যাইয়া ৪ জোড়া কাপড় এবং ৪ জোড়া চাদর কিনিয়া তাঁহাকে দিলেন। দিগম্বর বাবু বলিতেন, "সেই অবধি আমি কাপড়ের কষ্ট পাই নাই।"

৪ জোড়া কাপড় ও ৪ জোড়া চাদর

হস্ত লিখিত পুঁথি।

এই দরিদ্র কিন্তু দুঃখ-সহিষ্ণু বালকের অদম্য অধ্যবসায়ের বিষয় কি বলিব, এল্ এ, পর্য্যন্ত তিনি যত পুস্তক পড়িয়াছেন, তাহার এক খানিও ছাপা পুস্তক নহে, ছাপা বহি কিনিবার অর্থ সংস্থান ছিল না। দিগম্বর নিজ হাতে সমস্ত পাঠ্য পুস্তক নকল করিয়া লইয়াছিলেন! বহু কৃচ্ছ্র লিখিত বহু বর্ষের পুঁথি গুলি তিনি অতি যত্নে রাখিয়াছিলেন। ইউক্লিডের জ্যামিতি এবং সাহিত্য ভূগোল প্রভৃতি সকল পুস্তকই তিনি হাতে লিখিয়া লইয়া ছিলেন। উদীয়মান প্রতিভাকে দারিদ্র্য আরও বর্দ্ধিত করিয়া দেয়, দিগম্বরের জীবনে আমরা সর্ব্বদা ইহা লক্ষ্য করিবার সুবিধা পাই।

পায়ে ফোস্কা।

তিনি যখন প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেন, তখন সহপাঠিগণ তাঁহাকে জুতা পরিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। ক্লাসের সকল ছেলেরই পায় জুতা, দিগম্বর তাহাদের সাগ্রহ অনুরোধ অর্থাভাবে রাখিতে পারেন নাই; কিন্তু প্রথম শ্রেণীতে উঠিলে সহপাঠিগণ বিশেষ পীড়ন আরম্ভ করিলেন ও চাঁদা তুলিয়া তাঁহাকে জুতা কিনিয়া দিবেন, এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। অগত্যা দিগম্বর ৷৷০ আনা মূল্যে এক জোড়া জুতা কিনিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু দিগম্বর বলিয়াছেন, তিনি সে জুতা দু এক দিন পরিয়া আর পরিতে পারেন নাই,—'আমি জীবনে জুতা ব্যবহার করি নাই, প্রথম জুতা পরিয়া পায়ে বড় বড় ফোস্কা পড়িল, তাহা সারিতে ২।৩ মাস লাগিয়াছিল।"

নিজ মুখে বলিতেন।

এই আখ্যায়িকার সমস্ত বৃত্তান্তই আমরা তাঁহার নিজ মুখে শুনিয়াছি। যখন এগুলি আমাদিগকে বলিয়াছেন, তখন তাঁহার আয় রাজার মত। নিজের পূর্ব্ব জীবনের দৈন্যের বিষয় উল্লেখ করিতে সাংসারিক বদ্ধিষ্ণু ব্যক্তিগণ লজ্জাবোধ করেন,—কিন্তু দিগম্বর হীন অবস্থাতেও যেরূপ ছিলেন, অবস্থাপন্ন হইয়াও সেইরূপই ছিলেন। তাঁহার সারল্য, দৈন্য ও একান্ত আড়ম্বর-শূন্যতা, এই জন্যই তাঁহার বন্ধুবর্গের অকপট শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল।

দারিদ্র্যের শিক্ষা।

শৈশব ও প্রথম যৌবনে দিগম্বর অন্ন বস্ত্রের কষ্ট পাইয়াছিলেন, এজন্য তিনি শেষে অন্ন বস্ত্র দানে এরূপ মুক্তহস্ততা দেখাইয়া গিয়াছেন। যদি শুনিতেন, কেহ খায় নাই, কাহারও পরিবার কাপড় নাই, দিগম্বর তখন উতলা হইয়া পড়িতেন; সে কথা আমরা পরে লিখিব।

একুনে ১৪ টাকা বৃত্তি।

দিগম্বর ৪৲ টাকা ছাত্র বৃত্তি পাইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই বৃত্তি ৩ বৎসরের জন্য ছিল; কিন্তু তিনি তিন বৎসরে এণ্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পাছে পীড়া কিংবা অন্য কোন বাধায় এক বৎসর নষ্ট হয়,

* দিগম্বর বাবু শেষ সময়ে এই নাগ মহাশয়ের বহু তীর্থ পর্য্যটনের সমস্ত খরচ প্রদান করিয়া কৃতজ্ঞতা দেখাইয়াছিলেন।

তাহা হইলে পড়া চলিবে না, এই আশঙ্কায় এক বৎসর হাতে রাখিয়া দিগম্বর পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া ১০৲ টাকা বৃত্তি পাইলেন; এখন এক বৎসরের জন্য তাঁহার ছাত্রবৃত্তি ৪৲ টাকা এবং এণ্ট্রান্সের বৃত্তি ১০৲ টাকা, একুনে ১৪৲ টাকা মাসিক বৃত্তি পাওয়ার কথা; কিন্তু প্রিন্সিপাল সাহেব বলিলেন, "দুই বৃত্তি এক সঙ্গে পাওয়ার নিয়ম নাই, ৪৲ টাকার ছাত্রবৃত্তি রহিত হইবে।" কয়েক জন প্রফেসর মধ্যে পড়িয়া প্রিন্সিপাল সাহেবের দ্বারায় এ বিষয়টি ডিরেক্টর এ্যাটকিনসন সাহেবের বিচারাধীন করাইলেন। ডিরেক্টার আদেশ করিলেন, এ বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন নিয়ম নাই, সুতরাং এই ছাত্রটি দুই বৃত্তিই পাইবে। ভবিষ্যতে কেহ এভাবে দুই বৃত্তি পাইবে না, এ বিষয়ে তখনই সর্কুলার হইল। এই ১৪৲ টাকার সমস্তই তিনি মাতাকে পাঠাইতেন।

পিতার মৃত্যু।

ইহার কিছু পূর্ব্বে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। ছদ্মবেশধারী পিতা দিগম্বর বাড়ী আসিয়াছে শুনিয়া তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। দিগম্বরকে পাইয়া তিনি কত সুখী হইয়াছিলেন,—কিন্তু সেই দিনই তাঁহাকে সন্ন্যাস রোগে ইহ সংসার ত্যাগ করিতে হয়। দিগম্বরের নিজের মৃত্যুও এইরূপ শোচনীয় ভাবে ঘটিয়াছিল, তাহা পরে বর্ণিত হইবে। ১

পাঠত্যাগ ও চাকরী আরম্ভ।

তিনি ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষার সময় জ্বর রোগে আক্রান্ত হন, তথাপি কোনও রূপে পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হইলেন; অঙ্কের পরীক্ষার দিন কোন সহাধ্যায়ী বন্ধুপ্রবর দিগম্বরের লিখিত উত্তরগুলি চুরি করিয়া এক বিভ্রাটের অভিনয় করেন। এইরূপ নানা কারণে পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল লাভ হইল না। যদিও পরীক্ষায় ভালরূপ উত্তীর্ণ হইলেন, তাঁহার ভাগ্যে এবার বৃত্তি লাভ ঘটিল না। পরীক্ষার পর দিগম্বরের মাতাঠাকুরাণী তাঁহাকে চাকরী লইতে বাধ্য করিলেন। ৬০৲ টাকা বেতনে তিনি বহরমপুর স্কুলের হেডমাষ্টারী পদ গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, এই ৬০৲ টাকা বেতনে চাকরী করার কালে তিনি যেরূপ সুখী ছিলেন, জীবনে আর সেরূপ সুখ ঘটে নাই। এক বৎসর মাত্র তিনি মাতৃপাদপদ্ম পূজা করিতে পাইয়াছিলেন, মাতার কথা কহিতে বৃদ্ধকালেও তাঁহার কণ্ঠ স্নেহে কম্পিত হইত, তিনি শিশুর মত হইয়া যাইতেন। এক বৎসর পরে মাতৃবিয়োগ হইলে, তিনি ওকালতি পাশ করিয়া প্রথমতঃ ২৪ পরগণায় আসিলেন। তথায় হাঁপানি রোগের অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় দিগম্বর ফরিদপুরে আসিয়া ওকালতী আরম্ভ করিলেন।

ফরিদপুরের তদানীন্তন অবস্থা।

তখন ফরিদপুর নূতন জেলা হইয়াছে। মোক্তারগণের অসাধারণ পসার এবং প্রতিপত্তি। বড় বড় উকিলগণও মোক্তারবর্গকে তোষামোদ ও যথেষ্ট মর্য্যাদা প্রদান করিয়া স্বীয় পসার অক্ষুণ্ণ রাখিতেন। অনেক স্থলেই মোক্তারগণ উকিলদিগের প্রাপ্য হইতে শতকরা ৭৫৲ টাকা কাটিয়া রাখিতেন। নবযৌবনদৃপ্ত, সাহসী ও প্রতিভাশালী দিগম্বর নানারূপ বিঘ্ন ও শত্রুতা দলিত করিয়া অতি শীঘ্র উকিলগণের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথমতঃ প্রতিপক্ষীয়গণের বাধায় তিনি ফরিদপুর ছাড়িয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। শুধু মোক্তারবর্গ নহেন, বৃদ্ধ উকিলগণ পর্য্যন্ত দিগম্বরকে অপদস্থ

হুজুরকে এ বালক আইন শিখাইতে চায়।

করিয়া তাড়িত করিবার জন্য বিশেষ যত্নপর ছিলেন। কেহ কেহ হাকিমগণের নিকট বিচারালয়ে এই ভাবে বক্তৃতা করিতেন, "হুজুরের অবিদিত কোন আইন নাই, এই বালক হুজুরকে আইন শিখাইতে আসিয়াছে, ইহার প্রত্যেক কথা ধৃষ্টতাপূর্ণ, হুজুর ইহাকে কখনই প্রশ্রয় দিবেন না।" কিন্তু

পূর্ব্ববঙ্গের অদ্বিতীয় উকীল

ষড়যন্ত্র বিফল হইল, ফরিদপুরে যে সকল হাকিম আসিয়াছেন, প্রত্যেকে মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন, পূর্ব্ববঙ্গে এরূপ আইনজ্ঞ প্রতিভাশালী উকিল আর নাই। নজির প্রদর্শনে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল—তথাকার শ্রেষ্ঠ উকিলগণের নিকট শুনিয়াছি—দিগম্বর বাবু নথি পত্র দেখিয়া মোকদ্দমা এরূপ নূতন ভাবে দাঁড় করিতেন, তাহা আইনের এরূপ সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত হইত যে, প্রতিপক্ষের উকিলগণ তাঁহাদের অচিন্তিত এক নূতন মূর্ত্তিতে মোকদ্দমাটিকে দেখিয়া একবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িতেন এবং হাকিমবর্গ তাঁহার প্রদর্শিত পথে পরিচালিত হইতেন। গৃহে তিনি মৃদু ও কমনীয় স্বভাবের জন্য খ্যাত ছিলেন। তাঁহার কথা সলজ্জ সম্ভ্রমে একেবারে বাধ বাধ হইয়া যাইত; বিনয়াম্বিত

ভাষা অতিশয় ভদ্রতায় কণ্ঠে বিলীন হইয়া যাইত; কিন্তু বিচারালয়ের সান্নিধ্যে এই মৃদুস্বভাবাপন্ন ব্যক্তিটী সিংহ-বিক্রান্ত হইতেন। তিনি জজ এবং সবজজের আদালত ভিন্ন কখনও ম্যাজিষ্টেট মুন্সেফ কিম্বা ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারালয়ে যান নাই। প্রচুর অর্থের প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া তিনি স্বীয় সম্মান অপ্রতিহত রাখিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অপর্য্যাপ্ত অর্থ উপেক্ষা করিয়া তিনি কখনও মফস্বলে যাইতে স্বীকৃত হন নাই। তিনি দরিদ্র ও অক্ষম ব্যক্তির কার্য্য অনেক সময় অর্থ গ্রহণ না করিয়া নিজে নানারূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু সম্পন্ন মক্কেলের নিকট তাঁহার দাবীর এক কপৰ্দ্দকও হ্রাস করেন নাই। তাঁহার rate এত বেশী ছিল যে, তাহা একরূপ নিষেধাত্মক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ তাঁহার কার্য্যের অবধি ছিল না। তিনি যাহার কার্য্য হাতে লইতেন, প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া তাহা সুসম্পন্ন করিতেন। তাহার হাতে মোকদ্দমাটি দিতে পারিলে মক্কেল একবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারিত। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা লিখিয়া শেষ করা যায় না। ইহা কাহারও অবিদিত নহে যে কাঞ্চনপুরের সাহাদের মোকদ্দমার জন্য অপরিমিত পরিশ্রমই তাঁহার হঠাৎ মৃত্যুর কারণ। প্রাতঃকালে তিনি কাহারও সহিত বাক্যব্যয় করিতেন না। যাঁহার ভদ্রতার খ্যাতি দেশ-ব্যাপক ছিল, তিনি কর্ত্তব্য এবং ভদ্রতার সীমা উল্লঙ্ঘন না করিয়া উভয় বিষয়েরই কিরূপে আদর্শ হওয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন।

তাঁহার আয় এবং ব্যবসায়ে উদারতা ও মহত্ব।

দিগম্বর বাবু প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। জেলা কোর্টে এত অর্থ উপার্জ্জন অল্প সংখ্যক উকিলের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। যে বৎসর তাঁহার মৃত্যু হয়, সে বৎসর তাঁহার অন্যূন ৫০ হাজার টাকা আয় হইয়াছিল। কাঞ্চন পুরের সাহাদের মোকদ্দমায় তিনি রোজ ১০০৲ টাকা হিসাবে ৩৬০০০৲ টাকা ও অপরাপর কার্য্যে ১৫।১৬ হাজার টাকা অর্জ্জন করিয়া ছিলেন। এক সবজজ ও জজের কোর্টে যাইয়া তিনি এই রাজযোগ্য উপস্বত্ব লাভ করিতেন। কিন্তু তিনি অর্থলোভী ছিলেন না, অর্থ তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। কর্ত্তব্য ও সুনীতিই তাঁহার জীবনের আদর্শ ছিল। একবার এক মক্কেলের কাজের জন্য তিনি ২৫০০৲ টাকা অগ্রিম গ্রহণ করেন। এই সময় তাঁহার উকিল বন্ধু হরবিলাস বাবু আসিয়া বলিলেন, "দিগম্বর বাবু, আমার একটি নিজের কার্য্যে আপনাকে এই দুই তিন দিন খাটিতে হইবে।" দিগম্বর বাবু ইহার পূর্ব্বেই অন্যের মোকদ্দমার ভার গ্রহণ করিয়া অর্থ লইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে বন্ধুকে আপ্যায়িত করিতে তাঁহার ক্রটী হইল না। তিনি হর বিলাস বাবুর অবৈতনিক কার্য্য লইলেন এবং বলিলেন "আমারও একটি কাজ আপনার করিতে হইবে।" গোপনে মক্কেলকে ডাকিয়া ২৫০০৲ টাকা ফিরাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "আমি তোমাদের মোকদ্দমার সমস্ত পরিশ্রম নিজে করিয়া উপদেশ দিব, হর বিলাস বাবু তোমাদের কাজ করিবেন; ইঁহাকে ৫০০৲ টাকা দিলেই হইবে। আমার উপদেশাদির সুবিধা পাইবে, অথচ তোমাদের ২০০০৲ টাকা বাঁচিয়া যাইবে।" তিনি বন্ধুদের জন্য এরূপ ত্যাগপরায়ণ ছিলেন। তিনি বিচারালয়ে স্বীয় মোকদ্দমার কথা ব্যতীত হাকিমের মনস্তুষ্টি সাধন জন্য কখনও একটি কথাও বলেন নাই। একবার জজ পসফোর্ড সাহেবের সঙ্গে তাঁহার একটুকু বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়াছিল। তিনি তদবধি তাহার এজলাসে আর যান নাই। সেই কোর্টের মোকদ্দমার জন্য মক্কেলগণ তাঁহাকে যে কয়েক সহস্র টাকা অগ্রিম দিয়াছিলেন, তাহা তিনি ফিরাইয়া দেন। পসফোর্ড দীর্ঘ কাল ফরিদপুরে ছিলেন, সে সময়ের জন্য দিগম্বর বাবু শুধু সবজজের আফিসে কাজ করিয়াছিলেন, অথচ তাঁহার আয় যেরূপ, সেইরূপই ছিল। তাঁহার ওকালতী ব্যবসায়ে মহত্বের দৃষ্টান্ত আমরা অনেক জানি, সে সকল এখানে বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু তাঁহার দেবপ্রতিম দয়া যাহা চন্দ্র রশ্মির ন্যায় জীর্ণ কুটীর ও কাঙ্গালের ঘরে পড়িয়া শোভা পাইয়াছে, তাঁহার

উন্নত চরিত্র।

উন্নত চরিত্রমাধুর্য্য অমর বর্ণে আমাদের স্মৃতিতে অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহাই এ প্রবন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ছিনিয়া খাইতে কষ্ট হয় না।

তিনি দাড়িম, আম, আক, জাম প্রভৃতি ফলের বৃক্ষ বাটীর ভিতরে রোপন করিতে দিতেন না। তাহার বাসার বাহিরে রাস্তার ধারে সে গুলি ফলবান হইত ও দর্শকগণ ইচ্ছাক্রমে তাহা পাড়িয়া লইয়া যাইত। মুকুলিত আম্র ও জাম, শিশু মণ্ডলীর দ্বারা, ফলের পরিপক্কতা লাভ পর্য্যন্ত সর্ব্বদা উপক্রত

হইত। তিনি বলিতেন—"যে ফলটি যাহার ভাল লাগিবে, তাহার সেবায় তাহা অর্পিত হইলে কত আনন্দের বিষয়! ভগবান আমাদিগকে এমন অবস্থায় রাখিয়াছেন যে, আমাদের কিনিয়া খাইতে কষ্ট হয় না।"

যে ছুটিয়া খেলিয়া বেড়াইত, তাহাকে নষ্ট করিব?

তাঁহার তিনটি ছাগ ছিল, কাছারি হইতে আসিলে তাহারা ঘিরিয়া দাঁড়াইত। সেই পুণ্য চিত্র ঋষির আশ্রমের একটি দৃশ্যের মত দেখাইত। তাঁহার বৈকালে জল খাবার ২টি রসগোল্লার ১২টি আগে তাহাদিগকে ভাগ করিয়া তার পর আধখানি নিজে খাইতেন। এদিকে বিপুল-দেহ অপর্য্যাপ্ত রূপে সুস্থ ও বলিষ্ঠ ১৬ জন ঘরামি, ৮ জন বেহারা এবং বহুসংখ্যক ভৃত্য লুচি মণ্ডা ও সন্দেশের স্তূপ রাজভোগের জিনিস খাইত, তিনি তাহা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতেন। একদা অসুস্থতা হেতু ডাক্তারের উপদেশে সুপ প্রস্তুত করার জন্য একটি পাঠা কিনিয়া আনিয়া বাড়ীতে গোপনে কাটা হয়। ইহা জানিতে পারিয়া দিগম্বর বাবু যেরূপ বিরক্তি দেখাইয়াছিলেন, তাঁহার সেরূপ বিরক্তি কেহ কখনও দেখে নাই। তিনি বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন ও অতি বিনীতভাবে বলিয়াছিলেন, "অন্যে যাহা বিবেচনা করে করুক, আমি বড় দুঃখী, এই দুঃখময় তুচ্ছ জীবনরক্ষার জন্য, যে ছুটিয়া খেলিয়া বেড়াইত, তাহার প্রাণ নষ্ট করিব? তাহার অগ্রে আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।"

আশ্রিতের প্রতিপালন।

তাঁহার ভৃত্য, ঘরামি, বেহারা প্রভৃতিকে সর্ব্বদা বলিতেন, "তোমাদের বাড়ীর লোকদের খাইবার ও পরিবার জন্য যেন কষ্ট না হয়"—অনেক সময়েই সে টাকা তাহাদের বেতন হইতে কাটা যাইত না। তাঁহার বাড়ীতে বৎসরে প্রায় দুই হাজার টাকার কাপড় ক্রয় করা হইত। তিনি অনেক সময়ই, বিশেষতঃ গ্রহণাদি উপলক্ষে দরিদ্রদিগকে বস্ত্র দান করিতেন। তাঁহার বাড়ীতে যে ব্যক্তি কোনও কালে কয়েক দিনের জন্যও থাকিয়া গিয়াছে, পূজার সময় তাহাদিগকে বস্ত্রাদি পাঠাইয়া দিতেন। বৎসর বৎসর এই প্রভূত বস্ত্র ফরিদপুরের চন্দ্রকুমার নাথ নামক বস্ত্র-বিক্রেতার দোকান হইতে আনীত হইত, অথচ তাঁহার লোক সর্ব্বদা কলিকাতায় যাতায়াত করিত।—ফরিদপুরে এই কাপড় গুলি কলিকাতা হইতে আনিলে তাঁহার অনেক টাকা বাঁচিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু তিনি স্থানীয় দোকানদারগণের আশা নষ্ট করিতে সম্মত ছিলেন না। তিনি চিরদিনই খড়ের ঘরে জীবন কাটাইয়া গেলেন। তাঁহার দু তিন মাসের আয়েই দিব্য বাড়ী হইতে পারিত, বহুসংখ্যক খড়ের ঘর একত্র করিয়া অগ্নি ও চোরের ভীতি সহ্য করিয়া তিনি আজীবন কষ্টে ছিলেন। মৃত্যুর বৎসরে তাঁহার আয় ৫০,০০০৲ টাকা হইয়াছিল, অথচ হঠাৎ মরিয়া গেলেন পরে সিন্দুকে মাত্র ২০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছিল। এরূপ অজস্র ব্যয় হইয়াও তিনি নিজ সুখের জন্য এক কপর্দ্দকও খরচ করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। এক দিন আমাকে বলিয়াছিলেন, "কোঠা বাড়ী দিলে ঘরামিগুলি উঠাইয়া দিতে হইবে, কোঠা বাড়ীর কথা শুনিলে ইহাদের মুখ কাঁদ কাঁদ হয়, আমি ইহাদিগের বহু দিন হইতে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছি।" তাহার একখানি ফটোগ্রাফও নাই। যেখানি এই

গরীবের প্রাপ্য।

প্রবন্ধসহ দেওয়া হইল, তাহা কানাইপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র সিকদার মহাশয় শ্মশান ঘাট হইতে তাঁহার মরণান্তে তুলিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয়বর্গ বোরণ এবং সেফার্ড কোম্পানীর দ্বারদেশে গাড়ী স্থগিত করিয়া তাঁহার একখানি ফটোগ্রাফ তোলার জন্য এক দিন কত অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাকে এ কার্য্যের সার্থকতা বুঝাইতে পারেন নাই। "এই জন্য যে টাকা খরচ করিতে, তাহা গরীবকে দেওয়া যাইবে" বলিয়া তিনি চলিয়া আসিলেন।

দরিদ্রদিগকে দান।

এই স্বীয় সুখচিন্তাবর্জ্জিত একান্ত অনাড়ম্বর ব্যক্তিটি যখন দরিদ্রদিগকে দান করিতেন, তখন মহারাজার ন্যায় মুক্তহস্ততা দেখাইয়াছেন। বৎসর বৎসর অসংখ্য দরিদ্র তাঁহার বাড়ীতে খাইতে পরিতে পাইত। সেই মহোৎসব-চিত্র উদ্ভাসিত দয়াপূর্ণ দীন দুঃখীর অযাচিত বন্ধু দিগম্বরের মূর্ত্তি যিনি দেখিয়াছেন, তাঁহার মানসপটে তাহা চিরকাল অঙ্কিত থাকিবে। অসংখ্য দরিদ্রমণ্ডলী যেন তাঁহার বড় এক পরিবার, তিনি যেন তাহাদের ভরণপোষণের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। একান্ত অশক্ত শরীরে তিনি নিজে অনেক সময়ে তাহাদিগকে পরিবেশন করিতেন ও কোন দীন দুঃখীর নিতান্ত জীর্ণ শীর্ণ মূর্ত্তি এবং খাইবার আগ্রহ দেখিলে

সাশ্রু-নেত্র হইতেন। এ জীবনে সেই দেবমূর্ত্তি ভুলিবার নহে।

তাঁহার বিনয় ও দৈন্যের সীমা ছিল না। একজন সামান্য-ব্যক্তি তাঁহার বাড়ীতে গেলেও তিনি নিজে উঠিয়া হাত ধরিয়া তাকিয়ার নিকট বসাইতেন। অভ্যাগত গুরুতুল্য, তাঁহার এই নীতি-অনুষ্ঠান আমাদের চক্ষে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি সামান্য এ্যাপ্রেণ্টিস কি কেরাণীকেও কত সম্মান ও আদর দেখাইয়া নিজ হাতে তাম্বূল দিতেন। এদিকে কোন জজ ম্যাজিষ্ট্রেটও তাঁহার বাড়ীতে পূর্ব্বে না আসিলে তিনি আগে দেখা করিতে যাইতেন না।

তেজ ও বিনয়

দিগম্বর বাবুর সর্ব্বপ্রধান গুণ ছিল—স্ত্রীলোকের প্রতি মাতৃভাব। স্ত্রীলোককে এত সম্মান করিতে আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে কথা বলিতে যাইয়া তাঁহার ভাষা শিশুর ন্যায় কোমল হইয়া যাইত, কোন স্ত্রীলোকের কথা পাড়িলে তাঁহার মূর্ত্তি কেমন সুন্দর দেখাইত, যেন তাহাতে মাতৃভাবটি সজীব হইয়াছে। এমন নির্ম্মলতা ও সুকুমারতা, আমাদের ইন্দ্রিয় তাড়িত সমাজে বড় বিরল দৃশ্য। একদিন দিগম্বর বাবু মনে করিলেন, বেশ্যারা সমাজ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া অবশ্য মনে মনে একটুকু কষ্ট পায়; সকলে যখন নিমন্ত্রণ খাওয়ার কথা বলে, তখন তাহারা মুখ ছোট করিয়া থাকে, তাহাদিগকে কোন গৃহস্থ খাওয়ায় না। তাহারা যাহাই হউক না কেন, তাহারা স্ত্রীলোক। আমি মায়ের মতনই দেখি, আমি তাহাদিগকে খাওয়াইব।" সহরের সমস্ত বেশ্যা নিমন্ত্রিত হইল, তিনি শিশুগণকে দিয়া তাহাদের পরিবেশন করাইলেন, ভোজনান্তে বেশ্যাগণ তাঁহাকে প্রণাম করিল। তাহারা বলিল "আপনি আমাদিগকে ঘৃণা করেন না"। ইহা শুনিয়া দিগম্বর সাশ্রুনেত্র হইয়াছিলেন। জীবনে আমি পঞ্চাশোর্দ্ধে এই একটি মাত্র বালক দেখিয়াছি। যাহাদের স্বভাব খারাপ এবং যাঁহারা নীতি ধর্ম্ম ও চরিত্রের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া নির্লজ্জভাবে কুকার্য্যে রত হইয়াছেন, দিগম্বর বাবু তাহাদের প্রধান ভয়ের কারণ ছিলেন। কুনীতির অকুণ্ঠিত-ভাবে সেবা-পরায়ণ সরল বক্তা একটি পদস্থ ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি, তিনি যে দিন মদ বেশী খাইতেন ও প্রকাশ্যভাবে কুকার্য্য করিতেন, সে দিন দিগম্বর বাবু শুনিয়া কি বলিবেন ভাবিয়া লজ্জিত হইতেন, অথচ তিনি স্বীয় পিতাকেও এ বিষয়ে গ্রাহ্য করেন নাই।

স্ত্রীজাতির সম্মান।

দিগম্বর বাবু, তাঁহার চরিত্র ও বিবিধ সদ্‌গুণাবলীর কীর্ত্তন শুনিতে চাহিতেন না। আত্ম-প্রশংসা-সূচক কোন প্রসঙ্গ শুনিলে নিতান্ত লজ্জিত হইতেন, এবং "আমি ইহা করিয়াছি" এই ভাবের কোন কথা তাহার মুখে কখনও শুনিতে পাই নাই; তাঁহার আমিত্ব যেন লোপ পাইয়াছিল। যে অর্থ তিনি বিতরণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তিনি সাধারণের নিকট বিখ্যাত ও গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিশেষরূপ আদৃত হইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি নিন্দা ও প্রশংসার উর্দ্ধে যে আত্মতৃপ্তির এক সুনির্ম্মল রাজ্য আছে, তাহারই অধিবাসী ছিলেন। গোপনে সুকাজ করিয়া সুখী হইতেন। যে মুহূর্ত্তে সৎকাজের ঘোষণা আরম্ভ হইল, সেই মুহূর্ত্তেই নিজের মনের তৃপ্তিজনিত সুখটুকু ঘুচিয়া যায়। তিনি একটি অমৃতকুণ্ডের মক্ষিকার ন্যায় পরহিতব্রতে আত্মহারা ছিলেন,—বাহিরের ভন্‌ভন্ প্রকৃত সুখের আস্বাদনের ব্যাঘাত-কর। যাহারা তাঁহাকে সর্ব্বদা দেখিত, তাহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। বৎসর বৎসর দোল যাত্রার উপলক্ষে সমস্ত সহরের লোকবৃন্দ তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইতেন। তাঁহার মধুর ব্যবহার, তাঁহার বিপুল আয়োজন অপেক্ষাও নিমন্ত্রিতদিগকে বেশী আপ্যায়িত করিত। দোলযাত্রা উপলক্ষে তাঁহার বাসায় প্রতি বৎসর কীর্ত্তন গান হইত। প্রতি বৎসরই শৃঙ্খলার সহিত এই কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে দোল যাত্রায় কয়েক জন দুশ্চরিত্র ছাত্র কীর্ত্তনওয়ালীদিগের সঙ্গে একটুকু গোলযোগ করে। এই ব্যাপার কিছু গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়। দিগম্বর বাবু নিতান্ত অনিচ্ছাক্রমেও কর্ত্তব্যানুরোধে ছাত্রদিগের নাম হেড মাষ্টার মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াছিলেন; ভবিষ্যতে দোল যাত্রায় ছাত্রদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না, ইহাই স্থিরীকৃত হইল। দিগম্বর বাবু ছাত্রগণকে নিতান্ত ভাল বাসিতেন, আমার নিকট তিনি এই সম্বন্ধে অতি দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন—"আমি চিরদিনই ছাত্রদেরে ভালবাসি, তাহারাও আমার প্রতি অনুরক্ত, কেন এবার তাহারা এরূপ করিল? ভগবান আমার আমায়

আত্মতৃপ্তির সুখ

শেষ দোলোৎসব।

বিষয় উপলক্ষ্য করিয়া কেন তাহাদিগকে শাস্তির ভাজন করিলেন ও আমায় এরূপ মনোকষ্ট দিলেন! ভবিষ্যতে ইহাদিগকে ছাড়া দোল করিব কিরূপে, আমার বড় কষ্ট হইবে।" কিন্তু তাঁহার আর দোল করিতে হইল না;— দুই মাস পরেই তিনি ইহলোক ছাড়িয়া গেলেন।

অনাসক্তি।

দিগম্বর বাবু অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন। সে টাকা তিনি নিজ হাতে রাখেন নাই; অজস্রভাবে তাহা ব্যয় হইয়াছে, তিনি অর্থের প্রতি বিন্দুমাত্রও অনুরক্ত ছিলেন না। তাঁহার নিজের ছেলে পিলে হয় নাই, তাঁহার শ্যালকপুত্র শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (তিনি রাজসাহীর স্বনাম-খ্যাত কবিরাজ) এবং তৎকনিষ্ঠ হৃদয় বাবু, শরৎ বাবু, যোগেশ বাবু (ইঁহারা তিন জনই ফরিদপুরের জজকোর্টের উকীল) পুত্রনির্ব্বিশেষ যত্নে তাঁহার গৃহে লালিত পালিত হইয়াছেন, তিনি ইঁহাদের জন্য যাহা করিয়াছেন, পিতা পুত্রের জন্য তদপেক্ষা কিছু বেশী করিতে পারেন না। তাঁহার মোহরের জানকী, যাদব এবং উপেন বাবু, পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ গঙ্গাদাস ইঁহারা সকলেই তাঁহার নিকট পিতার ন্যায় যত্ন ও স্নেহ পাইয়াছে, অথচ দিগম্বর বাবু কাহারও উপর আসক্ত ছিলেন, এরূপ মনে হয় না। তাঁহার পত্নী দ্রবময়ী দেবীর* সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তিনি সর্ব্বদা যত্নশীল ছিলেন এবং তাঁহাকে তিনি প্রগাঢ় ভাল বাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। অথচ তিনি ছয় মাস হয়ত বাহিরের ঘরেই কাটাইয়া দিতেন! ফলতঃ কাহারও উপর তাঁহার বিশেষ মায়া আমি বুঝিতে পারি নাই, অথচ যে ব্যক্তি একদিনও তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিত, সেই তাঁহাকে নিতান্ত আপনার জন মনে করিত, তিনি নিজে যেন কাহাকেও ধরা দেন নাই।

ঠাট্টা বুঝিতেন না।

হৃদয়ের একান্ত ঔদার্য্য ও সারল্যের জন্য তিনি ঠাট্টা বিদ্রূপ বুঝিতেন না। অনেক সময় বন্ধুবর্গের শ্লেষ কথা তিনি সত্য মনে করিতেন। এই জন্য তাঁহার অনেক অর্থাদিরও ব্যয় হইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে 'এপ্রিল ফুল' করা সহজ ছিল। এক দিন, হরবিলাস বাবু উকীল, সহরের সমস্ত লোককে তাঁহার নামে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি বাজারে তাঁহার নামে লুচি সন্দেশ ও বিবিধ মিষ্টান্নের বায়না দিতেও ভুলেন নাই। একদিকে অসংখ্য লোক, অপর দিকে তাঁহাদের গ্রাসোপযোগী মিষ্ট দ্রব্যের সম্ভার, উভয়েই এক সঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে পৌঁছিয়া তাঁহার বিস্ময় উদ্রেক করিয়াছিল। এই ব্যাপার সুসম্পন্ন হইয়া গেলে তিনি কি হরবিলাস বাবু এতদুভয়ের কোন্ ব্যক্তি বেশী আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না।

মৃত্যু

দিগম্বর বাবু একরূপ চিররুগ্ন ছিলেন। ফরিদপুরে আসা অবধি তাঁহার হাঁপানি রোগ আরোগ্য হয়, কিন্তু গত ১২।১৩ বৎসর যাবৎ তিনি উৎকট বৃক্কক (kidney) রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। এই পীড়ায় জন্য তিনি সময়ে সময়ে হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন। কয়েকবার মুমূর্ষু অবস্থা হইতে তিনি সারিয়া উঠিয়াছিলেন, অনেক সময়েই ডাক্তারদের উপদেশ অনুসারে জলের পরিবর্ত্তে বিস্বাদ লিথি-ওয়াটার খাইতেন। গত জ্যৈষ্ঠ মাসে সোমবার তিনি প্রাতঃকাল হইতে ১০টা পর্য্যন্ত রীতিমত আফিসের জন্য খাটিয়াছিলেন, কাঞ্চনপুরের মোকদ্দমার নথী পত্র গুলি দেখিয়াছিলেন, উকীল শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মৈত্রেয় ও মথুরানাথ মৈত্রেয় দ্বয় তাঁহার সম্মুখে ছিলেন, তাঁহারা তাঁহার কোনও রূপ উদ্বেগ লক্ষ্য করেন নাই। আহারের পর কাছারী যাইবার জন্য বাহির বাড়ীতে আসিতে পথে স্নেহাস্পদ গঙ্গাদাসকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "এত বেলা হইয়াছে, স্নান কর নাই যে!" ইহা তাঁহার শেষ কথা; পরমুহূর্ত্তেই তিনি হঠাৎ কাঁপিয়া পড়িয়া গেলেন। সিভিল সার্জ্জন ডাক্তার ফিঙ্ক এবং অপরাপর ডাক্তার কবিরাজগণ তাঁহাকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিতে আসিয়াছিলেন। কাছারী যাইবার পোষাক ও পাল্কী পড়িয়া রহিল। তৎস্থলে গরদের ধুতি ও শ্মশান-শয্যা আনীত হইল!

শ্মশান যাত্রীর হাসি।

তাঁহার মৃত্যু আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি—যেন একটি বালক ঘুমাইয়া পড়িয়াছে! এই যদি মৃত্যু হয়, তবে তাহার বিভীষিকা ও যন্ত্রণা কোথায়? ফটোগ্রাফে দেখুন, দিগম্বর শ্মশান-শয্যায় শুইয়া হাসিতেছেন। এ অবস্থাতেও তাঁহাকে সুখ স্বপ্নে বিভোর হাস্যমধুরমুখ নিদ্রিত ব্যক্তি বলিয়া ভ্রম জন্মিবে। এই সহাস্য আনন আমরা চন্দনার্দ্র করিয়া দিয়াছিলাম,

* ইনি পাবনা জেলার অন্তর্গত নাকলিয়া গ্রামনিবাসী ৺পরমানন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কন্যা।



প্রচার করিতেছিল, তাহা হৃদয়ে চিরমুদ্রিত থাকিবে। সেই দিন ফরিদপুরের শিরোরত্ন খসিয়া পড়িয়াছে, চরিত্রবান্ ব্যক্তি শুধু স্বীয় পরিবারের জন্য নহেন, বিশ্বপ্রেমে তাঁহার সহিত সংসারের এক আশ্চর্য্য বন্ধন হয়, ইহা সে দিন সম্যক উপলব্ধি হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ প্রচারিত হওয়া মাত্র সমস্ত আফিস বন্ধ হইয়াছিল, দোকানীরা দোকান বন্ধ করিয়াছিল, আর সকলেই মনে করিতেছিল, "আমার

তাঁহাকে গরদের ধূতি পরাইয়া গলদেশে রঙ্গন ফুলের মালা দোলাইয়া দিয়াছিলাম। যখন সুন্দর খট্টায় রঞ্জিত মসারি শোভিত হইয়া হাসি মুখে মাল্য কণ্ঠে দিগম্বর শ্মশানে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন সে দেব মূর্ত্তি দেখিয়া সকল লোককেই বলিয়াছিল—"কি সুখকর মৃত্যু! যম তাহার স্বাভাবিক বিভীষিকা পরিত্যাগ করিয়া এই দেবপুরুষকে দেবধামে লইয়া যাইতে আসিয়াছে।"

ফরিদপুরের শোকোচ্ছ্বাস

সে দিনের শোকোচ্ছ্বাস ভুলিব না, সমস্ত বাজারের লোক "বাবারে, কোথায় গেলি" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়াছিল। আম্রবিক্রেতৃগণ বালকের ন্যায় লুটাইয়া কাঁদিতেছিল; রোজ ১৫।২০, টাকার আম এক দরে তাহারা আর কোথায় বিক্রয় করিবে? দরিদ্র পঙ্গু অন্ধ, "আজ অনাথ হইলাম" বলিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। তাঁহার স্বর্গারোহণে সমস্ত ফরিদপুরবাসী লোকবৃন্দের ব্যাকুলতা, তাঁহার শ্যালক-পুত্র শরতের তীব্র চীৎকার, গাভী ও ছাগগুলির সাশ্রুনেত্র নিস্পন্দতা প্রভৃতি সে স্থানটিকে যেরূপ করুণ রসের সজীব প্রতিকৃতি করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা ভুলিবার নহে। আর শোকের মূর্ত্তিময়ী প্রতিমা ম্রিয়মাণা অনাথিনীর ছবি খানি, আমাদের নিকট যে হৃদয়বিদারক শোকের কথা নীরবে

পরম বন্ধু গেল!" পুত্রতুল্য স্নেহের পাত্র হৃদয়, শরৎ এবং যোগেশ বাবুর যেরূপ শোক হইয়াছিল, আমরা তাঁহার কেহ না হইয়াও আমরাও সেদিন সেইরূপ শোক অনুভব করিয়াছিলাম। ফরিদপুরের উকিলগণ তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে যে সভা করিয়াছিলেন, তাহাতে কেহই কিছু বলিতে পারেন নাই। হরিশ বাবু দাঁড়াইয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন, স্বনামখ্যাত বাগ্মীপ্রবর অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের শ্বেত শ্মশ্রু বাহিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। তাঁহার বাগ্মিতা কোথায় ভাসিয়া গেল, নীরব শোকের অভিব্যক্তি যেন শব্দবিহীন মুখরতা দ্বারা সভাটিকে আকুলিত করিয়া তুলিল।

সান্ধ্য সম্মিলন।

সেই সান্ধ্য সম্মিলনের কথা মনে পড়ে। দিগম্বর বাবু মধুর কথায় তীর্থযাত্রার কথা কহিতেন। তিনি অনেক তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ঋষির আশ্রমের কথা, তীর্থবাসিনী পরদুঃখকাতরা রমণীগণের কথা, প্রাকৃতিক বিচিত্র দৃশ্যাবলীর কথা, বৃন্দাবনেরশেঠদের দৈন্যের কথা, প্রভৃতি কত কথা কহিতেন। তিনি শান্ত মধুর ভঙ্গীর সহিত যে নীতি ও ধর্ম্মের কথা বলিতেন, তাঁহার চরিত্রের জ্যোতিতে তাহা আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, সেই সান্ধ্য সম্মিলন কি মধুর ছিল! কত সঙ্গীত, কত

বক্তৃতা, কত আমোদ-মুখরিত সভা-সমিতিতে গিয়াছি কিন্তু একনিবিষ্ট চিত্তে বসিয়া এই একান্ত সজ্জন মহোদয়ের নিকট যে উপদেশময়ী কাহিনী শুনিয়াছি, ও তাহাতে যেরূপ চিত্ত নির্ম্মল হইয়া গিয়াছে, এরূপ আর কিছুতে হয় নাই! এখনও সংসার ক্লেশে পীড়িত, চিন্তা মথিত চিত্ত সেইরূপ একটি শান্তি ও সান্ত্বনার স্থান খুঁজিয়া বেড়ায়। সেই একান্তশুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, নির্ম্মলচরিত্র বন্ধুর বাক্যগুলির মত এমন সরস কবিতা যেন আর কর্ণে ধ্বনিত হয় নাই। পীড়ায় কষ্ট পাইয়া, সংসারে লাঞ্ছিত হইয়া জুড়াইবার জন্য তাঁহার নিকট যাইতাম। মনে হইত যেন লোকনিশ্বাস-কলুষিত নিম্নস্তরের বায়ু ছাড়িয়া কোন উর্দ্ধরাজ্যের অতি নির্ম্মল ও মধুর প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছি। সেখানে হিংসা দ্বেষ ও কাম বিচূর্ণ হইয়া যাইত; সংসারের অলীকতা ও কর্ত্তব্যপ্রণোদিত নির্লিপ্ত কর্ম্মঠতার দৃষ্টান্ত যেন চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। আমরা পাপী তাপী, তাঁহার সান্নিধ্যে ক্ষণেকের জন্য ভাল হইয়া যাইতাম; পরের দুঃখ নিজের দুঃখের মত বোধ হইত, নিজের দুঃখ পরের দুঃখের মত বোধ হইত; লোকের অন্নাভাবের কথা বলিতে যাইয়া দিগম্বর সরল কথায় আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিতেন, কঙ্কাল-সার মানুষ আমাদের একান্ত পরিজনের মত বোধ হইত, ও তাহাদের কথা ভাবিয়া হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইত। মনুষ্যের সেবার জন্য কিরূপে প্রাণ দিতে হয়, দিগম্বর তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন! তাঁহার আত্মীয়েরা কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন, "হায়! তিনি আমাদের সেবার জন্য দেহপাত করিলেন, কৈ আমাদের সেবা ত একদিনের জন্যও গ্রহণ করিলেন না!"

হায়! সেই সান্ধ্য সম্মিলনের সুখ, যাহা শাস্ত্রকারের নির্দ্দেশানুসারে সংসার সমুদ্রের দুই অমৃতোপম সুখের একতম, সেই সজ্জন সঙ্গ যে এত শীঘ্র স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে, তাহা কে জানিত? আবার সংসারের পঙ্কে মন ও দেহ অনুলিপ্ত হইতেছে, রমণীজাতির প্রতি সেই মহান্ মাতৃভাব, অক্লান্ত কর্ম্মঠতা, পরদুঃখকাতরতা ও দরিদ্রের ব্যথায় তেমন ব্যথিত হইতে আর কে শিখাইবে?

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

অল্-বেরুণী।



খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার বহুপূর্ব্ব হইতে ভারতীয় বৌদ্ধ মত সমগ্র এসিয়া খণ্ডে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সূত্রে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য, সভ্যতা ও সদাচার, শিল্প ও বিজ্ঞান, গণিত ও জ্যোতির্ব্বিদ্যা সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যে সকল বৌদ্ধাচার্য্য মহাচীন হইতে ভারতবর্ষাভিমুখে তীর্থ যাত্রা করিতেন, তাহাদের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়,—তৎকালে ইরাণ, তুরাণ গান্ধার প্রভৃতি এসিয়ার সম্পন্ন জনপদমাত্রেই বৌদ্ধপ্রভাব বর্ত্তমান ছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পর হইতে আরবীয় মরু-মরীচিকা অতিক্রম করিয়া ইস্লামের নবোত্থিত বিজয় কোলাহল পারস্য তাতার প্রভৃতি পুরাতন বৌদ্ধ রাজ্য হইতে বৌদ্ধমত বিলুপ্ত করিতে আরম্ভ করে। যাহারা একদা পালিভাষানিবদ্ধ বৌদ্ধত্রিপিটকের সূত্রভাষ্য অধ্যয়ন করিবার জন্য শত সহস্র বৌদ্ধ বিহারনিবাসী স্থবিরগণের পাদমূলে উপবেশন করিয়া চিত্ত সংযম অভ্যাস করিত, কালক্রমে তাহাদের বংশধরগণ আরবীয় দুরূহ ভাষানিবদ্ধ কোরাণ কণ্ঠস্থ করিতে নিরত হইয়া পূর্ব্বশিক্ষা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। একদা বন্যাবিতাড়িত জলস্রোতের ন্যায় বৌদ্ধমত সমগ্র এসিয়া খণ্ড প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল; ইস্লাম আবার সেইরূপ আচম্বিতে বৌদ্ধশিক্ষা ভাসাইয়া লইয়া গেল!

বৌদ্ধমত সহস্র বৎসর মাত্র ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করিয়া ধীরে ধীরে জন্মভূমির পুণ্যক্ষেত্র হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ইস্লাম যখন মধ্য এসিয়ার বৌদ্ধমত নির্ব্বাসিত করে, ভারতবর্ষের বৌদ্ধপ্রতাপ তখন মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছিল। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইস্লামের বিজয়-বাদ্য সিন্ধুতীরে প্রতিধ্বনিত হইবার সময়ে, সিন্ধু, গান্ধার, কাশ্মীর ও আর্য্যাবর্ত্তে বৌদ্ধ ধর্ম্মের চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান ছিল না;—আবার যাগ, যজ্ঞ, পূজা মহোৎসব প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল।

তৎকালে ভারতবর্ষের অবস্থা কিরূপ ছিল,—তাহা

জানিতে কাহার না কৌতূহল হয়? সুবিখ্যাত মোসলমান পণ্ডিত অল্ বেরুণী তাহার কথা কিয়ৎ পরিমাণে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সে গ্রন্থের নাম—"ইণ্ডিকা"। তাহা দুরূহ আরবীয় ভাষায় রচিত; সম্প্রতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কৃপায় উহা বহুভাষায় ভাষান্তরিত হইয়া সর্ব্ব সাধারণের বোধগম্য হইয়াছে।

অল্ বেরুণীর জীবনের ইতিহাস নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। বর্ত্তমান খিভা নগরের নিকটে খ্রীষ্টীয় ৯৭৩ অব্দে অল্ বেরুণীর জন্ম হয়। তিনি স্বদেশে আবু রৈহাণ্ নামে পরিচিত হইয়া দর্শন, বিজ্ঞান গণিত ও জ্যোতির্ব্বিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শী বলিয়া সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠালাভ করেন। তাঁহার জন্মভূমি পুরাতন বাহ্লীকরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তথায় ইস্লামের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে বৌদ্ধশিক্ষা প্রচলিত ছিল। আবু রৈহাণ্ খিভার অধিপতির মন্ত্রিত্বপদে আরূঢ় হইয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু খ্রীষ্টীয় ১০১৭ অব্দে বসন্ত সমাগমে গজনীর দিগ্বিজয়ী সুলতান মহম্মদ খিভার স্বাধীনতাহরণ পূর্ব্বক রাজ-পরিবারবর্গের সঙ্গে আবু রৈহাণ্‌কেও বন্দী করিয়া গজনী নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রাজ-পরিবারবর্গের দুর্দ্দশার অবধি রহিল না; কিন্তু সুপণ্ডিত বলিয়া আবু রৈহাণ্ সুলতানের কৃপায় কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞানালোচনার স্বাধীনতা পাইয়া মুলতান নগরে নির্ব্বাসিত হইলেন। আবু রৈহাণ্ এই সুযোগে ত্রয়োদশবর্ষকাল সংস্কৃত শিক্ষায় অতিবাহিত করিয়া সুলতান মহম্মদ পরলোকগামী হইবা মাত্র "ইণ্ডিকা" রচনায় প্রবৃত্ত হন।

"ইণ্ডিকা" কোন গ্রন্থ বিশেষের অনুবাদ নহে। ভারতীয় সাহিত্য, দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ ও ধর্ম্ম শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও লোকাচার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অল্ বেরুণী ভারতীয় শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা ও সদাচার সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি 'ইণ্ডিকায়' তাহাই গ্রন্থনিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 'ইণ্ডিকা' ভিন্ন আরও বহু গ্রন্থে অল-বেরুণী ভারতীয় গণিত ও জ্যোতিষের আলোচনা করেন; তদ্দ্বারা আরবীয় সাহিত্য যথেষ্ট পুষ্টিলাভ করিয়াছিল।

এই সকল গ্রন্থ অল্ বেরুণীর পাণ্ডিত্যের কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে অদ্যাপি সুধীবর্গের সাধুবাদ লাভ করিতেছে। আরবীয় সাহিত্যে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া এবং উত্তর কালে সংস্কৃত সাহিত্যের জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া অল-বেরুণী গ্রীক ও হিন্দু সভ্যতার সামঞ্জস্যসঙ্কলনে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহার পরিচয়ে "ইণ্ডিকা" পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

অল্ বেরুণী ভারতবর্ষকে যথারীতি অধ্যয়ন করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি রাজবংশমালা বা সমর কাহিনী লইয়া সময় নষ্ট করেন নাই। কেবল হিন্দু সভ্যতার নিদানভূত দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও বিবিধ আচার ব্যবহারের বিস্তৃত বিবরণ সঙ্কলিত করিবার জন্যই চেষ্টা করিয়াছিলেন। তৎকালে কাশ্মীর ও বারাণশী সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া সুপরিচিত ছিল; কিন্তু "ম্লেচ্ছ মোসলমানের" পক্ষে তখনও পর্য্যন্ত কাশ্মীর বা বারাণশীতে পদার্পণ করিবার উপায় ছিল না;—অল্-বেরুণী তজ্জন্য কত না আক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন! তিনি সিন্ধু প্রদেশের অধ্যাপকবর্গের নিকট অধ্যয়ন করিয়া যথা-সাধ্য সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন; খিভার পদবিচ্যুত রাজমন্ত্রী সকল সময়ে অর্থাভাবে ইচ্ছানুরূপ গ্রন্থ সংগ্রহে সমর্থ হইতেন না বলিয়া "ইণ্ডিকার" স্থানে স্থানে আভাষ দিতেও ত্রুটি করেন নাই।

অল্ বেরুণী সুপণ্ডিত হইয়াও অধ্যয়নপরায়ণ; মোসলমান হইয়াও হিন্দুবিদ্বেষবিরহিত ছিলেন;—তাঁহার "ইণ্ডিকা" পাঠ করিতে করিতে তাঁহার উদারতা ও সমা-লোচনার সমীচীনতায় সকলকেই মুগ্ধ হইতে হয়। তিনি আমাদের আচারব্যবহার ও শিক্ষাদীক্ষার প্রতিকূল সমালোচনা করিবার সময়ে মূল সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত না করিয়া কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই; এবং প্রতিকূল সমালোচনাক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া অনেক স্থলে এমনও বলিয়া গিয়াছেন,—"হয়ত উদ্ধৃতাংশের কোনও সুসঙ্গত অর্থ আছে, কিন্তু তাহা এ পর্য্যন্ত আমার কর্ণ গোচর হয় নাই।" অল্-বেরুণী আরবীয় ও গ্রীসীয় বিদ্যায় বিভূষিত হইয়া সংস্কৃত গ্রন্থাদি যথারীতি অধ্যয়নপূর্ব্বক "ইণ্ডিকা" রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার "ইণ্ডিকার" সহিত সংস্কৃতা-নভিজ্ঞ ভারতভ্রমণপরায়ণ ইংরাজ লেখকবর্গের অসংযত লিপিকণ্ডূয়নের তুলনাই হইতে পারে না।

অল্ বেরুণী যখন "ইণ্ডিকা" রচনায় প্রবৃত্ত, তখন ইস্লামের নিকট ভারতবর্ষ "কাফের স্থান" বলিয়া লুণ্ঠিত ও পরাজিত দেশ বলিয়া উপেক্ষিত;—ভারতবাসীর নিকট

মোসলমান "ম্লেচ্ছ" বলিয়া তিরস্কৃত ও বিজেতা বলিয়া পরিচিত। তৎকালে গজ্‌নীর সুলতান ও তদীয় পার্শ্বচরগণ বিজয়োল্লাসে স্ফীত বক্ষে অসি হস্তে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব সৌভাগ্য খণ্ড বিখণ্ড করিবার জন্যই উদ্‌গ্রীব! এরূপ সময়ে একজন মোসলমানের পক্ষে "কাফেরের" ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য আয়াস স্বীকার করা বা সমালোচনা করিতে বসিয়া ধীরতার সহিত দার্শনিক প্রণালীতে প্রত্যেক বিষয়ের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করা, যথার্থই বিস্ময়ের বিষয়। ইণ্ডিকাপাঠে বুঝিতে পারা যায়, হিন্দু "কাফের" হইলেও, অল্ বেরুণীর বিচারে জ্ঞানগৌরবে ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিলেন। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন,—ইহার যথেষ্ট কারণ ছিল। সুলতান মহমুদ অল্ বেরুণীর জন্মভূমির স্বাধীনতা হরণ করিয়া ভারতবর্ষের বিজিত রাজ্যে খিভার ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রীকে নির্ব্বাসিত করায় ভারতবর্ষের প্রতি অল্ বেরুণীর সহানুভূতি হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। যে কারণেই হউক,—অল্ বেরুণী ইস্‌লামের মাহাত্ম্য ঘোষণায় কিছুমাত্র শৈথিল্য প্রকাশ না করিয়াও সেই হিংসাবিদ্বেষের যুগেও হিন্দুগণকে যে "কাফের" বলিয়া ঘৃণা করেন নাই, এ কথা পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

অল্ বেরুণী পৌত্তলিকতার সমর্থন করিতেন না; তাঁহার সামসময়িক সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যাপকবর্গও পৌত্তলিকতার সমর্থন করিতেন না। তাঁহারা স্পষ্টই বলিতেন যে, জনসাধারণের জন্যই পৌত্তলিকতা; পণ্ডিতের জন্য একেশ্বরবাদ। সুতরাং সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রসম্মত বিশুদ্ধ ধর্ম্মমত যে অল্ বেরুণীর আরাধ্য ইস্‌লামের একেশ্বরবাদ ভিন্ন অন্য কিছু নহে,—একথা অল্ বেরুণী বহুবার মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

তিনি যে সময়ে ইণ্ডিকা রচনায় নিযুক্ত হন, তাহা এসিয়া খণ্ডের বিপ্লব-যুগ। এক দিকে বৌদ্ধ ও হিন্দুর সংঘর্ষে বৌদ্ধদল বিতাড়িত; অপর দিকে বৌদ্ধ ও ইস্‌লামের বিসম্বাদে ইস্‌লাম জয়োল্লাসে স্ফীতবক্ষঃ; মধ্যে মধ্যে খ্রীষ্টীয়ান ও ইস্‌লামের কলহ কল্লোলে খ্রীষ্টীয়ান এসিয়া হইতে পলায়নপর! এই বিপ্লবের যুগে দর্শন বিজ্ঞানের স্থলে ভক্তিবল এবং সমালোচনার স্থলে খরশান প্রচলিত হইতেছিল। ইহাতে কিছুদিনের জন্ত উচ্চশিক্ষা বিলুপ্ত হইয়াছিল,—অশিক্ষিত সেনাদলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছিল। সুতরাং বিজয়োন্মত্ত মোসলমান সেনাপতি ভারতবর্ষকে "কাফের স্থান" বলিয়াই মনে করিতে শিখিয়াছিলেন; তাহারাই বিপুল জ্ঞান ভাণ্ডার যে আরবীয় সাহিত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া "এডুইনকে" বিদ্বান করিয়াছে, সে কথা অল্ বেরুণীর ন্যায় দুই চারি জন সুপণ্ডিত ভিন্ন অন্য কেহ জানিত না বা শুনিলেও বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত ছিল না। অল্ বেরুণী কি জন্য ভারতবর্ষের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পলিত কেশে সংস্কৃত শিক্ষায় অভিনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে হইলে আরবীয় সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করা আবশ্যক।

আরবীয় ভাষা বহু পুরাতন হইলেও আরবীয় সাহিত্য গ্রীক বা হিন্দুর সাহিত্যের ন্যায় বহু পুরাতন নহে। কিছু দিন পূর্ব্বে একথা অনেকেই স্বীকার করিতেন না; কিন্তু জর্ম্মাণ পুরাতত্ত্বানুসন্ধান-পরায়ণ অধ্যবসায়শীল সুধীবর্গ এক্ষণে তাহা অক্ষরে অক্ষরে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।

আরবীয় পুরাতন সাহিত্যে কেবল কবিতার প্রগল্‌ভতাই বর্ত্তমান ছিল; তাহাই মরুময় দেশের কঠোর কর্ম্মক্লান্ত জাতির পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া পরিচিত ছিল। তাহার সহিত কোরাণ ও তাহার টীকা টিপ্পনী সংযুক্ত হইয়াও সমগ্র আরবীয় সাহিত্যকে অল্পসংখ্যক গ্রন্থে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও আরবীয় সাহিত্যে ইহার অধিক আর কিছু প্রবেশলাভ করে নাই। আরবীয় মরুমরীচিকায় ইস্‌লামের অভ্যুদয়,—কিন্তু সে দেশে ইস্‌লামের জ্ঞানগৌরব সমুজ্জ্বল হয় নাই। বোগদাদের বিচিত্র রাজধানীই আরবীয় সাহিত্যের গৌরব-ক্ষেত্র।

স্মরণাতীত কাল হইতে বোগদাদের নিকট দিয়া ভারতীয় পণ্যভাণ্ডার ভূমধ্যসাগর তীরে বাহিত হইত। তৎসূত্রে ভারতবর্ষ হইতে ভূমধ্যসাগরের তীর পর্য্যন্ত মধ্য এসিয়ার সকল স্থানেই ভারতীয়গণের গতিবিধি প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধাচার্য্যগণ সেই পুরাতন বাণিজ্য পথ অবলম্বন করিয়া এসিয়া খণ্ডের পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত বৌদ্ধমত প্রচারিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রচারকৌশলে ভারতীয় সাহিত্য দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ইস্‌লাম আসিয়া বৌদ্ধমত বিতাড়িত করিবার সময়ে বৌদ্ধগণ বিতাড়িত হন নাই; যাঁহারা বৌদ্ধ, তাঁহারাই মোসলমান হইয়া-

ছিলেন। মোসলমান সাম্রাজ্যের প্রথম কেন্দ্র দামাস্কস্ নগরে প্রতিষ্ঠিত হয়;—তখনও রাজ্যসংস্থাপনের কোলাহল প্রবল ছিল। সেই জন্য দামাস্কসের রাজধানীতে সাহিত্যচর্চ্চা শক্তিলাভ করে নাই। মোসলমান সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় কেন্দ্র বোগদাদ নগরেই ইস্‌লামের জ্ঞানপিপাসা জাগিয়া উঠিয়াছিল। তৎকালে আরবীয় সাহিত্যের সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র শক্তির নিকট ভারতীয় বিপুল সাহিত্যশক্তি মহাশক্তিরূপে প্রতিভাত হয় এবং বোগদাদের খলিফাগণ ভারতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডার করতলগত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠেন। দুইটি কারণে এই ব্যাকুলতা ঘনীভূত হইয়াছিল।

ইস্‌লামের অভ্যুদয়ের প্রথম অবস্থাতেই ইরাণ মোসলমানের করতলগত হয়। বোগদাদ বাহুবলে বলীয়ান হইলেও জ্ঞানবলে ইরাণের সমকক্ষ ছিল না। ইরাণ এক সময়ে বৌদ্ধশিক্ষায় সমুন্নত হইয়াছিল, তজ্জন্য পরাজিত হইলেও বোগদাদের নিকট জ্ঞানবলে ইরাণ সমুন্নত দেশ বলিয়া প্রতিভাত হইত। ভারতবর্ষের শিক্ষাই যে ইরাণের জ্ঞানোন্নতির মূল, তাহা জ্ঞাত হইবা মাত্র বোগদাদ ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডার করতলগত করিবার জন্য ব্যাকুল হয়। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে সিন্ধুপ্রদেশ কিছুদিনের জন্য বোগদাদের করায়ত্ত হওয়ায় খলিফাগণ ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদ করাইতে আরম্ভ করেন। তদুপলক্ষে ব্রহ্মগুপ্তের "ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত" এবং "খণ্ডখাদ্য" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থদ্বয় আরবীয় ভাষায় অনূদিত হইয়া মোসলমান রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়।

এ পর্য্যন্ত যত জনপদ ইস্‌লামের করতলগত হইয়াছিল, তাহার সকল স্থানেই অল্পাধিক মাত্রায় ভারতীয় জ্ঞানের পরিচয় প্রকাশিত ছিল। ইস্‌লাম তখন নবোত্থিত মহাশক্তিমাত্র—তাহার পূর্ব্বগৌরব কিছুই ছিল না। ভারতবর্ষ বহু পুরাতন সভ্যদেশ, তাহার অতীত সৌভাগ্যের নিদানভূত জ্ঞানভাণ্ডার হস্তগত করিবার জন্য যে ইস্‌লাম ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এই সময় হইতেই যে আরবীয়গণ জ্যোতির্ব্বিদ্যার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রাপ্ত হন,—এ কথা এখন সর্ব্ববাদিসম্মত ঐতিহাসিক তথ্যরূপে সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছে।

বোগদাদাধিপতি সুবিখ্যাত হরুণ-অল্-রসীদের শাসন সময়েই আরবীয় সাহিত্য বিপুলতা লাভ করে। তৎকালে প্রাচীন বাহ্লীকরাজ্যের "নব বিহার" নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মঠের "পরমক" নামক বৌদ্ধযতির বংশধর মোসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া "বরমক গোত্রীয়" নামে পরিচিত ও হরুণ অল্ রসীদের মন্ত্রিপদে আরূঢ় হন। ইঁহার চেষ্টায় ভারতীয় গণিত, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, দশন, বিজ্ঞান ও বিষচিকিৎসা বিদ্যা আরবীয় ভাষায় অনূদিত হয়। তাহার সঙ্গে সঙ্গে মিশর ও গ্রীসের পুরাতন সাহিত্য সংযুক্ত হইয়া আরবীয় সাহিত্যকে দিন দিন সমুন্নত করিতে লাগিল।

অল্ বেরুণী জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আরবী সাহিত্য এইরূপে বিপুলতা লাভ করিয়াছিল; অল্ বেরুণী তৎসমুদয় অধ্যয়ন করিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য লালায়িত ছিলেন। ভারতবর্ষে নির্ব্বাসিত হইয়া তাঁহার সে আশা সফল হইয়া গেল। ভারতীয় সাহিত্যের আরবীয় অনুবাদ অধ্যয়নকালে অল্ বেরুণী মুগ্ধচিত্তে ভারতীয় সাহিত্যের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন, এক্ষণে উহার অভ্যন্তরে প্রবেশলাভ করিয়া দিন দিন তাঁহার সংস্কৃতানুরাগ প্রবল হইতে লাগিল। আরবীয় অনুবাদে মূল সংস্কৃত গ্রন্থের মাধুর্য্য রক্ষিত হয় নাই বলিয়া অল্ বেরুণীর ধারণা ছিল;—সংস্কৃত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সে ধারণা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতে লাগিল। এই সময়ে জনৈক সাহিত্যসুহৃদের সঙ্গে অল্ বেরুণীর তর্ক বিতর্ক চলিত। বন্ধুর বিশ্বাস ছিল—মূল সংস্কৃত গ্রন্থাদি অধ্যয়নার্থ ক্লেশ স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন, আরবীয় সাহিত্যে যে সকল অনুবাদ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট। অল্ বেরুণীর বিশ্বাস ইহার বিপরীত ছিল। সুতরাং উভয়ের বাদ প্রতিবাদ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইলে, অল্ বেরুণী নবমতসংস্থাপন কামনায় মূল সংস্কৃত শাস্ত্রাদি হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া "ইণ্ডিকা" রচনায় প্রবৃত্ত হন।

"ইণ্ডিকা পাঠে অবগত হওয়া যায়,—অল্ বেরুণী "ইণ্ডিকা" রচনার পূর্ব্বে অনেকগুলি সংস্কৃতগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দর্শনশাস্ত্রে সাংখ্য, পাতঞ্জল ও গীতা; পুরাণে—বিষ্ণু, মৎস্য, বায়ু ও আদিত্য; জ্যোতিষে পুলিশ সিদ্ধান্ত, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, খণ্ডখাদ্য, উত্তর খণ্ডখাদ্য বৃহৎসংহিতা, পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, বৃহজ্জাতক, লঘুজাতক, করণসার, করণতিলক ও ভুবনকোষ; এবং আয়ুর্ব্বেদে—চরক সবিশেষ উল্লেখের যোগ্য। এতদ্ব্যতীত, রামায়ণ,

মহাভারত, মানবধর্ম্মশাস্ত্র ছন্দঃশাস্ত্র ও হস্তিচিকিৎসাদি বিষয়ক গ্রন্থও যে অল্ বেরুণী কিয়ৎপরিমাণে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার রচিত "ইণ্ডিকার" স্থানে স্থানে তাহারও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

অধ্যাপক ম্যাক্স মূলর।

(২)

(দেববিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্বের আলোচনা।)

দেববিজ্ঞানের উৎপত্তি।



নবীন ধর্ম্মের বিবর্ত্তনে, সোপানবিশেষে দেবতায় বিশ্বাস স্বাভাবিক। আত্মতত্ত্বের সম্যক্ পরিস্ফূর্ত্তির পূর্ব্বে, জ্ঞানের সরল শৈশবে, সহজেই মানব নৈসর্গিক বিষয়ে প্রাণশক্তি আরোপ করিয়া দেবতার সৃষ্টি করে। ব্যক্তি-ভিন্ন শক্তির জ্ঞান তখনও পরিস্ফুট হয় নাই। নৈসর্গিক শক্তির ক্রিয়া দর্শনে সন্ত্রস্ত মানুষ, তখন, সেই শক্তির পশ্চাতে ব্যক্তি কল্পনা করিয়া থাকে। ক্রমে জ্ঞানবিকাশ সহকারে, অল্পে অল্পে এই সকল কল্পিত দেবদেবীতে অবিশ্বাসের উদয় হয়। এই অবিশ্বাস হইতেই দেববিজ্ঞানের উৎপত্তি। এই অবিশ্বাস বৃদ্ধি পাইলে একদল লোক দেববাদের ও তৎসংসৃষ্ট কর্ম্ম কাণ্ডের প্রকাশ্য প্রতিবাদ করেন; ইঁহারাই প্রত্যেক ধর্ম্মের আদি সংস্কারক। আর একদল এই প্রতিবাদের শক্তি ও যুক্তি সম্যক উপলব্ধি করিয়াও, সমাজস্থিতি সংরক্ষণার্থ প্রাচীন ধর্ম্মকে রক্ষা করা সঙ্গত ভাবিয়া, পূর্ব্বতন দেববাদের ও লোকপ্রচলিত কর্ম্মকাণ্ডাদির অভিনব ও সদ্যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যার সাহায্যে, যুক্তি ও শাস্ত্রের সমন্বয়সাধনে নিযুক্ত হয়েন। ইঁহারাই প্রকৃত পক্ষে দেববিজ্ঞানের আদিপ্রতিষ্ঠাতা।

প্রাচীন হিন্দু-আর্য্যের দেববিজ্ঞান।

প্রাচীনতম বৈদিক ধর্ম্মে দেববাদের প্রভূত প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড এই দেববাদেরই সঙ্গে জড়িত, এই দেববাদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ইহাই হিন্দু আর্যাগণের শৈশব ধর্ম্ম। ক্রমে জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে হিন্দু আর্যাগণের অন্তরে বৈদিক দেববাদের উপরে অবিশ্বাস উৎপন্ন হয়। এই অবিশ্বাস হইতেই উপনিষদের উৎপত্তি। এই অবিশ্বাস হইতেই ভারতীয় দেববিজ্ঞানের সৃষ্টি। আদি উপনিষদ সকল একদিকে "নেদং যদিদমুপাসতে"—লোকে যে সকল পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে,—এই বলিয়া বৈদিক দেববাদের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন; অন্য দিকে পরা ও অপরা এই দুই শ্রেণীতে সমুদায় বিদ্যাকে বিভাগ করিয়া, "তত্রাপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ"—তাহার মধ্যে ঋগ্বেদাদিকে অপরা বিদ্যার অন্তর্ভূত করিয়া, দেবোপাসনাবহুল বৈদিক ধর্ম্মের প্রামাণ্য অস্বীকার করিতে লাগিলেন, এবং সর্ব্বোপরি "অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে"—যাহারা কাম্যকর্ম্মের অনুসরণ করে, তাহারা গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করে, এই বলিয়া কর্ম্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিলেন। পরবর্ত্তী উপনিষদে জ্ঞান ও কর্ম্মের একটা সমন্বয়-চেষ্টা দৃষ্ট হয় সত্য; কিন্তু আদি উপনিষৎকর্ত্তৃগণ, বৈদিক ধর্ম্মের আমূল সংস্কারেচ্ছু ছিলেন। তদানীন্তন সমাজে তাঁহারা উন্নতিশীল সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁহারা প্রাচীনকে একরূপ বর্জ্জন করিয়াই নূতনের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়াসী হন। কিন্তু নিরুক্তকারেরা অন্যরূপ লেখক ছিলেন। তাঁহারা তদানীন্তন হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। উপনিষৎকারদিগের ন্যায় তাঁহারাও প্রাচীনতম বৈদিক দেববাদের অসারতা ও অসঙ্গতি অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহারাও বৈদিক ধর্ম্মের সংস্কারপ্রার্থী ছিলেন। তবে প্রাচীনকে একেবারে বর্জ্জন করিয়া নহে, কিন্তু যথাবিধি ও যথাযোগ্য তাহার সংশোধন করিয়া তাহারই উপরে নূতনের প্রতিষ্ঠা করা তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। বৈদিক ধর্ম্মের প্রামাণ্য রক্ষা করিবার জন্য আগ্রহাতিশয্য বশতঃ তাঁহারা অভিনব ব্যাখ্যা দ্বারা, নূতন জ্ঞানের সঙ্গে প্রাচীন সংস্কারের সমন্বয় সাধনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। প্রাচীন হিন্দু আর্য্যগণের মধ্যে নিরুক্তকারেরাই দেববিজ্ঞানের আদি প্রতিষ্ঠাতা। সম্ভবতঃ এ জগতেও তাঁহারাই দেববিজ্ঞানের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহাদের পূর্ব্বে আর কোথাও কেহ দেববিজ্ঞানের আলোচনা করিয়াছিল বলিয়া, ইতিহাসে কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

বৈদিক দেববাদের চারি প্রকার ব্যাখ্যা।

প্রাচীন হিন্দু নিরুক্তকারগণ বৈদিক দেববাদের চারিপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। যাস্কের নিরুক্তে এই চতুর্ব্বিধ ব্যাখ্যারই উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবান্ সায়ণাচার্য্যের বেদভাষ্যেও এই চারি প্রকারের ব্যাখ্যাই দৃষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সায়ণের পদাঙ্কানুসরণে ঋগ্বেদের বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছেন বলিয়া তাহাতেও বিবিধ শ্রেণীর ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে, কোনও অজ্ঞাত সময়ে যাস্কের কাল নির্ণয় করিয়াছেন। সুতরাং ভারতীয় আর্য্যগণের মধ্যে অন্ততঃ তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে দেববিজ্ঞানের আলোচনা হইয়াছিল, ইহা একরূপ নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়।

প্রাচীন নিরুক্তকারগণের মধ্যে আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক, আধিযাজ্ঞিক, এবং ঐতিহাসিক, এই চারি প্রকারের বৈদিক দেববাদের ব্যাখ্যা প্রচলিত ছিল। আধিভৌতিকগণ নৈসর্গিক বিষয় ও ঘটনাদির রূপক রূপে বৈদিক দেবদ্বের ব্যাখ্যা করিতেন। ইঁহাদের মতে বেদের দেবতাগণ ভৌতিক শক্তি ও নৈসর্গিক ব্যাপারের রূপক মাত্র। অশ্বিনীকুমার-দ্বয় প্রদোষ এবং উষার রূপক, সারমেয় সকল সূর্য্যকিরণের রূপক। যে নৈসর্গিক শক্তি প্রভাবে মেঘ বারি বর্ষণ করে, ইন্দ্র তাহারই রূপক। এইভাবে আধিভৌতিকগণ বৈদিক দেববাদের একটা সদর্থ করিতে চেষ্টা করেন। আধ্যাত্মিকগণ বৈদিক দেবতত্ত্বকে মানবের দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মনোবৃত্তি সকলের রূপক রূপে ব্যাখ্যা করিতেন। আধিযাজ্ঞিকগণ ঠিক দেবতায় বিশ্বাস করিতেন বলিয়া বোধ হয় না; কিন্তু বেদ মন্ত্রের ও বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের অলৌকিক শক্তিতে আস্থাবান ছিলেন। জৈমিনী প্রভৃতি পরবর্ত্তী মীমাংসকগণ অনেকেই এই দলভুক্ত। তাঁহাদের মতে বৈদিক মন্ত্রে যে সকল দেবতার নাম দৃষ্ট হয়, তাঁহারা ঠিক দেবতা নহেন; এই সকল মন্ত্র দেবোদ্দেশে রচিতই হয় নাই। দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করিলে বেদের শক্তিহীনতা সপ্রমাণ হয়। বেদে পুরোহিতের সম্মুখস্থ মৃদ্ঘটে ইন্দ্রাদি দেবতার আহ্বান করিবার বিধি আছে। ঐরাবত-বাহন-সহ ইন্দ্র মৃদ্ঘটে আসিয়া আবির্ভূত হইলে ঘট চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবেই যাইবে। ঘট যখন বিনষ্ট হয় না, তখন ইন্দ্র ঘটে আসিয়া আবির্ভূত হন না, ইহাই বলিতে

হইবে। যদি ইন্দ্র নামে সত্য দেবতাত্মা থাকেন, আর মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আবাহন করিলে যদি তিনি তখনি আসিয়া উপস্থিত না হন, তবে মন্ত্র শক্তিহীন ও বেদ নিষ্ফল হইয়া যায়। কিন্তু বেদ নিষ্ফল হইতে পারে না। সুতরাং বেদে ইন্দ্র নামে কোনও দেবতাত্মার উল্লেখ নাই। বেদ অপৌরুষেয় মন্ত্রসমষ্টি মাত্র। এই মন্ত্রের অলৌকিক শক্তি প্রভাবে, তাহা উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞাদি ক্রিয়া করিলে ইহ পারত্রিক কল্যাণ সাধিত হয়। এইরূপে আধিযাজ্ঞিকগণ শুদ্ধ যজ্ঞার্থে বৈদিক দেবতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতেন। ঐতিহাসিকগণের মতে বেদ যাঁহাদিগকে দেবতারূপে বর্ণনা করিয়াছেন, এক সময়ে তাঁহারা মর্ত্ত্যবাসী মানব ছিলেন, তপঃ প্রভাবে সিদ্ধি লাভ করিয়া দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপে হিন্দু নিরুক্তকারগণ বৈদিক দেববাদের একটা সদযুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা প্রদান করিতে চেষ্টা করেন। ইঁহারাই আমাদের দেশের দেববিজ্ঞানের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা।

প্রাচীন হেলেনীয় আর্য্যের দেববিজ্ঞান।

হিন্দু আর্য্যগণের ন্যায় হেলেনীয় আর্য্যগণও, খৃষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চম কি ষষ্ঠ শতাব্দীতে, আপনাদিগের মধ্যে এক প্রকারের দেববিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বৈদিক দেববাদের সদযুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা করা যেমন হিন্দুর দেববিজ্ঞানের লক্ষ্য ছিল, সেইরূপ হোমরীয় দেববাদের সঙ্গত ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস হইতেই হেলেনীয় দেববিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়। প্রাচীন হিন্দু আর্য্যগণের মধ্যে যেমন উচ্চতর জ্ঞানালোচনা ও গভীরতর আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম সাধনের সঙ্গে সঙ্গেও বালস্বভাবসুলভ দেবোপাসনার বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাচীন হেলেনীয় আর্য্যগণের মধ্যেও ঠিক তাহাই দৃষ্ট হয়। হেলেনীয় সাধনা জ্ঞানের অতি উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। আজিও সেই হেলেনীয় জ্ঞানগরিমাতেই য়ুরোপীয় সাধনা গৌরবান্বিত। যে শিক্ষা ও সাধনার প্রসাদে বর্ত্তমান সভ্য জগতের জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মীলিত হইয়াছে, সেই শিক্ষা ও সাধনার আদি গুরু যাঁহারা, তাঁহাদের চক্ষে যে হোমর বর্ণিত দেবকাহিনীর হীনতা ও অযৌক্তিকতা কখনও প্রকাশিত হয় নাই, এরূপ কল্পনা করাও সুকঠিন। ফলতঃ যেমন হিন্দুগণের মধ্যে, সেইরূপ হেলেনীয় সমাজেও জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে দেশ প্রচলিত দেববাদে অবিশ্বাসের উদয় হইয়াছিল। আমাদিগের পৌরাণিক দেবকাহিনীর ন্যায়, হোমরের দেবতাদিগের সম্বন্ধেও চৌর্য্য পরদার প্রভৃতি মহাপাতকের বর্ণনা আছে। এই সকল কুৎসিত উপকথার রটনা নিবন্ধন হেলেনীয় জ্ঞানিগণের অন্তরে হোমরের দেববাদে কেবল অবিশ্বাস নহে, কিন্তু গভীর অভক্তিরও উদয় হইয়াছিল। ভারতে রাজশক্তি ও ধর্ম্মশক্তি একাধারে কদাপি কেন্দ্রীভূত হয় নাই। এই জন্য ধর্ম্মের সংস্কার, স্বাধীনভাবে ধর্ম্মের বিষয়ে চিন্তা ও আলোচনা করা এদেশে সহজ ছিল। কিন্তু হেলেনীয় সমাজে, হোমরীয় দেববাদ রাজনীতি ও রাজ-শক্তির সঙ্গে গ্রথিত হইয়া গিয়াছিল। এই জন্য হোমরের প্রতিবাদ করা রাজদ্রোহিতার মধ্যে পরিগণিত হইত। সুতরাং অন্তরে অবিশ্বাস পোষণ করিয়াও, প্রকাশ্যে তাহার বিরুদ্ধ মত প্রচার, বা বিপরীত আচরণ অবলম্বন করিতে অনেকে স্বভাবতঃই সঙ্কুচিত হইতেন। যাঁহারা সঙ্কুচিত হইতেন না, তাঁহাদিগকে দণ্ডভোগ করিতে হইত। প্রোটাগরাস বলিয়াছিলেন, হোমরীয় দেবতাদিগের অস্তিত্ব, প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ। এই গুরুতর অপরাধের জন্য তাঁহাকে নির্ব্বাসিত এবং প্রকাশ্য রাজপথে তাঁহার গ্রন্থাবলী স্তূপীকৃত করিয়া দগ্ধ করা হয়। জ্ঞানিপ্রবর সক্রেটিস সাক্ষাৎভাবে হোমরীয় দেববাদের প্রতিবাদ করেন নাই। তথাপি তিনি এ সকলে সরল ভাবে বিশ্বাস করেন না বলিয়া সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতেই, তাঁহাকে বিষপানে প্রাণত্যাগ করিয়া, আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইয়াছিল। এই সকল কারণেই, সম্যক ও স্বাধীনভাবে আলোচনার অভাব বশতঃ হেলেনীয় সমাজে হিন্দুদিগের ন্যায়, অতি প্রাচীন কালে দেববিজ্ঞানের সৃষ্টি হইতে পারে নাই। কিন্তু সক্রেটিসের মৃত্যুর পরে, এথেন্সে রাজনৈতিক স্বাধীনতার খর্ব্বতার সঙ্গে সঙ্গে, তাহারই ক্ষতিপূরণস্বরূপ, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা কথঞ্চিৎ সম্প্রসারিত হইয়াছিল। তখন হইতেই, প্রকৃতপক্ষে, হেলেনীয় সমাজে দেববিজ্ঞানের সূত্রপাত হয়। হোমরীয় দেববাদের অনেক স্থলেই একটা নিগূঢ় রূপকাত্মক অর্থ আছে, প্লেটো এই মত ব্যক্ত করেন। তৎপরে হিন্দু আর্য্যদিগের ন্যায় হেলেনীয় আর্য্য সমাজেও বিবিধ সম্প্রদায়ের দেবতত্ত্ব ব্যাখ্যাতার অভ্যুদয় হয়।

হোমরীয় দেববাদের চারি প্রকার ব্যাখ্যা।

হিন্দু দেবতত্ত্বব্যাখ্যা নিরুক্তকারগণ যেমন চারি সম্প্রদায়ের ছিলেন, সেইরূপ হেলেনীয় দেবতত্ত্বব্যাখ্যাতাদিগকেও চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ম্যাক্স মূলর তাঁহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। তবে আমাদের আধ্যাত্মিক নিরুক্তকারগণের ন্যায় যে সকল হেলেনীয় ব্যাখ্যাতা আধ্যাত্মিক রূপকরূপে হোমরের দেববাদের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, ম্যাক্স মূলর তাঁহাদিগকেও আধিভৌতিক শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইয়াছেন, নতুবা মূলতঃ হেলেনীয় দেবব্যাখ্যাতাগণও চারি সম্প্রদায়েই বিভক্ত হইতে পারেন। হিন্দু আধিভৌতিকগণের ন্যায় পাইথেগোরাসের শিষ্য এপিকার্মাস গ্রীক দেবদেবী সকলকে বায়ু, জল, পৃথিবী, সূর্য্য, অগ্নি এবং নক্ষত্রের রূপক বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ইঁহার কিছুকাল পরে, খ্রীষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে, এম্পিডোক্লিস্ জিউস্, হিরি, আইডোনিস্, এবং নেষ্টিয়া, এই চারি জন প্রধান হেলেনীয় দেবতাকে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, ও মরুৎ এই চতুর্ভূতের নামান্তর বলিয়া প্রচার করা হয়। মিত্রডোরস কেবল জিউস্ প্রভৃতি হোমরীয় দেবতাকেই নহে, কিন্তু হেক্টর প্রমুখ হোমরীয় অধিনায়ক সকলকে পর্য্যন্ত আধিভৌতিক বিষয় ও ঘটনাদির প্রচ্ছন্ন রূপক বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন। ইঁহারা সকলেই হেলেনীয় দেবব্যাখ্যাতৃগণের মধ্যে আধিভৌতিক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এনেক্সেগোরাস এবং তদীয় শিষ্যগণ আধ্যাত্মিক অর্থে হোমরীয় দেববাদের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, ইঁহাদের মতে জিউস বুদ্ধিবৃত্তির রূপক, এথিনী শিল্পের রূপকমাত্র। হিন্দুদিগের আধিযাজ্ঞিক নিরুক্তকারগণের ন্যায়, হেলেনীয় সমাজে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের দেব ব্যাখ্যাতা ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু লোকভয় নিবারণার্থ এই সকল দেবোপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে, একদল পণ্ডিত এরূপ মনে করিতেন। ইঁহাদিগকে নৈতিক ব্যাখ্যাতা বলা যাইতে পারে। ম্যাক্স মূলর ইঁহাদিগকে Ethical উপাধি প্রদান করিয়াছেন। জনগণের অন্তরে ভীতির সঞ্চার, এবং জনসমাজে বিধি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা দ্বারা শৃঙ্খলা ও শান্তি স্থাপনে লৌকিক ধর্ম্ম যে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া, সমাজস্থিতি রক্ষার্থ দুষ্টের দণ্ডদাতা ও শিষ্টের পুরস্কর্ত্তারূপে দেবদেবীরা কল্পিত হইয়াছেন, হেলেনীয় সমাজের নৈতিক দেবতত্ত্ব ব্যাখ্যাতারা, এইরূপ মনে করিতেন। মহামতি এরিষ্টোটল্ পর্য্যন্ত মানবীয় ধর্ম্মের গভীরতর ভিত্তি আছে, ইহা স্বীকার করিয়াও হেলেনীয় দেববাদ যে সমাজস্থিতি রক্ষার্থ কল্পিত হইয়াছিল, এরূপ ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। আমাদিগের দেশে যেমন, গ্রীসেও সেইরূপ, এক শ্রেণীর দেবব্যাখ্যাতৃগণ ঐতিহাসিক রূপক বলিয়া হোমরের দেববাদের একটা সদর্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায় ইউহিমারাসের (Euhemerus) নামে পরিচিত। তবে ইউহিমারাসের পূর্ব্বেও এই শ্রেণীর দেবব্যাখ্যার নিদর্শন হেলেনীয় সাহিত্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইউহিমারাস দিগ্বিজয়ী বীর সেকেন্দরের সমসাময়িক লোক ছিলেন। তাঁহার মতে হোমরবর্ণিত দেবদেবীগণের অতিপ্রাকৃত সত্তা কিছুই নাই। তাঁহারা মর্ত্ত্যবাসী রাজা, সেনানায়ক কিম্বা সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক ব্যক্তি ছিলেন। মরণান্তে লোক সমাজে সমাদৃত হইয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আধুনিক দেববিজ্ঞান।

বর্ত্তমান যুগে দুই কারণে দেব বিজ্ঞানের বিশেষ আলোচনা হইয়াছে। এক দল পণ্ডিত জগতের প্রাচীন ধর্ম্ম সকলের মর্ম্ম উদ্ঘাটনে ব্রতী হইয়া, দেবতত্ত্বের আলোচনা করিতেছেন। আর এক দল মানবীয় ধর্ম্মপ্রবৃত্তির মূল অন্বেষণে যাইয়া, প্রায় সর্ব্বত্রই ধর্ম্ম বিকাশের স্তরবিশেষে দেবতায় বিশ্বাস দেখিতে পাইয়াছেন, এবং এই সার্ব্বভৌম বিশ্বাসের বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া, দেবতত্ত্বের প্রকৃতি অনুসন্ধান করিতেছেন। এই সকল পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে দেবতার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবিধ মত প্রচলিত হইয়াছে। এক মতে জ্ঞানবিকাশের নিম্নতম স্তরে, প্রাণহীন পদার্থে প্রাণ ও নৈসর্গিক শক্তিতে ব্যক্তিত্ব আরোপ করা মানব মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়াই মানুষ দেবতার সৃষ্টি করে, এবং দেবতায় বিশ্বাস করে। অক্সফর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞানের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক টাইলার এই মতের প্রধান পরিপোষক। তাঁহার Early History of Mankind এবং Primitive Culture, গ্রন্থদ্বয় পণ্ডিতসমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে; এই গ্রন্থে তিনি এই মতের সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। মানব মনের এই স্বাভাবিক ধর্ম্মকে animism এনিমিজিম্ বা প্রাণীকরণ কহে। হেলেনীয় আর্য্য সমাজে প্রাচীনতমকালে কোনও বৃক্ষ শাখার আকস্মিক পতনে কাহারও অঙ্গহানি বা প্রাণহানি হইলে, সেই বৃক্ষের যথাবিধি বিচার হইত, এবং অপরাধী সাব্যস্ত হইলে, যথানিয়মে তাহার দণ্ড হইত। ইংলণ্ডের প্রাচীন রাজবিধানে এইরূপে শকটচক্রের দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। কিছুকাল পূর্ব্বে কোচিন চীনের এক রাজা এক অর্ণবপোত নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে আরোহণ করিয়া সমুদ্র যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তাঁহাকে সামুদ্র রোগে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হয়। এই অপরাধে গরিব জাহাজের উপরে বেত্রাঘাতের আদেশ হইয়াছিল। এই সকল ঘটনাই প্রাণীকরণের দৃষ্টান্ত।

প্রাণীকরণ।

এই প্রাণীকরণের প্রকৃতি ও অর্থ কি? জ্ঞানের শৈশবে মানব প্রাণহীন পদার্থে প্রাণ আরোপ করে বলিয়া জড় এবং চেতনের বিভেদজ্ঞান যে তাহার থাকে না, এরূপ মনে করা সঙ্গত নহে। এই কারণে প্রাণীকরণের উৎপত্তি হয় বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা মানুষকে ইতর জন্তু অপেক্ষাও হীন বলিয়াই প্রমাণ করিতে চাহেন। ইতর জন্তু পর্য্যন্ত যখন সচেতন ও অচেতনে বিভেদ করিয়া থাকে, শৃগাল কুক্কুরাদি পর্য্যন্ত যখন সুষুপ্ত ও মৃতের প্রভেদ সহজেই বুঝিতে পারে, তখন মানুষ কখনও চেতন ও অচেতনের পার্থক্য বুঝিত না, এরূপ কল্পনাও করা যায় না। তাহা করিতে গেলে মানবের মানসিক শক্তিকে শৃগাল কুক্কুরাদির সহজজ্ঞান অপেক্ষাও হীন বলিয়া মনে করিতে হয়। ফলতঃ প্রাণীকরণ এই কারণ হইতে উৎপন্ন হয় না, প্রাণীকরণের ধর্ম্ম এরূপ নহে। স্পেন্সারের মতে মানব আপনার ছায়া দেখে, সুষুপ্তিকালে স্বপ্নেও আপনাকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। এই ছায়া ও স্বপ্নের অভিজ্ঞতা হইতে, দেহাতিরিক্ত প্রাণশক্তির জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তৎপরে এই নবজ্ঞাত প্রাণশক্তিকে সে চতুর্দ্দিগস্থ বিষয় ও ঘটনাদিতে আরোপ করিয়া প্রাণীকরণের সৃষ্টি করে। কিন্তু ছায়া ও স্বপ্ন হইতে আত্মসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, চিন্তাশক্তির যেরূপ বিকাশের প্রয়োজন, মানসিক বিবর্ত্তনের সেইরূপ স্তরে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই মানব দেবোপাসনাদি করিয়া থাকে। সুতরাং ছায়া এবং স্বপ্ন হইতে সমুদ্ভূত আত্মজ্ঞানের দ্বারা যে প্রাণীকরণ সম্ভব হয়, একথাও বলা সঙ্গত নহে। তবে এই প্রাণীকরণের মূল কি? মানবের মনে স্বভাবতঃই কার্য্যকারণ সম্বন্ধের একটা জ্ঞান নিহিত আছে। অভিজ্ঞতা দ্বারা এই জ্ঞান প্রকাশিত হয় সত্য, আপনি কর্ত্তারূপে কোনও কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিলে, এই কর্ত্তৃত্বশক্তির জ্ঞান, এবং কার্য্য কারণ সম্বন্ধের অন্তর্বোধ মানব অন্তরে প্রকাশিত হইত না, ইহাও নিশ্চিত। কিন্তু শুদ্ধ অভিজ্ঞতা হইতে এ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এরূপ মনে করা ঠিক নহে। ভিতরে যাহা নাই, বাহিরের অভিজ্ঞতা দ্বারা তাহা কদাপি অন্তরে প্রকাশিত হইতে পারে না। যাহার স্বরবোধ নাই, সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে কখনও তাহা ফুটিয়া উঠে না; যাহার অন্তরে সঙ্গীতের শক্তি বীজাকারে নিহিত আছে, সুসঙ্গীত শ্রবণে, তাহারই সে শক্তি জাগরূক হইয়া থাকে। "যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে।" সুতরাং কার্য্য কারণ শৃঙ্খলার অভিজ্ঞতা হইতে, কার্য্যকারণ সম্বন্ধের জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, হইতে পারে না, কেবল অন্তর্নিহিত, গুপ্ত জ্ঞান, ব্যক্ত হয় মাত্র। প্রত্যেক কার্য্যেরই কারণ অন্বেষণ করা মানব মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। জ্ঞানের শৈশবে, মানব এই সাধারণ ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়াই নৈসর্গিক কার্য্য নিচয়ের কারণ অন্বেষণে নিযুক্ত হয়। স্বীয় অভিজ্ঞতাতে সে আপনাকে ও আত্মসদৃশ অপর ব্যক্তিদিগকেই কেবল কর্ত্তা বলিয়া জানে। প্রাণী ভিন্ন এ জগতে সে কুত্রাপি কাহাকেও কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং কোনও নৈসর্গিক ঘটনা দেখিলেই তাহার কারণ অন্বেষণে যাইয়া সে সহজেই যে বস্তু অবলম্বনে সে কার্য্য প্রকাশিত হয়, তাহাতে প্রাণশক্তি আরোপ করিয়া থাকে। দহনরূপ কার্য্য অগ্নিসংযোগে প্রকাশিত হয়। সুতরাং অগ্নিতে প্রাণ আরোপিত হয়। দিনকর সংযোগে এ জগতে আলোকের প্রকাশ হয়। সুতরাং সূর্য্যে প্রাণ আরোপিত হয়। বৃক্ষ এক ঋতুতে পত্র পল্লব বিহীন, অপর ঋতুতে বা পত্র পল্লব শোভিত হইয়া উঠে, সুতরাং এই সকল কার্য্যের কর্ত্তারূপে বৃক্ষে প্রাণ কল্পিত হয়। নদী ধাবিত হয়, সুতরাং তাহার গতি দর্শনে, সহজেই গতির কর্ত্তারূপে তাহাতেও প্রাণ কল্পিত হইয়া থাকে। ইহাই প্রকৃত পক্ষে প্রাণীকরণের অর্থ। এইরূপ প্রাণীকরণ হইতেই ক্রমে দেবতার উৎপত্তি হয়।

উপমা হইতে প্রতিমার উৎপত্তি।

কিন্তু প্রাণীকরণের দ্বারা যে দেবতার উৎপত্তি হয়, ম্যাক্সমূলর ইহা অস্বীকার করিতেন। তাঁহার মতে মানবীয় ভাষার বিকৃতি হইতেই দেববাদের সৃষ্টি হইয়াছে। ম্যাক্সমূলরের পূর্ব্বে এবং পরে আরো অনেক ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত এই মত প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, উপমা হইতেই প্রতিমার সৃষ্টি হইয়াছে। এক বস্তুর নাম অপর বস্তুতে প্রদত্ত হইলেই উপমার উৎপত্তি হয়। এবং মানবীয় ভাষাতে সর্ব্বদাই এক ধাতু হইতে বিবিধ বস্তু ও বিষয় প্রতিপাদক শব্দের সৃষ্টি হইয়া থাকে। জ্ঞানের আদিম অবস্থায়, মানুষের মন শুদ্ধ ইন্দ্রিয় ব্যাপারেই নিবদ্ধ থাকে। ক্রমে জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অতীন্দ্রিয় ভাবাদির অভিজ্ঞতা জন্মিতে আরম্ভ করিলে, সেই সকল অভিনব অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা হয়। পূর্ব্ব-জ্ঞাত বস্তুর সাহায্যেই সর্ব্বদা মানবীয় জ্ঞানে ও ভাষাতে অপূর্ব্ব জ্ঞাতের ভাব ও প্রকৃতি ব্যক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং পূর্ব্বজ্ঞাত ইন্দ্রিয়ব্যাপারপ্রকাশক শব্দাদির সাহায্যেই অভিনব অভিজ্ঞতার অতীন্দ্রিয় ভাবাদি ব্যক্ত হইতে আরম্ভ করে। এইরূপে দুই বা ততোধিক বস্তুতে কোনও সাধারণ ধর্ম্ম দর্শন করিয়া, একই শব্দের দ্বারা, তাহাদের নামকরণ হইয়া থাকে। এই প্রণালীতে এক শ্রেণীর উপমার সৃষ্টি হয়। এই শ্রেণীর উপমাকে ম্যাক্সমূলর ধাতুগত উপমা—Radical Metaphor—কহিয়াছেন। বস্ ধাতুর অর্থ উজ্জ্বল হওয়া; এই উজ্জ্বলতা, দিবা, দিবাকর, এবং স্বর্গের সাধারণ ধর্ম্ম। সুতরাং এই সাধারণ ধর্ম্ম অবলম্বনে এই একই "বস্" ধাতু হইতে বাসর, বিবস্বৎ, এবং বসু এই তিন বিভিন্ন বস্তুর জ্ঞাপক তিনটি পদ সিদ্ধ হইয়াছে। ইহাই ধাতুগত বা ধাতবী উপমার—Radical Metaphorএর—দৃষ্টান্ত। আর একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। অর্ক ধাতুর অর্থও উজ্জ্বল হওয়া, এবং উজ্জ্বল করা। কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃতে এই উজ্জ্বল

করার অনেক অর্থ ছিল। মানুষে প্রযুক্ত হইয়া, এই অর্ক ধাতু, আনন্দিত করা, প্রফুল্ল করা, এবং তদর্থে স্তুতি বন্দনা করা পর্য্যন্ত বুঝাইত। এই ধাতুর মৌলিক অর্থ উজ্জ্বল হওয়া বা উজ্জ্বল করা এবং অতি সহজেই এই অর্থে, এই ধাতু সূর্য্যে, চন্দ্রে, নক্ষত্রে, প্রযুক্ত হইতে পারিত, এবং অর্ক বা ঋচ্ অতি প্রাচীনতম কালে, আর্য্যদিগের মধ্যে হয়ত এই সমুদায় বস্তুকেই ব্যক্ত করিত। কিন্তু বর্ত্তমান আর্য্য ভাষায় ঋচ কেবল স্তুতি বন্দনা অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ঋচ অপর যে সকল অর্থ ব্যক্ত করিতে পারিত, তাহার সঙ্গে ঋচের সকল সম্বন্ধ যে একেবারে লোপ পাইল, এমনও নহে। কেবল ঐ একই ধাতুর বিভিন্ন প্রকারের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া, ঐ সকল বিবিধ অর্থজ্ঞাপক বিভিন্ন শব্দের উৎপত্তি হইল। যেমন, কিরণ কিম্বা আলোক অর্থ ব্যক্ত করিবার জন্য ঐ ধাতু হইতেই পুংলিঙ্গে অর্চিঃ শব্দ স্ত্রীবে অর্চিস্ শব্দ নিষ্পন্ন হইল। কিন্তু অর্চি বা অর্চিসের আর স্তুতি বন্দনা অর্থ রহিল না। আবার ঐ অর্ক বা অর্চি ধাতু হইতেই পুংলিঙ্গ অর্কঃ শব্দ নিষ্পন্ন হইল। এই অর্কেরও অর্থ কিরণ বা আলোক, এবং ক্রমে ইহা কিরণাধার দিবাকরের এক পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া গেল। অন্য দিকে স্তুতি-বন্দনা-ব্যঞ্জক এই অর্ক বা অর্চ ধাতু হইতে এই একই প্রক্রিয়া অবলম্বনে ঠিক একই লিঙ্গের একই আকারের আর একটা অর্কঃ শব্দ নিষ্পন্ন হইল। এই অর্কের অর্থ স্তুতিবন্দনা, এবং ক্রমে ইহা বেদের স্তুতি বন্দনাদিতে বিশেষ ভাবে প্রযুক্ত হইল। ইহাও ধাতুগত বা ধাতবী উপমার একটা বিশেষ দৃষ্টান্ত। এই উপমা হইতেও বেদের একটা দেববাদের সৃষ্টি হইয়াছে। অর্কঃ অর্থ সূর্য্য, অর্কঃ অর্থ বেদের স্তুতিবন্দনা। অতি প্রাচীন কালে, যে বিভিন্ন সূত্র অবলম্বনে এই একই আকারের দুই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছিল, যত দিন পর্য্যন্ত লোক স্মৃতিতে তাহা জাগরুক ছিল, ততদিন কোনও দেববাদ সৃষ্টি হইতে পারে নাই। কিন্তু কালক্রমে এই অর্কঃ দ্বয়ের জন্মবৃত্তান্ত লোকে ভুলিয়া গেল। এবং একই শব্দে দুই বস্তুকে নির্দ্দেশ করিতেছে দেখিয়া তাহাদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া লইল। এইরূপে এই ধাতবী উপমা অবলম্বনে বেদের ঋচের সঙ্গে সূর্য্যের একটা সহজ সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। এই সম্বন্ধের মূল অন্বেষণে যাইয়া সূর্য্যই বেদের প্রকাশক, সূর্য্য দেবতা বেদ-প্রচার ও প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, এই বৈদিক দেববাদের সৃষ্টি হইল। ম্যাকস্মূলর প্রভৃতি বলেন যে, এইরূপ ধাতবী (radical) উপমা অবলম্বনে, শব্দের মৌলিক অর্থের বিস্মৃতিজনিত ভাষার বিকৃতি হইতে, এক প্রকারের দেববাদের উৎপত্তি হইয়াছে।

কিন্তু ধাতুগত উপমাই (Radical Metaphor) দেববাদোৎপত্তির এক মাত্র কারণ নহে। সাধারণতঃ আমরা উপমা বলিতে যাহা বুঝি, ম্যাক্স্মূলর যাহাকে Poetical metaphor—কাব্যরচিত উপমা বলিয়াছেন, তাহা হইতেও তাঁহার এবং অপরাপর ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে, দেববাদের সৃষ্টি হইয়াছে। আকাশের নক্ষত্রকে যখন ফুলের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলি,—"দেখ ঐ নীলবাগানে কত ফুল ফুটিয়াছে"; কিম্বা গতিশীল মেঘের সঙ্গে যদি দ্রুতগামী দূতের তুলনা করিয়া, মেঘকে কালিদাসের মত, বিরহ বিধুরা প্রণয়িনীর দৌত্যে নিযুক্ত করি; কিম্বা সূর্য্যকে যদি অশ্বারোহী, তেজস্বী যোদ্ধার সঙ্গে তুলনা করিয়া, সূর্য্যরশ্মি সকলকে, তাঁহার শকট-যোজিত অসংখ্য শুভ্র অশ্ব রূপে বর্ণনা করি, তাহা হইলেই এই শ্রেণীর কাব্যোপমার সৃষ্টি হয়। শিশির-সিক্ত পত্র পল্লবাদির মধ্যে তরুণ অরুণের ক্রীড়া দর্শনে মোহিত হইয়া, অরুণ কিরণজালকে সূর্য্যের হস্ত বলিয়া কল্পনা করা কিছুই বিচিত্র ছিল না। এই স্বর্ণাভ কিরণজালকে উপমাসূত্রে আবদ্ধ করিয়া, সূর্য্যকে হিরণ্যপাণি উপাধি প্রদান করাও অতি স্বাভাবিক ছিল। এই রূপেই সবিতার এই নামকরণ হইয়া থাকিবে। ঋগ্বেদে (১, ৩৫, ৯,১০) তাহাকে হিরণ্যপাণি, হিরণহস্ত রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

কিন্তু যে সূত্র অবলম্বনে প্রথমে অতি স্বাভাবিক ভাবে, এই মনোহারিণী উপমা সূর্য্যে প্রযুক্ত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী কালে, তাহা লোকস্মৃতি হইতে লুপ্ত হইল। তখন হিরণ্যপাণি শব্দের একটা সার্থকতা প্রতিপন্ন করা প্রয়োজন হইল। ইতিমধ্যেই বৈদিক সমাজে সূর্য্যোপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সবিতা আপনার যজমানকে ঈপ্সিত বর প্রদান করিয়া থাকেন। প্রজাগণ তাঁহা হইতেই ধন রত্ন প্রাপ্ত হয়। সুতরাং হিরণ্যপাণি আপনার প্রাচীন স্বাভাবিক অর্থ পরিত্যাগ করিল। বৈদিক দেববাদে যজমানের পোষণার্থ সবিতা স্বর্ণাদি প্রদান করেন, সুতরাং তাঁহার হস্তে সর্ব্বদাই অশেষ স্বর্ণ রহিয়াছে, অতএব তিনি হিরণ্যপাণি, এই কাহিনীর উৎপত্তি হইল। এইরূপ ভাবে কাব্যোপমা Poetical Metaphor) অবলম্বনে বহুল পরিমাণে দেববাদের উৎপত্তি হইয়াছে। এই জন্য ম্যাকসমূলর প্রভৃতি বলেন, প্রাণীকরণ হইতে নহে, কিন্তু উপমার মৌলিক অর্থের বিস্মৃতি হইতে, ভাষার বিকৃতির ফল স্বরূপই, দেববাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

উপমার দ্বারা যে দেববাদ কিয়ৎ পরিমাণে পরিপুষ্ট হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সকল প্রকারের উপমা হইতেই তো আর দেবোৎপত্তি হয় না। আকাশকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত পুষ্পোদ্যানের সঙ্গে তুলনা করিয়া নক্ষত্ররাজিকে পুষ্পরূপে কল্পনা করা যায়, ততক্ষণ, এই উপমা হইতে কদাপি দেবতার উৎপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু নক্ষত্র সকলকে মানব চক্ষুর সঙ্গে তুলনা করিয়া, নক্ষত্র খচিত আকাশকে সহস্রাক্ষরূপে কল্পনা করিলেই, এই উপমা হইতে দেবতার উৎপত্তি সম্ভব হইল। এবং ইহার অর্থ এই যে, আকাশকে সহস্রাক্ষ বলাতেই আকাশে প্রাণ আরোপিত হইল। অতএব প্রাণীকরণ ব্যতিরেকে শুদ্ধ উপমার দ্বারা দেবোৎপত্তি সম্ভব নহে। প্রাণী করণকে একেবারে বর্জ্জন করিয়া, শুদ্ধ উপমার সাহায্যে, ভাষার বিকৃতি ঘটিয়া সকল দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে, ম্যাকস মূলর প্রভৃতির এই মত সর্ব্বত্র সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। দেবোৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাণীকরণের কার্য্যকে একেবারে অগ্রাহ্য করা সাধ্যায়ত্ত নহে; করিলে দেববাদের নির্ব্বিবাদ ব্যাখ্যা হইতেই পারে না। ম্যাকস মূলর প্রভৃতির দেববিজ্ঞানের আর একটা ভ্রান্তি এই যে, তাঁহারা সকল দেববাদকে শুদ্ধ আধিভৌতিক কারণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে করিয়াছেন। ম্যাকস মূলরের এই ভ্রান্তি বিস্ময়কর, কারণ হিন্দু আর্য্যদিগের সাহিত্যে পিতৃযান ও দেবযান, এই উভয় পন্থারই বিশেষ উল্লেখ রহিয়াছে, এ অবস্থায় তিনি যে কিরূপে পিতৃযানকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া, শুদ্ধ দেবযান অবলম্বনেই দেবতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিলেন, ইহা বুঝিয়া উঠা সুকঠিন।

নিসর্গ দেবতা ও কুলদেবতা।

ফলতঃ নিসর্গ হইতে যেমন এক শ্রেণীর দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে, সেইরূপ পিতৃপুরুষগণের স্মৃতি ও তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তি হইতেও আর এক শ্রেণীর দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে। মানুষ আদিম কাল হইতেই সামাজিক জীব। মানুষ কখনও সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিত না, এমন অবস্থা কল্পনাও করা যায় না। সুতরাং অতি আদিমকাল হইতেই নিসর্গ এবং জনসমাজ, এই দ্বিবিধ বিষয় মানব মনকে অধিকার এবং নৈসর্গিক ও সামাজিক এই দ্বিবিধ শক্তি তাহার চিত্তকে অভিভূত করিয়াছিল। সুতরাং একদিকে নিসর্গের প্রাণীকরণের দ্বারা নিসর্গ দেবতা সকলের উৎপত্তি হয়। অন্য-দিকে সমাজশক্তির পশ্চাতে পূর্ব্বপুরুষগণের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া, কুলদেবতাদিগের সৃষ্টি হয়। দেবতত্ত্বের আলোচনা করিতে গেলে, এই উভয় শ্রেণীর দেবতারই আলোচনা করা প্রয়োজন। য়ুরোপীয় দেববিজ্ঞানবিদ্‌দিগের মধ্যে ম্যাকসমূলর প্রমুখ একদল কেবল নিসর্গ দেবতারই আলোচনা করিয়াছেন। আর স্পেন্সার অন্য দিকে

কেবলই কুলদেবতাদিগের আলোচনা করিয়াছেন, নৈসর্গিক দেববাদের তত্ত্ব অন্বেষণে সম্যক্ সচেষ্ট হন নাই। কিন্তু হিন্দুর দেববাদ কেবল নিসর্গ দেবতাদিগের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। পিতৃযান ও দেবযান, এই উভয় যানের তত্ত্বান্বেষণ না করিলে বৈদিক দেববিজ্ঞানকদাপি সম্যকরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে এমন দেববাদ আছে, যাহাতে নিসর্গ দেবতার প্রাধান্য আদৌ নাই, যাহা বহুল পরিমাণে কুলদেবতাদিগকে লইয়া গঠিত হইয়াছে। চীনের দেববাদ এই শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং ম্যাক্সমূলরের প্রণালী অবলম্বনে চীনের দেববাদের সঙ্গত ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। এই কারণে বর্ত্তমান য়ুরোপীয় দেববিজ্ঞান এখনও পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠে নাই। ম্যাক্সমূলরের এবং স্পেন্সারের মতের সমন্বয় সাধিত হইলে য়ুরোপায় প্রকৃত দেববিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হইবে।

দেবোৎপত্তির বিবিধ কারণ।

বর্ত্তমান য়ুরোপীয় দেববিজ্ঞানের আর একটা ভ্রান্তি এই যে, সকলেই একটী মাত্র মূল কারণ হইতে সর্ব্ব প্রকারের দেববাদের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। এই ব্যগ্রতা নিবন্ধনই ম্যাক্সমূলর শুদ্ধ ভাষার বিকৃতি হইতে দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে, প্রাণপণে এই মত প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ফলতঃ কিন্তু একই কারণ হইতে দেববাদের উৎপত্তি হয় নাই। যেমন নৈসর্গিক ও সামাজিক কারণে নিসর্গ দেবতা ও কুল দেবতা, এই দ্বিবিধ শ্রেণীর দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে, তেমনি শুদ্ধ কল্পিত কাহিনী হইতেও কিয়ৎপরিমাণে দেববাদের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমান সভ্যযুগেই যে কেবল কল্পনা-সহচরীকে সঙ্গে লইয়া কাব্য উপন্যাসাদি রচনা করিতেছি, আর আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে তাহা করিতেন না, এমন নহে। কল্পনা মানব মনের চির সহচরী। এই কল্পনার বলে আদি মানুষও বিবিধ গল্প রচনা করিত। এই সকল প্রাচীন গল্প হইতেও দেববাদের সৃষ্টি হইয়াছে। তারপর বর্ব্বর জাতির বিজ্ঞান হইতেও এক শ্রেণীর দেববাদ উৎপন্ন হইয়াছে। আমাদের দেশে পারদ এবং অভ্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল দেবকাহিনী প্রচলিত আছে, এ সকল সেই শ্রেণীরই অন্তর্গত। ভূকম্প সম্বন্ধেও নাগকচ্ছপাদির যে কাহিনী অজ্ঞ লোকে বিশ্বাস করিয়া থাকে, তাহাও বর্ব্বরবিজ্ঞানোৎপন্ন দেবকাহিনী। তৃতীয়তঃ ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনেও কখনও কখনও দেববাদের ও অলৌকিক কাহিনীর সৃষ্টি হয়। কুরুক্ষেত্রের মৃত্তিকা লোহিত বর্ণের। বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কুরুপাণ্ডবের শোণিতে কুরুক্ষেত্র প্লাবিত হইয়াছিল, ইহাই বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্রের লোহিত বর্ণ মৃত্তিকার কারণ। এই দেবকাহিনী (Myth) ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। আবার বর্ব্বর সমাজের ভূগোলজ্ঞান হইতেও নানাবিধ দেবকাহিনী উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমাদিগের পুরাণোক্ত ক্ষীরোদাদি সাগরের উৎপত্তি কি এইরূপে হয় নাই? সুতরাং একই কারণে যে সর্ব্বপ্রকারের দেববাদের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা নহে। বিবিধ কারণে দেববাদের উৎপত্তি হইয়াছে। বিবিধ ভাবে তাহার সমর্থ করিবার চেষ্টা করিলে তবে প্রকৃত দেববিজ্ঞান রচিত হইতে পারিবে। নতুবা সমুদায় দেবতত্ত্বকে কেবল এক নিসর্গের ছাঁচে বা কুলদেবতার ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা করিলে চলিবে কেন? ম্যাকসমূলর এই ভ্রম করিয়াছেন বলিয়া, অশেষ পরিশ্রম করিয়াও তিনি বর্ত্তমান যুগের দেববিজ্ঞানকে সম্যকরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন নাই।

বর্ত্তমান দেববিজ্ঞানক্ষেত্রে ম্যাকসমূলরের কার্য্য।

কিন্তু এই ত্রুটী কেবল ম্যাকসমূলরের নহে; ম্যাকসমূলর যাহা করেন নাই, য়ুরোপীয় অপর কোনও পণ্ডিতও আজ পর্য্যন্ত তাহা করিতে চেষ্টা করেন নাই। এবং য়ুরোপীয় দেববিজ্ঞানের মৌলিক অপূর্ণতা অপনোদন করিতে পারেন নাই বলিয়া, ম্যাক্সমূলরের দ্বারা যে সাধনার এই অঙ্গ পরিপুষ্টি লাভ করে নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। দেববিজ্ঞানে তিনি নূতন তত্ত্ব কিছুই আবিষ্কার করেন নাই সত্য, কিন্তু আর্য্যজাতির দেববিজ্ঞান, কি হিন্দু, কি হেলেনীয় উভয়ই যে এক আদি মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, পট, বর্ণুফ প্রভৃতির এই মত তিনি সবিস্তারে প্রচার ও কিয়ৎপরিমাণে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু ও হেলেনীয় নিসর্গ দেবতাগণ যে একই জাতীয়, বেদে যিনি দ্যুঃপিতর, হোমরে তিনিই জুপিটার, বেদের সারমেয় যে হোমারের হার্মিস্, এই সকল তত্ত্ব ম্যাকসমূলরের মত আর কেহ বহুলভাবে লোকমণ্ডলী মধ্যে প্রচার করিয়া যান নাই। গত শতাব্দীতে হোমরবর্ণিত দেবকাহিনীর সহিত ইহুদীয় ধর্ম্ম বিধানের একটা কাল্পনিক সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছিল। ম্যাকসমূলর জনমণ্ডলীর মধ্যে বহুল ভাবে হিন্দু ও হেলেনীয় দেববাদের মৌলিক একত্ব প্রচার করিয়া, সে উদ্ভট চেষ্টার মূল কাটিয়া দিয়াছেন। এখন আর কেহ ঐরূপ ভাবে হেলেনীয় দেববাদের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করে না। দেববিজ্ঞান সম্বন্ধে ধরিতে গেলে, ইহাই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য।

ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় ম্যাকসমূলর।

যেমন দেববিজ্ঞানের সেইরূপ ভাষাতত্ত্বের আলোচনাতেও ম্যাক্সমূলরের কোনও মৌলিকতা দৃষ্ট হয় না। এই উভয় ক্ষেত্রেই তিনি অপরের আবিষ্কৃত সত্য সমূহ বহুলভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন মাত্র, স্বয়ং কোনও অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া যান নাই। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাঁহার পরিচর্য্যা দ্বারা বর্ত্তমান যুগের এই অভিনব বিজ্ঞান কিছুই পরিপুষ্টি লাভ করে নাই, ইহা বলা অসঙ্গত হইবে। পট, গ্রিম্ ও বর্ণুফ প্রভৃতি যে ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন, ম্যাকসমূলর, ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় তাহাই ফুটাইয়া তুলিয়া, বর্ত্তমান ভাষা বিজ্ঞানকে বিশেষ পরিপুষ্ট করিয়া গিয়াছেন, সন্দেহ নাই। আর এই সকল তত্ত্বের বহুল প্রচারে ভাষা বিজ্ঞানের ভবিষ্য উন্নতির পন্থা পরিষ্কার হইয়াছে। এই পরিচর্য্যার জন্য, ভাষাতত্ত্বান্বেষিগণ ম্যাকসমূলরকে চিরদিনই কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিবেন।

ভাষার উৎপত্তি।

সকল ভাষাই কতিপয় মূল ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা কিঞ্চিদধিক সপ্তদশ শত মূল ধাতু হইতে সমুদায় সংস্কৃত শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছেন। ম্যাক্সমূলর বলেন যে, বর্ত্তমান ভাষা বিজ্ঞানে ধাতু বলিতে যাহা বুঝায়, সেরূপ শব্দ সংস্কৃতে প্রায় ছয় শত মাত্র পাওয়া যাইবে। এই ছয় শত মৌলিক ধাতু হইতে বিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্যের অসংখ্য শব্দ রচিত হইয়াছে। হিব্রু সাহিত্য এইরূপ প্রায় পাঁচ শত মূল ধাতু দ্বারা গঠিত হইয়াছে। চীন ভাষায় সাড়ে চারি শত মূল ধাতু পাওয়া যায়। এই সাড়ে চারি শত মূল ধাতু হইতেই চীন ভাষার প্রায় পঞ্চাশ সহস্র শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যে শব্দের বিশ্লেষণ সম্ভব নহে, যাহাতে বিভক্তি প্রভৃতি যুক্ত হইয়া বিভিন্ন পদ সিদ্ধ হইয়াছে, তাহারই নাম ধাতু। ভাষার উৎপত্তি ধাতু হইতে; কিন্তু ধাতুর উৎপত্তি কোথায়? এই প্রশ্নের দুই উত্তর শুনিতে পাওয়া যায়। এক দল বলেন—প্রাকৃতিক শব্দের অনুকরণে মানব আপনার ভাষা রচনা করিয়াছে। অর্থাৎ মানুষের আদি অবস্থায় কোনও ভাষা ছিল না, সে বাক্যের দ্বারা আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিত না। ক্রমে পশুর চীৎকার, পাখীর গান, বজ্রের নিনাদ, বায়ুর নিস্বন, সমুদ্রের সাঁ সাঁ, তটিনীর কলকল, এইরূপে জীব কণ্ঠ-নিঃসৃত ও প্রাকৃতিক শক্তি সমুৎপন্ন বিবিধ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, তাহার অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়; এবং

এই অনুকৃত শব্দের সঙ্গে তত্তৎ শব্দ প্রকাশক বস্তুর সংযোগ করিয়া, ক্রমে তদ্দ্বারাই তাহাদের নামকরণ করিয়াছে। একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। মানুষ একটা গো দেখিল। গো শার্দ্দুল নহে, আকার ও বর্ণ প্রভৃতি দ্বারা ইহা বুঝিতে পারিল। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সে গরুর বর্ণ আকৃতি, সকলই জানিল, জানিয়া গরুর এমন একটা বিশেষত্ব মনে মনে অন্বেষণ করিতে লাগিল, যাহা দ্বারা সে এই বিশেষ জন্তুকে চিরদিন চিহ্নিত করিতে পারিবে। গো তখন ডাকিয়া উঠিল,—এই ডাকই গোর বিশেষত্ব হইল। গো যেরূপে ডাকিল, সেই ডাকের অনুকরণে গোর নামকরণ হইল। ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে এই এক মত প্রচলিত আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে ইহা বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এই মতের সমালোচনা করিতে যাইয়া ম্যাকসমূলর বলেন যে, যদিও প্রত্যেক ভাষাতেই কতিপয় অনুকৃত শব্দের নিদর্শন পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু সমুদায় শব্দ এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা প্রমাণ করা অসাধ্য। ফলতঃ মর্ম্মর, কুক্কুট প্রভৃতি কতিপয় শব্দ ব্যতীত অধিকাংশ শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই অনুকৃতির মত প্রযুক্ত হইতে পারিবে না। বিশেষতঃ আমরা একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাই যে, এই অনুকৃত শব্দ হইতে, সাক্ষাৎভাবে অন্য কোনও শব্দ উৎপন্ন হয় নাই। সংস্কৃতে কুক্কুট কোনও মূল ধাতু হইতে উৎপন্ন নহে, এবং তাহা হইতেও কোন পদ নিষ্পন্ন হয় নাই। কেবল কুক্কুটের সঙ্গে তুলনা করিবার জন্য, ফরাসী ককেট (coquet) প্রভৃতি কতিপয় শব্দ কুক্কুট হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। কোনও পূর্ণ বিকশিত ভাষার শব্দ সকলকে বিশ্লেষণ করিয়া, তত্তৎ মৌলিক ধাতুতে উপনীত হইলেই, এই মতের ভ্রান্তি প্রতিপন্ন হইয়া যায়।

হা! হতোস্মি! হইতে ভাষার উৎপত্তি।

অপর কেহ কেহ বলেন যে, মানুষ ইতর প্রাণীর শব্দ বা প্রাকৃতিক ধ্বনির অনুকরণ করিয়া আপনার ভাষা রচনা করিয়াছে, এরূপই বা মনে করিব কেন? মানব তো নিজেই কখনও ক্রন্দন করে, কখনও হাস্য করে, কখনও চীৎকার করে, কখনও হাহাকার করে। এই সকল হা হতোস্মি হইতেই মানবীয় ভাষা রচিত হইয়াছে। এই মত খণ্ডন করিতে যাইয়া ম্যাক্সমূলর বলিয়াছেন যে, আজি পর্যন্ত আমরা কোনও মানবীয় ভাষার বিশ্লেষণ করিয়া কেবল হা হতোস্মি প্রাপ্ত হই নাই। ফলতঃ হা, হতোস্মি ত, মানবের ভাষা আরম্ভ হওয়া দূরে থাকুক, হা, হতোস্মি বর্জ্জন না করা পর্য্যন্ত ভাষার সূচনাই হয় না। যেখানে হা হতোস্মির শেষ, সেইখানেই ভাষার আরম্ভ। বদ্‌ ধাতু আর উঁ উঁতে আকাশ পাতাল প্রভেদ। বিশেষতঃ যদি অনুকৃতি বা হা হতোস্মিই মানবীয় ভাষার মূল হইত, তবে ইতর জন্তুদিগের মধ্যে যে কেন ভাষা রচিত হইতে পারিত না, ইহা বুঝিতে পারা যায় না। তোতা, কাকাতুয়া, ময়না, দয়েল প্রভৃতি সে অবস্থায় সহজেই সাহিত্য রচনা করিতে পারিত; এবং মার্জ্জারশিশু কোমল গীতি কাব্য রচনা করিয়া জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিত। মোট কথা, মানবীয় ভাষার উৎপত্তি যেখান হইতে, যে উপায়েই হউক না কেন, শুদ্ধ অনুকরণ বা হা হতোস্মি হইতে তাহা উৎপন্ন হয় নাই, ইহা স্থির নিশ্চিত।

শব্দ বাদ।

আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কালে ভাষার অর্থাৎ শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন হিন্দুগণ শব্দকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছিলেন, এক স্ফোটাত্মক শব্দ, ও অপর বর্ণাত্মক শব্দ। বর্ণাত্মক শব্দ উৎপত্তি—বিনাশশীল; ভিন্ন ভিন্ন কণ্ঠে বিভিন্ন ভাবে উচ্চারিত হয়। তাহা নিত্য নহে। এই স্ফোটাত্মক শব্দই প্রকৃত শব্দ। এই শব্দ অপৌরুষেয় ও নিত্য। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই ভারতীয় স্ফোটবাদের সবিস্তার আলোচনা অসম্ভব। সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, প্রত্যেক বস্তুর যেমন একটা জাতি আছে; যাহার উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই; (কিন্তু ব্যক্তিরই উৎপত্তি ও বিনাশ হয় মাত্র, জাতি নিত্য ও অবিনশ্বর); সেইরূপ প্রত্যেক বস্তুজ্ঞাপক এক একটা স্ফোটাত্মক শব্দ আছে; যাহা নিত্যভাবে তাহার সঙ্গে সংযুক্ত। ঐ স্ফোটাত্মক শব্দ হইতেই, এই বস্তুজ্ঞাপক বর্ণাত্মক শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। হেলেনীয়দিগের যেমন লগসবাদ হিন্দুর সেইরূপ এই স্ফোটবাদ একই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

ম্যাকসমূলর প্রভৃতির মতে, এই স্ফোট হইতেই ধাতুর উৎপত্তি হইয়াছে। ধাতু সকল কেবল শব্দ নহে, কিন্তু চিন্তার অচ্ছেদ্য আধার। মানুষ ভাষা ভিন্ন চিন্তা করিতে পারে না, ম্যাকসমূলর এই মত পোষণ করিতেন। সুতরাং প্রত্যেক মানসিক ভাবের সঙ্গে তদভিব্যঞ্জক শব্দের অচ্ছেদ্য অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বিদ্যমান। ভিন্ন ভিন্ন ধাতু যেমন বিভিন্ন ভাবে বাজিয়া উঠে, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন মানসিক চিন্তাও বিভিন্ন ধ্বনি দ্বারা প্রকাশিত হয়। এই সকল বিভিন্ন ধ্বনিই ধাতু। যেমন আলোক দেখিলেই চক্ষের পাতা খুলিয়া যায়, সেইরূপ ধরিবার ইচ্ছা হইলেই "ধৃ" ধ্বনি অন্তরে জাগ্রত হয়, বা "ধৃ" শব্দ শুনিলেই ধরিবার জন্য হাত আপন বস্তু বিশেষের প্রতি ধাবিত হয়। ধাতু হইতেই ভাষার উৎপত্তি। ধাতু সকল চিন্তার মূল উপাদান, মানব চিন্তার সঙ্গে নিত্যভাবে বিরাজিত, অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে আবদ্ধ; মানব প্রকৃতির সঙ্গে জড়িত। ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে ইহাই ম্যাকসমূলরের মত। এই মতের সবিস্তার সমালোচনা এস্থলে অসম্ভব।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

জীবনে মরণে।

আমার বাল্য সঙ্গিনী সুধা আমাদের প্রতিবেশীর এক মাত্র কন্যা। আমরা সৃষ্টির দেশ হইতেই যেন এক সঙ্গে পরামর্শ আঁটিয়া এক গ্রামে এক পাড়ায় আসিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম।

ছেলেবেলার কথা এখন সুস্বপ্নের মত মনে হয়। আকাশে চাঁদ উঠিলে, অদূরে বাঁশী বাজিলে সুধাদের বাড়ী ছুটিতাম। উঠানে মাদুর পাতা; সুধার দিদিমা রূপ-কথার ভাণ্ডার। তাঁহার মুখনিঃসৃত কথার টুকরাগুলিকে আমরা দুইজনে প্রাণপণে গ্রাস করিতে থাকিতাম। কখন চাঁদ মাথার উপরে আসিত, কখন নিশীথের কোলে সমস্ত জগত ঘুমাইয়া পড়িত, জানিতাম না। প্রভাতে চিরপরিচিত গৃহ, আলুথালু শয্যা, আর মার মুখ দেখিয়া রাত্রির কথা নিতান্তই ধাঁধাঁর মত ঠেকিত। ক্রমে বেলা বাড়িয়া উঠিত। আমারও মাথায় টনক্ পড়িত। দুরন্তপনার জায়গা ছিল সুধাদের বাড়ী। কত হাসি, কান্না, সোহাগ, আব্দার, খেলাধুলার সরস স্মৃতি সেই ক্ষুদ্র পল্লীভবনটির মধ্যে লুক্কায়িত আছে। একদিন সুধা আমাকে ফেলিয়া ননির

সঙ্গে খেলিতে গিয়াছিল। এই গুরুতর অপরাধে তাহার সঙ্গে এমনতর আড়ি হইয়া গেল, যে ভাব হইতে সম্পূর্ণ একটি দিন লাগিল। যেমন একবৃন্তে যুগ্ম ফল ফলে, এক সন্ধ্যায় এক প্রভাতে, ধীরে ধীরে, অল্পে অল্পে বাড়িতে থাকে, কেহ কাহাকে লক্ষ্য করে না!—আমরাও তেমনি বাড়িতে লাগিলাম। আস্তে আস্তে জীবনে একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিল, এখন, দুজনেরই তেমন প্রাণ খুলিয়া মিশিতে কেমন বাধ'বাধ' ঠেকিত। আমার মা এবং সুধার মা বলাবলি করিতেন,—আমাদের দুটির বিবাহ হইলে বেশ হয়, কিন্তু তাহা ত হইবার নহে! যখন এরূপ বলাবলি হইত, তখন আমরা বালক বালিকা। আমাদের ঘনিষ্ঠতা যে অবশেষে প্রেমে পরিণত হইয়াছে, তাহা কেহই লক্ষ্য করেন নাই। বাল্য-কালের ভালবাসা বড় সরল, বড় ভালমানুষ, সে আপনি সাধিয়া যার তার কাছে ধরা দেয়; বয়সের সঙ্গে যতই পরিপক্কতা লাভ করে, ততই সাবধান হইয়া চলে!

আমাদের কেন বিবাহ হইতে পারে না, তাহার সকল কারণ আমি জানিতাম না। কিন্তু বিবাহ অসম্ভব একথা সুধা এবং আমি উভয়েই নিশ্চিতরূপে জানিতাম। এখন আমরা আর ছোটটি নহি। আমার বয়স কুড়ি, সুধা সপ্তদশবর্ষীয়া। সুধা স্বভাবতই বড় লাজুক, বড় চাপা, তাহার সহিত এ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া ভালবাসার কথাও হয় নাই। কেবল তাহার করুণাকোমল শান্ত দৃষ্টিতে তাহার শুভ্র স্বচ্ছ অন্তর খানি বড় স্পষ্ট প্রতি-বিম্বিত হইত! আমি তাহা জলের মত পাঠ করিতাম। এক দিন স্থির করিলাম, বিবাহসম্বন্ধে সুধার মনের ভাব পরীক্ষা করিতে হইবে। সুধাদের বাড়ীর পাশেই বাগান। সুধা প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা সেখানে বেড়াইতে আসে। আমি গিয়া দেখিলাম, সুধা একটী গাছের তলায় বসিয়া আছে! নিঃশব্দে তাহার কাছে গিয়া বসিলাম। সেদিন চৈত্র-পূর্ণিমা। গাছের পাতার মধ্য দিয়া সম্মুখস্থ দীঘির কাল জলে জ্যোৎস্না নামিয়াছে! একটা কোকিল ডাকিয়া ডাকিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। আজ অন্তর বাহিরে কি যেন একটা চঞ্চল আনন্দোৎসব চলিতেছিল। আমি ডাকিলাম,—সুধা! আমার স্বর কম্পিত—কিঞ্চিৎ বেদনা জড়িত। কোন উত্তর পাইলাম না, কেবল একখানি কুসুমকোমল করতল আমার করতলের মধ্যে আশ্রয় লইল। উহার মধ্যে এমন একটা নির্ভরশীলতা ছিল, যাহা আজন্মব্যাপী এবং আমরণসঙ্গী। সহসা তাহার অধরে আমার অধর মিশিল। প্রস্ফুটিত ফুলের গন্ধ ও জ্যোৎস্নার লীলা-হাস্যের মধ্যে সেই প্রথম প্রেমের প্রথম চুম্বন! ভালবাসা যেন মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়া ভক্তের পূজা সেই প্রথম গ্রহণ করিলেন। সুধা কি মনে করিয়া আসিয়াছিল, জানি না। কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত মিলন-ব্যাপারের জন্য যে একটি মোহমধুর পূর্ণিমা রাত্রির উদয় হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কথাটি মাত্র না বলিয়া দ্রুত পদে বাড়ী ফিরি-লাম। সেই অবধি, আমাদের দুজনারই সঙ্কোচের ভাবটা শত গুণে বাড়িয়া গেল। এখন পরস্পরের দেখা শুনা পর্য্যন্ত অত্যন্ত বিরল হইয়া উঠিল।

এইবার সুধার পিতার পরিচয়টা দেওয়া আবশ্যক। সুধার পিতার নাম লোকনাথ দত্ত। লোকটী উদার, শিক্ষিত, কিছু উদাসীন, কিছু এক গুঁয়ে। দেশাচার ও লোকাচারের উপর হাড়ে চটা! বন্ধুরা তামাসা করিয়া তাঁহাকে Reformed Hindoo বলিতেন। লোকনাথ বাবু বাল্যবিবাহের ঘোর বিরোধী। তাই সমাজের অনেকগুলি খোঁচা পরিপাক করিয়া যুবতী কন্যাকে অবিবাহিতা রাখিয়াছিলেন। একদিন সুধাদের বৈঠক-খানায় বসিয়া আছি, লোকনাথ বাবু ও তাঁহার বাল্য-বন্ধুর মধ্যে সমাজসংস্কার, দেশ-উদ্ধার ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা চলিতেছে; আমি মাঝে মাঝে তাঁহাদের মুখ হইতে দু'একটা কথা কাড়িয়া লইয়া মহা ভালমানুষের মত উভয়ের মন রক্ষা করিতেছি। অনেক কথার পর বন্ধু সুধার কথা পাড়িলেন। রূপ গুণের সুখ্যাতি আরম্ভ করিয়া ছোটখাট speech দিয়া ফেলিলেন। আমার সমস্ত মুখটা লাল হইয়া উঠিল। বন্ধু বলিলেন, সুধা ত আর এখন বালিকা নহে, যোগ্য পাত্র দেখিয়া তাহার বিবাহ দাও। মেয়ে চির কুমারী থাকে, এটা বোধ হয় তোমার ইচ্ছা নয়। লোকনাথ বাবু হঠাৎ একটুকু অন্যমনস্ক হইলেন। খানিক পরে কিঞ্চিৎ উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন,—নিশ্চয় না। আমি ঐ মতটাকে দু'চক্ষে দেখিতে পারি না। শীঘ্রই সুধার বিবাহ দিব। তুমি একটি বর দেখিয়া দাও না!" আমার সমস্ত মুখে কে যেন কালী মাখাইয়া গেল! ভাগ্যি রাত্রিকাল, প্রদীপও তত উজ্জ্বল ছিল না, নহিলে আমার

ভাবান্তর বোধ হয় তাঁহারা লক্ষ্য করিতে পারিতেন। কাহাকেও সম্ভাষণ মাত্র না করিয়া চলিয়া আসিলাম। পৃথিবী প্রবল বেগে আমার পায়ের নীচে ঘুরিতেছিল, কখন বাড়ী পৌঁছিয়া বিছানা লইলাম, জানি না। আমার বালিকা ভগ্নী আহারের জন্য ডাকিতে আসিলে, তাহাকে এমন তাড়া করিয়া উঠিলাম যে, সে কাঁদিয়া পলাইয়া গেল; আর আসিল না। সে রাত্রি আবার নিদ্রা? আমার মনে হইতেছিল, যেন বাহিরে আমার সর্ব্বনাশের জন্য একটা বিষম আয়োজন চলিতেছে। সমস্ত সংসার যেন একটা গভীর চক্রান্তচক্র ও ষড়যন্ত্রে সুধাকে আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতেছে। হায়, হায়, সুধার বিবাহ!—কেন, তাহার কি বিবাহ হইতে নাই? তুমি তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে না বলিয়া সে কি চিরকুমারী থাকিবে? কিন্তু এ চিন্তা মনে অধিকক্ষণ স্থান পাইত না। সুধা পরের হইবে, ইহা আমার নিকট অসহ্য। আমার বুকে বসিয়া অভিমান অগ্নি জ্বালাইতেছিল! অভিমানটা সুধার উপর, কি সুধার পিতার উপর, কি সমাজের উপর জানি না—বোধ হয় সকলের উপরই। আহা সুধার কি দোষ? সে কি করিতে পারে? সুধা আমারি মত একটা অলৌকিক কল্পনার মোহে মুগ্ধ হইয়া ইহলোককে এমনি করিয়া অগ্রাহ্য করিতেছে! চির উপবাস ব্রত গ্রহণ করিয়া পরলোকে প্রিয় সম্মিলনের স্বপ্ন দেখিতেছে! কিন্তু সুধার সমস্ত মনের ভাবগুলির সহিত আমি তত সুপরিচিত ছিলাম না। সুধার নিকট আমি এতটা প্রত্যাশাও করিতাম না; সে যে আমারই জন্য তাহার সুকুমার শক্তি লইয়া এতগুলি বাধাবিঘ্নের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে, এই চিন্তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

এখন সুধাদের বাড়ী যাওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিলাম। কতকটা প্রণয় অভিমান, কতকটা নৈরাশ-জনিত লজ্জা, কতকটা অকারণ অপমান-জ্ঞান হেতু সুধাদের বাড়ী যাইতাম না সত্য, কিন্তু নিত্যকার খবর লইতাম। প্রেম এমনি করিয়া বঞ্চিতের খুঁটিনাটির সন্ধান লইয়া থাকে! সংসার যখন আপনাকে কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে ডুবাইয়া দেয়, প্রেম তখন নিশ্চিন্তমনে বাঞ্ছিতের পশ্চাতে ছায়ার মত ফিরিতে থাকে। একদিন শুনিলাম, বিবাহে সুধার বড় আপত্তি, এজন্য পিতা পুত্রীতে একটুকু মনোমালিন্যও হইয়াছে। বিবাহে আপত্তি কেন, সুধাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কেহ তাহার উত্তর পায় নাই। লোকনাথ বাবু মনে করিলেন, মেয়ে লেখা পড়া শিখিয়া চির-কৌমার ব্রতে উৎকট কল্পনাকে মনে স্থান দিয়াছে। মাতা বুদ্ধিমতী; কিন্তু হাজার হোক্ মা!—মনে করিলেন, আজন্মের স্নেহাশ্রয় পিত্রালয়ের মায়া কাটান কি সহজ কথা? আসল কারণটা জানিতাম, শুধু আমি। আমার বুঝিতে বাকী ছিল না; আমারি জন্য সুধা এই কঠিন পণ করিয়াছে। কিন্তু আমার সহিত ত তাহার মিলন অসম্ভব। তবে কি

আর একদিন শুনিলাম, লোকনাথ বাবু একটি পাত্রের বাড়ী লোক পাঠাইয়াছিলেন; বরের বাড়ী হইতে মেয়ে দেখিতে আসিলে সুধা হঠাৎ জ্বর করিয়া বসিল! এইরূপ দুই তিন বার হইল। আর কতদিন ভাণ চলে? বারবার বিফল মনোরথ হইয়া লোকনাথ বাবুও বয়স্থা কন্যাকে পাত্রস্থ করিবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিলেন। এবার সুধার হার হইল। সহসা একটি পাত্রও জুটিল। শুভ কার্য্যে আর বিলম্ব হইবে কেন? পরশুই বিবাহ। আমি ত আপনার লোক, শুভ কর্ম্মের আয়োজন উদ্যোগের আংশিক ভার আমারও উপর না পড়িবে কেন? ভাবিয়াছিলাম, সুধার বিবাহরাত্রে একটা ছুতা করিয়া গ্রামান্তরে আশ্রয় লইব। দূরস্থিত মিলনের বাঁশী শুনিতে শুনিতে মুমূর্ষু প্রাণটাকে আপনার হাতে জলন্ত চিতায় সঁপিয়া দিব।

আজ বিবাহ; সমস্ত দিন ধরিয়া আনন্দের সুরে সানাই বাজিতেছে। আমার চারিদিকে পল্লী স্ত্রীগণের উলুধ্বনি ও হাস্যকৌতুক মুহুর্মুহু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। আমি বুকের মধ্যে শেল লইয়া হাসি ছড়াইতে লাগিলাম। শেষে শ্রান্তির ভাণ করিয়া একটা নির্জ্জন ঘরে শুইয়া পড়িলাম। সে রাত্রে আমার অন্তরে যে অগ্নি জ্বলিতেছিল, সেই হাস্য মুখরিত উৎসব ভবন কি তাহার সন্ধান লইয়াছিল? বেশ টের পাইলাম, বর-কনে বিবাহমণ্ডপে আসিয়াছে, এখনই সম্প্রদান শেষ হইয়া যাইবে। আমি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া বসিলাম। দুই হাতে মাথা টিপিয়া কতকটা কাঁদিয়া লইলাম।

সহসা বিবাহ সভার দিক দিয়া একটা রোদনের রোল উঠিল। ছুটিয়া গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। সুধা বিবাহ-আসনে ঢলিয়া পড়িয়াছে। আমার মনে সহসা সেই অশুভ আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল। আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে ডাক্তার আনিতে ছুটিলাম; ফিরিতে বিলম্ব হইল।

ডাক্তার যখন আসিল, তখন সুধা আর ইহলোকে নাই। বিষ কোথায় পাইল?—খোঁজ হইতে হইতে দিদিমার আফিমের শূন্য কৌটাটি সুধার বালিসের নীচে পাওয়া গেল। দিদিমা তাঁহার এক মাসের খোরাক কৌটায় পুরিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ হইতেই আমার মাথায় আগুণ জ্বলিতেছিল, এবার চক্ষে অন্ধকার দেখিলাম। পড়িয়া যাইতেছিলাম, কষ্টে আপনাকে সামলাইলাম। আর বাড়ী ফিরিলাম না, সেই রাত্রেই দেশত্যাগ করিয়া গেলাম। কলিকাতায় কিছু টাকা পাওনা ছিল, তাহা লইয়া সেই দিনই মুঙ্গের যাত্রা করিলাম। বিশেষ করিয়া মুঙ্গের যাওয়াই যে স্থির ছিল, তাহা নহে। ষ্টেশনে যখন বেড়াইতে ছিলাম, তখনও ভাবি নাই, কোথায় যাব। একটি হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবু, তুমি কি মুঙ্গের যাইবে? আমিও সেখানে যাইতেছি। আমি কলের পুতুলের মত বলিলাম হাঁ মুঙ্গের যাইব। তিনি বলিলেন, টিকিটের ঘণ্টা ত অনেকক্ষণ পড়িয়াছে। আমি টিকিট লইয়া তাড়াতাড়ি একটা গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম; ভদ্রলোকটির জন্য যে অপেক্ষা করিবার কথা ছিল, তাহা মনেই হইল না। গাড়ি ছাড়িয়া দিল, কোথায় যাইতেছি, কেন যাইতেছি, অন্তর হইতে এরূপ অনেক ব্যাকুল ব্যথিত প্রশ্ন উঠিল। জগৎ নিরুত্তর, চারিদিক্ অন্ধকার, শুধু অন্ধকার! সেই অপার অন্ধকারের মধ্যে ধীরে ধীরে আমার চৈতন্য বিলুপ্ত হইল। যথাসময়ে মুঙ্গেরে পৌঁছিলাম; সহরের এক প্রান্তে একটা ক্ষুদ্র বাড়ী ভাড়া করিয়া কিছুদিন কাটাইলাম। সঞ্চিত অর্থ প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছিল। সেখানে একটি ক্ষুদ্র কর্ম্ম লইলাম; বেতন সামান্য। আমার অর্থের প্রয়োজন ছিল, কেবল জীবনধারণের জন্য।

দেখিতে দেখিতে সুধার মৃত্যুর পর এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সে দিন রবিবার, ছুটি। একখানা উপন্যাস খুঁজিতে গিয়া অনেকগুলি পুরাতন কাগজপত্র ঘাঁটিয়া আমার কবিতার খাতাটি বাহির করিলাম। সুধার মৃত্যুর পর সেই প্রথম কবিতার খাতা হাতে লইলাম। কবিতাগুলি অনেক দিনের রচনা। কস্মিন্ কালেও কবি নামে পরিচিত হইবার স্পর্দ্ধা রাখি নাই। জীবনের মধ্যে একটা বয়েস আছে, যখন সকলেই হঠাৎ কবি হইয়া উঠে; আমারও তাহাই হইয়াছিল। আমি আঠার বৎসরের সময় কবিতা লিখিতে আরম্ভ করি। যশের জন্য কখনও লিখি নাই। সুধাকে শুনানই আমার রচনার একমাত্র সার্থকতা ছিল। কবিতা শুনিয়া যখন সুধার মুখে একটি উদার হাস্য ফুটিয়া উঠিত, সেই মুহূর্ত্তেই যেন আমার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি লাভ করিত। আমার লেখাগুলির প্রতি তাহার একটা স্নেহজনিত পক্ষপাতছিল। অনেকবার পড়িয়া পড়িয়া প্রায় সকলগুলিই তাহার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। একটা নূতন কবিতা লিখিলেই, খাতা লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত। আমি লিখিতাম,—বিদুষী সুধা শুনিত, শুধুই শুনিত না, কখনও কখনও সংশোধন করিয়া দিত। একটা স্থান খুলিয়া দেখিলাম—হায় সে আজ কতদিন!—আমি লিখিয়াছিলাম "দেহের মিলন" সুধা "দেহের" কাটিয়া "আত্মার" করিয়াছে! তাহার সুন্দর হস্তাক্ষরটি তেমনি জ্বলন্ত মহিমায় শোভা পাইতেছিল। তখন বুঝি নাই, সুধার প্রেমের আদর্শে কতটা উচ্চতা, কতটা আন্তরিকতা ছিল। একবিন্দু অশ্রুজল গড়াইয়া সুধার হস্তাক্ষরের উপর পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে কত কথা মনে উঠিতে লাগিল। আমি ভাবের আবেগে একটা কবিতা লিখিয়া ফেলিলাম। কবিতার মধ্যে আমার সমস্ত বর্ত্তমানটিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলাম। ভাষা ছন্দে, অলঙ্কার অনুপ্রাসে একটি সুধাস্মৃতি যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। যেন সেই আত্মহারা সঙ্গীত কোন দূরলোক-প্রবাসী ব্যক্তিত্বের সন্ধানে ব্যাকুল হইয়া ফিরিতেছিল। কবিতার নাম দিয়াছিলাম "প্রবাসিনী!" তুমি এখন যেখানে আছ, সেই খানেই কি প্রণয়ের পূর্ণ পরিণতি? পৃথিবীতে আমরা তাহারই আভাস মাত্র দেখিতে পাই? তুমি কি এখনও আমাকে ভালবাস? সস্নেহে স্মরণ কর? কবিতার মধ্যে এই রকমের অনেক আকুল প্রশ্ন ছিল। তুমি কি মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া থাক? শুধু একবার—একবার মাত্র আমি তোমার দর্শনকরুণাপ্রার্থী। তুমি আসিও, হে দয়াময়ী, তুমি আসিও!—এই রকমের বহু ব্যাকুল মিনতি ছিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল; সেদিন ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা। আমি খাতা লইয়া ছাদে উঠিলাম। তখন চাঁদ উঠিয়াছে; গঙ্গা পূর্ণযৌবনে কূল ছাপাইয়া উঠিয়াছে; নিকটে উপবনে স্তবকে স্তবকে দ্রাক্ষা ফলিয়াছে; দূর আম্রকানন হইতে একটা তর্ তর্ সর্ সর্ ধ্বনি যেন বিশ্ববেদনা বহিয়া আনিতেছে। আমি অপার রহস্যনিলয় আকাশের নীচে

দাঁড়াইয়া "প্রবাসিনী" কবিতাটি আবৃত্তি করিলাম। একবার, দুইবার, বহুবার আবৃত্তি করিলাম। আমার কণ্ঠ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর, উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে লাগিল। ক্রমে সেই ধ্বনি যেন মেঘলোক স্পর্শ করিল। যেন নিবিড় নীলিমাবরণ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে—বহু ঊর্দ্ধে কোন ছায়াময়ীর চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। আমার মনে হইল, যেন সপ্তর্ষি মণ্ডলের পার হইতে কেহ আমার করুণ আহ্বান শুনিতে পাইল। ধীরে ধীরে খাতাটি বন্ধ করিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম। তখন নিশীথের গভীরতা সমস্ত কোলাহলকে কোলে লইয়া ঘুম পাড়াইতেছে। শুধু জাহ্নবীর, মৃদু মিষ্ট সঙ্গীত নৈশ পবনে ভাসিয়া আসিতেছে। আমি একটা স্বপ্নভার বুকে লইয়া অল্পকালের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িলাম। কখন জাগিলাম, জানি না। সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলাম, শিয়রে দাঁড়াইয়া রমণীমূর্ত্তি! কুলুঙ্গিতে কেরোসিনের আলো মিটি মিটি জ্বলিতেছিল; ম্লানালোকে তাহাকে তেমন স্পষ্ট দেখা যাইতে ছিল না; কিন্তু আমার সমস্ত অন্তরাত্মা এক মুহূর্ত্তে জাগিয়া উঠিয়া দিব্য দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিল। আমার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতেছিল; ললাটের ঘর্ম্ম মুছিয়া ডাকিলাম, সুধা! সুধা! কোন উত্তর পাইলাম না। ঠিক সেই সময়ে প্রদীপ নিবিয়া গেল। ঘরে ভোরের আলো প্রবেশ করিল। ছায়ামূর্ত্তি কখন অন্তর্দ্ধান করিয়াছে, জানিতে পারি নাই। তাহার পর দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে; আমি আমার সেই মানসীর ধ্যানে তন্ময় হইয়া আছি এবং প্রতিক্ষণে মিলনের দেবতা মঙ্গলময় মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি।

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

বাঙ্গলা শব্দ-দ্বৈত।

বর্ত্তমান সনের প্রথম সংখ্যক "সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা"য় শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গভাষার শব্দদ্বৈত সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সাধারণতঃ এ ধরণের প্রবন্ধ এক জনের চেষ্টায় নিখুঁত হওয়া প্রায় অসম্ভব। তথাপি রবি বাবুর সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার স্পর্শে সেই অসম্ভবও সম্ভব প্রায় হইয়াছে। প্রবন্ধের যে যে স্থলে সামান্য ত্রুটী আছে বলিয়া আমাদের বোধ হইয়াছে, এখানে সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করিব।

তিনি লিখিয়াছেন যে, 'চার চার,' 'তিন তিন'—এ সকল স্থলে দ্বিত্ব প্রকর্ষ বাচক। "চার চার পেয়াদা আসিয়া হাজির—অর্থাৎ নিতান্তই চারটে পেয়াদা বটে।"

আমাদের মতে এখানে অন্যরূপ অর্থ—প্রত্যেকের জন্য বা প্রতি বারের জন্য চার চার পেয়াদা আসিয়া হাজির; যথা "তাহাদিগকে ধরিয়া দেওয়ার জন্য চার চার পেয়াদা আসিয়া হাজির," অথবা "যখনি কোন ছাত্র অনুপস্থিত হইত, তখনি গুরু মহাশয়ের আদেশ অনুসারে চার চার পেয়াদা আসিয়া হাজির হইত।" যেখানে একজন লোকও এক বার মাত্র বুঝায়, সেখানে 'চার চার পেয়াদা হাজির' এরূপ বলা যায় না; যথা নিম্নলিখিত বাক্যে—"তখন তাহাকে ধরিবার জন্য চার চার পেয়াদা আসিয়া হাজির হইল," এরূপ বলা যায় না। ফলতঃ 'চার চার পেয়াদা' অর্থ 'ইহার জন্য চার, উহার জন্য চার,' অথবা এবারে চার, সেবারে চার। এইরূপ 'চার চার গ্রামে একজন চৌকিদার' 'পাঁচ পাঁচ বেত দেওয়া হইল' (অর্থাৎ প্রত্যেককে পাঁচ বেত দেওয়া হইল, (বিভক্ত বহুলতাজ্ঞাপক—distributive numeral)

রবি বাবু লিখিয়াছেন, "সকাল সকাল" প্রকর্ষভাব ব্যক্ত করিতেছে, অর্থাৎ নিশ্চিতরূপে, দ্রুতরূপে সকাল বুঝাইতেছে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় উহার অর্থ অন্যরূপ। 'রোজ সকাল সকাল উঠিবে,' অর্থাৎ প্রতিবারে সকাল সকাল উঠিবে। এইরূপ 'তোমরা কা'ল সকাল সকাল উঠিও—' অর্থাৎ প্রত্যেকে সকাল সকাল উঠিও। একজন ও একবারের বেলা 'সকাল সকাল উঠিবে বলা যায় না।* এখানেও পূর্ব্ববৎ দ্বিত্ব বিভক্তবহুলতাজ্ঞাপন করিতেছে।

তিনি লিখিয়াছেন, 'গরম গরম' শব্দে দ্বিত্ব প্রকর্ষবাচক। তাঁহার মতে 'গরম গরম জল খাইবে,' ইহার অর্থ 'খুব গরম জল খাইবে'। কিন্তু আমাদের মতে উহার অর্থ 'প্রতিবারে গরম জল খাইবে,' অর্থাৎ 'যখন জল খাইবে গরম জল খাইবে'; অথবা 'প্রত্যেকে গরম জল খাইবে'। মাত্র একজন ও একবারের বেলা 'গরম গরম জল খাইবে' এরূপ বলা যায় না। ফলতঃ 'গরম গরম' শব্দে দ্বিত্ব পূর্ব্বের ন্যায়

---

* "আমি আজ একটু সকাল সকাল আফিসে যাইব, মনে করিতেছি" এখানে সমালোচক মহাশয় কিরূপ অর্থ করিবেন?—প্রঃ সঃ।

বিভক্ত বহুলতাজ্ঞাপক। কয়েকজন লোককে লক্ষ্য করিয়া বলা যাইতে পারে, "তোমরা গরম গরম জল খাইবে;" কিম্বা একজনকে লক্ষ্য করিয়াও বলা যাইতে পারে, "তুমি রোজ গরম গরম জল খাইবে।"

রবি বাবুর উল্লিখিত প্রকর্ষ অর্থ 'গরমাগরম' শব্দে আছে। উহার অর্থ 'গরমের উপরে গরম,' 'অতি গরম', এইরূপ 'ঝমাঝম বৃষ্টি'। এ গুলির সহিত 'সংস্কৃত পরাৎপর', 'সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম,' 'ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র' প্রভৃতি শব্দের বেশ সাদৃশ্য আছে। এস্থলে প্রসঙ্গতঃ ইহা অনুধাবনীয যে, অভ্যস্ত শব্দের পূর্ব্বাংশের দীর্ঘস্বরত্ব অনেক স্থলেই উৎকর্ষবাচক, যথা কড়াক্কড়্, পুরাপুরি (অতিপূর্ণতা), বাড়াবাড়ি (অতি বৃদ্ধি)। কখন কখন শেষার্দ্ধের স্বর দীর্ঘ হইয়াও উৎকর্ষ বুঝাইয়া থাকে, যথা, লাল ডগডগা, লবণে কটকটা, বুদ্ধিতে টন্‌টনা। পশ্চিম বঙ্গে এই সব স্থলে 'কট কটে,' 'টন্‌টনে' প্রভৃতি বলা হইয়া থাকে।

রবি বাবু লিখিয়াছেন, টলটল শব্দের দ্বিত্ব প্রকর্ষ বুঝাইতেছে। আমাদের মতে এই দ্বিত্ব পৌনঃপুন্য-জ্ঞাপক (frequentative) বলিয়া ধরিয়া টলমল শব্দের দ্বিত্ব প্রকর্ষ-জ্ঞাপক ধরিলে অর্থ অধিকতর সঙ্গত হয়। 'পদ্মপত্রে জল টল্‌টল করিতেছে,' এস্থলে 'পুনঃপুনঃ টলিতেছে' অর্থ ধরিলে ভাল হয; আর "দেবাসুরের যুদ্ধে পৃথিবী টলমল করিযাছিল," এস্থলে প্রকর্ষ অর্থ ধরিলে ভাল হয। এইরূপ 'ঝক্‌ঝক্ করিতেছে' বলিলে পৌনঃপুন্য ও 'ঝকমক করিতেছে' বলিলে প্রকর্ষ বুঝায়।

এ স্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, পৌনঃপুন্য ও প্রকর্ষের অর্থ বড় কাছাকাছি,—যাহা বারংবার ঘটে, তাহা প্রকৃষ্টরূপেও ঘটে বটে। এই জন্যই সংস্কৃত যঙ্‌ প্রত্যয যোগে যেখানে ধাতু অভ্যস্ত হয়, সেখানে প্রত্যয় উক্ত উভয় অর্থই জ্ঞাপন করে বলিয়া বৈয়াকরণগণ লিখিয়া গিয়াছেন, যথা পুনঃ পুনঃ বা অতিশয় জলে যাহা—জাজ্বল্যমান।

রবি বাবু লিখিয়াছেন, কাঠে কাঠে, মানুষে মানুষে—এ সব স্থলে দ্বিত্ব পরস্পর সংযোগবাচক। আমাদের মতে প্রথমোক্ত স্থলে ঐ অর্থ ঠিক্ বটে, কিন্তু শেষোক্ত স্থলে নহে। 'কাঠে কাঠে ঘর্ষণ', এস্থলে দুই কাঠের সংযোগ (contact) বুঝাইতেছে; কিন্তু 'মানুষে মানুষে শত্রুতা'র অর্থ—এই মানুষের সহিত ঐ মানুষের এবং ঐ মানুষের সহিত এই মানুষের শত্রুতা। এইরূপ, "চোরে চোরে মাসতুত ভাই" অর্থ—এই চোরের সহিত ঐ চোরের, ও ঐ চোরের সহিত এই চোরের মাসতুত ভাই ভাই সম্পর্ক। এ সব স্থলে 'পরস্পর সংযোগ' অর্থ—তত ভাল বোধ হয না, শুধু অন্যোন্য অর্থ ধরিলে অর্থটীকে টানিয়া উহার স্থিতিস্থাপকত্ব নষ্ট করিবার প্রয়োজন হয না।

তিনি লিখিযাছেন "কথায কথায—পুনরাবৃত্তি বুঝাইতেছে," অর্থাৎ উহার অর্থ 'প্রতি কথায়'। আমাদের মতে "কথায কথায় ইংরেজ নিন্দা" —একপ স্থলে ঐ অর্থ ঠিক্, কিন্তু "কথায কথায বিবাদ বাধিয়া উঠিল"—এ স্থলে ঐ অর্থ সঙ্গত নহে। এ স্থলে 'কথায কথায' অর্থে 'এক কথার পরে অন্য কথায'—'নানা কথায'। এইরূপ 'হাতে হাতে *ব্যাগটী চলিয়া গেল*'—*ইহার অর্থ* 'এক হাতের পরে অন্য হাতে, এইরূপে নানা হাতে,' এ সকল স্থলে ক্রমানুবর্ত্তিতা (succession) বুঝাইতেছে। এইরূপ 'মুখে মুখে সংবাদটী রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে', 'কথায কথায় ব'লে ফেল্‌লে'। পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত "শুনাশুন্ শুন্‌লাম," এ স্থলেও ঐ অর্থে দ্বিত্ব হইযাছে—'এক জন শোনার পরে অন্য জন শুনিল, তাহার নিকট হইতে অন্য একজন শুনিল,—এই প্রণালীতে শুনিলাম।'

রবি বাবু লিখিযাছেন, "পাশে পাশে, পিছনে পিছনে, পেটে পেটে, ভিতরে ভিতরে—প্রভৃতির স্থলে দ্বিত্ব নিয়তবর্ত্তিতাবাচক, অর্থাৎ এ গুলিতে সর্ব্বদা লাগিয়া থাকার ভাব ব্যক্ত করিতেছে"। আমাদের মতে উহাদের মধ্যে প্রথম দুটীর বেলা ঐ অর্থ ঠিক্ বটে, কিন্তু অপর দুটীর বেলা প্রকর্ষভাব ব্যক্ত হইতেছে। 'তাহার পেটে পেটে কুবুদ্ধি'—ইহার অর্থ 'তাহার অতি পেটে—গূঢ় পেটে—অতি লুক্কায়িত স্থানে—কুবুদ্ধি।' এইরূপ ভিতরে ভিতরে ষড়্‌যন্ত্র' অর্থ—অতি ভিতরে, অতি গোপনে ষড়্‌যন্ত্র। এইরূপ 'মনে মনে গালি' 'তলে তলে পরামর্শ' স্থলেও রবি বাবু নিয়তবর্ত্তিতা অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা প্রকর্ষ অর্থ করি।

হাড়ে হাড়ে চটা—রবি বাবুর মতে এ স্থলে দ্বিত্ব পুনরাবৃত্তি-বাচক, অর্থাৎ উহার অর্থ 'প্রতি হাড়ে চটা।' আমাদের মতে উহা প্রকর্ষবাচক; এবং বাক্যটীর অর্থ—'হাড় পর্য্যন্ত অর্থাৎ অতিশয় চটা।' তাঁহার অর্থ আমাদের কাছে সঙ্গত বোধ না হইবার কারণ এই যে, উহাতে, চর্ম্ম

মাংস রক্ত না লইয়া হাড় লইবার সার্থকতা থাকে না। এইরূপ "কড়ায় কড়ায়" স্থলেও তাঁহার অর্থ লইলে টাকা পয়সার পরিবর্ত্তে কড়া লইবার তাৎপর্য্য থাকে না; অতএব "কড়ায় কড়ায় হিসাব' অর্থ 'প্রতি কড়ায় হিসাব' নহে,— "কড়া পর্য্যন্ত হিসাব'।

তিনি লিখিয়াছেন, "ঘোড়া ঘোড়া খেলা, চোর চোর খেলা'—এ সব স্থলে ঈষদূনতা বুঝাইতেছে। অর্থাৎ তাঁহার মতে 'ঘোড়া ঘোড়া খেলা' অর্থে সত্যকার ঘোড়া নহে। তাহারি নকল করিয়া খেলা। আমাদের মতে উহার অর্থ "একবার তুমি ঘোড়া, আর একবার আমি ঘোড়া, এইরূপ পরস্পর ঘোড়া হইয়া খেলা," এস্থলে 'পরস্পর-ভাব' বা পর্য্যায়ক্রম বুঝাইতেছে। এখানে ঘোড়ার অনুকরণ ভাবটি দ্বিত্ব দ্বারা সূচিত হইতেছে না, 'খেলা' শব্দ দ্বারা হইতেছে। যদি দ্বিত্ব দ্বারাই উহা সূচিত হইত, তাহা হইলে 'জামাই-বৌ খেলা' 'হর-গৌরী খেলা' প্রভৃতি স্থলে দ্বিত্ব না থাকা সত্ত্বেও অনুকরণ বুঝায় কিরূপে? ফলতঃ খেলা শব্দ দ্বারাই অনুকরণ জ্ঞাপিত হইতেছে, দ্বিত্ব দ্বারা নহে। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, একাধিক লোক না হইলে বাঘ বাঘ বা চোর চোর খেলা সম্ভবপর নহে। সুতরাং এ সব স্থলে যেন পরস্পর-ভাব বুঝাইল; কিন্তু এক জন লোকে তো সাহেব সাহেব খেলিতে পারে; যেমন, 'তিনি বম্বে হইতে আসিয়া কয়েক দিন সাহেব সাহেব খেলিয়াছিলেন'। এ সব স্থলে পরস্পরভাব কেমন করিয়া খাটিবে?

ইহার উত্তর—এই শেষোক্ত স্থলে দ্বিত্ব দ্বারা পৌনঃপুন্য সূচিত হইতেছে, পূর্ব্বের উদাহরণগুলির ন্যায় পরস্পর-ভাব ব্যক্ত হইতেছে না। 'খেলা' শব্দও এক স্থলে প্রচলিত অর্থে ও অন্যত্র আলঙ্কারিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'সাহেব সাহেব খেলা' অর্থ 'সাহেব সাহেব ক'রে মত্ত হওয়া' পুনঃ পুনঃ (বা দীর্ঘ কাল) সাহেবী ভাবে মত্ত হওয়া। এই রূপ পৌনঃপুন্য-জ্ঞাপক দ্বিত্ব নিম্নলিখিত স্থলেও দৃষ্ট হয়;—তিনি টাকা টাকা ক'রে পাগল, মরিবার অল্প আগে তিনি জল জল করিয়াছিলেন, বাঁশী রাধা রাধা বলে ইত্যাদি। (নিম্নে লিখিত ৭ম অনুবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

এক্ষণে রবিবাবুর প্রবন্ধে যে কয়েক রকমের শব্দ-দ্বৈতের উল্লেখ নাই, সংক্ষেপে সে গুলি বিবৃত করিতেছি।

(১) দেখিতে দেখিতে বাড়ী খানা পুড়িয়া গেল; "দেখিতে দেখিতে লুকাইল",—এস্থলে হ্রস্ব-সময় জ্ঞাপক। এখানে 'দেখিতে দেখিতে অর্থ যেন 'দেখিতে না দেখিতে,' 'অতি অল্প সময়ের মধ্যে'। এইরূপ "পুলিশ আস্‌তে আস্‌তে ডাকাতেরা চম্পট দিল;" "নূন আন্‌তে আন্‌তে পান্তা ফুরাইল"। কিন্তু 'কষ্টে কষ্টে হাড়ে দূর্ব্বা জ্বালাইয়াছে'— এস্থলে দ্বিত্ব দীর্ঘকাল জ্ঞাপন করিতেছে, অর্থাৎ ঠিক্ উহার বিপরীত অর্থ বুঝাইতেছে।

(২) কোণা কোণি—কোণা অভিমুখে। এই রূপ লম্বালম্বি, আড়াআড়ি,—এ সব স্থলে দ্বিত্ব দিগভিমুখ (direction) বুঝাইতেছে। ×

(৩) গোলগাল মুখখানা—দিব্যি গোল মুখ খানা, এ স্থলে দ্বিত্ব সৌন্দর্য্য-বোধক। মোটা সোটা, নাদুষ নুদুষ, হেলে দুলে, ছোট খাট, এবং পূর্ব্ব বঙ্গে প্রচলিত চিকন্ চাকন, পাতলা পুত্‌লা প্রভৃতিও ঐ অর্থ-বাচক।

(৪) তেল্ তেলা মুখ—তৈলের মত (তৈলাক্তবৎ) মুখ।

এই রূপ, পাগল ছাগল মানুষ—পাগলের মত।

মুখ্যু সুখ্যু মানুষ—মূর্খ সদৃশ।

তুলা তুলা ক'রে দিয়েছি—তুলার মত।

এ গুলি সাদৃশ্য বাচক।

(৫) পরে পরে আর কত সাহায্য কর্‌বে? এ স্থলে পরে পরে = পরেরা।

আপনা আপনি ঝগড়া করিও না = আপনারা।

মহামহা পণ্ডিত—মহা পণ্ডিতেরা।

এ গুলি বহুলতাজ্ঞাপক।

(৬) মারামারি—এ উহাকে মারে ও সে ইহাকে মারে। এ স্থলে পরস্পর অর্থ বুঝাইতেছে। এইরূপ হাতাহাতি, কাড়াকাড়ি, ঠেলাঠেলি। কিন্তু সাধাসাধি, চেঁচাচেচি প্রভৃতির স্থলে পৌনঃপুন্য অর্থ ব্যক্ত হইতেছে, অথবা কর্ত্তৃ-বহুলত্ব জ্ঞাপিত হইতেছে; (নিম্নের ১৭ চিহ্নিত অর্থ দেখুন)। পিঠাপিঠি ভাই—এ উহার পিঠে, সে ইহার পিঠে (ঐ পরস্পর অর্থ-জ্ঞাপক)।

এইরূপ বনিবনাও—পরস্পর বনা।

অদলবদল—পরস্পর বদল।

পাশাপাশি—এ উহার পাশে, সে ইহার পাশে।

মিট্‌মাট করা—পরস্পর মিটাইয়া ফেলা।

উলট্ পালট্ ইহা উল্টিয়া উহার স্থানে, উহা উল্টিয়া ইহার স্থানে।

এইরূপ 'চারিজনে ভাগাভাগি করিয়া লও'=পরস্পর ভাগ করিয়া লও।

আধা আধি, কাণাকাণি, বলাবলি,—উক্ত রূপ।

(৭) পেন্ পেনানি—পৌনঃপুন্য ও দীর্ঘ কালব্যাপকতা-বাচক। এইরূপ ঘেন্ ঘেনানি; বৌ বৌ ক'রে পাগল, সাহেব সাহেব খেলিয়াছিলেন। ছি ছি—পুনঃ পুনঃ ছি। এইরূপ থুথু, ভো ভো, ঝা ঝা শো শো,

টোটো করা, হো হো, গন্ধে ঘর ম'ম' করা। এইরূপ ঝক্ ঝক্ কর্‌ছে, ঠন্ ঠন্ শব্দ। চাকচিক্য শব্দের দ্বিত্বও ঐ অর্থবাচক। (লালা শব্দের দ্বিত্বও কি এই অর্থজ্ঞাপক?)

চেচা চেচি করিও না—পুনঃ পুনঃ চেচিওনা। দুর্গা দুগা বল মন—পুনঃ পুনঃ দুগা বল। এইরূপ সাধা সাধি, ডাকা ডাকি, পীড়াপীড়ি, জেদা জেদি। এই রূপ কষ্টে কষ্টে, কেঁদে কেঁদে জীবন গেল, জল জল করে প্রাণ বাহির হইল, দাদা দাদা করে অস্থির, রাধা রাধা বলে বাঁশী।

(৮) জর জারি—জর প্রভৃতি, যেমন জর পেটের অসুখ ইত্যাদি।

রাজা-রাজ্‌ড়া—রাজা প্রভৃতি, যেমন রাজা, মহারাজা ইত্যাদি। এ সব স্থলে দ্বিত্ব প্রভৃতি বাচক।

ঠিক এইরূপ—কাঁদাকাটি (ক্রন্দন অনুনয় প্রভৃতি), পাঁজিপুথি, ফলফলানি, নাম গাম, চালচলন, খাম খেয়াল, ঠায় ঠিকানা, আশে পাশে, কেটে কুটে, ভাব সাব, অলি গলি, আম্‌লা-পায়লা, সাধ্য সাধনা, ইত্যাদি।

(৯) তাহার সাড়াশব্দ পাইলাম না—অণুমাত্র শব্দ পাইলাম না। তাহার জ্ঞানগম্য নাই—অণুমাত্র জ্ঞান নাই। এগুলি নিষেধজ্ঞাপক, এবং অভাবাত্মক (negative) বাক্যের মধ্যেই প্রযুক্ত।

(১০) কটমট—অত্যন্ত কট, বিকট (ইহা উৎকর্ষ বাচক)। এইরূপ সাদাসিদে—অত্যন্ত সিদে (অর্থাৎ সোজা)। ধুমধাম, গোলমাল, হুলস্থূল, হুড়মাড়, লুট পাট্, জাঁকজমক, কিষ্টবিষ্টু, এলোমেলো (ইংরেজী topsy turvy, hugger-mugger এর সঙ্গে সাদৃশ্য আছে)। ঝমাঝম, জড়াজড়, হোমরাচোমরা মানুষ (অতি বড় আমীরের মত), ফিটফাট, আঁকাবাঁকা (বিশেষরূপ বাঁকা), ধপ্‌ধপে সাদা, ডগ্‌ডগা লাল, চুপচাপ্, আথালি পাথালি, শুধুশুধু মেরেছে, খামখা খামখা রাগ করে, তাড়াতাড়ি (অতি তাড়িত ভাবে—অতি ত্বরা), বাড়াবাড়ি (বিশেষ বৃদ্ধি), কড়াকড়ি, আবল তাবল—এগুলিও পূর্ব্ববৎ উৎকর্ষ-বাচক। সংস্কৃত ওতপ্রোত শব্দেও উৎকর্ষ বুঝায়; বাঙ্গলা এলোমেলো, আথালি পাথালি শব্দের সঙ্গে ইহার বেশ সাদৃশ্য আছে।

বরাবর শব্দও উৎকর্ষ বাচক (= exactly in the direction of)

ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, চূর্ণবিচূর্ণ, খণ্ডবিখণ্ড, ছিন্ন ভিন্ন, লণ্ডভণ্ড—পূর্ব্ববৎ। পাকাপাকি বন্দোবস্ত—অত্যন্ত পাকা বন্দোবস্ত (উৎকর্ষ বাচক)। এইরূপ—সোজাসুজি, মিছামিছি।

(১১) এ বিষয়ের টুনটুনি আমরা অনেক আগেই শুনিয়াছি—ঈষৎ টুনি (অর্থাৎ কিয়ৎ পরিমাণে টের) পাইয়াছি। (ঈষদর্থ বাচক)।

আব্‌জাব্—ঈষৎ জাব্ অর্থাৎ ঝাপ্‌সা।

এইরূপ, কমসম করিয়া খাও—ঈষৎ কম, (কিন্তু, 'কম কম ক'রে খাও'—প্রতিজনে বা প্রতিবারে কম ক'রে খাও—বিভক্ত বহুলতা বাচক)।

বড়সড় হয়েছি—প্রায় বড়, একরূপ বড়।

(১২) টিক্‌টিকী, গিব্‌গিটী, কুকুর, কুক্কুট—এগুলি স্ব স্ব মুখধ্বনি, বা তদ্রূপ অন্য কোন ধ্বনি-জ্ঞাপক।

বোবা—বো—বো—করে যে।

ঠেটা—ঠে ঠে করে যে।

দদ্দুর, মর্ম্মরিয়া তরুকুল, কঙ্কণ, বুদ্‌বুদ, প্রভৃতি এইরূপ বিভিন্ন ধ্বনির অনুকরণ-জ্ঞাপক।

থুথু—(নিষ্ঠীবন ফেলিবার কালে জাত শব্দ হইতে উৎপন্ন)।

(১৩) এ বিষয়ে আবার হারাহারি কি—হার জিৎ কি? এস্থলে দ্বিত্ব দ্বারা শব্দের প্রথমাংশের বিপরীতার্থ সূচিত হইতেছে)। এ বিষয়ে আবার জানাজানি কি? ইহাতো আন্দাজেই বলা যায়—জানা-অজানা কি? কিন্তু "এ বিষয় কত আগে জানাজানি হইয়াছে—বহু লোকে জানিয়াছে (কর্ত্তৃবহুলত্বজ্ঞাপক। নিম্নের ১৭ প্যারা দেখ)। এইরূপ—এ বিষয়ে চাপাচাপিতে সমান ফল—অর্থাৎ গোপন রাখা ও খুলিয়া বলার সমান ফল। কিন্তু এ

বিষয়ে চাপাচাপিতে ফল নাই—বেশী চাপ দিয়া ফল নাই (উৎকর্ষ-জ্ঞাপক)।

নিম্নলিখিত সংস্কৃত শব্দগুলি এতৎ সঙ্গে বিচার্য্য—ফলাফল, পারাপার, কালাকাল, পাত্রাপাত্র, শুদ্ধাশুদ্ধ, সম্পর্কাসম্পর্ক।

ধর্ম্ম টর্ম্ম—ধর্ম্ম ও তদ্বিপরীত অর্থাৎ ধর্ম্ম ও পাপ (বিপরীতার্থ সূচক।) এইরূপ পুণ্যটুণ্য, ছেলেপিলে।

(১৪) এই মাসের মাঝামাঝি—মাঝে বা তাহারই কাছে In or about the middle of this month) (সামীপ্য-বাচক)। এইরূপ মোটামুটি।

(১৫) আমি তাহাকে চোখে চোখে রাখিতেছি—সর্ব্বদা চোখে রাখিতেছি। (অবিরতি-বাচক)।

একলা একলা ভাল লাগে না—সর্ব্বদা একলা ভাল লাগে না। (পশ্চিম বঙ্গে একলা স্থলে একেলা বলা হয়)।

(১৬) সে কেবল দেইদিচ্ছি করছে—দীর্ঘকাল যাবৎ দিচ্ছি বলছে। (দীর্ঘকালব্যাপকতা জ্ঞাপক)।

এইরূপ—"যাই-যাচ্ছি কর্‌ছে," গয়গচ্ছ করিও না, দিব দিব ক'রে এক বৎসর কেটে গেল, যাই যাই ক'রে যাওয়া হচ্ছে না।

(১৭) এ বিষয়ে জানাজানি হয়ে গেছে—বহু লোকে জানিয়াছে (কর্ত্তৃবহুলত্বজ্ঞাপক)। কাড়াকাড়ি, মারামারি প্রভৃতির স্থলে যেমন পরস্পর অর্থ বুঝাইতেছে,—এখানে সেরূপ নহে।

এইরূপ,—তাহাকে ধরাধরি করিয়া বাড়ী লইয়া গেল—বহু লোকে ধরিয়া বাড়ী লইয়া গেল।

(১৮) ধীরে ধীরে বলিবে—একবার ধীরে বলিবে, আবার ধীরে বলিবে; যখন যাহা বলিবে ধীরে বলিবে, (বিভক্ত কার্য্যজ্ঞাপক, অথবা রবি বাবুর নামকরণ অনুসারে, বিভক্ত বহুলতাজ্ঞাপক)। তিল তিল করে মৃত্যু—আজ এক তিল, কাল এক তিল, এইরূপে (অর্থাৎ ক্রমশঃ) মৃত্যু।

এইরূপ অল্পে অল্পে আয়ু ফুরায়—আজ অল্প কাল অল্প।

(১৯) সে শুয়ে শুয়ে পড়্‌ছে—শয়িত অবস্থায়; (অবস্থা জ্ঞাপক।) কিন্তু শুয়ে শুয়ে ব্যারাম এনেছে—দীর্ঘ কাল শুয়ে। ব'সে ব'সে গান গাচ্ছে—বসা অবস্থায়। কিন্তু ব'সে ব'সে কমর ধরেছে—দীর্ঘ কালীনতা জ্ঞাপক।

(২০) নিম্ন লিখিত উদাহরণগুলিতে শব্দের দুই অংশের আকার ভিন্ন, কিন্তু অর্থ এক; এ সকল স্থলে স্বার্থে দ্বিত্ব হইয়াছে; যথা সদা সর্ব্বদা, ক্রিয়া কর্ম্ম, অল্প স্বল্প, ছাই ভস্ম, মাথা মুণ্ড। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

কিন্তু চিঠি পত্র—চিঠি প্রভৃতি, যথা চিঠি বুক পোষ্ট্ ইত্যাদি। দান দাতব্য—দান প্রভৃতি, যথা দান ও অনুরূপ সাহায্য সহানুভূতি প্রভৃতি। এগুলি প্রভৃতি অর্থবাচক।)

আবার, বাও বাতাস—নানা রূপ বাতাস।

অসুখ বিসুখ—নানারূপ অসুখ। (বিবিধত্ব জ্ঞাপক।)

(২১) নিম্নলিখিত স্থলে শব্দের দুই অংশের অল্পাধিক পার্থক্য আছে:—

কড়ায় ক্রান্তিতে আদায় করিব—নিতান্ত ক্রান্তিতে (to the last Farthing.)। পূর্ব্বোল্লিখিত 'হাড়ে হাড়ে চটা'র ন্যায় এখানেও উৎকর্ষ বুঝাইতেছে। এই রূপ লম্ফ ঝম্ফ—উৎকর্ষ বাচক।

সভ্য ভব্য, ছিটা ফোটা—এ গুলি আবার স্বার্থ জ্ঞাপক। নাম কাম (নাম প্রভৃতি), গাল গল্প, মাল মশলা, গাছ গায়রান্ (গয়রান্ গহন বন),—এ গুলিতে দ্বিত্ব 'প্রভৃতি' অর্থ বাচক। তয় তরকারী, সাজ গোছ, পয় পরিষ্কার—এ গুলিতে শব্দের একার্দ্ধের অর্থ নাই বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের প্রথম দুটী 'প্রভৃতি' অর্থ জ্ঞাপক, শেষোক্তটী উৎকর্ষজ্ঞাপক।

(২২) নিম্নলিখিত শব্দগুচ্ছের (phrases) দুই অংশের অর্থ-পার্থক্য এত স্পষ্ট যে, এ গুলিকে অনেকে শব্দদ্বৈতের উদাহরণ না বলিয়া নিরবচ্ছিন্ন ইতরেতর দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ বলিতে ইচ্ছুক হইবেন; এ সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। আপাততঃ শব্দগুচ্ছ গুলি ও তাহাদের অর্থ দিতেছি:—তালা তালুক—তালা (নগদ টাকা) ও তালুক (ভূসম্পত্তি।) চালা চুলা—চালা—(থাকিবার স্থান ঘর) ও চুলা (চুল্লী অর্থাৎ খাদ্য সংস্থান।) এই রূপ দান ধ্যান, কালে কোলে, দর দস্তুর, গুণ জ্ঞান, বিদ্যা সাধ্যি (learning and power or influence.)। এইরূপ, তাহার রাম রহিম্ জ্ঞান নাই—হিন্দু ও মুসলমানের দেবতার পার্থক্য জ্ঞান নাই, অর্থাৎ সে শাস্ত্র-জ্ঞান-বিরহিত।

মন্তব্য—তালা তালুক, চালা চুলা প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ, এবং এই প্রবন্ধে উদাহৃত তদ্রূপ আরও কতকগুলি শব্দগুচ্ছ (যথা কড়া ক্রান্তি, ফুল ফুল, কিষ্টি বিষ্টু, আবল তাবল্, এলো মেলো, আশে পাশে ইত্যাদি) আকারে দ্বৈত

ভাবাপন্ন না হইলেও প্রয়োগে তদ্ভাবাপন্ন বলিয়া আমরা সে গুলিকেও জানিয়া শুনিয়া এই প্রবন্ধে আনয়ন করিয়াছি। ফলতঃ রবি বাবু যে হিসাবে জলটল, কাপড়-চোপড় প্রভৃতিকে তাঁহার প্রবন্ধের আস্‌বাবের মধ্যে আনিয়াছেন, আমরাও ঠিক্ সেই হিসাবে ও-গুলিকে শব্দদ্বৈতের উদাহরণ মধ্যে গণ্য করিয়াছি।

শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহাপ্রয়াণ।

কি ব'লে কাঁদিবে, কাঁদরে লেখনী
আমি যে কাঁদিতে পারি না আর।
এ মহাপ্রয়াণে, জগতের প্রাণে
উঠিয়াছে হায়! কি হাহাকার!
শত শত কোটী কণ্ঠ হ'তে আজি
উঠিছে দারুণ শোকের গাথা,
শত শত কোটী, হৃদয় আসন
যে জনার তরে রয়েছে পাতা;
রমণী কুলের, শিরোমণি যিনি
জগতে তুলনা কোথায় পাই,
হায় কি অভাগ্য, জগৎ জননী,
মহারাণী আর জগতে নাই!
নাট্যমঞ্চে হায়, নিভিলে দেউটী
সহসা, আঁধারে উঠে কোলাহল,
সকলের মুখে, "কি হ'লো কি হ'লো,"
সকলের চিত্ত সমান বিহ্বল।
ভবনাট্যশালে, নিভেছে দেউটি
আঁধারে জগৎ ঢেকেছে তাই,
জগৎ-জোছনা, নারীকুল-মণি
মহারাণী আর জগতে নাই।
অস্তাচল শিরে, ডুবিলে তপন
পশ্চিমের হয় যামিনী ভোর,
পশ্চাতে পড়িয়া, পূরব গগন
মলিন বদন আঁধারে ঘোর।
স্বমুখ স্বরগ করি আলোকিত
পশ্চাৎ জগৎ আঁধারে ঢাকি,
চলিলেন অই, রাণী ভিক্‌টোরিয়া
সমস্ত সংসারে বিষাদ মাখি'।
জগতে উঠিল 'হাহাকার ধ্বনি,
কি আনন্দ অই গগন মাঝে,
ধরায় উঠিল, শোকের সঙ্গীত
স্বরগে আনন্দ-বাজনা বাজে,
অমনি খুলিল, স্বরগের দ্বার
ইন্দ্রাণী আইলা বিমানপথে,
"এসো ভিক্‌টোরিয়া" বলিয়া আপনি
তুলিয়া লইলা পুষ্পক-রথে।
নিজ হাতে করি, মন্দারের মালা
মরাল গ্রীবায় পরালা হাসি,
চপলায় বাঁধি, চিকণ-চিকুর,
সর্ব্বাঙ্গে ঢালিলা জোছনা রাশি।
ছুটিল পুষ্পক, উজ্জ্বল গগনে
ছাড়ি রবি শশী উঠিল দূরে,
কোটী চন্দ্র রবি— কিরণ-মণ্ডিত
উতরিল এক অপূর্ব্ব পুরে।
"এই সুখরাজ্য, ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার"
কহিলা সুস্বরে বাসব-জায়া,
"শুন ওগো রাণী, সংসার-সৌভাগ্য
হেথাকার শুধু ক্ষণিক-ছায়া।
হেথায় বাসনা ফল-অনুগামী
হেথায় আনন্দ আতঙ্ক-হীন,
রতন-বিভায়, উজ্জ্বল এ লোক
চির-পৌর্ণমাসী নিশি কি দিন।
এ লোকের নাম "দিব্য রাজলোক"
হেথা বসে সব রাজ ঋষিদল,
তোমার প্রতাপে, তোমার প্রভায়
আজি এই লোক অধিক উজ্জ্বল।
কোটী কহিনুর— বিভায় মণ্ডিত
অই সিংহাসন তোমার লাগিয়া,
ধরার ইন্দ্রাণী, তুমি মহারাণী
এই সিংহাসনে বসো ভিক্‌টোরিয়া।"
বসিলা সেথায়, রাজরাজেশ্বরী
শোভাময় করি রত্ন-সিংহাসন,



সম্ভ্রমে দাঁড়াল,　　রাজর্ষি মণ্ডলী
　সানন্দে গাইল স্বর্গ-বন্দিগণ,
"জয় ভিক্‌টোরিয়া,　　রাজরাজেশ্বরী
　জয় ভিক্‌টোরিয়া ভবের ইন্দ্রাণী,
যাঁর রাজ্যে রবি　　সদা রয় বাঁধা
　জয় ভিক্‌টোরিয়া জয় মহারাণী,"
ক্ষণেকে উন্মনা,　　হইলা সম্রাজ্ঞী,
　সে ঐশ্বর্য্যালোকে কি যেন নাই,
বুঝিয়া ইন্দ্রাণী,　　কহে "ওগো রাণী
　অন্য দিব্যালোকে চলগো যাই।"
দেব মনোরথ—　　পুষ্পক সুরথ
　উঠিলা উভয় সে রথ'পরে,
পলকে ভেটিলা,　　অন্য দিব্যালোক
　কহিলা ইন্দ্রাণী মধুর-স্বরে।

"এই সতী লোক　　দিব্য ধাম, হেথা
　জড়ের বন্ধন নাহিক লেশ,
বহু দূরে ঘুরে　　রবি চন্দ্র তারা
　সতী অঙ্গ বিভা উজলে দেশ।
পতি প্রেমে যারা,　　সদা মাতোয়ারা
　এই লোকে তারা বসে আসিয়া,
তুমি ত সতীর　　শিরোমণি রাণী
　এইখানে তুমি বসো ভিক্‌টোরিয়া।
শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী,　　দময়ন্তী সীতা
　এই লোকে তাঁরা বসেন আসি,
নিশ্বাসে তাঁদের,　　মন্দার বিকাশে
　স্বর্গের জোছনা তাঁদের হাসি।
চির বিচ্ছেদের　　মিলন এ লোকে,
　হেথায় মিলন বিচ্ছেদ-হীন।
হেথায় প্রণয়ি-　　যুগল-কুসুম
　এক বৃন্তে ফুটে নিশি কি দিন।
হেথা প্রেমময়　　অশরীরি-তনু,
　হেথায় নাহিক যৌবন জরা,
হেথায় প্রণয়　　সংশয়-বিহীন
　পাপেতে মলিন এ নহে ধরা।
হেথা ভালবাসা　　সুধু ভাল বাসা
　অন্য আশা কিছু নাহিক তায়।
হেথায় না বসে　　বণিক-প্রণয়ী
　দানে প্রতিদান কেহ না চায়।
তব প্রতীক্ষায়,　　এ লোকের দ্বারে
　অই কে দাঁড়ায়ে দেখ গো রাণী,
যুগ যুগান্তের　　বিচ্ছেদের প'রে
　মিলনে জুড়াও তাপিত প্রাণী।"
বাঞ্ছিত দেবতা,　　নিরখিয়া রাণী
　বক্ষমাঝে তাঁর লুকা'লা মুখ,
তটিনী ডুবিল　　সাগর সঙ্গমে
　মুগধা না জানে দুখ কি সুখ।
চির-তপ্তপ্রাণ,　　হইল শীতল
　প্রেম-বারিনিধি বারেক ছুঁয়ে,
এক ফোটা অশ্রু,　　যুগ যুগান্তের
　বিষাদ-কালিমা ফেলিল ধুয়ে।

সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ বিরহ বেদনা
ক্ষণিক-স্বপন-স্মৃতির পারা,
হাসিল কুমুদী চাহি শশী পানে
সুধাংশু ঢালিল পীযূষ-ধারা।
কহিলা ইন্দ্রাণী, "শুন ওগো রাণী,
আর (ও) এক লোকে যে'তে সে হবে।
সে লোকে তোমায় ডাকিছে সন্তান
ত্বরা করি দোঁহে চল গো তবে।"
লইয়া দম্পতি. চলিলা ইন্দ্রাণী
অন্য দিব্য লোক ভেটিলা গিয়া,
জিনি বীণাবাণী, জয়ন্ত-জননী
কহিলা মধুরে বাসব-প্রিয়া ;—
"ক্ষীরোদ সাগর প্রবাহিত হেথা
এই মাতৃলোক সু পুণ্য ভূমি।
এইখানে তুমি, বসো ভিক্টোরিয়া
কোটী সন্তানের জননী তুমি।
জননীর স্নেহ স্তন্যরূপে হেথা
পীযূষের নদী সতত বয়।
কল্পতরু হেথা, শোভে সারি সারি
ফল ধরে সদা অমৃত ময়।
নিয়ত হেথায়, কল্পতরু হ'তে
স্নেহামৃত ফল আপনি ঝরে।
নিয়ত হেথায়, সুরভির স্তনে
পীযূষের ধারা আপনি ক্ষরে।
মাতৃভাবে যারা, আত্ম-সুখ হারা
এই লোকে তারা বসে আসিয়া।
কোটী সন্তানের জননী ও রাণী,
এইখানে তুমি বসো ভিক্টোরিয়া।"
শ্যাম তৃণদলে, বিছায়ে অঞ্চল
মাতৃলোকে সেথা বসিলা জননী।
জয় মহারাণী জয় মা জননী
ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া উঠিল এ ধ্বনি।
পূরবে পশ্চিমে কোটী কোটী কণ্ঠে
কাতরে ডাকিল জননী ব'লে।
জয় মা জননী জয় ভিক্টোরিয়া
উঠিল সে ধ্বনি গগন তলে।

কহিলা ইন্দ্রাণী, "শুন ওগো রাণী,
ধরায় এমন সৌভাগ্য কার?
ত্রিদিবে আসিয়া, তোমার মতন
তিন লোকে তিন আসন যার?
বহু পুণ্য ফলে, একলোকে লোকে
পায় না আসন ত্রিদিব-ধামে,
তিনলোকে তব, সম অধিকার
ধন্য ধরা আজি তোমার নামে।"
ধন্য ধরা আজি, তব নামে রাণী
গাইল তারকা সুধাংশু রবি,
ধন্য ধরা আজি, ভিক্টোরিয়া নামে
সুদূরে গাইল এ দীন কবি।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ।

হতভাগ্য।

(গল্প)

শনিবার সকাল সকাল আপিসের ছুটি হইলে কাল যখন সকলে আসিয়া ট্রামে চাপিলাম, তখন সপ্তাহের কার্য্য ও কোলাহলময় জীবনের পর একটি সমগ্র দিনের আরাম উদ্দেশে অনুভব করিয়া স্কুলের ছেলেদের ন্যায় আমোদ বোধ হইয়াছিল। কিন্তু কার্য্যই যাহাদের অভ্যাস, তাহাদের পক্ষে ছুটির দিন কেবল উদ্দেশেই আরামদায়ক, প্রকৃত পক্ষে ছুটির দিন তাহাদের তেমন ভাল কাটে না। কেমন একটা উদাস অলসতায় শরীরটা যেন অসার বলিয়া মনে হয়; তাহার পরে যন্ত্রের মত ১০ টায় আপিস করা, ৫ টায় বাড়ী ফেরা ও শেষ চুপ চাপ পড়িয়া থাকা একরূপ মন্দ লাগে না। আজ এই চৈত্র মাসের মধ্যাহ্নে—রুদ্ধ গৃহে সময়টা কিছুতেই কাটিতে চাহিতেছে না। তাহাতে এবারে সহরে কিছু অতিরিক্ত গরম পড়িয়াছে, গগন-কেন্দ্রে রবি অনল বর্ষণ করিতেছেন—সূর্য্যদেব যেন সহস্র করে পৃথিবীকে আকর্ষণ করিয়া আপনার জ্বালাময় বক্ষের সন্নিহিত করিতে চাহিতেছেন। বায়ু-তরঙ্গে ইতস্ততঃ বিচলিত বালুরাশি বহু দূর ব্যাপিয়া আবর্ত্তের সৃষ্টি করিতেছে। উপরে নীলাভ রজত আকাশ সৌরকরে ঝলসিতেছিল। আর তাহার মধ্য দিয়া কতকগুলি রজতশুভ্র মেঘখণ্ড ইতস্ততঃ

ভাসিয়া যাইতেছিল। পথ পার্শ্বের বৃক্ষবিলগ্ন আতপতপ্ত বায়সের বিকৃত স্বরে পথিকের অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষু কচিৎ উন্নমিত হইতেছিল। মাঝে মাঝে ফিরিওয়ালার অবসাদপূর্ণ চীৎকার ক্ষীণ হইতে স্পষ্টতর হইয়া আবার বহু দূরে ক্ষীণ হইয়া মিলাইতেছিল।



সিমলার একটি কবাট জানালাবদ্ধ নিম্নতল প্রকোষ্ঠে বসিয়া, শুইয়া এবং মস্তিষ্কের উদ্ভাবনী শক্তির প্রভাবে নানা প্রকার সুখের কল্পনা করিয়া আরাম করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। হস্ত-সন্নিহিত হোয়াটনটের ভিতর থেকে দুই একখানা বই টানিয়া লইয়া পড়িবার চেষ্টাও করিলাম কিন্তু কিছুতেই মন সংযত হইল না। অবশেষে একটা স্থূল তাকিয়ায় আমার স্থূলতনু দেহভার ন্যস্ত করিয়া আলবোলায় তামাক চড়াইয়া রবারের নলের শব্দ বৈচিত্র্যে কথঞ্চিৎ আরাম উপভোগ করিতে লাগিলাম।

কিছুকাল এইরূপে কাটাইয়া যখন নিতান্ত অসহ্য বোধ হইল, তখন সম্মুখের একটা জানালা খুলিয়া দিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আমার ঘরের সম্মুখেই এক ভদ্র লোকের বাড়ী। রোয়াকের নিম্নে এক রাশি ইট রহিয়াছে এবং তাহার উপরে বসিয়া একটি বৃদ্ধ অন্যমনে ইট চূর্ণ করিতেছে। হতভাগ্যের এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া নিজের অশান্তি যেন অনেকটা কমিয়া গেল। মনে হইল, এই বৃদ্ধ এক মুষ্টি অন্নের জন্য দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে অনাবৃত মস্তকে এত পরিশ্রম করিতেছে, আর সহস্র গুণে শীতল গৃহে, কোমল শয্যায় শুইয়া আমার এত দুঃখ! ঐ বেচারী এবং আমার মধ্যে প্রভেদ কি? আমার পিতার কিছু বিত্ত ছিল, তিনি আমাকে লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন, তাই আমি আফিসের কেরাণী বাবু। আর উহার পিতা হয়ত দরিদ্রতায় প্রপীড়িত ছিল, তাই ও মজুর!

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ পরে বোধ হয় রৌদ্রের তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে তাহার হাতুড় লইয়া গাত্রোত্থান করিল। সে কিয়ৎক্ষণের মধ্যে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিলনা, বৃদ্ধ অতি কষ্টে গিয়া রোয়াকের উপর দুখানি হাতে ভর করিয়া বসিয়া পড়িল। দেখিলাম তাহার দুখানি পদই ভগ্ন, কোনরূপে চলিতে পারে মাত্র। সে আমার দিকে ফিরিয়াই বসিয়াছিল। দেখিলাম তাহার ললাট বাহিয়া ঘর্ম্ম বারি পড়িতেছে আর কষ্ট নিঃসৃত শ্বাসে তাহার কঙ্কাল উদ্বেলিত হইতেছে। তাহার কোটরগত এবং সঙ্কুচিত চক্ষু দুটী লক্ষ্যশূন্য বলিয়া বোধ হইতেছিল। তাহার ললাটের শিথিল চর্ম্ম গভীর রেখা বাহুল্যে পরিণত হইয়াছিল। আর অতি ক্ষীণ মাংসপেশী ব্যাপিয়া স্ফীত শিরা-জাল তাহার কৃশ দেহে ফুটিয়া উঠিয়া ছিল। বৃদ্ধের ভ্রূকুটি আনত মুখ মণ্ডল যেন এই মর্ত্ত্য জীবনের ইতিহাস ব্যক্ত করিতেছিল।

বৃদ্ধের বিশ্রাম করা হইয়া গেল। সে আবার হাতুড়ি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তখনও তাহার কপালে স্বেদ বিন্দু দূর হইতে লক্ষিত হইতেছিল। অর্দ্ধসেবিত কলিকায় দিকে আমার দৃষ্টি পড়িল, কলিকায় কুণ্ডলীকৃত ধূমপুঞ্জে পার্শ্বের দেয়াল কলঙ্কিত দেখাইতেছিল। বৃদ্ধ তামাক খাইলে সুস্থ হইবে মনে করিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে ডাকি-

লাম। সে আমার দিকে মুখ ফিরাইল। তাহার দৃষ্টিতে যেন একটা তীব্র উপেক্ষার ভাব বিদ্যমান ছিল, যেন কাহারও অনুগ্রহ পাইতে সে অভ্যস্ত নহে; পাইবার জন্যও কিছুমাত্র যত্নবান নহে। আমি আবার ডাকিলাম, এবারে সে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিয়া আমার বারান্দায় বসিল। তাহাকে আমার কলিকাটী দিলাম। বৃদ্ধ যথেচ্ছ ধূম পান করিয়া কলিকাটী নামাইয়া রাখিয়া জল খাইতে চাহিল। ইহার মধ্যে আমি তাহাকে অনেক প্রশ্ন করিয়া একটিরও উত্তর পাইলাম না। জলপান করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলে আমি তাহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, কিন্তু বৃদ্ধ আমার প্রশ্নের উত্তর দিবার আবশ্যকতা বোধ করিল না। সে মাঝে মাঝে অস্পষ্ট ভাষায় কত কি বলিল। তাহার অর্থ সংগ্রহে আমি কৃতকার্য হইতে পারিলাম না। কিন্তু তাহার সেই ভাষা হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে আসিতেছিল, প্রাণের অসম্বদ্ধ চিন্তার স্রোত ভাষার সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকে না। দরিদ্র ভাষা তাহার বহু পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। আমি তাহাকে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম 'বুড়ো তোমার ছেলে মেয়ে কি?' বৃদ্ধ উত্তর না দিয়া, পুনরায় কলিকাটী তুলিয়া লইয়া ধূম পানে প্রবৃত্ত হইল। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—'তোমার আর কে আছে?' বৃদ্ধ উপরের দিকে হাত তুলিয়া দেখাইল। 'তোমার বাড়ী কোথায়?' 'সঙ্গে সঙ্গে বাবু' তাহার এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে যেন কত অনিচ্ছা, কত বিরক্তি মাখান ছিল। কিন্তু আমি ইহাতে যতই তাহার দুঃখের গুরুত্ব বোধ করিতে লাগিলাম, ততই তাহার অতীত ইতিহাস জানিবার জন্য আমার ব্যগ্রতা বাড়িতে লাগিল। বৃদ্ধ বোধ হয় পূর্ব্বে কখনও কোথাও সহানুভূতি পায় নাই। সে প্রথমে আমাকে কতকটা বিস্ময় ও কতকটা বিরক্তির চক্ষে দেখিতেছিল। এবং আমার এই অযাচিত যত্নের জন্য কিছু মাত্র কৃতজ্ঞতা দেখান সে আবশ্যক মনে করে নাই। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাহার মৌনের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। শোকের, দারিদ্র্যের, অত্যাচারের তীব্র নিষ্পেষণে ধৈর্য্যহারা মানবের হৃদয় শেষে অনন্যোপায় হইয়া এক বিন্দু সান্ত্বনার জন্য আকুল হইয়া উঠে। কিন্তু এমনই বিড়ম্বনা যে ঠিক তাহাই সে পায় না। জগতের নিষ্ঠুর ঔদাস্য, ক্রূর উপহাস, মরণোপম উপেক্ষাই তাহার কাল হইয়া উঠে। তখন সে একমাত্র শরণ শান্তির নিদান মরণকেই সাধনার ধন বলিয়া মনে করে। বৃদ্ধের সমগ্র জীবন যেন ইহারই বিস্তৃত দৃষ্টান্ত স্বরূপ কাটিয়াছে। আজ তাই আমার সামান্য সহানুভূতি পাইয়া হতভাগ্য গলিয়া গেল। তাহার কঙ্কালসার বক্ষের জীর্ণ আবরণ আন্দোলিত করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইল, তাহার অনভ্যস্ত নয়নে স্বচ্ছ অশ্রু দেখা দিল, সে অনেক বার থামিয়া, অনেকবার সামলাইয়া সরলভাবে তাহার আত্মজীবন-কাহিনী বলিতে লাগিল।

'বাবু, আমার দুঃখের কথা শুনিয়া কি হইবে? ভগবান যাহাকে মারেন তাহাকে কেহ রাখিতে পারে না, তাহা না হইলে এই কাঠ ফাটা রোদে—এই বৃদ্ধ বয়সে—আমি খাটিয়া মরিব কেন? আমার কর্ম্মের ফল আমিই ভোগ করিতেছি। তাহা না হইলে আমার বাড়ী ছিল, ঘর ছিল, একদিন আমার সবই ছিল, বুদ্ধির দোষে সে সব খোয়াইয়া বসিব কেন?—সাবাজপুর চেন বাবু? সাবাজপুরের কাছে আমার বাপের ভিটা ছিল। অতি ছোট কালে আমার বাপ মরিয়া যায়। আমার মা'র হাতে কিছু পয়সা ছিল, তাহাতেই আমাদের চলিয়া যাইত। মা আমার বড় বুদ্ধিমতী ছিল, আর আমাকে যেমন ভাল বাসিত, সকল মায় তেমন বাসিতে পারে না। বাবার মৃত্যুর পরে তাহাকে নিকা করিবার জন্য অনেকে তোষামোদ করিয়াছিল, কিন্তু আমার অযত্ন হইবার ভয়ে মা কখনও সম্মত হয় নাই। ছেলে বেলায় আমার গায়ে খুব জোর ছিল, আমার বয়সের কেহই আমার কাছে দাঁড়াইতে পারিত না। সে সময়ে অন্নের জন্য ভাবিতে হইত না। কেবল 'গায়ে ফুঁ দিয়া' বেড়াইতাম, আমার তেড়ী ফিরাণ কাল মিচমিচে বাবরি চুল ছিল; রঙ্গীন গামছা কাঁধে লইয়া, আর রিং ঝুলান পাকা বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া যখন বেড়াইতাম, তখন সকলে আমার দিকে চাহিয়া থাকিত। এমন দিনও আমার ছিল! যখন শরীরে কষ্ট সহিত তখন আমি আলস্য করিয়াছি, তাই এই বয়সে ইঁট ভাঙ্গিয়া খাই, সকলই অদৃষ্টের ফল!

"সাবাজপুরে বছর বছর মেলা হয়, ওখানকার বড়লোক আহম্মদ মিঞারা সেই মেলায় একটী কলসী টানাইয়া ঢেঁড়া পিটিয়া দিত। কুস্তীতে আর লাঠিতে যে জিতিতে পারে, সে সেই কলসী পায়। ঐ কলসী জিতিয়া আনিবার জন্য সকলে একবার আমাকে ধরিল। মাও

তাহাদের কথায় সায় দিলেন। চাদর কোমরে আঁটিয়া লাঠি হাতে করিয়া মেলায় চলিলাম। মা সেই সময়ে কাঠ কাটিতে গিয়া পা কাটিয়া ফেলিলেন, সে দিকে লক্ষ্যও করিলাম না। মেলায় আমার চেহারা দেখিয়া সকলেই বলিতে লাগিল, আমিই ঐ কলসী পাইব। সেখানে দেশ বিদেশের লোকের ভিড় দেখিয়া আমার মনে একটা ত্রাস হইল, প্রথম প্রথম মনে ভয় হয়। আর ভয় করিয়া চলিতে হয় দুষ্টলোকদের। তাহারা নানা প্রকার 'গুণজ্ঞান' 'মন্ত্র-তন্ত্র' জানে। না পারিলে শেষে ধূলা পড়িয়া কত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া দেয়। দুই এক 'হাত' কুস্তী লড়িয়া আমার সাহস বাড়িয়া গেল। কিন্তু শেষ বেলায় কোথা হইতে একটা সাড়ে পাঁচ হাত লম্বা বিকট আকারের লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। আর লোকজন ত সব হৈ হৈ করিয়া উঠিল। সেও বেশ দুই চারি পাক খেলিয়া আমার নিকটে আসিয়া হাত বাড়াইল। প্রথমতঃ আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল, শেষে আল্লার নাম করিয়া আমিও হাত বাড়াইয়া দিলাম। আমি নীচে পড়িয়া গেলাম, লোকে খুব গোলমাল করিয়া উঠিল। মনে করিল আমি হারিয়াছি। কিন্তু, বাবু, জোর বেশী থাকিলে কি হয়, সে লোকটা কৌশল একেবারেই বুঝিত না। আমি তাহার দুই পায়ের মাঝে মাথা দিয়া এমন ভাবে উপর মুখে ধাক্কা দিলাম যে ঐ বড় জোয়ানটা দশ হাত দূরে ছটকাইয়া পড়িল। সব লোক চারিদিক হইতে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। আহম্মদ মিঞা নিজে হাতে করিয়া আমাকে কলসীটি দিলেন, আর তাঁহার বাড়ীতে আমাকে রাত্রে খাইতে বলিয়া গেলেন।"



বৃদ্ধ থামিল, যেন কিছু স্মরণ করিয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'তারপর?' বৃদ্ধ বলিল—"বাবু সেই ত আমার কাল হইল। আহম্মদ মিঞার সংসারে তাহার এক বিধবা কন্যা ছিল। অমন শ্রী চেহারার মেয়ে আমাদের দেশে আর ছিল না। সকলেই তাহার ব্যাখ্যা করিত। আমি খাইতে বসিয়া দেখিলাম দরজার আড়াল থেকে সে আমাকে দেখিতেছে। আমি আগে কখনও তাহাকে দেখি নাই মিঞাদের মেয়েরা কখনও বাড়ীর বাহির হয় না। কিন্তু তাহার ফুটফুটে রঙ ও পটলচেরা চোক দেখিয়া স্থির করিলাম যে এই আহম্মদ মিঞার কন্যা। আমি তাহার দিকে চাহিলে সে দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু আবার পরক্ষণেই চাহিয়া দেখি সে দরজা ঈষৎ খুলিয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। আমার আর বাড়ী ফিরিতে ইচ্ছা হইল না। রাত্রি যখন দ্বিপ্রহর হইয়া গিয়াছে তখনও আমি আহম্মদ মিঞার বাড়ীর পার্শ্বে একটা গাছ তলায় দাঁড়াইয়া ছিলাম, জোছনা ফুট ফুট করিতেছিল, মাঝে মাঝে একটা ঘরের জানালা নিঃশব্দে খুলিয়া আবার তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইতেছিল। জানালার পার্শ্বে ছটুর মুখ দেখিলাম (আহম্মদ মিঞার মেয়ের নাম ছটু)। জোছনা যখন অস্ত গেল তখন আস্তে আস্তে দরজা খুলিয়া ছটু বাহির হইয়া আসিল। সে দিন মনে হইয়াছিল যেন

সমস্ত জীবন এমনই কাটিবে, সে দিন মরিলেও বুঝি দুঃখ বোধ হইত না। ইহার পর প্রত্যহ ছটুর সঙ্গে গোপনে দেখা করিতে আসিতাম। এইরূপে ২।৩ মাস কাটিয়া গেল। একদিন একটা বাগানে বসিয়া আমরা কথা কহিতে ছিলাম। রাত্রি অন্ধকার, কোথাও আর কেহ ছিল না। হঠাৎ পিছন দিক থেকে আমার মাথায় কে বাড়ি দিল। সে আঘাত পাইয়া আমার বোধ হইল যেন পায়ের তলা হইতে মাটি সরিয়া যাইতেছে, ছটুর দিকে হাত বাড়াইয়া দিলাম এই মাত্র জানি, তাহার পর আর আমার জ্ঞান ছিল না। সেই সময় যদি আমার মরণ হইত তবে বাঁচিয়া যাইতাম।



"তিন দিন তিন রাত পরে যখন আমার চৈতন্য হইল, তখন দেখিলাম আমি একটা গোয়াল ঘরে মার কোলে শুইয়া আছি, পার্শ্বে ছটু বসিয়া মাথায় ঔষধ বাঁধিতেছে। অসুখ একটু আরাম হইলে শুনিলাম যে আহম্মদ মিঞা সেই রাত্রেই আমার ঘর জ্বালাইয়া দিয়াছে। মা পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন। আর শুনিলাম সেই রাত্রে যখন লাঠির আঘাতে আমি পড়িয়া গেলাম, তখন আমার রক্ত তীরের মত ছুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহাই দেখিয়া খুন হইয়াছে মনে করিয়া দুষ্টেরা পলাইয়া গিয়াছিল। শেষে ছটু আমাকে এক বুড়ীর গোয়াল ঘরে আনিয়া শুশ্রূষা করিতেছে। মা আর ছটু তিন দিনের মধ্যে কিছু মাত্র খায় নাই। বুড়ীর বাড়ী গ্রামের শেষ সীমায় ছিল বলিয়া কেহ বড় একটা সন্দেহ করে নাই। কলঙ্কের আশঙ্কায় আহম্মদ মিঞাও আর কোন অনুসন্ধান করে নাই। বুড়ী ঔষধ কুড়াইয়া আনিয়া দিত ও শেষে আমাদের ভাত খাওয়াইয়া যাইত। সারিয়া উঠিবার আগেই পলাইবার চিন্তা করিতে লাগিলাম, কারণ আহম্মদ মিঞারা বড় লোক, তাদের সঙ্গে বিবাদ করিয়া ও দেশে থাকা যায় না। তাহারা একটু সন্ধান পাইলেই বোধ হয় আমাদের নিকাশ করিয়া দিত। কাজে কাজেই আমরা তিনটী প্রাণী সংসার সাগরে ভাসিলাম। ছটুর গায় যে গহনা ছিল তাহাই আমাদের সম্বল, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া আমরা রওনা হইলাম। দুই দিন কি তিন দিন পরে আমরা কাশীপুর আসিয়া পৌছিলাম। সেখানে একটা খোলার ঘর ভাড়া লইয়া তিন জনে থাকিলাম। আমার মাথার ঘা আরাম হইলে বোর্ণিও কোম্পানির চটের কলে ঠিকা চাকরী লইলাম। কিছু দিন পরে ছটুর একটি মেয়ে হইল, মেয়ে যে ঠিক মার মত হয়, তাহা জানিতাম না, চোক মুখ হাত পা সবই যেন মায়ের মত। নিজের কপাল দোষে সব হারাইলাম আর দোষ দিব কা'র? মেয়েটীও যদি থাকিত!"

বৃদ্ধের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, তাহার মর্ম্মের অন্তস্তল হইতে যেন আত্মার অব্যক্ত কাতর ধ্বনি উঠিতে লাগিল। বৃদ্ধ একটু সামলাইয়া লইয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল।

"আমি যেমন মন্দ অদৃষ্ট লইয়া জন্মিয়া ছিলাম, শত্রুরও যেন এমন না হয়। বাবু, জীবন ত এক রূপ শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন দুঃখকে আর ভয় নাই। এত দিন ইচ্ছা করিলে ছার জীবনের অন্ত করিয়া দিতে পারিতাম, কিন্তু আমি যে পাপ করিয়াছি তাহার দণ্ড ভোগ না করিয়া

মরিলেও যে শাস্তি হইবে না। এখন এই কষ্ট পাইয়াই আমার সুখ, কষ্ট পাইলেই মনে হয় আমার কর্ম্মের প্রতিফল হইল। সেই জন্যই এত কষ্ট পাইয়াও বাঁচিয়া আছি। কিন্তু বাবু এত দুঃখ পাইয়াও মানুষ বাঁচিয়া থাকে কেমন করিয়া বলিতে পার? আমি ছেলে বেলায় বড় সৌখীন ও বড় অলস ছিলাম; এক মায়ের এক ছেলে যেমন হয় আমারও তাহাই হইয়াছিল। কিন্তু যখন ঐ তিনটীকে লইয়া নিজের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিতে হইল, তখন যেন বড়ই জঞ্জাল বলিয়া মনে হইতে লাগিল। বাড়ী হইতে আসিবার পরে নিজে যাহা উপার্জ্জন করিতাম তাহার দ্বারা কিছুতেই চলিত না, ছটুর গায়ে ২ ৩ খানা গহনা ছিল তাহাই বন্ধক দিয়া বা বিক্রয় করিয়া এত দিন কোনও রূপে চলিয়াছে। মেয়েটী হইবার পর হইতে আমার পরিশ্রম শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। ঠিকা কাজ, পরিশ্রম কম করিলেই উপার্জ্জনও কম হয়। মেয়েটী হইবার কিছু দিন পরে মা রোগ শয্যায় পড়িল, এমন টাকা কড়ি ছিল না যে তাঁহার চিকিৎসা করাইতে পারি, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আলস্য পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না, কেবল আমার অযত্নেই তিনি ভুগিয়া ভুগিয়া মারা গেলেন। কিন্তু সহস্র কষ্টের মধ্যেও ছটু আমার মুখ চাহিয়া কাটাইয়াছে। আমার আলস্যের জন্য সকল দিন তাহার আহার জুটিত না। আমি দেখিয়াও দেখিতাম না। মনে করিতাম, এসব খোঁজ লইতে গেলেই আমাকে বেশী খাটিতে হইবে। খাটুনিও আমার একেবারেই ভাল লাগিত না। এইরূপ এক দিন নয়, দুই দিন নয়, তিন বৎসর ধরিয়া অনাহারে জীর্ণ বস্ত্রে অসহ্য ক্লেশে তাহার কাটিয়া গেল। তাহার পর তাহার শরীরে রোগ প্রবেশ করিল, বড় লোকের মেয়ে কখনও কষ্ট পাওয়াত অভ্যাস ছিল না। তবু যে আমার মুখের দিকে চাহিয়া সব সহ্য করিয়াছিল তখন তাহা বুঝিতে পারি নাই। তাহার যেমন রোগ বাড়িতে লাগিল আমারও তেমনি আলস্য বাড়িতে লাগিল। আমি যে কলে কাজ করিতাম সে কলের সকলেই আমাকে তিরস্কার করিত, আমার তাহা ভাল লাগিত না। অবশেষে সাহেব আমাকে জবাব দিল। আমিও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম, ছটু শুনিয়া কত কাকুতি মিনতি করিয়া আবার কাজে যাইতে বলিল, কিছুতেই শুনিলাম না। আমি আবার গেলেই সাহেব আমাকে লইত, কিন্তু সে মতি আমার থাকিলে ত? কিন্তু কাজের হাত এড়াইয়া যে শান্তি পাইলাম, বাড়ীর ঘ্যাণোর ঘ্যাণোর শুনিয়া তাহার চতুর্গুণ বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। শেষে ছটু আমাকে এক কথা বলিলে আমি যাহা মুখে আসিত তাহাই বলিয়া দিতাম। সে কখনও কাঁদিত, কখনও রাগ করিত, কখনও পায় ধরিত। তখন আমার চৈতন্য হয় নাই। আমি গরীবের ছেলে, সেই ভাল মানুষের মেয়েকে অত সহজে পাইয়া ছিলাম, তাই তাহার গৌরব বুঝি নাই। সে আমাকে বাঁদীর ন্যায় সেবা করিত, আর আমি সব ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, সে আমারই জন্য সব ত্যাগ করিয়া শেষে আমারই হাতে এত কষ্ট পাইতেছে। এক দিন সকাল বেলায় মেয়েটী ক্ষুধায় কাঁদিতেছিল, তাহার আগের রাত্রে আমাদের অন্ন জুটে নাই। ছটু মেয়েটীর হাত খানি ধরিয়া আমার সম্মুখে আনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'একবারটী বাছার মুখের দিকে চাও, এ যে না খাইয়া মরিবে একবার তাহা ভাবিয়াছ কি? সাহেবের হাত পায় ধরিয়া বলিলে এখনও তিনি শুনিবেন।" আমার মেয়ে ক্ষুধার জন্য চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ছিল, আমার অপমান বোধ হইল। রাগে অন্ধ হইয়া গেলাম, মেয়েটীকে মারিতে লাগিলাম। ছটু বাঘিণীর মত ছুটিয়া আসিল, তাহাকেও ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিলাম। তাহার গায়ে সেই প্রথম হাত তুলিলাম। দুজনে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। আমি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলাম।

"সমস্ত দিনমান পথে পথে ঘুরিলাম। সন্ধ্যা হইলে একবার বাড়ী ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু অভিমান আসিয়া উপস্থিত হইল। তবুও কতদূর গেলাম, দেখিলাম আমার গৃহে দীপ জলিতেছে, আবার ফিরিলাম। অনেকক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া শেষে গঙ্গার চাতালের উপর গিয়া বসিলাম, ছেলে বেলার কত কথা মনে পড়িতে লাগিল। গঙ্গার জলে জোছনা ঝিকমিক করিতে ছিল। মনে পড়িল এমনই এক জোছনা রাত্রে আমাদের প্রথম দেখা। আর আজ এই গঙ্গার জলে ডুবিতে পারিলে যেন শরীরটা জুড়াইত। একদিন ত মরিতে বসিয়াছিলাম, সেদিন ছটু আমার প্রাণ বাঁচাইয়াছিল, আর আমি আজ তাহাদের ভুলিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। ক্ষুধায় কাতর একটি শিশু মেয়েকে ফেলিয়া আসিয়াছি,

এই চিন্তা তখন মনে হইতে লাগিল। মাথা ঝিম ঝিম করিতেছিল। আর ইতস্ততঃ না করিয়া বাড়ীর দিকে ছুটিলাম। আমার ঘরে তখনও প্রদীপ জ্বলিতেছিল। মেঝেয় একটা শপের উপর ছটু মেয়েটীকে বুকের উপর করিয়া শুইয়া আছে—পাছে মেয়েটী জাগিয়া ক্ষুধার জন্য আবার কাঁদিয়া উঠে। কিন্তু ছটুর মুখের দিকে হঠাৎ চোখ ফিরাইয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার সর্ব্বশরীর যেন হিম হইয়া গেল। তাহার মুখে যেন কালি মাখিয়া দিয়াছিল। গণ্ড বাহিয়া ফেন পড়িয়াছে, চক্ষু চালের দিকে স্থাপিত। আমি দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলাম। মেয়েটীকে ছাড়াইয়া লইতে গিয়া দেখি মায়ের যে দশা, মেয়েরও সেই দশা। জীবনে অত কষ্ট দিয়াছি বলিয়া তাহার আদরের মেয়েকে আমার কাছে রাখিয়া যাইবে বিশ্বাস হয় নাই। তাই সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। আমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। আমার হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া যাইতে চাহিল। কিন্তু চোকে এক বিন্দুও জল আসিল না। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া শেষে উঠিয়া দরজায় খিল দিয়া আসিলাম। সেই শপের উপর তাহাদের দুজনকে একবার জন্মের মত কোলে লইয়া আমি শুইয়া পড়িলাম। মনে করিলাম যদি তাহাদের সঙ্গে যাইতে পারি, কিন্তু আমার মত পাপীর ইচ্ছা কি পূর্ণ হয়? অত দুঃখের মধ্যেও আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। যখন চৈতন্য হইল তখন দেখিলাম আমার শিয়রে দুজন পাহারাওয়ালা, আমার হাতে হাতকড়ি, দরজা ভগ্ন, প্রদীপ জ্বালা রহিয়াছে। বেড়ার মধ্য দিয়া রৌদ্র ঘরে আসিয়াছে।

পুলিশের কাছে আমি বলিলাম যে আমিই ইহাদিগকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছি। দায়রায়ও সেই কথা বলিলাম। সত্য সত্যই আমি তাহাদের মৃত্যুর কারণ, আমার শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু ফাঁসি হইল না। আমার দ্বীপান্তর হইল। দশ বৎসর সেইখানে ছিলাম তারপর আমাকে কলিকাতায় আনিয়া ছাড়িয়া দিল। কিন্তু জেলই বা কি? আর খালাসই বা কি? আমার সবই সমান। একবার সেই বাড়ীর সন্ধান করিয়াছিলাম। কিন্তু চিনিতে পারিলাম না। অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। যখন জেলে ছিলাম তখন ইট ভাঙ্গাই আমার কাজ ছিল। দুপর রোদ্রে ইট ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া আমার শরীর চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমার উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে কি বাবু? এখন আর কোন কাজই করিতে পারি না। যেখানে ইট ভাঙ্গার কাজ পাই সেইখানেই যাই—বাবু আমার দুঃখের কথা শুনিয়া কি হইবে? যে পাপ করিয়াছি শত জন্ম এমন করিয়া খাটিলেও তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।"

বৃদ্ধের কথা শুনিয়া আমি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না। তাহার এই মর্ম্মস্পর্শী ইতিহাস, এই তীব্র যন্ত্রণা আমার হৃদয়ে অনন্ত তরঙ্গ তুলিয়া দিল। কত কি ভাবিতে লাগিলাম। জানালার দিকে ফিরিয়া চাহিলাম—তখন শ্রান্ত রবির শেষ কিরণ রেখা উচ্চ সৌধশির হইতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। আকাশে যেন নীল ঢালিয়া দিয়াছে, আর শুভ্র মেঘের পরিবর্ত্তে লাল লাল ছোট ছোট মেঘ খণ্ড আকাশের নীল পটে নানা মূর্ত্তি গড়িতেছিল।—আর ইটের উপর বসিয়া বৃদ্ধ আপন মনে তখনও ইট ভাঙ্গিতেছিল।

শ্রীখগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র।

সাহজাহান বাদসাহের দৈনিক জীবন। *

"রাজাগণের মধ্যে যিনি সূর্য্য স্বরূপ (অর্থাৎ সম্রাট), যিনি রাজ্যের পক্ষে স্নিগ্ধ উজ্জ্বল জ্যোতিদায়ক চন্দ্রমারূপী, অথবা যিনি পৃথিবীর অতি প্রাচীনকালের গৌরবান্বিত বাদসা জাম্‌সিদের (১) ন্যায় অসীম শক্তি-সম্পন্ন—সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতা তাঁহার গৌরব ও জ্যোতিঃ আরও উজ্জ্বলিত করুন।"

(মঙ্গলাচরণ)

প্রভাতের কর্ত্তব্য।

* * উষার আলোক সম্যকরূপে পরিস্ফুট হইবার পূর্ব্বে সাহান-সা, সাহজাহান, শয্যা ত্যাগ

---

* মূল পারসী গ্রন্থের প্রথম বঙ্গানুবাদ। মূল পারসী গ্রন্থে অনেক বর্ণনার আড়ম্বর ও শব্দ-বিন্যাস কৌশল আছে। আমরা ইহার যথাযথ অনুবাদ না করিয়া আবশ্যক মত প্রয়োজনীয় স্থান গুলি বাছিয়া লইয়াছি। যাহা ত্যাগ করিয়াছি—সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাহা নীরস।

(১) মুসলমান শাস্ত্র মতে জামসিদ পৃথিবীর চতুর্থ বাদসা—লেখক

করিয়া মুখ প্রক্ষালনাদি করিতেন। কৃতশৌচ হইয়া তিনি খোদাতাল্লার নিকট প্রার্থনা করিয়া কৃতার্থমন্য হইতেন; প্রার্থনান্তে স্থিরচিত্তে, পরিষ্কার স্বরে, মুসলমানের মহা পবিত্র গ্রন্থ "কোরাণ" পাঠ করিতেন। কোরাণের শ্লোকগুলি তিনি অতি সুন্দররূপে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। এইরূপে তাঁহার উষাকৃত্য সমাপ্ত হইত। তাঁহার দান অসীম, তাঁহার হৃদয় অতি উদার, কাজেই দিবালোক বিকশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার ভাণ্ডার সাধারণের জন্য উন্মুক্ত হইত। সুস্বাদু সুপরিপক্ক ফল, সুমিষ্ট মদিরা, নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রভৃতি আশ্রিত আমীর ওমরাহ ও দরিদ্রগণের মধ্যে বিতরিত হইত। ফলসমূহের মধ্যে—বালখের খরমুজা, কাশগর ও গৌড়ের নানাবিধ কুল, "ছক্সী" ও "সাহেবী" জাতীয় আঙ্গুর, সমরকাণ্ডজাত নানাবিধ সুমিষ্ট ফল, ইবেজ ও জেলাবাদের বেদানা, গুজরাটের সুমিষ্ট আম্র, কাশ্মীরের তরমুজ, কমলালেবু আনারস, ইক্ষু, নানা জাতীয় তোরেন্দ ও তুঁদফল প্রভৃতি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক সুবার উৎকৃষ্ট ফলসমূহ প্রত্যহ তাঁহার দরবারে প্রেরিত হইত। রাজকীয় উদ্যান সমূহ হইতেও অনেক সুমিষ্ট ফল আসিত। পদমর্য্যাদা অনুসারে রাজকুমার, আমীর ওমরাহদের মধ্যে এই সমস্ত রসনাতৃপ্তিকর দ্রব্য, স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্রে বিতরিত হইত। গ্রীষ্মকালে—বহুদূর হইতে আনীত বরফও সকলে পদমর্য্যাদানুসারে পাইতেন।

ঝরোকা-দর্শন।

মোগল বাদসাহদিগের চিরন্তন প্রথানুসারে—বাদসাহ প্রতিদিন "ঝরোকায়" (ক্ষুদ্র দ্বার) সাধারণকে দেখা দিতেন। বাদসাহকে দেখিবার জন্য প্রতিদিন অসংখ্য লোকের সমাগম হইত। রাজা আমীর ওমরাহ, দরিদ্র, ভিখারি কাহারও পক্ষে এই সময়ে সম্রাট-দর্শনে বাধা ছিল না। সাজিহানাবাদ (দিল্লী), আকবরাবাদ (আগরা) ও লাহোরের রাজপ্রাসাদ সমূহে, এইরূপ দর্শন দিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল। নদী তীরে উন্মুক্ত ক্ষেত্রে, অসংখ্য প্রজাবৃন্দ সেই প্রাতঃকালে সমবেত হইয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিত। এই সময়ে হস্তীযুদ্ধ প্রভৃতি নানাবিধ ক্রীড়া, কৌতুকও প্রদর্শিত হইত। বাদ্যকরেরা নিয়মিত সময়ে উপস্থিত থাকিয়া শ্রবণরঞ্জন সুমধুর স্বরনিক্বণে দিক্‌বলয় প্রফুল্লিত করিত। দেশের অতি দীন দরিদ্র প্রজা, এই সময়ে সম্রাটের সাক্ষাৎকার লাভ করিত। এবং কাহারও কোন আবেদন, অভিযোগ থাকিলে, সে সেই ক্ষেত্রে বাদসাহের নিকট তাহা দিতে পারিত।

ঝরোকা-খাস্-ও-আম্।

রাজ্যের ও অপরিমিত সৌভাগ্যের সূর্য্যস্বরূপ—ঈশ্বরের ছায়া স্বরূপ, বিশ্বের আশ্রয় স্বরূপ, মহা প্রতাপান্বিত বাদসাহ ঝরোকা দর্শনের কার্য্য সমাপনান্তে, ঝরোকা খাস্-ও-আমে, আগমন করিতেন। (২)

ঝরোকার পশ্চাতে বাদ্যকর সম্প্রদায় অপেক্ষা করিত। বাদসাহ সভায় আগমন করিবার সময়—সেখান হইতে দামামা বাজিয়া উঠিত। বাদসাহ "খাস্-আমে' উপস্থিত হইলে—সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার সম্মুখ দিয়া দলবদ্ধ অশ্বসাদিগণ তীরের ন্যায় বেগবান অশ্বে আরোহণ করিয়া চলিয়া যাইত। তাহার পশ্চাতে হস্তীচালকেরা সুশিক্ষিত, সুচিত্রিত, রত্নাদিতে বিভূষিত সুবৃহৎ রাজহস্তিগণকে যূথবদ্ধ করিয়া লইয়া যাইত। ইহার পর—রাজকুমার ও রাজবংশীয়গণ সম্রাটের রত্নময় সিংহাসনের নিকট উপবেশনের জন্য আদিষ্ট হইতেন। তৎপরে, ইরাণ ও তুরাণের প্রধান প্রধান খাঁ সাহেবেরা * ১ মির্জ্জা সাহেবেরা * ২ ওমরাহগণ, রাজমন্ত্রিগণ, সম্ভ্রান্ত উজীরগণ, সাধারণ রাজকর্ম্মচারিগণ—অসিজীবি ও

---

(২) খাস্ (সম্ভ্রান্ত)—আম্—(সাধারণ)—যেখানে সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ লোকে, বিনা বাধায় সমান প্রবেশাধিকার লাভ করিতে সমর্থ।

* (১) পাঠানগণের "খাঁ" ও মোগলদিগের "মির্জ্জা" উপাধি ছিল।—উল্লিখিত বর্ণনা হইতে পাঠক দেখিতে পাইবেন—আমখাসের বিস্তৃত দরবার, জগতের সমস্ত সম্রাটগণের দরবার অপেক্ষা ঐশ্বর্য্যময় ছিল। এই ঐশ্বর্য্যের পরাকাষ্ঠা ও বিচিত্র বিকাশ দেখিয়া রো, করিয়'ট, ফিচ, ফ্রায়ার, বার্ণিয়ার, টাভারনিয়ার ও জেসুট মিশনরীগণ মোহিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে শত শত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা দিল্লী ও আগরার বিস্তৃত "আম খাস" দেখিয়াছেন—তাহার পরিসর ব্যাপ্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছেন—তাঁহারাই বুঝিবেন দিল্লীর বাদসাহের দরবার অপেক্ষা কোন রাজ দরবারই শ্রেষ্ঠ ছিল না। নানা দেশের, নানা শ্রেণীর লোকে এই দরবারগৃহ পরিপূর্ণ থাকিত। অথচ—সামান্য সূচীপতন শব্দও সকলে শুনিতে পাইত। জয়পুর, যোধপুর, বিকানির, যশল্মীর, কোটা, বুঁদী, সেকাবতী, নিমচ প্রভৃতি দেশের মহা প্রতাপান্বিত রাজপুত রাজন্যবর্গ—বড় বড় মোগল পাঠান আমীর ওমরাহ হইতে—দীন হেবী দরিদ্র পর্য্যন্ত এই দরবারে স্থান পাইত। বর্ত্তমান প্রবন্ধের সহিত পাঠক যত অগ্রসর হইতে থাকিবেন, বাদসাহের দৈনিক জীবনের অদ্ভুত কার্য্য কলাপ জানিতে পারিয়া তাঁহারা ততই আশ্চর্য্য হইবেন।

মসীজীবিগণ, বিজয়ী সেনাপতিগণ, এবং সম্রাটের বিশ্বস্ত শরীর-রক্ষিগণ, নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইতেন।

ইহাদের পরে অন্যান্য শরীররক্ষী সেনাগণ, পতাকাধারিগণ, ধনুর্দ্ধারী ও বন্দুকধারী সেনাগণ, পদস্থ সেখ ও সৈয়দগণ, রাজবৈদ্য, রাজসভাসদ ও পণ্ডিতগণ ধীরে ধীরে আসীন হইতেন। তুরস্ক, তেজেক (আরবের সীমা বহিভূত স্থান), আজম (পারস্য), খুদ্দ, তাতার, ইথিওপিয়া (উরস্) সাবকেশিয়া (সরখাস্), মিশর, ইরাক্ প্রভৃতি দেশের অসংখ্য লোক দলবদ্ধ হইয়া আম-খাসের শোভা বৃদ্ধি করিত। এতদ্ব্যতীত লোদি, রোহিলা, খিল্জী, ইউসফ্জী জাতীয় আফ্গান সর্দ্দারগণ, রাণা, রাজা রাও, রায়রায়াঁ প্রভৃতি পদবী বিশিষ্ট রাজন্যবর্গ, রাঠোর শিশোদিয়া কচ্ওয়াহা গৌরস্, চৌহান, ঝালা, চন্দ্রায়ৎ তুয়ার, বর্গুজীর, পুনওয়ার ভাহুহরিয়া, সালেখী, বুন্দেলা, সক্রাওল প্রভৃতি—বিভিন্ন শ্রেণীর রাজপুতগণ এই সভার অলঙ্কার স্বরূপ হইতেন। সাত হাজার হইতে, এক হাজারী মন্সবদার, রাজরাজা ও মধ্য ভারতবর্ষের পার্ব্বত্য প্রদেশের ভুঁইয়াগণ, বাঙ্গালা, মগ (ব্রহ্ম), আসাম, শ্রীনগর, তিব্বত প্রভৃতি করদ ও মিত্ররাজ্য সমূহের জমীদারগণও এই ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতেন। সকলেই নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইতেন। এত লোক সমাগম হইলেও এই বিরাট দরবারে শব্দমাত্র হইত না।

এই দরবারের শান্তি রক্ষার জন্য, মীর তুজেক, ইসাউল প্রভৃতি খিদ্মতীয়া শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণ চারিদিকে স্বর্ণ রৌপ্য মণ্ডিত আশাশোটা—ও নানাবিধ রাজচিহ্ন লইয়া দরবার গৃহের সম্মুখে পাদচারণা করিত। দরবারের বহিঃপ্রাঙ্গণে, এক দল পদাতি সৈন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইয়া অবস্থান করিত। তুরস্কের সম্রাট, ইরাণ ও তুরাণের সর্ব্ব ভাষাবিদ্ রাজদূত সমূহ, বাদসাহের নিকটে যথোপযুক্ত স্থানে আসন পাইত। এতদ্ব্যতীত আর্য্যাবর্ত্তের ও দাক্ষিণাত্যের সামন্ত রাজগণের প্রতিনিধিবর্গ পেশ্কস্ ও উপহারাদি লইয়া সম্ভ্রমে দরবারে উপস্থিত থাকিত। এতদ্ব্যতীত, ইরাণ, খোরাসান, রুম (তুরুস্ক), সিরিয়া, চীন, মে-চীন, খাতিয়া (?) খুতন, তুর্কীস্থান, প্রভৃতি দেশের ও অনেক প্রকাণ্ড দ্বীপপুঞ্জের বড় বড় সওদাগর, ব্যবসায়ী ও সম্পত্তিশালী ব্যক্তিগণ নানাবিধ আশ্চর্য্য উপঢৌকনাদি লইয়া দরবারে



সাহজাহান বাদসাহ।

বাদসাহের আদেশ অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন। উপযুক্ত সময়ে তাঁহারা আদেশ প্রাপ্ত হইলে, নানাবিধ বহু মূল্য মণি রত্ন ও বাণিজ্য দ্রব্যাদি সেই আম খাসের বিস্তৃত দরবারে সাধারণের সমক্ষে প্রদর্শন করাইয়া সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিতেন। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ, দার্শনিকগণ শাস্ত্রাভিজ্ঞ মনীষিগণ, উৎকৃষ্ট লেখক, বক্তা এবং সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণ, কনষ্টাণ্টিনোপল, বসোরা, হামদান, শিরভান সামাকি, জিলান্, মাজেন্দারান, আস্ত্রাবাদ, গুঞ্জে, বারদা, তাব্রিজ, আর্দেবিল, কাজভিল্ কম্, সাওযা, কাসান, তিহারণ, ইযেজ্, ইস্পাহান, শিরাজ, নিশাপুর, মেশেদ্, হিরাট, বাখ্রাজ, কান্দাহার, বাল্খ্ ও বদাক্শান, বোখারা, সমরখন্দ, তিব্বত, কাশগার প্রভৃতি দেশের বীরকান্তি যোদ্ধৃগণ রাজদরবারে কর্ম্ম প্রাপ্তির আশায় উপস্থিত থাকিত।*

এই প্রকাণ্ড দরবারে, কার্য্যের ও গুণের উপযুক্ত পুরস্কার স্বরূপ যোগ্য ব্যক্তিদিগকে মুন্সব্ (জাইগির ও উপাধি) খেলোয়াত, রাজপ্রসাদ স্বরূপ নানাবিধ মণি খচিত পোষাক, স্বর্ণ রৌপ্য মণি মুক্তাদি খচিত নানাবিধ উপঢৌকন দ্রব্য, অশ্ব, হস্তী, সাহানসার তস্বীর প্রভৃতি বিতরিত হইত। এতদ্ব্যতীত জিগা (বর্ম্ম) নানাবিধ

---

* এই সমস্ত দেশের অনেক নাম, আধুনিক ভূগোলে অপরিচিত। তবে যে গুলি আজও চলিয়া আসিতেছে, পাঠক সেগুলি দেখিলেই সহজে বুঝিতে পারিবেন। মুসলমান লেখকেরা অনেক নাম তাঁহাদের নিজ জ্ঞানানুসারে লিখিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ উল্লিখিত নাম গুলি এসিয়ার ও ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের। ইউরোপের মধ্যে এক তুরস্ক ছাড়া আর কাহারও নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। কত দূর দেশবাসী দিল্লীর দরবারে উপস্থিত থাকিত, ঐ নাম গুলিতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

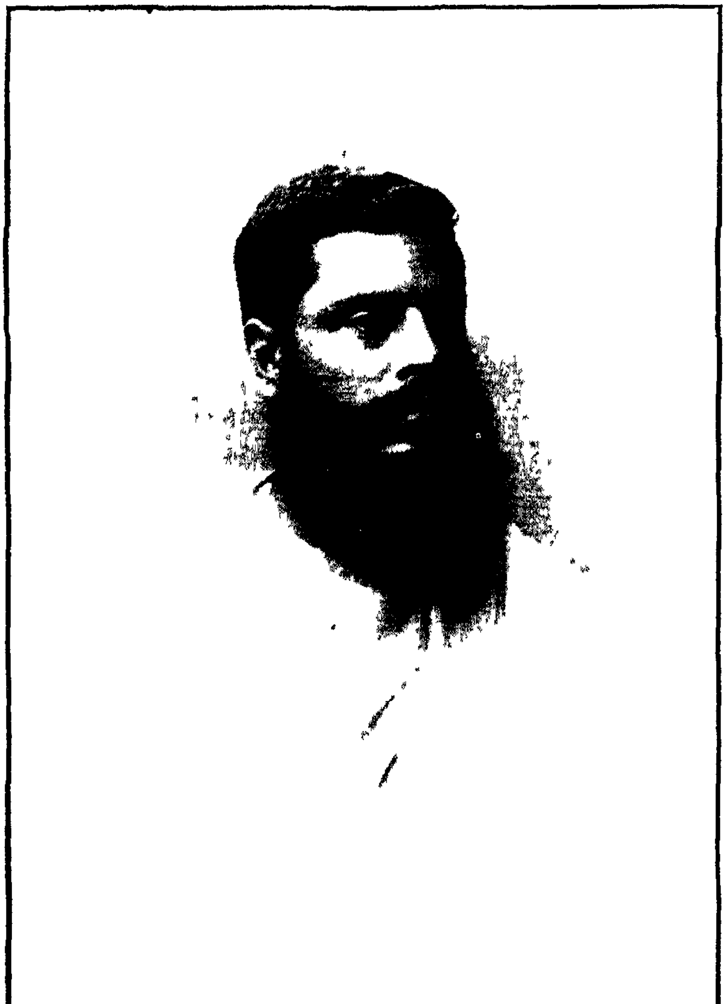
তরবারি, জুবার (খড়্গ) খুঞ্জার (দ্বি-মুখ বিশিষ্ট ছোরা) রাজ পতাকা, দামামা ও অন্যান্য সম্মান চিহ্ন পুরস্কার প্রাপ্তি যোগ্য লোক দিগের মধ্যে বিতরিত হইত। যাঁহারা মনসব্ পাইতেন, প্রথমতঃ তাহাদের "তস্‌লিম্" দিতে হইত। যাঁহারা "রুদ্ররাজ" প্রভৃতি মতির মালা, রত্নবলয়, মুক্তাহার পাইতেন, তাঁহাদের যোড় হস্তে রাজোপহার গ্রহণ করিতে হইত। ইঁহাদেরও তস্‌লিম্‌প্রথা পূর্ব্বরূপ। যাঁহারা কোনরূপ শিরোপা বা পরিচ্ছদ পাইতেন, পাইবার সময় তাঁহাদের চারি বার "তস্‌লিম" করিতে হইত। পোষাক পরিবার পর আবার চারিবার করিতে হইত। অস্ত্রাদি যাহারা পুরস্কার স্বরূপ লাভ করিত, একবার তাহাদের উপহার দ্রব্য হস্তে লইয়া তস্‌লিম করিতে হইত—দ্বিতীয় বার—সেই সমগ্র অস্ত্রাদিতে সুসজ্জিত হইয়া বাদসাহকে সম্মান প্রদর্শন করিতে হইত।

এই দরবারে উপাধি বিতরণ করা হইত। হিন্দু ও মুশলমান দিগের জন্য স্বতন্ত্র উপাধি ব্যবস্থা ছিল। সাহী, সুলতানী, সিপাহি সালারী, খাঁ-খানানী, আমিরি, আমীর উল্‌-ওমরাই, রাজ-গী, (রাজপদ) মহারাজ-গী, রাঁয়া, রায় রাঁয়ানী, প্রভৃতি উপাধি, অবস্থা ও কার্য্য বিচারে উপযুক্ত রাজন্য বর্গ, ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে প্রদত্ত হইত। বিভিন্ন প্রদেশ ও সুবা সমূহের জন্য, কাজি (ফৌজদারি ম্যাজিষ্ট্রেট্) এহ্‌তে সাবৎ (হিসাব রক্ষক), কানুনগোঁ, চৌধুরাই-প্রভৃতি উপাধি বড় বড় জমীদার ও উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে দেওয়া হইত। রক্ষিত রাজ্য সমূহের কিল্লাদার, ফৌজদার, দেওয়ান, আমিন, আমিল, প্রভৃতির নিযোগপত্র বা পরোয়ানা—এই আমদরবার হইতে বাহির হইলে, তাঁহারা নিজ নিজ সুবা, পরগণা, কিল্লা, ও মহলে কার্য্যভার গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেন। যে সকল কর্ম্মচারী সুবা বা মহল হইতে বিদায় প্রাপ্ত হইতেন, এই আমদরবারে সর্ব্ব সমক্ষে তাহাকে কৃতকর্ম্মের বিচারাদি হইত। কার্য্য সমাপনান্তে যে সকল রাজকর্ম্মচারী বিদায় প্রাপ্ত হইত—তাহারা পদমর্য্যাদা, গুণ, ও অবস্থা অনুসারে বাদসাহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভূমি চুম্বন করিত। যাহারা অতিরিক্ত অনুগ্রহলাভে সমর্থবান হইত—বাদসাহ তাহাদের পৃষ্ঠে, হস্তস্পর্শ করিয়া সম্মানিত করিতেন। কখনও কখনও—বাদসাহ ভ্রুভঙ্গি করিয়া, বা করুণাপূর্ণ সহাস্য দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া, কোন কোন আমীর ওমরাহকে সম্মানিত করিতেন। রাজ্য, জমীদারি, বা অর্থাদি সম্বন্ধে সনন্দ পত্র, মন্সব, জাইগীর, মাসিক বৃত্তি, দৈনিক বৃত্তি, সৎকার্য্যে দান খোরাকি-বৃত্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে কাগজ পত্রাদি বাদসাহ দুইবার দেখিয়া দিতেন। মন্সবদার, শান্তিরক্ষক, ফৌজদার, গুপ্ত প্রতিনিধি, প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারীর এই দরবারে বাদসাহকে প্রত্যেক সুবার গোপনীয় ও আবশ্যকীয় সংবাদ সমূহ প্রদান করিতেন। অবাধ্য জমীদার ও প্রজাদের বিদ্রোহ দমন, রাজ্যের শাসন ও বিচার বিভাগের ন্যায্য বিচার বিতরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে আদেশ, এই দরবার হইতে দেওয়া হইত। রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মচারিগণ, কর সংগ্রাহক ও হিসাব রক্ষকগণ, দেওয়ানগণ রাজকার্য্যের সাধারণ তত্ত্বাবধারকগণ,—সকল বিভাগ হইতে আসিয়া এই আসমুদ্র বিস্তৃত রাজ্যের—কার্য্যাদি সম্বন্ধে সমস্ত কথাই লিখিত আরজী দ্বারা বাদসাহের গোচরীভূত করিত ও এতদ্‌সম্বন্ধে তাঁহার আদেশ পাইয়া কৃতার্থ্যমন্য হইত। রাজ্যসম্বন্ধে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত রাজকার্য্যই—সাহানসার সূক্ষ্ম মনোযোগ আকর্ষণ করিত। সকল কথাই তাঁহার শ্রবণপথে উঠিত—সমস্ত ঘটনাই তিনি নিজে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া যথাযথ আদেশ দিতেন। মদদে মাআস্ (সাধু ও ফকিরদের জন্য বৃত্তি) মিল্‌কিয়েৎ (নিস্বত্বে দান) আলতুমঘা (সম্মানার্থে দান) প্রভৃতি সম্বন্ধে সমস্ত আবেদন পত্র মদরুস্-সদবের (সদর ফৌজদারির বিচারক —বা শেসন জজ) মারফৎ প্রেরণ করিতে হইত। এগুলির আদ্যোপান্ত বিচার করিয়া বাদসাহ—নিঃস্ব, প্রজা সাধারণ ও পণ্ডিতদের জন্য দান ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

---

* মোগল রাজত্বের-বিস্তৃতি ও পরিমাণ বড় অল্প ছিল না। ধরিতে গেলে সমগ্র হিন্দুস্থানই বাদসাহের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে ছিল। বাদসাহগণ এক পক্ষে যেমন বিলাসী ও ভোগ সুখপরায়ণ ছিলেন, বৈজয়ন্তী ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও তাঁহারা রাজ কার্য্যে আদৌ অমনযোগী হইতেন না। ভোগ বিলাসের ও রাজ কার্য্যের সময় বিভিন্ন করা ছিল। রাজ্যের সামান্ত ঘটনাটী—সামান্ত সংবাদটী, সামান্ত কার্য্যটীর দিকে—বাদসাহের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। আমরা জাঁহাগীর সাজাহান প্রভৃতি বাদসাহকে এ পর্য্যন্ত ভোগ সুখনিরত নরপতি বলিয়াই জানিতাম, কিন্তু উপরোক্ত ঘটনা গুলিতে আমাদের সে বিশ্বাস টলিয়াছে।

২৩ নং, স্কট্‌স্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত ও ২০৮।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত।



শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ।

KUNTALINE PRESS.



চতুর্থ ভাগ। } চৈত্র, ১৩০৭। { ৪র্থ সংখ্যা।

প্যারীচাঁদ মিত্র।

(টেকচাঁদ ঠাকুর)

পিতা ও পিতামহের পরিচয়।

প্যারীচাঁদ মিত্রের পিতামহ গঙ্গাধর মিত্র কলিকাতার বিখ্যাত ধনী রামদুলাল দেব কারবারের অংশীদার ছিলেন, নিমতলা ষ্ট্রীটে এখনও ইঁহার শিবমন্দির দৃষ্ট হয়। গঙ্গাধরের পুত্র রামনারায়ণের সঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল এবং রামনারায়ণ স্বয়ং কাব্যানুরাগী ও সুকবি বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি রাধামোহন সেনের সহিত একত্র ভাবে "সঙ্গীততরঙ্গিণী" নামক কাব্য প্রণয়ন করেন, সেকালে এই পুস্তক খানির বিশেষ আদর হইয়াছিল।

ছাত্র জীবন।

রামনারায়ণের চতুর্থ পুত্র প্যারীচাঁদ ১৮১৪ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে কলিকাতাস্থ নিমতলা-ভবনে জন্ম গ্রহণ করেন। কতকদিন পড়া শুনার পর (১৮২৯ খৃঃ অঃ) তিনি হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন; সেখানে প্রথমতঃ উচ্চারণদোষ ও গ্রাম্যতার জন্য ইঁহাকে বড় লাঞ্ছনা পাইতে হইয়াছিল; কিন্তু অল্প কালের মধ্যেই ইঁহার তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও বিদ্যানুরাগ সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়া পড়ে। স্যার জন পিটার গ্রাণ্ট হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে তাঁহার নির্ব্বাচিত বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনার জন্য একটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন, প্যারীচাঁদ সহাধ্যায়ী দিগম্বর মিত্র ও অপরাপর প্রতিভাশালী ছাত্রগণকে পরাজিত করিয়া তাহা লাভ করেন। প্রথম শ্রেণীতে পাঠের সময় তিনি ১৬৲ টাকার মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তাঁহার চিন্তাশীলতার সুখ্যাতি করিয়া অধ্যাপক ডাক্তার টাইটলার সাহেব তাঁহাকে সেই অল্প বয়সেই "দার্শনিক" আখ্যা দান করিয়াছিলেন। এস্থলে বলা উচিত, প্যারীচাঁদ অঙ্কশাস্ত্রের অনুশীলনে তাদৃশ মনোযোগী ছিলেন না।

সংসারে প্রতিপত্তি।

পাঠ ত্যাগের পর প্যারীচাঁদ কলিকাতা পাব্লিক লাইব্রেরীর ডিপুটি লাইব্রেরিয়ান পদ গ্রহণ করেন (১৮৩৫ খৃঃ) এবং অল্প দিন পরেই তিনি লাব্রেরিয়ানের পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে তিনি যখন স্বেচ্ছায় এই পদ ত্যাগ করেন, তখন লাইব্রেরির অবস্থা



৺প্যারিচাদ মিত্র।

অতীব সন্তোষকর ছিল। এই কারণে তাঁহাকে রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টাও হইয়াছিল। এই পাঠাগারে প্যারীচাঁদ শুধু কর্ত্তব্য পালন করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করেন নাই, তিনি অধ্যয়নের প্রচুর সুবিধা পাইয়া নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। লাইব্রেরিয়ানের পদত্যাগ করিয়াও তিনি লাইব্রেরীর সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করেন নাই। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি ইহার অবৈতনিক সম্পাদকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। কালাচাঁদ শেঠ ও তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া প্যারীচাঁদ কারবার আরম্ভ করেন; ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জনও করিয়াছিলেন। সাহেব মহলে তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও সত্যপরায়ণতার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। বহুসংখ্যক বিদেশী কোম্পানী তাঁহাকে তাঁহাদের ডাইরেক্টার মনোনীত করিয়াছিলেন, বিদেশীয় বণিক্ সম্প্রদায় তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। স্যার এডোয়ার্ড র‍্যান এবং ক্যামিরণ সাহেব তাঁহাকে সরকারী চাকুরী (প্রসন্নকুমার ঠাকুর ছাড়িয়া দিলে—সরকারী মেম্বরের পদ) গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্যারীচাঁদ তাহাতে সম্মত হন নাই।

সভা সমিতি ও লোক হিতকর অনুষ্ঠান।

সে কালে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সভা সমিতি স্থাপনের চেষ্টা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইত। সুপ্রসিদ্ধ রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দিগম্বর মিত্র প্রভৃতি মহোদয়গণ সাধারণের হিতকর অনুষ্ঠানে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতেন; প্যারীচাঁদ মিত্র এই দলের একজন অগ্রণী ছিলেন। ১৮৩৭খৃঃ অব্দে তিনি বাগ্মী জর্জ্জ টমসনের সহযোগে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি সংস্থাপিত করেন। প্যারীচাঁদ এই সভার সম্পাদকের পদে বরিত হন। 'পশুর প্রতি অত্যাচার-নিবারণী' সভার অনুষ্ঠাতৃগণের মধ্যে তাঁহার নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। কোলেশ ওয়ার্দি গ্রাণ্ট সাহেবের মৃত্যুর পর তিনি সেই সভার সম্পাদক হন। মেটকাফ্ হলের জন্য চাঁদা আদায় করিতে যাইয়া প্যারীচাঁদ দিবা রাত্রি কঠোর শ্রম করিয়াছিলেন। তিনি বেথুন সোসাইটির প্রথম সম্পাদক এবং হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ প্রতিষ্ঠিত সভার স্থাপয়িতা ছিলেন। এতদ্ব্যতীত বেঙ্গল সায়েন্স এসোসিয়েসন, সোসাইটি ফর্ দি একুইজিসন অব্ জেনারেল নলেজ, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, প্রভৃতি বহু সংখ্যক সভা সমিতির সভ্যরূপে প্যারীচাঁদ অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সহিত সাধারণের হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। লর্ড ডালহাউসির সময় একবার পুলিসের অত্যাচার সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় এবং দেশীয় ব্যক্তিগণের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। সেই সময়ে প্যারীচাঁদ নির্ভীকভাবে পুলিসের অত্যাচার কাহিনী প্রচারিত করিয়া সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা এবং অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৬৭ খৃঃ অব্দের জুন হইতে ১৮৭০ খৃঃ অব্দের জুন পর্য্যন্ত তিনি মাননীয় ছোট লাট বাহাদুরের সভার অন্যতম সদস্য ছিলেন।

পত্রিকার প্রবন্ধ লেখা এবং গ্রন্থ রচনা।

প্যারীচাঁদ, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সহযোগে 'জ্ঞানান্বেষণ' এবং রাম গোপাল ঘোষ ও রসিক কৃষ্ণ মল্লিকের সাহায্যে "বেঙ্গল স্পেক্টেটর" নামক সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম "মাসিক পত্রিকার" প্রকাশক। এই পত্রিকার মুখপত্রে লিখিত থাকিত—"এই পত্রিকা সাধারণের, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের জন্য ছাপা হইতেছে। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই"। প্যারীচাঁদ

'ইংলিশম্যান,' 'বেঙ্গল হরকরা,' 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড', 'কলিকাতা রিভিউ' এবং আমেরিকার 'দি ব্যানার অব লাইট' প্রভৃতি পত্রের নিয়মিত লেখক ছিলেন। কলিকাতা রিভিউ পত্রে "প্রজা ও জমিদার" সম্বন্ধে তিনি যে প্রবন্ধ লিখেন, তাহা লর্ড এলবোমারল কর্ত্তৃক পার্লিয়ামেণ্টের হাউস অব্ লর্ডস্ সভায় বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়া আলোচনার বিষয় হইয়াছিল।* তাঁহার রচিত বহু সংখ্যক ইংরাজী পুস্তক ও প্রবন্ধ আমরা দেখিয়াছি; তন্মধ্যে হেয়ার সাহেবের জীবনী, রামকমল সেনের জীবনী, 'ধর্ম্ম বিষয়ক প্রস্তাবাবলী' প্রভৃতি পুস্তক সারগর্ভ ও তৎকালে বিশেষরূপে আদৃত হইয়াছিল। এই সকল পুস্তকে প্রসঙ্গক্রমে সেকালের যে সকল সামাজিক চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা অতীব কৌতূহলকর এবং শিক্ষাপ্রদ। আমরা প্যারীচাঁদের বাঙ্গলা গ্রন্থাবলীর বিস্তারিতভাবে আলোচনা পরে করিব।

প্যারীচাঁদ কারবার করিয়া প্রায় দশ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন

চরিত্রে শান্তভাব।

করিয়া লন। কিন্তু শেষ বয়সে বিস্তর
ক্ষতিও হইয়া অর্থ কষ্টে পতিত হন।
প্যারীচাঁদ মিত্র অর্থশালী ... াং যেরূপ ছিলেন, অর্থশূন্য
অবস্থাতেও তদ্রূপ ছিলে ... তাঁহার শান্ত সমাহিত চিত্তের
প্রসন্নতা কখনও নষ্ট হয় ... াই; তাঁহার নীতি ও চরিত্র
সাংসারিক আলোক ও চ ... র সহিত সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকিয়া
স্বীয় পুণ্য কর্ত্তব্য পালনে ... পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। উদরী
রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়; ত ... কবার তাঁহার উদরে ছিদ্র করিয়া
জল বাহির করিয়া দিতে ... য়াছে, সে কষ্টও তিনি প্রশান্ত-
চিত্তে সহ্য করিয়াছেন। ... ার অব্যবহিত পূর্ব্বে উদরে ছিদ্র
করিবার সময়েও তিনি ... াস্য বদনে বলিয়াছিলেন, "দেখ
কি? আমার পেট হইতে ... া বরুণদেব বাহির হইতেছেন।"
এরূপ চরিত্রে দয়া এ ... ঔদারতা কিয়ৎ পরিমাণে স্বতঃ-
সিদ্ধ ... । একদা তাঁহার বাটীর চাকরের

দয়া।

অসুখ ... য়াছিল। এদিকে প্যারীচাঁদকে
বাটীর সকলে সারারাত্রি ... য়া শ্রান্ত হইল; পরদিন জানা
গেল, রুগ্ন ভৃত্যটির পাশে ... য়া কর্ত্তা সারারাত্রি কাটাইয়া-
ছেন। পাঠত্যাগের পর ... গ্রামে তিনি এক অবৈতনিক
স্কুল স্থাপিত করিয়াছিলে ... প্রসিদ্ধ ডিরোজিও এবং হেয়ার
সাহেব এই স্কুলটি পরি ... ন করিয়া তাঁহাকে উৎসাহ দান
করিতেন। ১৮৬৬—৬৭ খৃঃ অব্দে দুর্ভিক্ষের সময় প্যারীচাঁদ নিজের বাটিতে অন্নছত্র খুলিয়াছিলেন।

১৮৬০ খৃঃ অব্দে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ ঘটে। এই দুর্ঘটনার

ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস।

পর তাঁহার হৃদয় গভীর তত্ত্বজিজ্ঞাসু এবং ধর্ম্ম-প্রসঙ্গে একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়ে। ক্রমশঃ তিনি তত্ত্ববিদ্যার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হন। ম্যাডাম ব্লাভাটস্কি এবং কর্ণেল অল্‌কটের সহিত তাঁহার সর্ব্বদা চিঠি পত্র চলিত। প্যারীচাঁদকে বর্ত্তমান কালের তত্ত্ববিদ্যার প্রসিদ্ধ অধিনায়কগণ কিরূপ গভীর শ্রদ্ধা এবং প্রীতি করিতেন, তাহা সেই সকল পত্র পড়িলে জানা যায়। ঈশ্বরোপাসনায় তিনি সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকিতেন। এই ধর্ম্মপ্রাণতা তাঁহার পরবর্ত্তী রচনায় সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। তিনি জন্মান্তর মানিতেন না।* তাঁহার বিশ্বাস ছিল—এই নশ্বর বপু ত্যাগ করিয়া আত্মা জ্যোতিঃবিমণ্ডিত অধ্যাত্ম জগতে আরোহণ করে; সে স্থানে ক্রমে ক্রমে সে শোক দুঃখাতীত চির-প্রসন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। মৃত স্বজনবর্গকে আবার সে স্থলে ফিরিয়া পাওয়া যায়। "সংকিঞ্চিৎ" নামক পুস্তকে তিনি কোন পুত্র শোকাতুরা জননীকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় হৃদয়ের বিশ্বাসানুসারে সান্ত্বনাস্থলে এই কথা বলিয়াছেন—"মা! উত্থান কর। শান্ত ও সমাহিত হও। বিয়োগ ক্ষণিক, সংযোগেই দীর্ঘকালের জন্য। যে কিছু পদার্থ ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে, কত শীঘ্র তাহা সংযুক্ত হইতেছে। সংযোগেতেই এই অনন্ত সৃষ্টি নিয়োজিত হইতেছে। কোটী কোটী পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতেছে ও ঐ সকল পুষ্পের রেণু বায়ুদ্বারা সহস্র সহস্র ক্রোশান্তরে প্রেরিত হইতেছে, তথাচ ঐ রেণু সকল যে পুষ্পকে ফলবান করিতে পারে, তাহাতেই বায়ু দ্বারা আবার সংযুক্ত হইতেছে। যখন সেই প্রেমাধার পুষ্পরেণুর প্রেম পরিতৃপ্ত করিতেছেন, তখন তুমি কি নয়নবারি প্রদান করিয়া সান্ত্বনা বারি পাইবে না? তোমার পুত্র জন্য স্নেহ, প্রেম ও রোদন কি ব্যর্থ হইবে? তুমি অবশ্যই আপনার অঞ্চলের ধন পাইবে।"

* London Times, 5 ... uly, 1853.

* The light which we in modern India, have received, inclines us not to accept the doctrine of transmigration or reincarnation, because we know psychically through our own souls, that progression in the spirit land is more natural and more to the advantage of the spirits, than progress through transmigratory existences.

Spiritual stray leaves. P. 37.

প্যারীচাঁদ মিত্র যোগের অসাধারণ ক্ষমতায় বিশ্বাস করিতেন। অদৃশ্যদর্শন, শূন্যে আরোহণ প্রভৃতি তাঁহার নিকট সম্ভবপর বোধ হইত। এমন কি তিনি লিখিয়াছেন যে, বহুসংখ্যক ভূতযোনির সঙ্গে তিনি কথাবার্ত্তা কহেন ও তাহারা সর্ব্বদা তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বাস সুদৃঢ় করে।*

মৃত্যু এবং স্মারক চিহ্ন ও প্রবন্ধাদি।

শেষ বয়সে প্যারীচাঁদ ধর্ম্মজীবনের কঠোর অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, মৎস্য মাংসাদি ছাড়িয়া দিয়া দিবা রাত্রি ঈশ্বরোপাসনা এবং ধর্ম্মকার্য্যে নিরত হন। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দের ২৩শে নবেম্বর তিন পুত্র† ও এক কন্যা রাখিয়া উদরী রোগে প্যারীচাঁদ ইহ সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। প্যারীচাঁদের মৃত্যুর পর ইংরাজ ও বাঙ্গালী একত্র সম্মিলিত হইয়া তাঁহার জন্য শোকপ্রকাশার্থ কয়েকটি সভা আহ্বান করেন; মেটকাফ্ হলে তাঁহার একখানি সুন্দর তৈলচিত্র রক্ষিত হইয়াছে এবং টাউনহলে তাঁহার প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। বহুসংখ্যক সাহেব প্যারীচাঁদের প্রসঙ্গ লইয়া সংবাদ পত্রে লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে পাদ্রি ডল সাহেবের প্রবন্ধটি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। প্যারীচাঁদ ডল সাহেবের গির্জ্জায় উপাসনা শ্রবণার্থ যাইতেন, কিন্তু একদিন ডল সাহেব খ্রীষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলাতে প্যারীচাঁদ আর সেই গির্জ্জায় যান নাই। উদারচরিত পাদ্রি সাহেব এই ঘটনায় প্যারীচাঁদের বিশ্বাস ও সৎসাহসের প্রশংসা করিয়াছিলেন।

তৎপ্রণীত বাঙ্গলা গ্রন্থাবলী।

আমরা এ পর্য্যন্ত প্যারীচাঁদ প্রণীত বাঙ্গলা গ্রন্থাবলীর উল্লেখ করি নাই। তাঁহার ইংরাজী ভাষায় প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি, তদ্রচিত বহু সংখ্যক উৎকৃষ্ট ইংরেজী পুস্তক ও প্রবন্ধ, সাধারণের হিতার্থ জীবনব্যাপী অধ্যবসায়, এমন কি তাঁহার সাধু চরিত্রের কথাও ধীরে ধীরে বিস্মৃতির অঙ্কে নিমগ্ন হইতে চলিয়াছে; কিন্তু তিনি বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের যে উন্নতি সাধন করিয়াছেন—তাঁহার 'আলালী' ভাষার গৌরব তাঁহার কণ্ঠে যে অমর যশোমাল্য প্রদান করিয়াছে, তাহা স্বতন্ত্রভাবেও বিস্তৃতরূপে উল্লেখযোগ্য। তৎপ্রণীত বাঙ্গলা পুস্তকগুলির মধ্যে "আলালের ঘরের দুলালই" সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এই পুস্তকে তিনি নিজের নাম গোপন করিয়া "টেকচাঁদ ঠাকুর" নাম অবলম্বন করিয়াছিলেন। "আলালের ঘরের দুলালের" ইংরেজী অনুবাদক G. D. Oswell সাহেব এই নামে প্রতারিত হইয়া গ্রন্থকারের জীবনী খুঁজিতে ঠাকুর বাবুদের বাড়ী ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন। "আলালের ঘরের দুলাল" ছাড়া প্যারীচাঁদ মিত্র "অভেদী," "কৃষিপাঠ", "যৎকিঞ্চিৎ" "বামাতোষিণী", "রামারঞ্জিকা" "আধ্যাত্মিকা" প্রভৃতি অনেকগুলি পুস্তক বাঙ্গালায় প্রণয়ন করেন।

পূর্ব্বকালের রচনায় পদ্যের প্রতি অনুরাগ।

অনেকের বিশ্বাস, রাজা রামমোহন রায়ই বাঙ্গলা গদ্যের প্রবর্ত্তক। একথা আংশিকভাবে সত্য। পদ্য অপেক্ষা গদ্যই যে কতকগুলি বিষয় রচনার বেশী উপযোগী, ইহা ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিগণই প্রথম উপলব্ধি করেন; রাজা রামমোহন রায় ইঁহাদের অগ্রণী। পূর্ব্বে ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্কের সূত্র, চিকিৎসা গ্রন্থ, এমন কি অভিধান পর্য্যন্ত পদ্যে রচিত হইত। গদ্য লিখিবার প্রণালী আদরণীয় এবং সাহিত্যক্ষেত্রে প্রচলিত থাকিলে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও বৃন্দাবন দাস কখনই পদ্য ছন্দে চৈতন্য জীবনী প্রণয়ন করিবার ক্লেশ স্বীকার করিতেন না; এবং নরোত্তমবিলাস ও ভক্তি-রত্নাকরের ন্যায় ঘটনাবহুল ইতিহাস গ্রন্থ পদ্যে লিপিবদ্ধ করিতে যাইয়া নরহরি চক্রবর্ত্তী গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া পড়িতেন না। নরোত্তমবিলাসের একটুকু অংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"প্রসাদী পাকান্ন সব লৈয়া থরে থরে।
অতি শীঘ্র গেলেন সবার বাসা ঘরে॥
সকল মহান্ত প্রতি কহে বারেবার।
কালি এ খেতরি গ্রাম হবে অন্ধকার॥
পদ্মাবতী পার হৈয়া পদ্মাবতী তীরে।
করিবেন স্নান সবে প্রসন্ন অন্তরে॥
তথা ভুঞ্জিবেন এই প্রসাদী পাকান্ন।
বুধরী গ্রামেতে গিয়া হইবে মধ্যাহ্ন॥
আগে যাইবেন গোবিন্দাদি কথোজন।
সেই সঙ্গে পাক কর্ত্তা করিবে গমন॥
রামচন্দ্রাদি এ সঙ্গে যাইবেন তথা।
বুধরি হইতে তারা আসিবেন এথা॥"

এ কথাগুলিও পয়ার বাঁধিয়া লিখিতে হইয়াছিল। সুতরাং

* "For the last sixteen years I have been associated with spirits who are not away from me for a moment and I am not only being spiritualized by them, but I am talking with them as I talk with those who are in flesh."

The spiritual stray leaves P. 53.

† অমৃতলাল মিত্র, চুণিলাল মিত্র এবং নগেন্দ্রলাল মিত্র।

সে কালের লোকেরা বাটলারের হুডিব্রাসের ন্যায় কবিতা-দেবীর প্রতি যে উৎকট ভালবাসা দেখাইতে অঙ্গীকার-বদ্ধ ছিলেন, * দুঃখের বিষয়, আমরা তাহার আদৌ সুখ্যাতি করিতে পারি না।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাঙ্গলা গদ্য বহু দিনের জিনিষ।

প্রাচীনকালের বাঙ্গলা গদ্য।

রাজা রামমোহন রায় নিজে যেরূপ গদ্য লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার বহু পূর্ব্বে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট গদ্য প্রচলিত ছিল। এ কথা স্বীকার্য্য যে, নিতান্ত সাহসী ও স্বাতন্ত্র্যপরায়ণ ব্যক্তিগণ ভিন্ন অপর কেহ কবিতাদেবীর মোহিনী শক্তি এড়াইতে পারিতেন না। কিন্তু সেরূপ লোকের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিল বলিয়া বোধ হয় না। চণ্ডীদাসের "গদ্যময় গীতের" কথা পদকল্পতরুতে উল্লিখিত আছে; কিন্তু অত প্রাচীন গদ্যের নমুনা আমরা পাই নাই। তিন চারি শত বৎসরের প্রাচীন বাঙ্গলাগদ্যে লিখিত কতকগুলি তাম্রফলক আমরা দেখিয়াছি। সেগুলি ত্রিপুরায় পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন মহাভারত এবং রামায়ণ প্রভৃতি বাঙ্গলা পুঁথির শেষ পত্রে লেখকের পরিচয় স্থলে অনেক স্থানে আমরা ৩।৪ শত বৎসরের পূর্ব্বের বাঙ্গলা গদ্যের নমুনা দেখিয়াছি; তাহা সহজ ও মনোভাব জ্ঞাপনের অনুপযোগী বলিয়া বোধ হয় না। দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ নন্দকুমার যে সকল বাঙ্গলা চিঠি লিখিয়াছিলেন, কয়েক বৎসর হইল, বেভারিজ সাহেব তাহার কয়েক খানি ন্যাসনাল ম্যাগাজিন পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সে গদ্যের নমুনা অনেকেই দেখিয়াছেন; তাহা প্রাঞ্জল, সাবেকী ধরণের কাজ কর্ম্মের উপযোগী ও অতিশয় অনাড়ম্বর। সম্প্রতি ৺দুর্গা প্রসাদ মিত্র মহাশয়ের কতকগুলি বাঙ্গলা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।† সেই পত্র সমূহের ভাষা এখনকার চলিত চিঠি পত্রের ভাষা হইতে বহুদূরবর্ত্তী নহে। প্রায় ১০০ শত বৎসর পূর্ব্বে সে গুলি লিখিত হইয়াছিল। সে ভাষার নমুনা এইরূপ:— "তোমার পত্র পাইয়া তুষ্ট হইয়াছি, ইংরাজী এবং বাঙ্গলা অক্ষর এবং পত্রের বাক্যপ্রবন্ধ পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে, ইহাতে বোধ হইতেছে, তুমি লিখন পঠনে অনাবিষ্ট নহে। বিবেচনা করিয়া মনোযোগ করিয়া শ্রমকরণের কি অপূর্ব্ব ফল! আপনি গুণবিশিষ্ট হইয়া আত্মীয়বর্গের প্রিয় এবং প্রশংসার্হ হইব। ইহার বিপরীতাচারণের যে ফল, তাহা শ্রীযুক্ত মথুরামোহন মিত্র বাবাজিকে যে পত্র লিখিতেছি, তাহাতে অবগত হইবা।" অনেকেই "দেহ কড়চ" গ্রন্থ দেখিয়াছেন, এই গদ্য পুস্তকখানি তিন শত বৎসর পূর্ব্বের রচনা। এই শ্রেণীর গদ্য পুস্তক বাঙ্গলা বৈষ্ণব 'সাহিত্যে' বিরল নহে। কৃষ্ণদাসের "রাগময়ী কণ" এবং সহজিয়া সম্প্রদায়ের অনেকগুলি পুঁথির মধ্যে গদ্যাংশ দেখা যায়; উহাদের ভাষা একই প্রকার—বড় সহজ ও বাক্যগুলি অতি সংক্ষিপ্ত, চলিত কথাবার্ত্তায় রচিত। তাহাতে সমাসের খেলা ও সংস্কৃতের কুহক আদৌ নাই। স্মৃতিগ্রন্থের একখানি প্রাচীন গদ্যানুবাদ পাওয়া গিয়াছে, অনুবাদ রচয়িতার নাম রাধাবল্লভ শর্ম্মা। এই অনুবাদ পুস্তকের ভাষাও বড় সরল। সম্প্রতি নবদ্বীপের বর্ণনাসূচক একখানি দেড় শত বৎসরের প্রাচীন গদ্য পুঁথি আমরা পাইয়াছি, তাহাও অতি সহজ চলিত কথায় লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ১৮১১ খৃঃ অব্দে লণ্ডন নগরে প্রকাশিত রাজীবলোচন রায়ের "কৃষ্ণচন্দ্র চরিত" নামক যে একখানি বাঙ্গলা গদ্য গ্রন্থ দেখা যায়, তাহাতে লেখকের ভাষা ও শব্দাধিকার বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। তদ্দ্বারা অনুমান করা যায় যে, গদ্য লেখার পদ্ধতি এ দেশে বিশেষরূপ প্রচলিত না থাকিলেও তাহা অনেকটা পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই পুস্তকখানি চলিত কথায় লিখিত, ইহার ভাষা-সম্পদ ও গদ্য রচনার প্রণালী—ইংরাজী নবিস প্রথম গদ্য-প্রবর্ত্তনাভিমানী ব্যক্তিগণের অনেকের লেখা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মৎপ্রণীত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক পুস্তকের ৩৯৫ পৃষ্ঠায় প্রায় দেড় শত বৎসরের প্রাচীন "কামিনীকুমার" নামক পদ্য গ্রন্থের অন্তর্ব্বর্ত্তী "হর বল্লভের তামাক সাজা" নামধেয় অধ্যায়টি উদ্ধৃত করা হইয়াছে; তাহা পড়িলে দৃষ্ট হইবে যে, প্যারীচাঁদ মিত্র আলালী ভাষার প্রবর্ত্তক নহেন, স্বীয় পুস্তকে উহার তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন মাত্র।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, গদ্য রচনার যখন এরূপ সুন্দর ও

টুলো পণ্ডিতের হাতে বাঙ্গলা গদ্যের দুর্গতি।

যোগ্য নিদর্শন প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়, তখন ইংরাজের আগমনের পরে "পুরুষপরীক্ষা" "প্রবোধচন্দ্রিকা" 'প্রতাপাদিত্য চরিত' প্রভৃতির ন্যায় উৎকট গদ্য সম্বলিত

* "For rhetoric he could'not ope
His mouth, but out flew a trope"
Hudibras

† কলিকাতা—৮৮নং মেছুয়াবাজার, হরচন্দ্রের মেসিন প্রেসে মুদ্রিত।

পুস্তক লিখিত হইয়াছিল কেন? "ঐহিক পারত্রিক নিস্তার-কর্ত্তৃক ভবার্ণব নাবিক শ্রীযুক্ত প্রাণেশ্বর," "পরম প্রণয়ার্ণব গভীর নীর তীর-নিবসিত কলেবরাঙ্গ সম্মিলিত নিতান্ত প্রণয়াশ্রিত" প্রভৃতি ভাবের সমাস যোজনার ব্যঙ্গ এবং "রে পাষণ্ড ষণ্ড, এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কাণ্ড দেখিয়াও কাণ্ড-জ্ঞানশূন্য হইয়া বকাণ্ড প্রত্যাশার ন্যায় লণ্ড ভণ্ড হইয়া ভণ্ড সন্ন্যাসীর ন্যায় ভক্তিভাণ্ড ভঞ্জন করিতেছ" প্রভৃতি ভাবে যমক অলঙ্কারের শ্রাদ্ধ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের কোন্ অকৃত্রিম সুহৃৎ গদ্য রচনার এই বিকট মূর্ত্তি আবিষ্কার করিলেন? অনেকের বিশ্বাস, প্রাচীনকালের গদ্য এইরূপই ছিল, রাজা রামমোহন রায় এবং তৎপথাবলম্বী লেখকগণই আধুনিক সহজ গদ্যের প্রবর্ত্তক। এই ধারণা যে ভুল, তাহা আমরা বিস্তৃত ভাবে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। ইংরেজের আগমনের পর "ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ" স্থাপিত হয়। এই শিক্ষালয়ে সাহেবদিগকে বাঙ্গালা শিখাইবার জন্য কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত নিযুক্ত হন। তাঁহারা মনে করিলেন, এত বড় বিজ্ঞ পণ্ডিতগণের দ্বারা যে গদ্য গ্রন্থ রচিত হইবে, তাহাতে প্রভূত পরিমাণে পাণ্ডিত্যের নিদর্শন থাকা আবশ্যক, তাঁহাদের প্রণীত বাঙ্গলা পুস্তক সাধারণের অধিগম্য হইলে এবং একান্ত দুর্ব্বোধ্য না হইলে তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট সুখ্যাতি থাকিবে না। সুতরাং সেই সকল গ্রন্থ যত দূর কঠিন ও সমাসবিড়ম্বিত করা যাইতে পারে, তাঁহারা তজ্জন্য চেষ্টার ক্রটী করেন নাই। পরবর্ত্তী সময়ে এই শ্রেণীর এক পণ্ডিত সহজ বাঙ্গলায় লিখিত কোন প্রবন্ধ শুনিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন,—"এ কি হয়েছে! এ যে বিদ্যাসাগরী বাঙ্গলা হয়েছে! এ যে অনায়াসে বোঝা যায়"*। অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার প্রবোধচন্দ্রিকা লিখিয়া বাঙ্গলা ভাষায় এক অত্যুৎকট প্রহেলিকার সৃষ্টি করিলেন। সাহেব ছাত্রগণ মনে করিল,—পূর্ব্বদেশীয় ভাষা সমূহের ব্যাকরণ ও অলঙ্কারের ব্যূহ ভেদ করিয়া অর্থ পরিগ্রহ করা তাহাদের কর্ম্ম নহে। এই হাস্য ও বীভৎস রসের অজস্র প্রস্রবণকে পাণ্ডিত্যাভিমানিগণ তাঁহাদের কীর্ত্তি বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই পক্বতার প্রভাধারী একান্ত অপরিপক্ব ও অসার বস্তু আমাদিগের জাতীয় সাহিত্যের অন্তর্গত নহে, ইহা আমাদের দেশের প্রাচীন এবং আধুনিক সাহিত্যের সহিত সম্পূর্ণ সংস্রববিহীন। হর্ষচরিত্র, কাদম্বরী, দশকুমারচরিত প্রভৃতি সংস্কৃত গদ্য গ্রন্থের এই বিকট অনুকৃতি, পণ্ডিতাভিধেয় কয়েকজন মূর্খের সৃষ্টি। পাঠকগণ এই সকল রচনা বাঙ্গলা গদ্যের আদিরূপ মনে করিয়া ভ্রমে পড়িবেন না।

রাম মোহন রায়ের গদ্য

রাম মোহন রায় তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সরল বাঙ্গালা অবলম্বন করেন নাই। তাঁহার পূর্ব্বে প্রচলিত বঙ্গীয় গদ্যে সরসতা, সরলতা ও এক-রূপ স্তিমিত সৌন্দর্য্য ছিল, তাহা ক্বচিৎ হাস্যরসে মুখর হইয়া উঠিত। সে রচনা প্রণালীতে লিপি-নৈপুণ্যেরও অভাব ছিল না কিন্তু সমাজ সংস্কার উদ্দেশ্যে যে তূরী ভেরী বাজাইয়া তীব্র নিনাদ করিতে হয়, যে উদ্যম সহকারে ভাষাকে জীবন্ত করিয়া তুলিতে হয়, তাহা প্রাচীন গদ্য সাহিত্যে ছিল না। এই জন্য রাজা রাম মোহন রায় সরল গদ্য লিখিবার পথ অবলম্বন করিয়াও তাহাতে ইংরাজী ভাষার ভঙ্গী প্রবেশ করাইয়া তৎপ্রণীত পুস্তকগুলির ভাষা কিয়ৎ পরিমাণে দুর্ব্বোধ্য করিয়া তুলিলেন; ইংরেজী ভাষায় ব্যাকরণ প্রণালী ও বাক্যগুলি বিন্যাস করিবার নিয়ম বাঙ্গলা গদ্যের হঠাৎ আয়ত্ত হয় নাই। এই জন্য সহজ শব্দগুলিও বিদেশী প্রণালীতে সংবদ্ধ হইয়া প্রথমতঃ সহজ বোধ্য হয় নাই।

গ্রন্থ সমালোচন, অঙ্কননৈপুণ্য

প্যারীচাঁদ মিত্রের ভাষা অনেকটা এ দেশ প্রচলিত প্রাচীন গদ্যের অনুরূপ। তবে কথা-বার্ত্তায় চলিত শব্দগুলি তাহাতে একটুকু বেশী স্ফূর্ত্তিশালী ও সজীব হইয়াছিল। টেকচাঁদের লেখা কৌতূহলোদ্দীপক ও বেগশালী। কোন বিষয় বর্ণনা করিতে যাইয়া তিনি বিষয় ভুলিয়া ভাষা সাজাইবার চেষ্টা করেন নাই—এইজন্য ভাষাটি আপনা হইতেই-স্বাভাবিক ও সুন্দর হইয়াছে। ক্ষিপ্র হস্তে লেখনী পরিচালিত করিয়া তিনি প্রাকৃতিক দৃশ্য, বাজার, আদালতের ভিঁড়, বিবাহোৎসব, লম্পটদের মিলন, জেলখানা, প্রভৃতি শত শত নিত্যদৃষ্ট চিত্রের অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা যেন সজীব হইয়া উঠিয়াছে। ইহসংসারের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি এত সূক্ষ্ম ছিল যে, তাঁহার প্রতি কথায় বর্ণ ফলিয়াছে,—প্রতি ছত্রে বর্ণিত বিষয়ের এক একটি অঙ্গ অঙ্কিত হইয়াছে। গৃহকোণে হঠাৎ আলো পড়িলে যেরূপ আঙ্গিনার ক্ষুদ্র গুল্মটি, প্রাচীরবাহী

* রামগতি ন্যায়রত্ন 'কৃত বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব', ১৫৮ পৃঃ.

অলাবু লতাটি, গবাক্ষ কোণের মসারি ও খট্টার একাংশ চক্ষের সম্মুখে জাগিয়া উঠে, প্যারীচাঁদের লেখনীতে সেইরূপ ক্ষিপ্র আলো প্রক্ষেপে বর্ণিত বিষয়টির মূর্ত্তি যথাযথ-রূপে জাগাইয়া দেয়। তাহাতে ক্ষুদ্র জিনিষ হতাদৃত হয় না এবং বড় জিনিষের প্রতি মনোযোগ বেশী পরিমাণে আকৃষ্ট হয় না। পাঠককে যেন একবারে ঘটনার মধ্যস্থলে পৌঁছিয়া দেয়। এই গুণের জন্যই 'আলালের ঘরের দুলাল' পড়িতে কুত্রাপি ধৈর্য্যচ্যুত হইবার আশঙ্কা নাই। নিত্য পরিচিত দৃশ্যগুলি কথা বলিবার আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তিতে সজীব হইয়া উঠিয়াছে, যে স্থানে সিরাজান গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়াছে, সেই স্থলে সিরাজানের মুখের অদ্ধোচ্চারিত "শালার গরু চলতে পারে না" এবং তৎসঙ্গে "শ্যামের নাগাল পালাম না গো সই—ওগো মরমেতে মরে রই" এইগানের অংশ, গরুর লেজ মোচড়ান, ও গাড়ীচলার "টংয়স ডংয়স্" শব্দ ফুটিয়া উঠিয়া একখানি গোশকটের ন্যায় একান্ত অসার ও কবিত্বহীন পদার্থকেও যেন কাব্যময় করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার রচনায় সর্ব্বত্রই এইরূপ স্বভাবের দৃশ্যাবলীর একখানি মূল্যবান প্রতিলিপি, বিশুদ্ধ ও আদিম রাগিণীর একটি সরস প্রতিধ্বনি প্রাপ্ত হওয়া যায়!

ভাষা বিষয়ের উপযোগী।

বস্তুতঃ টেকচাঁদ ঠাকুরের বর্ণনায় অতিমাত্র অকৃত্রিমতা হেতুই নিতান্ত গ্রাম্য শব্দের এত অধিক ব্যবহার দৃষ্ট হয়। লেখক আদৌ ভাষার উপর দৃষ্টি করেন নাই; উৎকৃষ্ট গল্পবাজ যেরূপ নানা ভঙ্গিতে কথা কহিয়া চিত্রটী সজীবভাবে উপস্থিত করেন,—এ লেখা সেইরূপ; ভাষা লেখকের হুকুম মান্য করিয়া নিরত আজ্ঞাকারী; বিষয়টি পরিস্ফুট করিতে যাইয়া প্যারীচাঁদ কখনও উর্দ্দু, কখনও নিতান্ত খেলো রকমের বাঙ্গলা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি গ্রন্থ লিখিবেন, এ কথাটি যেন একবারও ভাবেন নাই, গল্পটি ভাল করিয়া বলিবেন, এই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। তাহার বর্ণিত রাস্তা ঘাট দেখিয়া যাইতে যাইতে নানারূপ বিচিত্র দৃশ্য দৃষ্টি আকৃষ্ট করে, শৃঙ্খলাবিহীন বিবিধ চিত্র মনের কৌতূহল উদ্দীপিত করে, প্যারীচাঁদের হাতের একটি রাস্তা বর্ণনা এইরূপ;—ইহাতে গাম্ভীর্য্যের অভাব থাকিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত নাটকীয় সংস্থান-নৈপুণ্য বর্ণনাটিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে:—

"বৃষ্টি খুব এক পসলা হইয়া গিয়াছে—পথ ঘাট পেঁচ পেঁচ সেঁত সেঁত করিতেছে—আকাশ নীল মেঘে ভরা—মধ্যে মধ্যে হড় হড় হড় মড় শব্দ করিতেছে। বেং গুলা আশে পাশে যাঁওকো যাঁওকো করিয়া ডাকিতেছে। দোকান পশারীরা ঝাঁপ খুলিয়া তামাক খাইতেছ—বাদলার জন্য লোকের গমনাগমন প্রায় বন্ধ। কেবল গাড়োয়ান চীৎকার করিয়া গাইতে গাইতে যাইতেছে ও দামো কাঁদে ভার লইয়া "হায়গো বিসখা সে যিবে মথুরা" গানে মত্ত হইয়া চলিয়াছে। বেদা বাটীর বাজারের পশ্চিমে কয়েকঘর নাপিত বাস করিত। তাহাদিগের মধ্যে একজন বৃষ্টির জন্য আপন দাওয়াতে বসিয়া আছে। এক একবার আকাশের দিকে দেখিতেছে ও এক একবার গুণ গুণ করিতেছে, তাহার স্ত্রী কোলের ছেলেটি আনিয়া বলিল—ঘর কন্নার কর্ম্মে কিছু থা পাইনে—হেদে! ছেলেটাকে একবার কাঁকে কর, এদিকে বাসন মাজা হয়নি, ওদিকে ঘর নিকন হয় নি, তার পর রাঁদা বাড়া আছে, আমি একলা মেয়ে মানুষ এ সব কি করে করব, আমি কোন্ দিকে যাব? আমার কি চাটে হাত চাটে পা? নাপিত অমনি ক্ষুর ভাঁড় বগলদাবায় করিয়া বলিল, এখন ছেলে কোলে করিবার সময় নয়, কাল বাবুরাম বাবুর বিয়ে, আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে। নাপতানী চমকিয়া উঠিয়া বলিল—ওমা আমি কোজ্জাব? বুড়ো চোস্কা আবার বে করবে। আহা এমন গিন্নি—এমন সতী লক্ষ্মী; তার গলায় আবার একটা সতিন গেঁতে দিবে, মরণ আর কি? পুরুষ জাত সব করতে পারে। নাপিত আশা বায়ুতে মুগ্ধ হইয়াছে—ও সব কথা না শুনিয়া একটা টোকা মাথায় দিয়া সাঁ সাঁ করিয়া চলিয়া গেল।"

এইরূপ লেখাই সর্ব্বত্র; বর্ণনার প্রত্যেক অংশে জীবন আছে, তাহা মনের ভিতরএমন এক একটি ছবি আঁকিয়া দেয়, যাহা চক্ষু দেখিতে পায় নাই, লিপিনৈপুণ্যে মন তাহা দেখিতে পায় এবং পুরাতন জিনিষগুলি নব সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইয়া পাঠকের নিকট উপস্থিত হয়। স্থানে স্থানে গ্রন্থকর্ত্তার কথা বলিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা (যথা কাশীর বর্ণনা প্রসঙ্গে), বর্ণনার ক্ষিপ্রকারিতা ও বাক্যবাহুল্যে কথকদিগের শক্তির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কবিওয়ালাগণের ছড়া পাঁচালী যেরূপ সতত উজ্জ্বল ও সজীব, প্যারীচাঁদের গদ্য স্থানে স্থানে সেইরূপ। দাশু রায়ের পর প্যারীচাঁদ বাঙ্গলা রচনায় আর এক হাত দেখাইয়াছেন। দাশু রায় পয়ার বাঁধিয়াছিলেন, প্যারীচাঁদ গদ্যে সেই ভঙ্গীটি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।

পরিহাস শক্তি।

পরিহাসরসিকতা প্যারীচাঁদের একটি বিশেষ গুণ, ইহা তাঁহার রচনায় সর্ব্বত্র দীপ্তিশালী। এই রসিকতা সম্যক্‌রূপে দ্বেষ-বর্জ্জিত। ইংরেজী রসিকতায় ব্যক্তিবিশেষ কি শ্রেণীবিশেষের উপর অনেক সময় তীব্র কটাক্ষপাত করা হয়, বিদ্বেষ এক পক্ষকে দারুণ ক্ষোভিত করিয়া অপর পক্ষের দন্তরুচি কৌমুদীর বিকাশ করাইয়া দেয়। এই বিদ্বেষনিষ্ঠুর রসিকতা একদলের নিকট বড় সুস্বাদু ও অপর দলের নিকট বড় বিস্বাদ বোধ

হয়। ফলতঃ উহা সকল লোকে সমানরূপে উপভোগ করিতে পারে না। বাটলারের হুডিব্রাস কি বাইরণের স্কচ রিভিউয়ার ব্যক্তি বিশেষ কি শ্রেণীবিশেষকে নির্য্যাতন করিবার উদ্দেশ্যে লিখিত। কথিত আছে, কবি বারণ্‌সেব এক একটি রসিকতা দশটি করিয়া শত্রু সৃষ্টি করিত। এতাদৃশ কবি দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলে তাঁহার ভূমণ্ডলে টিঁকিয়া থাকা ভার হয়। বারন্‌সকেও স্বীয় পল্লী পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইয়াছিল। বাইরণ southeyর সঙ্গে drotheyর মিল দিয়া যে রসিকতা করিয়াছিলেন, তাহা বন্ধুবর southey বড় মুখরোচক মনে করেন নাই। সংস্কৃত সাহিত্যে পরগ্লানিকর রসিকতা স্থান পায় নাই। প্যারীচাঁদ মিত্রের রসিকতা সর্ব্ববাদিসম্মত, অথচ তাহা বিদ্বেষ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই। তাঁহার পরিহাস সর্ব্ব শ্রেণীর উপভোগ্য ও নিরাড়ম্বর। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি। বাবুরাম বাবুর মৃত্যু আসন্ন, তখন "বৈদ্যবাটীর যাবতীয় লোক বাবুরাম বাবুকে ঘিরিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, মহাশয়! আমাকে চিনিতে পারেন কি? আমি কে বলুন দেখি?"

"রায় মহাশয়ের মুখের মধ্যে যতগুলি গোঁপ, গোঁপও পেকে গিয়াছে, কিন্তু স্নেহপ্রযুক্ত কখনই ফেলিবেন না।" 'স্নেহপ্রযুক্ত' কথাটি অতিশয় আড়ম্বরশূন্য ও হাস্যোদ্দীপক।

বৃদ্ধ বরের চসমা চখে পরিয়া চারি চক্ষের প্রথম মিলন এবং "তিনি আপন সৌন্দর্য্য প্রকাশার্থ কোচার কাপড় দিয়া গোঁপ ভুরু নাক ও মুখ পুছিতে লাগিলেন" প্রভৃতি কথা আমরা যখন তাঁহার গল্পে পড়িয়াছিলাম, তখন হাসি রাখিতে পারি নাই। প্যারীচাঁদের গল্পের সর্ব্বত্রই কৌতুকপূর্ণ হাস্যরসের খেলা আছে। আর একটি অংশ এ স্থলে আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। শ্রাদ্ধের আসরে পণ্ডিতগণ একত্র হইয়াছেন ও বিচার চলিতেছে—

"একজন অধ্যাপক ন্যায়শাস্ত্রের একটা ফোকড়া উপস্থিত করিলেন—"ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাভাব বহ্নিভাবে ধূমা, ধূমাভাবে বহ্নি।" উৎকলনিবাসী একজন পণ্ডিত কহিলেন—"যৌটি ঘটিয়া বচ্ছন্তি তার প্রতিযোগা সৌটি পর্ব্বত বহ্নি নামে ধিয়া!" কাশীজোড়া নিবাসী পণ্ডিত বলিলেন,—"কেমন কথা গো বাকাটি প্রিমিধান কর নাই—যে ও ঘটকে পট করে, পর্ব্বতকে বহ্নিমান ধূম, শিড়মণি যে মেকটি মেড়ে দিচ্ছেন।' বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত বলিলেন—গটিয়াবচ্ছিন্ন চাব প্রতিযোগা দুমা বাব অগ্নিবাবে ধূমা, অগ্নি না হলে দুমা কেমনে লাগে।" সময়ে সময়ে এই রসিকতা উচ্ছ্বলিত অপূর্ব্ব কবিত্বপূর্ণ উপমাতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। গদাধর, মতিলাল, হলধর প্রভৃতি বন্ধুবর্গ মদ খাইয়া চলিয়াছেন, "কোন দিকে দৃষ্টিপাত নাই, একেবারে ফুল্লারবিন্দ, মত্ততায় মাথাভারি, গুমরে যেন গড়িয়া পড়েন!"

রচনার বিবিধ সদ্গুণাবলী।

স্বভাবের প্রকৃত প্রতিলিপির ন্যায় সরস বর্ণনা, আদ্যন্ত কথাবার্ত্তার ভাষার উপর এরূপ অসীম অধিকার, গল্প বলিবার অদ্বিতীয় সুন্দর ভঙ্গী এবং রস কৌতুকের অনাবিল প্রবাহ, 'আলালের ঘরের দুলাল'কে একখানি উপাদেয় ও পরম রমণীয় গল্প গ্রন্থের শ্রেণীতে অভিষিক্ত করিয়াছে। বঙ্কিম বাবু যথার্থই লিখিয়াছেন—"তিনি (প্যারীচাঁদ) প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনি সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না।"

এই সকল পুস্তকে কি নাই?

কিন্তু প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস অথবা কাব্যে কোন মহৎ গুণের অপূর্ব্ব আদর্শ চরিত্রবিশেষে প্রতিফলিত হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়গুলি, এমন কি বহুপত্র ব্যাপী বর্ণনা, অনেক সময় নিতান্ত সাধারণ শ্রেণীর ন্যায় হইলেও সেগুলি স্বর্গে উঠিবার সোপানের ন্যায়; স্বর্গের দিকে চাহিয়া পাঠক কষ্টে সৃষ্টে উত্তীর্ণ হইবেন। কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখিবার জন্য অনেক দুরূহ শৈল অতিক্রম করিতে হয়, কিন্তু পরিণামে পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার আছে। বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসের অনেক গুলিই 'আলালে'র ন্যায় আদ্যন্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে; দুর্গেশনন্দিনীতে বিমলার রূপ বর্ণনা, বিষ বৃক্ষের নগেন্দ্র বাবুর অন্তঃপুর বর্ণনা প্রভৃতি কোন কোন স্থলে বোধ হয় যেন বঙ্কিম বাবুকেও লেখনী নিংড়াইয়া বর্ণনা করিতে হইয়াছিল। টেকচাঁদঠাকুরের কষ্টকল্পনা কুত্রাপি নাই, 'আলালে'র রচনা হইতে যে অংশ উদ্ধৃত হইবে, তাহাই সুন্দর কৌতুকসরস ও স্বাভাবিক। কিন্তু বঙ্কিমের উপন্যাসে যে সকল অত্যুজ্জ্বল চরিত্র আছে, সৌন্দর্য্য ও প্রেমের যে অমর দৃশ্যাবলী আছে, প্যারীচাঁদের গ্রন্থে তাহার একান্ত অভাব। কতকগুলি চরিত্র খুব স্বাভাবিক হইয়াছে, বর্ণনা-নৈপুণ্য দেখিয়া

আমরা তাহাদিগকে ক্ষণেকের জন্য ভাল বাসিলাম, তাহা পড়িবার কালে হাসিতে হাসিতে গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ দিলাম, এই পর্য্যন্ত ; তাহাদিগকে হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিতে পারিলাম না। বঙ্কিমের উপন্যাসগুলি কাব্য সংজ্ঞায় বাচ্য, প্যারীচাঁদের উপন্যাসগুলি শুধুই গল্প। শুধু নীতি কথা থাকিলেই সাহিত্যে উচ্চ প্রতিষ্ঠা লাভ হয় না, ইসপের গল্পগুলির মত নীতিপূর্ণ জিনিষ সাহিত্যে কোথায়? কিন্তু সে গুলিতে কাব্যের সৌন্দর্য্য নাই। কাব্যের নীতি ও সামাজিক নীতি এক নহে। যখন সাহিত্যিক চরিত্র দয়া কিম্বা নিষ্ঠুরতা, ভালবাসা বা বিদ্বেষ প্রভৃতি যে কোন গুণের উচ্চতম গ্রামে যাইয়া দাঁড়ায়, তখন সাহিত্যে উহা সুন্দর কিম্বা মহান্ হয়। লেডি ম্যাকবেথ, রোডিন ইয়াগো, জিন ভালজিন সুকুমার বৃত্তি দলন করিলেও এই হিসাবে অমর চিত্রাঙ্কন ; এবং অপরদিকে সুকুমার কলার অপূর্ব্ব বিকাশে প্রতাপ, কুন্দনন্দিনী, আয়েসা, কপাল কুণ্ডলা, সূর্য্যমুখী, প্রফুল্ল প্রভৃতি বঙ্কিম বাবুর বহুসংখ্যক নায়ক নায়িকা সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিস্বরূপ সাহিত্যে প্রতিভাত হইতেছে। আলালের অন্তর্গত সাধু চরিত্রগুলিকে ঠকচাচা "কেতাবী বাবু" আখ্যা প্রদান করিয়াছে ; আমরা এই সংজ্ঞাই মানিয়া লইলাম। সেই সকল চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, যেন গ্রন্থকার নীতিসূত্র মুখস্থ করিয়া দৃষ্টান্ত আঁকিয়াছেন ; তাহারা যেন কতকগুলি বক্তৃতার সমষ্টি, গির্জ্জায় ধ্বনিত উপদেশের মত তাহাদের কথা আমাদের কর্ণে পৌছে, কিন্তু মর্ম্ম স্পর্শ করে না। আলালের একমাত্র চরিত্র 'ঠকচাচা' সাহিত্যিক দক্ষতার নিদর্শন, কিন্তু দুরেখায় টানা 'বাহুল্য' ঠকচাচা অপেক্ষাও খানিকটা উচ্চ মঞ্চে দাঁড়াইয়াছে। যখন দুজনেই নির্ব্বাসিত, জাহাজ চলিতেছে—তখন "ঠকচাচা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলে, "মোদের নসিব বড় বুরা, মোরা একবারে মেটি হলুম, ফিকির কিছু বেরোয় না, মোর শির থেকে মতলব পেলিয়ে গেছে, মোকান বি গেল—বিবির সাতে বি মোলাকাত হলো না, মোর বড় ডর তেনা বি পেলেট সাদি করে।" "বাহুল্য বলিল—"দোস্ত ! ও সব বাৎ দেল থেকে তাফাৎ কর। দুনিয়াদারি মুসাফিরি সেরেফ আনা যানা, কোই কিসকা নেহি, তোমার এক কবিলা, মোর চেট্টে—সব জাহান্নমে ডাল দেও, আবি মোদের কি ফিকিরে বেহতর হয়, তার তদ্বির দেখ।" বাতাস হু হু বহিতেছে, জাহাজ একপেশে হইয়া চলিয়াছে—তুফান ভয়ানক হইয়া উঠিল। ঠকচাচা ত্রাসে কম্পিত কলেবর হইয়া বলিতেছেন, "দোস্ত —মোর বড় ডর মালুম হচ্ছে। আন্দাজ হয়, মৌত নজ্‌দিগ।" বাহুল্য বলিল—"মোদের মৌতের বাকি কি? মোরা মেম্‌দো হয়ে আছি—চল মোরা নিচু গিয়া আল্লা মিয় দেবাচা পাড়ি—মোর বেলকুল লোক—জাবান আছে —যদি ডুবি ত পিরের নাম নিয়ে চেল্লাব।" ঠকচাচার ব্যাকুলতা ও বাহুল্যার নির্ভীকতা দেখিলে মনে হয়, দুজনেই দুষ্কর্ম্মান্বিত, কিন্তু একজন ভীরু, অপর ব্যক্তি বীর।

ঠকচাচা ও বাহুল্য।

মতিলাল।

মতিলাল একান্ত খেলো রকমের নষ্ট ছেলে, তাহার দুরন্তপনা এবং অসদ্ব্যবহারগুলি কোন নাটকীয় নৈপুণ্যের পরিচায়ক হয় নাই। শেষ কালে যখন তাহার মতিগতি ধর্ম্মের দিকে প্রবর্ত্তিত হইল, তখন বরং চরিত্রটা কতকটা সজীব হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং সেখানে এই হাস্যরস-প্রবল গল্পটী একান্ত সকরুণ ভাব ধারণ করিয়াছে।

ভাষা অতি তরল
বিষয় গৌরবজনক

টেকচাঁদের ভাষা নিতান্ত তরল, শিক্ষিত সম্প্রদায় এ ভাষা গ্রহণ করেন নাই, সাধারণ উপন্যাস ও গল্পেও এরূপ তরল ভাষা আর ব্যবহৃত হয় না। "বেল্লাল্লা ছোঁড়াদের আয়েসে আশ মেটে না, প্রতিদিন তাহাদের নূতন নূতন টাট্‌কা টাট্‌কা রং চাই।" গল্পের ভিতরে গ্রন্থকারের এবংবিধ অনেক মন্তব্য পাওয়া যায়। এ ভাবের লেখা সাহিত্যের নিতান্ত ইতর শ্রেণীতে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্কিম বাবু টেকচাঁদের ভাষা সমগ্রভাবে গ্রহণ করেন নাই, তদুপরি সংস্কৃতের রং ফলাইয়া, কালিদাস, ভবভূতি, জয়দেব প্রভৃতি মহাকবির মহাকাব্যের শব্দৈশ্বর্য্য ঢালিয়া তাহা উজ্জ্বল করিয়াছেন। টেকচাঁদের ব্যবহৃত অনেক কথা এখন আর ভাষায় সেরূপভাবে প্রচলিত নাই। "তুষ্টিজনক" 'এলোমেলো লোক" "শরীর তাজা হৈয়া উঠিল," "টালমাটাল,', "সে স্থানকে ক্লাইব ষ্ট্রীট বলিয়া ডাকে," "লোকে ধর্ম্মে বাড়িতে পারে না।" "শিক্ষা দেওনের," "অর্থকে অগ্রাহ্য করেন, "ঠক চাচা ভারি ব্যাঘাত দেখিল," "যাওন কালীন" "পতনে পেলে" প্রভৃতি ভাবের

প্রয়োগ প্যারীচাঁদ মিত্রের যাবতীয় গ্রন্থেই দৃষ্ট হয়। প্যারীচাঁদের ভাষা খুব তরল, উহাকে 'বাজারে ভাষা' সংজ্ঞা দিলেও অন্যায় হয় না। শবদেহ অলঙ্কারে সাজাইবার ন্যায় যাঁহারা মৃত ভাষাকে শুধু শব্দচ্ছটায় বিভূষিত করেন, তাহাদের পাণ্ডিত্যাভিমান মিথ্যা। চপলতা ও লঘুতার মধ্যেও যদি সজীব রসের ধারা প্রবাহিত হয়, তবে এক হিসাবে ভাষার সৌন্দর্য্যও স্বীকার করিতে হয়। বিশেষতঃ বঙ্গভাষা তৎকালে পণ্ডিতগণের হস্তে যেরূপ লাঞ্ছিত হইতেছিল, তাহাতে কঠিন ও অচল প্রস্তর হইতে সহসা ক্রীড়াশীল ও চঞ্চলা নির্ঝরিণীর ন্যায় আলালী ভাষার স্বচ্ছন্দ ক্রীড়াশীলতা ও মাধুর্য্য আমাদের প্রীতিকর বোধ হইয়াছে। প্যারীচাঁদের ভাষা তরল ও নিতান্ত গ্রাম্যতাদোষ দুষ্ট হইয়াও অচেতন পদার্থের ন্যায় হয় নাই। উহাতে তেজোময়ী লেখনীর স্ফূর্ত্তিশালী আবেগ দৃষ্ট হয়। তাহার আর একটি প্রধান গুণ এই যে, প্যারীচাঁদের তরল ভাষা প্রকৃত সুনীতির মর্য্যাদায় মহিমান্বিত। এরূপ দৃষ্টান্ত সাহিত্যে বড় বিরল—তাহার ভাষায় চপলতার একশেষ থাকিলেও তাহা নীতির সমর্থনকারী ও কুনীতির বিরুদ্ধে উদ্যতায়ুধ;—সুতরাং ভাষা খেলো হইলেও উদ্দেশ্য এবং বিষয় গৌরবে প্যারীচাঁদের গ্রন্থগুলি সম্মানার্হ। 'আলালের ঘরের দুলাল' ছাড়া ইঁহার অপরাপর গ্রন্থ সম্বন্ধেও এই মন্তব্য প্রযুজ্য। 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' পুস্তকে নায়ক আগড় ভামর বিবাহ-চেষ্টা ও নানারূপ লাঞ্ছনাপ্রাপ্তি দ্রুত ও মুখর রসিকতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পড়িয়া পাঠকগণ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আনন্দ পাইবেন, সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মভাব।

স্ত্রীপাঠ্য ও আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনাপূর্ণ পুস্তকগুলি পড়িলে দৃষ্ট হইবে, প্যারীচাঁদের হৃদয়ের অন্তঃপুর মহান ধর্ম্মভাব ও জীব-হিতৈষণার ক্রীড়া ভূমি ছিল। ভাষার তরলতা ও বাহ্য রসিকতা এক ভাবগম্ভীর তত্ত্বপিপাসু চিত্তের বহিরাবরণমাত্র। এই ধর্ম্মপ্রাণতা ও সুনীতির আদর্শই তাঁহার গল্পগুলির কৌতুকপূর্ণ রচনারও প্রধান অবলম্বন এবং এই উচ্চ আদর্শই তাঁহার 'আধ্যাত্মিকা', 'রামরঞ্জিকা' প্রভৃতি পুস্তককে ধর্ম্ম-সাহিত্যের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

সামাজিক চিত্র।

প্যারীচাঁদের গ্রন্থাবলীতে সামাজিক আচার ব্যবহার ও প্রথার সম্বন্ধে অনেকগুলি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা ভবিষ্যৎকালের ইতিহাস লেখকগণের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইবে এবং সেগুলি বেশী দিনের কথা না হইলেও তাহার কতকগুলি আমাদের নিকটও বেশ আমোদকর বলিয়া বোধ হয়। সে কালের পল্লীগ্রামের বড় মানুষের ছেলেদের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, মাডাগাস্কার দ্বীপে সহসাপ্রাপ্ত ডডো পাখীর ন্যায় অধুনা একান্ত বিরল হইয়া পড়িয়াছে, সন্দেহ নাই। "চৌদ্দ বৎসরের একটি বালক গলায় মাদুলী, কাণে মাকড়ি, হাতে বালা ও বাজু" এরূপ ছেলে এখন মাড়োয়ারী পাড়া ভিন্ন বাঙ্গালা মুল্লুকের অন্যত্র সুলভ নহে। ছেলেদের পার্শী পড়াইবার জন্য মুন্সি নিযুক্ত হইত, তাহার বেতন সচরাচর ছিল,—"তেল, কাঠ ও মাসিক ১৷৹ টাকা।" সে কালের সাহেবগণ বাঙ্গালীদের সঙ্গে খুব মিশিতেন—"সর বোরণ সাহেবের শরীর মোটা—ভুরুতে রোঁ ভরা, গালে সর্ব্বদা পান, বেত হাতে এক একবার স্কুলে বেড়াইতেন ও এক একবার চৌকীতে বসিয়া গুড়গুড়ি টানিতেন।" ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বর্ণনায় আছে—তিনি দু পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইতেন ও গুড়গুড়ি টানিতেন। সাহেবদের দু পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইবার অভ্যাসটী এখনও আছে, কিন্তু প্রকাশ্য স্থানে পান, তামাক খাওয়া এখন আর নাই। সেই সময়ে এণ্টুনি ফিরিঙ্গী যাত্রার দল করিয়াছিল এবং অপর দলের অধ্যক্ষ ঠাকুর সিংহ তাহাকে কুর্ত্তি ও টুপি ছাড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় এণ্টুনি এমন একটী কবিতা বাঁধিয়া উত্তর দিয়াছিল, যাহার অর্থে ঠাকুর সিংহ সাহেবের স্ত্রীর ভ্রাতৃত্ব পদে বরিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর সেই গার্হস্থ্য আমোদ প্রমোদে সাহেবের যোগদান এখন সুখস্বপ্নে পর্য্যবসিত হইয়াছে। প্যারীচাঁদের সময় বাঙ্গালা ভাষা নিতান্ত অনাদৃত ছিল, হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ প্রতিষ্ঠিত সভায়, প্যারীচাঁদের প্রবর্ত্তনায় অক্ষয়কুমার দত্ত সর্ব্ব প্রথম যে বাঙ্গলা ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহাতে অনেক সভ্যই বিস্মিত হইয়া পড়িলেন এবং পরবর্ত্তী বক্তা এই অদ্ভুতপূর্ব্ব কাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াও নিজের কথাগুলি বাঙ্গলায় বলিতে সমর্থ হইলেন না। এই সময়ে প্যারীচাঁদের মত উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তি বাঙ্গলা ভাষায় এতগুলি সারগর্ভ ও

উপাদেয় পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, ইহা অল্প সাহস ও দেশীয় ভাষার প্রতি সামান্য অনুরাগের পরিচায়ক নহে।

গ্রন্থাবলীর আদর।

প্যারীচাঁদ মিত্রের রচিত বাঙ্গলা গ্রন্থের আদর তৎসময়ে এবং পরেও বিশেষভাবেই ঘটিয়াছে। বঙ্কিম বাবুর প্রশংসা বাক্য তাঁহার উদারতার পরিচায়ক হইলেও সত্য হইতে দূরবর্ত্তী নহে। তিনি লিখিয়াছেন, "আলালের ঘরের দুলালে"র দ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, আর কোন বাঙ্গলা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কিনা সন্দেহ।' কলিকাতা রিভিউ পত্রে ইংরাজ সমালোচক প্যারীচাঁদের রহস্যশক্তি ফিল্ডিংএর তুল্য মনে করিয়াছিলেন, অপর কয়েক জন বিজ্ঞ সমালোচক তাঁহাকে মলিয়ার এবং ডিকেন্সের সঙ্গে তুলনা করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। জি, ডি, ওসওয়েল সাহেব বলেন "থ্যাকারীকে যেরূপ পাশ্চাত্য প্রদেশে সংযত রহস্যকারীদিগের শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মান দেওয়া যায়, প্যারীচাঁদেরও সেইরূপ স্থান এদেশে প্রাপ্য। বিষবৃক্ষের অনুবাদক'সিভিলিয়ান ফিলিপ্স সাহেব 'আলালের ঘরের দুলালকে একখানি প্রকৃত গার্হস্থ উপন্যাস বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। জন বিমস্ সাহেব বলেন, "প্যারীচাঁদ মিত্র (যিনি টেকচাঁদ ঠাকুর নামে আপনার পরিচয় দিয়াছেন) বাঙ্গলার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন।" সাহেব মহলে এই পুস্তকখানির বিশেষ আদর হইয়াছে। প্রসিদ্ধ কাউএল সাহেব এই পুস্তকখানির একটী ইংরেজী অনুবাদ প্রণয়ন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু বড় দুরূহ মনে করিয়া শেষে সে চেষ্টায় বিরত হন। জি, ডি ওসওয়েল সাহেব সম্প্রতি আলালের যে অনুবাদ সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা অনেকটা মূলানুযায়ী হইয়াছে। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পাশ করিয়া যে সকল সাহেব এতদ্দেশে আসেন, বিভাগীয় পরীক্ষার জন্য 'আলালের ঘরের দুলাল' তাঁহাদের পাঠ্য। এজন্য সাহেবগণ এই পুস্তকখানির সহিত বিশেষ পরিচিত,—সম্প্রতি পেনেল সাহেব তাঁহার অদ্ভুত নোয়াখালি মোকদ্দমার রায়ে 'আলালের ঘরের দুলালে'র ঠকচাচার সঙ্গে আসামী বিশেষের তুলনা করিয়া প্যারীচাঁদের এই গ্রন্থের প্রতি আবার আমাদের সকৌতুক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

অধ্যাপক ম্যাক্স মূলর।

(৩)

(ধর্ম্মবিজ্ঞান ও জাতীয় আর্য্যধর্ম্মের বিকাশ)

ধর্ম্মবিজ্ঞানের আলোচনায় ম্যাক্স মূলর।

ধর্ম্মবিজ্ঞানের আলোচনাই ম্যাক্স মূলরের জীবনের প্রধান কার্য্য। তাঁহার ভাষাতত্ত্ব সংক্রান্ত গ্রন্থ বিশেষজ্ঞেরাই পাঠ করিয়া থাকেন। তাঁহার ঋগ্বেদাদি কেবল পণ্ডিত সমাজেই সমাদৃত। তাঁহার প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস আজি পর্যান্ত পুনঃ মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া জানা নাই। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মবিজ্ঞান সম্বন্ধ, গ্রন্থাবলী ইংলণ্ড, আমেরিকায় এবং ভারতে বহুলরূপে প্রচারিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থের দ্বারাই তিনি সাধারণ শিক্ষিত সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিচিত হইয়াছেন।

ধর্ম্মবিজ্ঞানের প্রাচীন ইতিহাস।

ধর্ম্মবিজ্ঞান নূতন কথা—সাধনার অতি নূতন অসি। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে মোগল সম্রাট আকবর হিন্দু, ইস্লাম ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সমালোচনা করিয়া, একটা সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মতত্ত্বে উপনীত হইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সে সময়ে বিজ্ঞানের বিচার প্রণালী সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট হয় নাই বলিয়া তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। য়ুরোপীয় সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক হিউমই ধর্ম্ম বিজ্ঞানের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। হিউমই সর্ব্বপ্রথমে মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম প্রবৃত্তির মূল অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া, ধর্ম্ম বিকাশের একটা সার্ব্বভৌমিক প্রণালী প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন। হিউম সন্দেহবাদী ছিলেন। তিনি ইন্দ্রিয়ানুভূতিকেই মানব জ্ঞানের মূল উপাদান বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং তাঁহার মতে অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব সমূহ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়; তাহাদের সম্বন্ধে আমরা অস্তি নাস্তি কোন কথাই বলিতে পারি না। ঈশ্বর তত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব, প্রভৃতি সকলই ইন্দ্রিয়বোধের অতীত, সুতরাং অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। কিন্তু এই সকল তত্ত্বের প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়াও হিউম ধর্ম্ম প্রবৃত্তির অস্তিত্ব মানিতেন। এই প্রবৃত্তি যে মানব প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন, এবং অপরাপর অন্তঃপ্রবৃত্তির ন্যায় ইহা যে সত্য, হিউম একথা স্বীকার করিতেন। এমন কি ঈশ্বরাস্তিত্ব প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ বলিয়া মানিয়াও, হিউম সমাজ রক্ষার্থে, সমাজ বিবর্ত্তনের নিম্নস্তরে এবং অজ্ঞজনগণের পক্ষে সকল অবস্থাতেই ধর্ম্ম বিশ্বাস ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপযোগিতা সরলভাবে বিশ্বাস করিতেন। সুতরাং ধর্ম্মের মূল ও প্রকৃতি অনুসন্ধানে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মে। বলিতে গেলে, বর্ত্তমান যুগে হিউমই বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে মানবীয় ধর্ম্মের আলোচনায় সূত্রপাত করেন। এইজন্য তাঁহাকেই য়ুরোপে ধর্ম্ম বিজ্ঞানের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে। কিন্তু হিউম বিভিন্ন ধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মের উপকরণ সকল সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন নাই। খৃষ্টীয়, ইস্লাম, হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ধর্ম্মের আলোচনা করিয়া হিউম আপনার সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। পরবর্ত্তী ধর্ম্মবিজ্ঞানবিদ্‌গণ এ কার্য্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। হিউম কেবল ধর্ম্মের অন্তঃপ্রকৃতিই সামাষ্টিভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে প্রেতপূজা হইতেই মানবীয় ধর্ম্মের উৎপত্তি। তৎপরে প্রাকৃতিক শক্তি ও বিষয়াদিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া দেববাদের সৃষ্টি হয়। ইহারই সঙ্গে সঙ্গে বলি পূজা প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করে। ক্রমে বহুদেববাদের মধ্য দিয়া একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ইহাই ধর্ম্মবিবর্ত্তনের চরম সোপান নহে। একেশ্বরবাদের পরে

সন্দেহবাদ বা অজ্ঞেয়বাদ। হিউমের মতে এই অজ্ঞেয়বাদেই মানবীয় ধর্ম্ম চরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়।

ধর্ম্ম বিজ্ঞানের লক্ষ্য।

সমুদয় বিজ্ঞানের লক্ষ্য যাহা, ধর্ম্ম বিজ্ঞানের লক্ষ্যও তাহাই। প্রাকৃতিক বিষয় ও ঘটনার বিচিত্রতার মধ্যে শৃঙ্খলা, নিয়ম ও একত্বের অনুসরণ ও প্রতিষ্ঠা করাই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের লক্ষ্য। সেইরূপ ধর্ম্মমতের ও ধর্ম্মানুষ্ঠানাদির বিচিত্রতার মধ্যে নিয়ম, শৃঙ্খলা, এবং একত্বের অনুসরণ করা এবং ধর্ম্মবিবর্ত্তনের ইতিবৃত্তরচনা ও ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক সত্যসমূহের প্রতিষ্ঠা করা ধর্ম্মবিজ্ঞানের লক্ষ্য। শব্দ স্পর্শ রূপ-রস-গন্ধময় এই জগৎ প্রপঞ্চ সম্বন্ধে মানবীয় অভিজ্ঞতা, জড় বিজ্ঞানের উপকরণ। সেইরূপ ঈশ্বর, জীব, ও পরলোক সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাই ধর্ম্ম বিজ্ঞানের উপকরণ। এই সকল উপকরণ লইয়া, তাহাদের গতি ও প্রকৃতি প্রভৃতির পর্য্যালোচনা করিয়াই ধর্ম্ম বিজ্ঞান রচিত হইয়া থাকে। এই সকল উপকরণ জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম হইতে সংগৃহীত হয়। সুতরাং ধর্ম্মের আলোচনা ব্যতিরেকে ধর্ম্ম বিজ্ঞান সম্যকরূপে গঠিত হইতে পারে না। বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে লোকে কেবল আপন আপন ধর্ম্মের কথাই স্বল্প বিস্তর জানিত; তাহার বাহিরে যে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান বা ধর্ম্ম মত আছে, তাহার সন্ধান কেহ রাখিত না। এই জন্য সে সময়ে প্রকৃতভাবে ধর্ম্মবিজ্ঞান আলোচনা করা সম্ভবপর ছিল না। প্রকৃত পক্ষে, বলিতে গেলে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধেই য়ুরোপীয় ধর্ম্ম বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ কর্ত্তৃক বিভিন্ন ধর্ম্মের আলোচনা।

এই ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের উপকরণ-সংগ্রহে খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ অশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহারা নানা দেশ দেশান্তরে আপনাদিগের ধর্ম্ম প্রচার করিতে যাইয়া, তত্তদ্দেশ প্রচলিত ধর্ম্মাদির অন্বেষণে নিযুক্ত হন। আপনার ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্যই, বিরুদ্ধ মতের সমালোচনা আবশ্যক হয়। এই রূপে তাঁহারা ভারতে আসিয়া হিন্দু ধর্ম্ম, চীনে যাইয়া বৌদ্ধ মত, আফ্রিকায় গিয়া তত্রত্য বর্ব্বর ধর্ম্ম সমূহের আলোচনাতে নিযুক্ত হন। ক্রমে ইঁহাদের দ্বারা ঐ সকল বিভিন্ন ধর্ম্মের মতামত ও অনুষ্ঠানের বিবরণাদি য়ুরোপের পণ্ডিত সমাজে প্রচারিত হইতে আরম্ভ করে। অন্যদিকে জড় বিজ্ঞানের অধ্যয়ন এবং আলোচনাতে, এবং সর্ব্বোপরি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিবিধ বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তি জাগরূক হইয়া, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রন্থের অলৌকিক প্রামাণ্যে পণ্ডিত মণ্ডলীর মনে স্বল্প বিস্তর সন্দেহের উদয় হয়। এই জন্য অভ্রান্ত শাস্ত্র পরিহার করিয়া, ধর্ম্মের একটা সার্ব্বভৌমিক ভিত্তি অন্বেষণ করা, ধর্ম্ম-সংরক্ষণার্থ নিতান্তই প্রয়োজন হইয়া উঠে। এই বিবিধ কারণেই বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্ম বিজ্ঞানের বিশেষ আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে।

রাজা রামমোহন—বর্ত্তমান ধর্ম্মবিজ্ঞানের প্রথম অধ্যাপক।

যদিও খৃষ্টীয় প্রচারকগণ বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্ম বিজ্ঞানের বিবিধ উপকরণ সংগ্রহ করিয়া, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা সম্ভবপর করিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের অশেষ সৌভাগ্য ও গৌরবের কথা এই যে, বিগত শতাব্দীর ধর্ম্ম বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মধ্যে, আমাদের পূজ্যতম রাজা রামমোহনই অগ্রণীর স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। তিনিই এই যুগে সর্ব্ব প্রথমে, হিন্দু, ইস্‌লাম, খৃষ্টীয়, এবং সম্ভবতঃ বৌদ্ধ মতের তুলনায় সমালোচনা করেন। যে সময়ে রাজা এই মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তখন য়ুরোপীয় পণ্ডিত সমাজে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ধর্ম্মতত্ত্বালোচনার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত অনুভূত হয় নাই। রাজার পরলোক গমনের চল্লিশ বৎসর পরে, অক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যেতৃবাসিগণ সমীপে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ধর্ম্ম তত্ত্বের আলোচনা করা যে সম্ভব, অশেষ পরিশ্রম সহকারে, ম্যাক্‌সমূলরকে ইহা প্রতিপন্ন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, রাজা রামমোহন যে আলোক ধারণ করিয়া, উদ্‌ভ্রান্ত ভারতবাসীদিগকে ধর্ম্মের সরল, সার্ব্বভৌমিক পন্থা প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পরে, ঠিক সেই ভাবে, সে আলোক আর কেহ ধারণ করিতে অগ্রসর হইলেন না। এইজন্য রাজার উত্তরাধিকারিরূপে যে আধ্যাত্মিক ধনগৌরব আমাদিগেরই প্রাপ্য ছিল, তাহা বিধিবিড়ম্বনায়, ক্রমে পরহস্তগত হইয়া গিয়াছে।

ম্যাক্‌সমূলর রাজার প্রকৃত উত্তরাধিকারী।

আমরা রাজার দেশে, রাজার বংশে, জন্মগ্রহণ করিয়াও তাঁহার যে সম্পদের অধিকারী হইতে পারিলাম না, জর্ম্মান দেশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, বিজাতীয় বিধর্ম্মী ম্যাক্‌সমূলর, সে সম্পদের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। রাজার পরে, ম্যাক্‌সমূলরই, প্রধানতঃ ধর্ম্ম বিজ্ঞানের তত্ত্বসমূহকে ইংরাজি ভাষাভিজ্ঞ জনগণের মধ্যে বহুলরূপে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁহার কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় থাকিবে।

ধর্ম্মের মূল কোথায়?

ইহাই ধর্ম্ম বিজ্ঞানের প্রথম বিচার্য্য। এই প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতেরা নানা মত অভিব্যক্ত করিয়াছেন। টাইলার বলেন, প্রাণীকরণেই ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। স্পেন্সার বলেন, পিতৃপুরুষদিগের পূজাই মানবীয় ধর্ম্মের আদি স্তর। ম্যাকসমূলর বলেন, মানব অন্তরে স্বভাবতঃই অনন্তের জ্ঞান নিহিত রহিয়াছে; এই জ্ঞান বাহ্য প্রকৃতির সংস্পর্শে উত্তরোত্তর বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এই জ্ঞান হইতেই ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে প্রাণীকরণের সত্যাসত্য সম্বন্ধে সামান্যতঃ আলোচনা করিয়াছি। কেবল প্রাণীকরণ হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি হইতে পারে না। উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ ধর্ম্মের মৌলিক ভাব। যেখানে এই সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় না, সেখানে ধর্ম্মের উৎপত্তি হয় না, হইতে পারে না। শুদ্ধ প্রাণীকরণে প্রাণহীনে প্রাণ আরোপ করিতে পারে, কিন্তু পূজা পদ্ধতির উদ্ভব করিতে পারে না। বিবর্ত্তনের নিম্নস্তরে স্বার্থের সম্বন্ধ ব্যতিরেকে পূজার সম্বন্ধ কুত্রাপি প্রতিষ্ঠিত হয় না। সুতরাং ধর্ম্মের মূলে, আর যাহাই কিছু থাকুক না কেন, আত্মরক্ষা বা স্বার্থরক্ষার ভাব তাহাতে নিতান্তই থাকা প্রয়োজন। মধ্য আফ্রিকার কৃষ্ণকায় কুঞ্চিতকেশ কাফ্রি প্রাতঃকালে আপনার কুটির হইতে বহির্গত হইয়া পথিমধ্যে উপল খণ্ডে হোঁচট খাইয়া পড়িলে,—সেই উপলে প্রাণের আরোপ করিয়া, "বটে, বটে, তুমি এখানে ছিলে, আমি তাহা জানিতে পারি নাই,"—এই বলিয়া তাহাকে আপনার ঝুলিতে সযত্নে তুলিয়া রাখে। এখানেই প্রাণীকরণের কার্য্য শেষ হইল। কিন্তু যদি সে দিনের সেই যাত্রা তাহার কল্যাণসাধন না করে, যে উদ্দেশ্যে সে কুটির পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহা যদি সিদ্ধ না হয়, তবে ঐ উপলখণ্ডকে সে দূরে নিক্ষেপ করে। কিন্তু যদি কার্য্য সিদ্ধ হয়, তবে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া, তাহাকে আপনার দেবালয়ে প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার পূজা আরম্ভ করে। টাইলার প্রদত্ত, এই দৃষ্টান্ত হইতেই আমরা স্পষ্টতঃ দেখিতে পাই যে, কেবল প্রাণীকরণে ধর্ম্ম হয় না, তাহার সঙ্গে কোনও স্বার্থের যোগ থাকা অত্যাবশ্যক।

স্পেন্সার এই জন্য, প্রাণীকরণে ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, এই মত গ্রহণ না করিয়া হিউমের ন্যায় প্রেত পূজা হইতেই ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, বলিতেছেন। কিন্তু তাহাই কি ঠিক? কোনও কোনও ধর্ম্মের নিম্নতর স্তরে প্রেতপূজার প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয় সত্য, কিন্তু সকল ধর্ম্মে ত তাহা দেখিতে পাই না। এমন অনেক বর্ব্বর জাতির কথা আমরা শুনিতে পাই, যাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মানুষ্ঠানরূপে প্রেতপূজা প্রভৃতি কিছুই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; কিন্তু কোনও বিশেষ সামাজিক আচার ব্যবহারকে, কোনও বিশেষ জাতীয় চিহ্নকেই, যাহারা ধর্ম্মরূপে প্রতিপালন ও পোষণ করে, এই আচারের অন্যথা করা, বা এই চিহ্ন ধারণ না করা, ইহাদের মধ্যে এক মাত্র অধর্ম্ম কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং ধর্ম্মবিজ্ঞান ধর্ম্মের যে ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিবে, তাহা সর্ব্বাগ্রে সার্ব্বভৌমিক হওয়া চাই। ছোট বড়, সভ্য অসভ্য, সকল জাতির ধর্ম্মানুষ্ঠানের মূলেই তাহা থাকা প্রয়োজন। প্রাণীকরণ বা প্রেতপূজা, এই দুয়ের কোনটীই ধর্ম্মের এই সার্ব্বভৌমিক ভিত্তি নহে। ম্যাক্সমূলরও প্রাণীকরণ এবং প্রেতপূজা এতদুভয়ের একটীকেও ধর্ম্মের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেন নাই।

ধর্ম্মের ভিত্তি—ম্যাক্সমূলরের মত।

ম্যাক্সমূলর, জর্ম্মান দার্শনিক শেলিংএর শিষ্য ছিলেন। শেলিংএর নিকট হইতেই তিনি মানব অন্তরে অনন্তের প্রতি একটা স্বাভাবিক নির্ভরের ভাব নিহিত আছে, এই তত্ত্ব শিক্ষা করেন। এই তত্ত্বের উপরেই তিনি ধর্ম্মতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা যাহাকে অনন্ত বলি, জ্ঞানের শৈশবে, তাহা অনুভব করা অসম্ভব, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন, ম্যাক্সমূলরও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ঠিক এই ভাবে না হইলেও, অতি বৃহৎ, এবং অতি ক্ষুদ্র (Infinitely large and infinitely small) অনির্দ্দেশ্য ভাবে বড়, এবং অনির্দ্দেশ্য ভাবে ছোট, এইরূপে, মানব সভ্যতার শৈশব-দোলাতেও, সমাস্থতঃ অনন্তের একটা আভাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাকেই ম্যাক্সমূলর অনন্তের অনুভূতি বলিয়াছেন। তাঁহার মতে এই অনুভূতি হইতেই মানবীয় ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। কিন্তু অনন্তের একটা অনুভূতি থাকিলেই, তাহা হইতে কিরূপে, আর কেনই বা উপাসনার উৎপত্তি হইবে, ম্যাক্সমূলর এই প্রশ্নের বিচার করেন নাই; করিলেই স্বকীয় মতের অপূর্ণতা প্রত্যক্ষ করিতেন। যদি বলা যায় যে, কেবল অনন্তের অনুভূতি নহে, কিন্তু এই অনন্তের উপরে একটা নির্ভরের ভাবও মানব মনে সহজসিদ্ধ রহিয়াছে; তাহা হইলে প্রশ্ন হয়, এই নির্ভরের ভাব কোথা হইতে আসে, বা কি উপায়ে জাগরূক হয়। মানবের অন্তরে যে সকল মৌলিক ভাব স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তিরূপে বিরাজিত, তাহার অনুরূপ বিষয়ের বহিঃপ্রকাশ ব্যতিরেকে, কুত্রাপি তাহা জ্ঞানের ভূমিতে উদিত হয় না। র‍্যাফেলের চিত্তে অসাধারণ সৌন্দর্য্যানুভূতি ছিল; না থাকিলে তিনি এমন অলৌকিক ছবি সকল রচনা করিতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি যদি ইটালীয় সমাজে জন্ম গ্রহণ না করিতেন, তাঁহার জাতীয় জীবনে যদি সৌন্দর্য্যচর্চ্চা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ না করিত, পূর্ব্ব পূর্ব্বকালের চিত্রকরদিগের চিত্রচাতুর্য্য যদি তিনি দেখিতে না পাইতেন, আরবের মরুভূমিতে নগ্ন রুক্ষকায়, সৌন্দর্য্যবোধবিহীন, জনমণ্ডলীর মধ্যে যদি তাঁহাকে জীবন অতিবাহিত করিতে হইত, তাহা হইলে কদাপি তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা প্রকৃষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিতে পারিত না। অন্তরের ভাবের অনুরূপ বহিঃপ্রকাশ ব্যতিরেকে সে ভাবের স্ফূর্ত্তি হয় না। ম্যাক্সমূলরও এই সত্য অনুভব করিয়াছিলেন; এই জন্যই শুদ্ধ অনন্তের অন্তর্জ্ঞানে ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, এ কথা না বলিয়া, এই অন্তর্জ্ঞান, বাহ্য প্রকৃতির সংস্পর্শে জাগরূক হইয়া, মানবীয় ধর্ম্ম রচনা করে, ইহাই বলিয়াছেন। অর্থাৎ বাহ্য প্রকৃতির অধীনতার জ্ঞান হইতেই, অন্তর্নিহিত অনন্তের উপরে নির্ভরের ভাব উদিত হইয়া থাকে। এই সকলই অতি সত্য সন্দেহ নাই। এবং এই জন্য টাইলারের প্রাণীকরণের মত, কিম্বা স্পেন্সারের প্রেতপূজার মত অপেক্ষা ম্যাক্সমূলরের এই মত শ্রেষ্ঠ ও সমধিক যুক্তযুক্ত। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, কেবল বাহ্য প্রকৃতির অধীনতা হইতেই কি অনন্তের জ্ঞান মানব অন্তরে প্রস্ফুটিত হয়, না তাহার আরো কোনও উৎপত্তি স্থান আছে?

অনন্তের আদি প্রকাশ।

এই প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, আদিতে অনন্তের ভাব, কিরূপ আকারে মানব মনে প্রতিভাত হয়, ইহার আলোচনা করা প্রয়োজন। দর্শনে যে অনন্তের কথা বলে, বর্ব্বর মানবের পক্ষে সে অনন্তের জ্ঞানলাভ করা তো দূরের কথা, অনেক জ্ঞানাভিমানীর পক্ষেও তাহা বুঝিয়া উঠা সুকঠিন। দার্শনিকভাবে বর্ব্বরেরা কদাপি অনন্তকে বুঝিতে বা ধরিতে পারে না। অতি বড় বা অতি ছোটরূপে, জ্ঞানের শৈশবে মানব অন্তরে অনন্তের ভাব প্রতিভাত হইয়া থাকে, ম্যাক্সমূলরের এই কথাও কল্পনাপ্রসূত। বৃহৎ বস্তুকে ছাড়িয়া বৃহত্ত্বের একটা সাধারণ ভাব বা ক্ষুদ্র বস্তুকে ছাড়িয়া ক্ষুদ্রত্বের একটা সাধারণ ধারণা, জ্ঞানের শৈশবে সম্ভবপর হয় না। বর্ব্বর চিন্তা এইরূপ সমন্বয়-সাধনে, এই সকল abstraction করিতে একেবারেই অক্ষম। সে অবস্থায় বৃহৎ বস্তুর জ্ঞান হয়, বৃহত্ত্বের জ্ঞান হয় না। অথচ অতি বড় বা অতি ছোট রূপে অনন্তের আভাষ, বৃহত্ত্ব বা ক্ষুদ্রত্বের জ্ঞান হইতেই কেবল পাওয়া সম্ভব। কিন্তু বর্ব্বরের অনন্তের জ্ঞান না থাকিলেও ইদংএর জ্ঞান চিরদিনই থাকে। ফলতঃ মানবজ্ঞান মাত্রেই অহং ও ইদং মূলক। এই ইদংকে ইংরাজীতে not--me বলা যায়। এই ইদংএর জ্ঞান হইতেই, মানব চিন্তার বিবর্ত্তনে ক্রমে অনন্তের জ্ঞান প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে।

ইদংএর দ্বিবিধ মূর্ত্তি।

মানব সমক্ষে এই ইদং দুই আকারে উপস্থিত হয়; এবং দুই দিক দিয়া ইহা মানবের চিত্তকে অভিভূত করে। এক প্রকৃতির মধ্যে, অপর জন সমাজে। প্রকৃতির শক্তি ও সমাজের শক্তি এই দুই দিক দিয়া মানব ইদংএর দ্বারা সংহত ও সংযত হয়। ঝড়, ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি, বজ্র, ভূকম্পন, দাবানল, মহামারী ও বন্য জন্তুর উৎপীড়ন, এই সকলে প্রকৃতির শক্তি প্রকাশিত হইয়া, বর্ব্বর মানবের স্বেচ্ছাচার ও বিষয়-ভোগের ব্যাঘাত উৎপাদন করে। এক দিক দিয়া এই শতমুখী শক্তির দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপ অনুভব করিয়া আত্মরক্ষার্থে এই শক্তির সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করা প্রয়োজন হয়। অপর দিক দিয়া সমাজপতি, দলপতি বা গোষ্ঠীপতির আদেশ ও শাসনরূপে, কিম্বা সামাজিক রীতি নীতির ও আচার ব্যবহারের বাধা বাধকতার আকারে, সমাজ শক্তি আসিয়া তাহাকে সংহত ও সংযত করে; তাহার স্বেচ্ছাচারের ব্যাঘাত উৎপাদন করিয়া থাকে। সামাজিক জীবনে সে এই শক্তিরও দুর্দ্দমনীয় প্রতাপ অনুভব করে, এবং বংশ রক্ষার্থ এই শক্তির সঙ্গে সন্ধিস্থাপন অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করে। এইরূপে আদি হইতেই আত্মরক্ষার জন্য প্রাকৃতিক শক্তির উপর, এবং বংশ রক্ষার জন্য সমাজ শক্তির উপরে মানবকে বিশেষভাবে নির্ভর করিতে হয়। ম্যাক্সমূলর যে অনন্তের উপরে নির্ভর করা মানব মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলেন, বিচার পূর্ব্বক বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে, তাহা ফলতঃ এই বিবিধভাবে শুদ্ধ ইদংএর উপরে নির্ভর ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ধর্ম্মের দুই মূল—প্রকৃতি ও সমাজ, দেবপূজা ও প্রেতপূজা।

অতএব ধর্ম্মের উৎপত্তি এক মূল হইতে নহে, কিন্তু যুগপৎ দুই

মূল—ইদংএর এই দ্বিবিধ মূর্ত্তি হইতে। প্রকৃতির উপরে নির্ভর, প্রাকৃতিক শক্তির অধীনতা ও তাহার সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা হইতে দেবপূজা, এবং সমাজের উপর নির্ভর, সমাজশক্তির অধীনতা ও তাহার সঙ্গে সখ্যস্থাপনের আবশ্যকতা হইতে প্রেতপূজা—কিম্বা কোন সামাজিক চিহ্ন ধারণ, এই দুই আকারে মানবের ধর্ম্ম সর্ব্বাংশে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই ধর্ম্মানুষ্ঠানের মূলে আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষা এই দুই প্রবৃত্তি রহিয়াছে। এই দ্বিবিধ প্রবৃত্তি হইতেই মানবের ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে।

ধর্ম্মের বিচিত্রতার কারণ।

আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার জন্য মানবের স্বাভাবিক ব্যাকুলতা হইতেই তাহার ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল উৎপন্ন হইয়া, নিসর্গ পূজা ও সমাজ শাসনের বশ্যতা ও প্রেতপূজা, এই দুই ধারায় প্রবাহিত হয়। কিন্তু সকল সময়ে ত সমভাবে আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার প্রয়াস পাইতে হয় না। সকল অবস্থাতেও এই দুই বিষয়ের উপরে সমান দৃষ্টি রাখা আবশ্যক হয় না। যে জাতি অপরাপর বিরুদ্ধ জাতি হইতে দূরে থাকিয়া, প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, তাহার চিত্ত নিসর্গের শক্তি দ্বারাই সমধিক অভিভূত হইয়া থাকে, হওয়াই স্বাভাবিক। সে যে সমাজশাসন মানে না তাহা নহে, বংশ রক্ষার জন্য যে সমাজের বশ্যতা ও সামাজিক রীতি নীতির যথাযোগ্য অনুসরণ তাহার পক্ষে প্রয়োজন হয় না, তাহা নহে, কিন্তু এ সকল সে কলের মতই করিয়া যায়। এ বিষয়ে তাহাকে কিছু চেষ্টা চরিত্র করিতে হয় না। অপর দিকে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে সে গলদঘর্ম্ম; সুতরাং সেই দিকেই তাহার চিন্তা ও ভাবনা নিয়ত ছুটিয়া যায়। এইজন্য তাহার সে অবস্থায় ধর্ম্মে ও নিসর্গের উপরেই বেশী ঝোঁক দেখিতে পাওয়া যায়। নিসর্গ দেবতাদের প্রাধান্য সে ধর্ম্মে দৃষ্ট হয়। আবার আর এক জাতি অপর বিরোধী জাতির সান্নিধ্যে বাস করিতেছে। কেবল প্রকৃতি দ্বারা নহে, কিন্তু প্রাকৃতিক শক্তি অপেক্ষা তাহারা শতগুণে এই বিরোধী সমাজের সমবেত শক্তি দ্বারা সংহত হইতেছে, সততই দলবদ্ধ হইয়া তাহাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইতেছে। এজন্য দলপতির বশ্যতা স্বীকার প্রয়োজন হইয়া উঠে। দলপতি সমাজ শক্তিরই আধার, সুতরাং সমাজবন্ধন দৃঢ় হইতে থাকে। এ অবস্থায় তাহার ধর্ম্মে নিসর্গ অপেক্ষা সমাজেরই উপরে বেশী দৃষ্টি পড়া স্বাভাবিক। এই জাতির আদি ধর্ম্মে নিসর্গ পূজা অপেক্ষা প্রেত পূজার প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যাইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। এইরূপে কোথাও বা কোন জাতির ধর্ম্মে, নিসর্গের প্রতি দৃষ্টি বেশী; কোথাও বা সমাজের প্রতি দৃষ্টি বেশী, আর কোথাও বা সমভাবে সমাজ ও নিসর্গ উভয়েরই প্রতি দৃষ্টি পড়ে। এবং এই কারণে এক দিক দিয়া ধর্ম্মে বিচিত্রতা উৎপন্ন হয়।

এ ছাড়া ধর্ম্মের বিচিত্রতার আরও কারণ আছে। তন্মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির চিন্তাপ্রণালীর সমাজ গঠনের বিভিন্নতাই সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু তাহার সম্যক্ আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে অসম্ভব।

ধর্ম্মবিবর্ত্তনের সাধারণ প্রণালী।

ধর্ম্ম বিবর্ত্তনের সবিস্তার আলোচনাও বর্ত্তমান প্রবন্ধে অসম্ভব। সংক্ষেপতঃ ইহা বলা যাইতে পারে যে, মানব ধর্ম্মের আদি সোপানে সামাজিক বিধানের বশ্যতার সঙ্গে সঙ্গে নদী, বন, সরিৎ, বৃক্ষ, প্রভৃতি পার্থিব পদার্থের, সর্প, ব্যাঘ্র, প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর, দাবানল, বন্যা, ভূকম্পন প্রভৃতি নৈসর্গিক উৎপাতের এবং বিবিধ শারীরিক ব্যাধি ও মহামারী প্রভৃতির দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া, তাহাদের অন্তরে, প্রাণী-কর্ত্তৃত্বের দ্বারা, আত্মশক্তি সদৃশ, ব্যক্তিত্ব কল্পনা করিয়া কখনও বা বলি প্রভৃতি দ্বারা তাহাদের তুষ্টি সম্পাদন, কখনও বা উচ্চাটনাদি মন্ত্রের দ্বারা তাহাদিগকে পরাভূত করিতে চেষ্টা করে।

ক্রমে জঙ্গল কর্ত্তন কার্য্য সমাধা হইলে, মানব পশুপালন এবং যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করে, এবং কৃষি কার্য্যাদিতে নিযুক্ত হয়। এই অবস্থায় রৌদ্র বৃষ্টি প্রভৃতিই তাহার ভাবনার প্রধান বিষয় হয়। ক্রমে পার্থিব পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া সে আকাশ দেবতাদিগের পূজাতে প্রবৃত্ত হয়। অন্য দিকে সামাজিক শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রেতাত্মার পূজা আরম্ভ হয়। এই স্তরে দিবা ও রাত্রির আশ্চর্য্য প্রত্যাবর্ত্তন, সূর্য্য চন্দ্রের প্রভাব, ও তাহাদের দ্বারা অন্ধকারের বিনাশ, এই সকল নৈসর্গিক ঘটনাও মানবের ভাবনার বিষয় হয়। ক্রমে মঙ্গল এবং অমঙ্গলের সঙ্গে আলোক ও অন্ধকারের সমন্বয় সাধিত হইয়া, আলোক-দেবতা সামাজিক জীবনের মঙ্গলের প্রতিষ্ঠাতা সমাজধর্ম্মের আবহরূপে কল্পিত হন।

তৎপরে বহুদেববাদ হইতে একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাই মানবীয় ধর্ম্মের চরম অবস্থা নহে। এই একেশ্বরবাদের পরে ক্রমে অধ্যাত্মতত্ত্বের বিকাশ হইয়া, সর্ব্বশেষে মানব ধর্ম্ম চরম অবস্থায় সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে।

এই প্রণালী অনুসারেই মোটামোটি, ভারতীয় ধর্ম্মও ফুটিয়া উঠিয়াছে। বেদে আর্য্যজীবনের যে চিত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে তাঁহারা তৎপূর্ব্বেই জঙ্গল কর্ত্তনের অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, ইহা স্পষ্টতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে ঋগ্বেদের কোনও কোনও স্থলে সে প্রাচীন অবস্থারও ঈষদুল্লেখ দেখিতে পাই। আর্য্যেরা তখন কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত, সুতরাং আকাশ দেবতাগণই ঋগ্বেদের প্রধান উপাস্য। সে সময়ের দেবতারা বিশিষ্টভাবেই আরাধিত হইতেন কিন্তু ক্রমে বহুদেববাদ পরিহার করিয়া, প্রাচীন আর্য্যগণ একেশ্বরবাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই পরিবর্ত্তনের অবস্থায়, আর্য্যেরা যখন যে দেবতার স্তুতি করিতেন, তাহাকেই সর্ব্বময়, সর্ব্বাধিপতি বলিয়া বর্ণনা করিতেন। এই অবস্থার ধর্ম্মকে মাক্সমূলর henotheism নাম দিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে বৈদিক ধর্ম্মে যে বহুদেববাদ আছে, মাক্সমূলর ইহা স্বীকারই করেন না। বৈদিক ধর্ম্মে তাঁহার মতে, একেশ্বরবাদও নাই, বহু ঈশ্বরবাদও নাই। ইহার মাঝামাঝি একটা অবস্থা—যাহার নাম henotheism ক্রমে বৈদিক ধর্ম্ম এক প্রকারের একেশ্বরবাদে পৌঁছিয়াছিল। তথাপি মোটামোটি ইহাকে মাক্সমূলর নিসর্গ ধর্ম্ম Physical Religion এরই অন্তর্গত বলিয়া গণনা করিয়াছেন।

উপনিষদ বেদান্ত।

উপনিষদে ভারতীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রধানতঃ আত্মাতে অনন্তকে অনুভব ও প্রত্যক্ষ করে। বেদে যে অনন্ত নিসর্গে প্রকাশিত, উপনিষদে সেই অনন্তই আত্মাতে অভিব্যক্ত। কিন্তু এখানেই ধর্ম্মের চরম উৎকর্ষ লাভ হইল না। অনন্ত ত আর দুই হইতে পারে না। সুতরাং নিসর্গে অনন্তের যে প্রকাশ দেখা গিয়াছে, আত্মাতে তাহার যে অনুভূতি প্রত্যক্ষ হইয়াছে, এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। বেদান্তে সে সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। এইজন্য বেদান্তকেই মাক্সমূলর ভারতীয় ধর্ম্মের চরম উৎকর্ষ বলিয়া গ্রহণ করেন। তাঁহার মতে ইহাই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম। খ্রীষ্টীয় তত্ত্ববিদ্গণ, মহম্মদীয় সুফী সাধকগণ হিন্দু বৈদান্তিকের ন্যায় এই সার্ব্বভৌমিক তত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। বেদান্তের মূল সত্যেই সকল সত্যের সমন্বয়।

পুরাণ ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম।

বেদান্তেই ভারতীয় আর্য্যধর্ম্মের চরম উৎকর্ষ লাভ হইয়াছে, বলিয়া

ম্যাক্স মুলর পৌরাণিক বিশেষতঃ বৈষ্ণব ধর্ম্মের কোনও বিশেষ আলোচনা করেন নাই। পুরাণেও অনেক ভুল ভ্রান্তি থাকিলেও, পৌরাণিক ধর্ম্ম যে বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্বের আরও উচ্চতর বিকাশ, বিশেষতঃ বৈষ্ণব ভক্তি মার্গেই যে হিন্দুধর্ম্ম চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, একথা কোনও য়ুরোপীয় পণ্ডিত আজি পর্য্যন্ত বিচার করিয়া দেখেন নাই। ম্যাক্স মুলরও তাহা করেন নাই বলিয়া, তাঁহার দোষ দিই না। তবে ম্যাক্স মুলরের সূচিত কার্য্য যাঁহারা সমাধা করিতে যাইবেন, তাঁহাদিগকে পুরাণ ও বৈষ্ণব শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা না করিলে চলিবে না।

(সমাপ্ত)

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

বারাণসী।

(১)

বালার্কের স্বর্ণ করোজ্জ্বলিত কাশীর বক্ষে অবতীর্ণ হইতে না হইতে, অত আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইল। মধুচক্র-বেষ্টনকারী মক্ষিকাকুলের মত, এক দল যাত্রা-ওয়ালা ও গঙ্গাপুত্র আমাকে যুগপৎ বেষ্টন করিল। গঙ্গা-পুত্রেরা স্নানের ঘাটে মন্ত্র পড়াইয়া যাত্রীদের নিকট পয়সা আদায় করে। আর যাত্রাওয়ালারা কাশীর সকল স্থান যাত্রীদিগকে দেখাইয়া আনে। ধরিতে গেলে যাত্রা-ওয়ালারা guide এর কাজ করে। এক সময়ে গঙ্গাপুত্রদের ভয়ানক অত্যাচার ছিল। যখন নদী পথে লোকে কাশী যাত্রা করিত, যখন রেল পথ সুগম হয় নাই, তখন এই গঙ্গাপুত্রেরা ধর্ম্মের আচ্ছাদনে অনেক অধর্ম্মাচরণ করিত। ধনীর নৌকার সন্ধান পাইলে তাহারা দলবল সমেত তাহাকে ডাকিয়া সুযোগ বুঝিলে লুটপাট পর্য্যন্ত করিত, নৌকা ডুবাইয়া দিত। জলপন্থী ঠগ জাতীয় দস্যুদের সহিত ইহাদের ব্যবসার সংস্রব ছিল। সেকালের একজন সুদক্ষ মাজিষ্ট্রেট—স্যামুয়েল সাহেব অনেক চেষ্টা করিয়া ইহাদের দমন করেন।

যাহা হ'ক, আমি যাত্রী নই এই কথাটা তাহাদের বুঝাইয়া দিলাম। তাহারা নিরুপায় হইয়া আমায় ছাড়িয়া দিল। যাহারা নিতান্ত নাছোড়বান্দা তাহারা আমার এক্কার পিছনে পিছনে দৌড়াইতে লাগিল। দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া ক্লান্ত হইয়া শেষ গালাগালি দিতে দিতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল।

বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্টে আমার আবাস স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এখানে আমার পরমাত্মীয় শ্রীমান—বাস করিতেন। বারাণসীতে তিনি অনেক দিন কাটাইয়াছেন ও লাভজনক চাকরী করিয়া তিনি সেখানে বাড়ীঘর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সেইখানে গিয়া উঠিলাম। তিনি সহসা আমায় পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। সেই দিন বারাণসী ক্ষেত্রে প্রথম অন্ন গ্রহণ করিলাম।

ক্যাণ্টনমেণ্টটী বেশ নির্জ্জন স্থান। সহর হইতে আগে ক্যাণ্টনমেণ্টে যাইতে হইলে এক্কা বা পাল্কি গাড়ির আশ্রয় লইতে হইত এখন ক্যাণ্টনমেণ্টে ষ্টেসন খুলিয়াছে। এখানে গোরাবারিক, কাশীরাজের পুরাতন টঙ্কশালা, জজ্ মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীদের বাঙ্গলা গির্জ্জা প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। বারাণসী সহরের সহিত তুলনায় এ অংশ অতি নির্জ্জন। প্রসর খুটিম বাঁধান পথের দুইধারে বড় বড় ছায়াময় গাছ—শেষ ভাগে ক্ষীণকায়া বরুণা ও তাহার উপরে লৌহময় সেতু—জন সমাগম বিরল প্রসারিত রাজবর্ত্ম—ইউরোপীয়গণের দ্রুত চালিত শকট-নেমীর ঘর্ঘর নিনাদ—এই সব লইয়াই ক্যাণ্টনমেণ্টের অস্তিত্ব।

দিন কতক খুব আনন্দে কাটিল। এ আনন্দটা অবশ্য ক্যাণ্টনমেণ্টে বসিয়া উপভোগ করি নাই। প্রতি দিন প্রাতে উঠিয়া দশাশ্বমেধে স্নান করিতে যাইতাম। স্নান করিয়া বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণার দর্শন করিতাম। মধ্যাহ্নে উত্তপ্ত রৌদ্র মাথায় লইয়া বাটীতে ফিরিতাম। দিবাভাগে আহারান্তে নিদ্রার পর সান্ধ্য বায়ুসেবন ও সন্ধ্যায় বিশ্বনাথের আরতি সন্দর্শন। আনন্দময়ের আনন্দ-কাননে এইরূপ আনন্দেই দিন কাটিত।

আনন্দকানন প্রকৃতই আনন্দ কানন। কাশীতে যাহা আছে, তাহা কাশীরই উপযুক্ত। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে বারাণসী প্রাচীনতমা নগরী। হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের মতে প্রয়াগ, নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, অবন্তিকা, অযোধ্যা, মথুরা, দ্বারকা, অমরাবতী, গঙ্গাসাগর সঙ্গম, সরস্বতী, সিন্ধুসঙ্গম, ত্র্যম্বক, গোদাবরী, কালঞ্জর, প্রভাস, বদরিকাশ্রম মহালয়, ওঙ্কার, পুরুষোত্তম, গোকর্ণ, ভৃগুকচ্ছ, ভৃগুতুঙ্গ, পুষ্কর, শ্রীপর্ব্বত, মানসতীর্থ, গয়া প্রভৃতি কয়েকটী তীর্থ মুক্তিদায়ক বলিয়া উল্লিখিত। বারাণসী, ইহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সমগ্র ভারতবর্ষে বারাণসীর ন্যায় প্রাচীনতমা নগরী আর দ্বিতীয় নাই। ধর্ম্মগ্রন্থে, শাস্ত্রে, পুরাণে, উপকথায়, সাহিত্যে কবিতায় দর্শনে, বিজ্ঞানে,

বারাণসীর নাম সর্ব্বতোভাবে সংযোজিত। বারাণসী সমগ্র ভারতবর্ষের জ্ঞানের প্রবেশদ্বার। বিলাতে যেমন অক্সফোর্ড— ভারতবর্ষের সেইরূপ বারাণসী, সাধনার কেন্দ্র, মুমুক্ষুর প্রিয়, বাণীর বিলাসকানন, জ্ঞানের বিকাশক্ষেত্র, কর্ম্মের ক্রীড়া ভূমি। বারাণসী—অতীতের পরিস্ফুট কীর্ত্তি কাহিনী—যুগ পরিবর্ত্তনের জাগ্রৎ ইতিহাস, হিন্দুর ক্রমিক অধঃপতনের সাক্ষী, আর হিন্দু, বৌদ্ধ, মোগল, পাঠান ও ইংরাজ এই পঞ্চাধিকার কালের গাথাময় পরিস্ফুট ইতিহাস। আধ্যাত্মিক, সামাজিক, লৌকিক, রাজনৈতিক—সর্ব্ববিষয়ক ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠা যেন বারাণসী একাই বলিতে পারে। কত পুণ্যাত্মা ধার্ম্মিকের দেহ এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে মুক্তিলাভ করিয়াছে। কত মণিময় মুকুট-মণ্ডিত মস্তক মণিকর্ণিকার কাহিনীময় শ্মশান ভস্মে মিশাইয়াছে—কত প্রস্ফুট প্রতিভা কালের বিনশ্বর স্রোতের উপর ভাসিয়া গিয়াছে। সেই অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র, অযোধ্যা, গান্ধার, মগধ, উজ্জয়িনী, দ্রাবিড়, কর্ণাট, ইন্দ্রপ্রস্থ—যাহাদের সহিত পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আজও বারাণসী যুগ যুগান্তরের স্পর্দ্ধা বহন করিতেছে—আজ কোথায় সেই সব লোকবিশ্রুত জনপদ। তাহারা সকলেই গিয়াছে —আছে কেবল বারাণসী।

বারাণসী যেন উত্তাল তরঙ্গময় কালসমুদ্রে একমাত্র স্পর্দ্ধাবান উন্নতমস্তক সমুদ্র-গিরি। যে সময়ে প্রাচীনতম নগরী বেবিলন নিনেভের সহিত প্রাধান্য লইয়া বিবাদে ব্যাপৃত টায়ার যখন নূতন উপনিবেশ স্থাপনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—এথেন্স যখন ধীরে ধীরে বল সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত, বীরপ্রসবিনী রোম যখন জগতের মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই, তখনও এই বারাণসী সমগ্র ভারতের শিক্ষাকেন্দ্ররূপে সগর্ব্বে দণ্ডায়মান ছিল। সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া অতীতের গৌরব স্বরূপ যাহারা ছিল—তাহারা সঙ্গে গিয়াছে; কিন্তু বারাণসী আজও সেই সব অতীতের সুখ দুঃখ, জয় পরাজয় কীর্ত্তি অকীর্ত্তি, উন্নতি অবনতির কাহিনীস্তম্ভরূপে অবিনশ্বর ভাবে দণ্ডায়মান। তোমার প্রাণে যদি একটু মহত্ব থাকে, এই বিশাল জম্বু দ্বীপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ বলিয়া যদি আপনাকে সৌভাগ্যবান বোধ করিয়া থাক, তোমার হৃদয়ে যদি একটু জাতীয় গৌরব থাকে, জাতীয় ইতিহাসের প্রতি তোমার যদি একটুও আন্তরিক অনুরাগ থাকে, এই পুণ্য ক্ষেত্রে আর্য্যভূমিতে জন্মিয়া উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার উজ্জ্বল জ্যোতিতে আত্মহারা না হইয়া যদি এখনও তোমার মনে হিন্দুত্বের কোন গৌরব বা আত্মাভিমান থাকে—তবে একবার বারাণসী দেখিয়া আইস। তোমার দেশে যাহা ছিল, যাহা চলিয়া গিয়াছে, তাহা আর দেখিতে পাইবে না—যাহা অতীতের স্বপ্ন, বর্ত্তমানের দুরাশা, ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন—তাহাই বারাণসীতে বর্ত্তমান। নূতন ও পুরাতনের সংমিশ্রণে বর্ত্তমান বারাণসীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইলেও কয়েকবার প্রদক্ষিণ করিবা তাহা হইতে তুমি যে শিক্ষা লাভ করিবে—শত শত খণ্ড ইতিহাস পাঠে তাহার অর্দ্ধেক শিক্ষা পাইবে কিনা সন্দেহ। কূপমণ্ডুকের আত্মমহত্বে স্ফীতগ্রীব না হইয়া একবার তোমার ভারতবর্ষের কোথায় কি আছে, দেখিয়া আইস—তোমার যুগযুগান্তর সাধনার ফল ফলিবে।

বারাণসী নামটী কোথা হইতে আসিল এখন তাহারই একটু আলোচনা করা যাউক। শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় শত পথ ব্রাহ্মণে এবং কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষদে সর্ব্বপ্রথমে কাশী শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "অতঃ কাশয়ো হগ্নীনা দত্তং" ইত্যাদি সূক্তে কাশী নামের অতি প্রাচীনত্ব জ্ঞাপক। কেবল প্রাচীন নহে—কাশী সেই সময়ে একটী বিস্তৃত জনপদ ছিল। রামায়ণের সময়ে কাশী ঐশ্বর্য্য লোক বিশ্রুত।

> উত্তরানন্দা কাশেয়পুরীং বারাণসীং ব্রজ।
> রমণীয়াং ত্বয়া গুপ্তাং সুপ্রাকারাং সুতোরণাম্॥
> * * * *
> প্রতিষ্ঠানে পুরবরে কাশি রাজো মহাযশাঃ :—

প্রভৃতি শ্লোকে কাশীর ঐশ্বর্য্যময়ী অবস্থা পরিকীর্ত্তিত হইতেছে। এক্ষণে বারাণসী এই নামের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে একটু অনুসন্ধান করা যাক্। কেহ কেহ বলেন কাশীতে বরণার নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন, তাঁহার নামানুসারে বারাণসী হইয়াছে। তিনি "বারাণসী নামে এক দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা আজও কাশীতে বর্ত্তমান। কিন্তু কাশীখণ্ডের বিবরণ অনুসরণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—

> বরণা পিঙ্গলা নাড়ী তদন্তস্তু বিমুক্তকং
> সা সুষুম্না পরা নাড়ীত্রয়ং বারাণসী ত্বসৌ,

অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলা জড়িত সুষুম্না নাড়ীর ন্যায় বরুণা

ও অসি এই উভয়ের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া কাশী বারাণসী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে কিম্বা—

অসিশ্চ বরণা যত্র ক্ষেত্ররক্ষাকৃতো কৃতে ॥
বারাণসীতি বিখ্যাতা তদারভ্য মহামুনেঃ।
অসেশ্চ বরণায়াশ্চ সঙ্গমং প্রাপ্য কাশিকা ॥

"অর্থাৎ সত্যযুগে যখন এই কাশী ক্ষেত্র রক্ষা করিবার জন্য অসি ও বরণা নদী উৎপন্ন হইয়াছে—হে মুনে। সেই দিন হইতেই এই কাশী বরণা ও অসি নদীর সঙ্গম লাভ করিয়া বারাণসী নামে বিখ্যাত হইয়াছে।"



মনিকর্ণিকা।

বৌদ্ধদিগের আধিপত্য কালে শাক্যসিংহ এই বারাণসী প্রদেশের মৃগদাব নামক স্থানে আসিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বারাণসীর অবস্থা অতিশয় উন্নত ছিল। হিউয়েন্থসাংএর বর্ণনা হইতে জানা যায়, তাঁহার সময়ে সমগ্র বারাণসী রাজ্য ৩৩৩ ক্রোশ (৪০০০ লি) ও বারাণসী নগরী—দীর্ঘে দেড় ক্রোশ ও বিস্তারে অৰ্দ্ধ ক্রোশ ছিল। হিউয়েন্থসাং তাঁহার ভ্রমণ-বিবরণীতে বারাণসীকে "পোলনিশি" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে সেই সময় বারাণসী প্রদেশ বিস্তারে তিন শত ক্রোশেরও উপর ছিল।

হিউয়েন্থসাংএর লিখিত বিবরণ হইতে এই প্রতিপন্ন হয় যে, তাঁহার সময়ে বারাণসী উন্নতির অভিমুখে ক্রমশঃ ধাবিত হইতেছিল—এই উন্নতি অবশ্য একদিনে সংসাধিত হয় নাই। যদি কেহ একটী প্রাচীনতম আর্য্যনগরীর চিত্র মানস পটে দেখিতে চান, তিনি বারাণসীর মুসলমান কীৰ্ত্তি-গুলি বাদ দিয়া দেখিলেই সেই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবেন।

যে বারাণসীতে বসিয়া কপিল সাংখ্য সূত্র প্রচার করিয়াছিলেন, যে মহাক্ষেত্রে বসিয়া মহামতি যাস্ক "নিরুক্ত" ও পণ্ডিতপ্রবর পাণিনি গভীর গবেষণাপূর্ণ স্বীয় ব্যাকরণ সূত্রগুলি জগতে প্রচার করিয়াছিলেন, যে স্থানে বসিয়া কুল্লূক ভট্ট হিন্দুর প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র মনুর টীকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, যেখানে বসিয়া মহামতি মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব, বৌদ্ধ ধর্ম্মের শান্তিময় সূত্রগুলি সাধারণ সমক্ষে প্রচার করিয়াছিলেন, যেখানে বসিয়া সাধকপ্রবর তুলসীদাস স্বীয় মধুময় রামায়ণ গানে সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, সেই বারাণসী বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা দেখিলে কাহার না হৃদয়ে আঘাত লাগে?

সমসময়িক প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে কাশীর হিন্দু প্রধান কালের এক একটী উজ্জ্বল চিত্র পাওয়া যায়। আমি একবার একখানি প্রাচীন তামিল নাটকের অনুবাদ পড়িয়াছিলাম। নাটককার কে, তাহার নাম নাই, কিন্তু সিংহলের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার মুথুকুমার স্বামী তাহার অনুবাদক। তিনি নাটকের ভাষা বিচার করিয়া পুস্তকখানি যবনাধিকারের বহু পূর্ব্বে লিখিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন, এবং তাহাই সম্ভবপর বোধ হয়। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের ছলনায়

রাজ্য ভ্রষ্ট হইয়া কাশী প্রবেশ করিবার সময়ে রাজ্ঞীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"প্রিয়তমে! ঐ দেখ ভারতের পবিত্রতম তীর্থ ক্ষেত্রের রাজপ্রাসাদের ন্যায় গৃহগুলির উন্নত চূড়া অদূরে দেখা যাইতেছে। ঐ দেখ, আমরা মেখলার ন্যায় নগর-বেষ্টনকারী উচ্চ প্রাচীরের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছি। ঐ দেখ। কত শত গগনস্পর্শী গৃহচূড়া সগর্ব্বে উত্থিত হইয়া মেঘের ক্রোড় স্পর্শ করিতেছে। আবার দেখ দেবদেব বিশ্বনাথের মণি মুক্তাময় ধ্বজ পতাকাদিশোভিত মন্দিরের চূড়া সার্ব্বভৌমিকত্ব লাভ করিয়া সকলের উপরে উঠিয়াছে। কৃতাঞ্জলি হইয়া দেবাদিদেবকে প্রণাম কর। * * * * * এই দেখ প্রিয়ে! আমরা নগর দ্বারের নিকটস্থ হইয়াছি। দেখ কতশত অস্ত্রধারী বর্ম্মাবৃত বীর পুরুষেরা নগর দ্বার রক্ষা করিতেছে। ভীমকায় দৌবারিকগণের অসি ফলক সৌরকরে প্রদীপ্ত হইয়া দুষ্টের মনে বিভীষিকা উৎপাদন করিতেছে। * * (নগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া) "আহা কি সুন্দরী নগরী। এই বারাণসী সকলের শ্রেষ্ঠ। ধন-দেবতা কুবেরের এত ঐশ্বর্য্য আছে কিনা সন্দেহ! গৃহে গৃহে পূজা পাঠ-পরায়ণ ব্রাহ্মণদিগের মন্ত্রধ্বনি আমরা স্পষ্টই শুনিতে পাইতেছি। আহা! এই পবিত্র ক্ষেত্র কাশী বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী ভগবতী বীণাপাণির বিচিত্র ক্রীড়া-ক্ষেত্র। এস্থানে কেবল বেদ, উপনিষদ, তন্ত্র, পুরাণ স্মৃতি ও বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতির প্রতি নিয়ত আলোচনা হইয়া থাকে। * * অদূরশ্রুত সুকঠিন জ্যা নির্ঘোষ ও তরবারির ঝনঝনা শব্দে বোধ হইতেছে এখানে ক্ষত্রিয়ের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব আছে। * * এই দেখ! এক্ষণে আমরা লক্ষ্মীর বরপুত্র বৈশ্যদিগের শ্রী-সম্পন্ন প্রাসাদের সন্নিকটস্থ হইয়াছি। ইহাদের অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিলে চিত্ত বিমোহিত হয়। পথিপার্শ্বে কতশত বিপণিরাজি বহুমূল্য দ্রব্যজাত পরিপূর্ণ হইয়া নগরীর শোভা সম্পাদন করিতেছে। দেখ বণিকেরা স্তূপাকার স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা লইয়া বসিয়া আছে। নাগরিকেরা বিনিময় করিতেছে। মুদ্রাদির ক্রমাগত সঞ্চালন শব্দ এই ক্রেতা বিক্রেতাদিগের ক্ষেত্র ছাড়াইয়াও আমাদের কর্ণ পথে প্রবেশ করিতেছে। এই দেখ। এখন আমরা ঐশ্বর্য্যের সীমা রেখা অতিক্রম করিয়া শূদ্রদের মৃৎকুটীরের সন্নিহিত হইয়াছি। ঐ দেখ। শ্রমজীবীরা কেহ গোচারণ করিতেছে, কেহ বা ভূমিকর্ষণার্থে দ্রুত বেগে ধাবিত হইতেছে—কেহ বা হলনিযুক্ত অবাধ্য বৃষযুথকে অযথা তাড়না করিতেছে? আবার দেখ রাখাল বালকেরা সুশীতল বৃক্ষ ছায়ায় উপবেশন করিয়া কেমন মধুর বংশীধ্বনি করিতেছে। * * * * এই দেখ! আমরা ভূতভাবন ভবানীপতির মন্দির প্রকোষ্ঠের সম্মুখবর্ত্তী হইয়াছি। চল, উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া সার্থক হই।"

উল্লিখিত বর্ণনা হইতে প্রমাণ হয়, যবনাধিকারের পূর্ব্বে বারাণসী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদি চতুর্ব্বর্ণের আবাসস্থান ছিল ও তাহা ধনধান্যে পরিপূর্ণ ছিল।

কাশীর প্রাচীন ইতিবৃত্ত একটু আলোচনা করিলে বোধ হয়, আমাদের পাঠকবর্গের বিরক্তিকর হইবেনা। বিষ্ণু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের মতে—আয়ুবংশীয় সুহোত্র রাজার পুত্র কাশ—কাশীর প্রথম হিন্দু রাজা। তাহার পুত্র কাশিরাজ কাশ্য। এই "কাশিরাজ হইতেই সম্ভবতঃ "কাশী" শব্দের ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। নিম্নে একটী বংশতালিকা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

পুরূরবা
|
আয়ু
|
নহুষ — ক্ষত্রবৃদ্ধ

নহুষ
|
যযাতি
|
যদু

ক্ষত্রবৃদ্ধ
|
সুহোত্র
|
কাশ
|
কাশিরাজ
|
দীর্ঘতমা
|
ধন্ব
|
ধন্বন্তরি

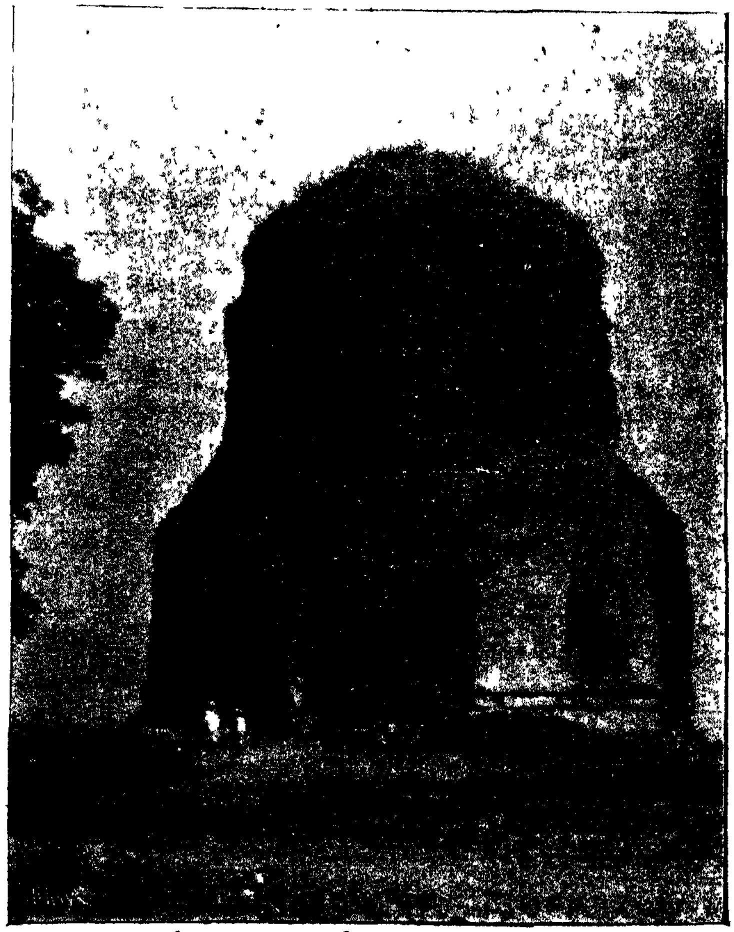
পুরূরবা বংশীয় ছাব্বিশ জন রাজা হিন্দুপ্রধান কালে কাশীতে রাজত্ব করেন। এই বংশীয় শেষ রাজা—ভার্গভূমি। ভার্গভূমির পর আর কাহারও নাম পাওয়া যায় না। শাক্য চূড়ামণি ভগবান বুদ্ধদেবের সমসময়ে দেবদত্ত নামক এক নৃপতি কাশীতে রাজত্ব করিতেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব সময়ে বারাণসী মগধরাজগণের শাসনাধীন হয়। প্রদ্যোত বংশীয় রাজগণ এক শত বৎসরের উপর রাজত্ব করিলে—শিশুনাগ নামক জনৈক নরপতি বারাণসীতে অধিকার স্থাপন করেন। কোন কোন বৌদ্ধ গ্রন্থে কাশী-রাজ ব্রহ্মদত্তের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার সময় নির্ণয় করা অতি কঠিন। মগধ রাজ্যের পতন হইলে সম্ভবতঃ বারাণসী গুপ্তরাজগণের অধিকারভুক্ত হয়। ঐ বংশীয় প্রকটাদিত্য সম্ভবতঃ সপ্তম শতাব্দীতে কাশীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার পর খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে গৌড়ের পালবংশীয় রাজগণ কাশীতে আধিপত্য স্থাপন করেন। গৌড়াধিপ মহীপালই কাশীর পালবংশীয় প্রথম নরপতি। সারনাথে আজিও একটি বৌদ্ধস্তূপ বিদ্যমান আছে। তাহার মধ্যে মহীপালপ্রদত্ত একখানি শিলালিপি (১০৮৩ সম্বৎ=১০২৬ খ্রীঃ অব্দ) পাওয়া গিয়াছে। এই সকল প্রমাণ হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, কাশী বাঙ্গলা ও বিহারের অনেক নরপতির রাজ্যাধীন ছিল।

বারাণসী হইতে কিছু দূরে আমরা একা করিয়া প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ "সারনাথ" দেখিতে গেলাম। আধুনিক চক্ষে

দেখিলে ইহাতে স্পষ্টতঃ শিল্পের কোন চাতুর্য্যই দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু দেশের ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহার শিল্প কৌশলের মূল্য অত্যন্ত অধিক। ইহার ভিত্তি প্রস্তর মণ্ডিত। এই ভিত্তির পরিসর ৯৩ ফিট এবং উচ্চতা ৪৩ ফিট। ইহার উপরেই ইটের গাঁথনি। ইহাও প্রায় ১১০ ফিট উচ্চ। নীচে দাঁড়াইয়া দেখিলে মানুষ ইহার নিকট আপনার ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করে। এই স্তূপটী ঐতিহাসিকের চক্ষু ভিন্ন সাধারণের চক্ষে অতি অতৃপ্তিকর দৃশ্য। সারনাথের প্রাচীন "বিহারাদির" আর কোন চিহ্নই এখন দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পরিব্রাজক হি উয়েন্ত সাং এই লুপ্তচিহ্ন বিহারের বর্ণনা ব্যপদেশে বলিয়াছেন—"বেষ্টিত সীমা মধ্যে দুই শত ফিট উচ্চ এক "বিহার" সংস্থাপিত ছিল। এই বিহারের ভিত্তি প্রস্তর ময়। কিন্তু চূড়া ও সোপানাবলী ইষ্টক নির্ম্মিত। এই বিহারের মধ্যস্থলে বুদ্ধদেবের এক প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি আছে।" ইহা হইতে সপ্রমাণ হয়,—সারনাথের বিহারে অনেক "শ্রমণ" ও "ভিক্ষু"গণ আশ্রয় পাইত—এবং বিহারটি আয়তনে বড় কম দীর্ঘ ছিল না। বারাণসীর প্রাচীনত্ব আলোচনার উদ্দেশ্যে আমরা উপরে যাহা বলিলাম, সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাহা নীরস বোধ হইতে পারে। কিন্তু ইহাতে শিক্ষার ও আলোচনার অনেক কথা আছে।

অতঃপর বারাণসীতে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃথ্বীরাজ ও জয়চন্দ্রের আত্ম-বিগ্রহই ভারতে বৈদেশিক অধিকার স্থাপনের প্রধান সূত্র, ইতিহাস-পাঠক তাহা উত্তম-রূপ জানেন। বারাণসী প্রদেশও কনোজরাজ জয়চন্দ্রের শাসনাধীন ছিল। তিরৌরীর বিখ্যাত যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘোরী কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন—সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার সেনাপতি কুতবউদ্দিনও জয়-চন্দ্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত করিলেন। জয়চন্দ্রের অগণিত সৈন্য—বারাণসীতে যবনাধিকার রোধ করিতে পারিল না। হৃদয়হীন কুতবউদ্দিন ও তাঁহার সহকারীরা বারাণসীর সহস্রাধিক দেবালয় ভাঙ্গিয়া দেন।

ইহার পর আকবর সাহের সময়, বারাণসীর অবস্থা অত্যন্ত উন্নত হয়। আকবর হিন্দুধর্ম্মের প্রধান রক্ষক ছিলেন। তাঁহার সময়ে মির্জ্জা কলিজ নামক এক জন শান্ত প্রকৃতি সুবেদার বারাণসী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। মির্জ্জা সাহেবের পর বুন্দীর সর্দ্দার রাজপুতকুলগৌরব রাও সজ্জন সিংহ বারাণসীর শাসনকর্ত্তা হন। রাও সাহেবের আমলে বারাণসীর হিন্দুগণ নিঃশঙ্কভাবে জীবন যাপন



সারনাথ স্তূপ।

করিয়াছিল। অনেক স্থানের বন জঙ্গল কাটাইয়া, রাও সজ্জন সিংহ, বিচিত্র মন্দির ও অন্নসত্রাদি সংস্থাপন করেন। তাঁহার সময়ে জাহ্নবীর কূলে কয়েকটী প্রস্তরময় সুবৃহৎ ঘাটও নির্ম্মিত হয়। তাঁহার শাসনের কথা শুনিলে উপন্যাস বলিয়া বোধ হয়। গুণ্ডাপ্রধান বারাণসীর রাজপথে পথিকেরা নিঃশঙ্ক চিত্তে বহু মূল্য দ্রব্যাদি লইয়া পড়িয়া থাকিলেও কেহ তাহা অপহরণ করিতে সাহসী হইত না।

বাদসাহ জাহাঙ্গীরের সময়ের শাসন বিবরণীতে আমরা দেখিতে পাই—"বারাণসীতে ১৫০০ মন্দির, অগণ্য প্রাসাদ, বহুদূরব্যাপী অজগরবৎ বঙ্কিম রাজপথ, আর সেই বিস্তৃত রজেবর্ত্মের দুই পার্শ্বে বিপণিশ্রেণী। জাহাঙ্গীর বারাণসীকে তাঁহার জীবনবৃত্তান্তে "মন্দিরময়ী নগরী" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

তার পর সাহ জাহানের আমল। সাহজাহান বাদসাহ দিল্লী আগরা লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। বারাণসীর দিকে অতি অল্পই দৃষ্টি রাখিতেন। তবে তাঁহার সময়ে অনেক বিখ্যাত স্থপতি আগরায় সমবেত হওয়ায়, হিন্দু রাজন্যবর্গ ইহাদের সহায়তায় বারাণসীতে মন্দির ও দেউলাদি নির্ম্মাণ করিয়া লয়েন। হিন্দুদ্বেষী ঔরঙ্গজেবের আমলে বারাণসীর যথেষ্ট অনিষ্ট হয়। এই সময়ে ঔরঙ্গজেব বিশ্বেশ্বরের আদি মন্দির, বেণীমাধবের মন্দির প্রভৃতি ধ্বংস করেন। বেণীমাধবের মন্দিরের বর্ত্তমান আকৃতি দেখিলেই পাঠক ঔরঙ্গজেবের কীর্ত্তির জ্বলন্ত নিদর্শন পাইবেন। ঔরঙ্গজেব বারাণসীর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "মহম্মদাবাদ" রাখেন।

দিল্লীর বাদসাহের প্রতাপ নাশের সঙ্গে সঙ্গে বারাণসী অযোধ্যার নবাব বংশের শাসনাধীন হয়। দিল্লীর হীনবল বাদসাহ মহম্মদ সাহ বারাণসীকে হিন্দু শাসনাধীন রাখিবার বাসনায়—১৭০০ খৃষ্টাব্দে বারাণসীর পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে গঙ্গাপুর গ্রামের জমীদার মনসারামকে রাজা উপাধি দিয়া বারাণসীর শাসনভার প্রদান করেন। মনসারামের পুত্র বলবন্ত সিংহ—রামনগরে দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়া মহাপ্রতাপান্বিত হইয়া উঠেন। তখন বারাণসী অযোধ্যার শাসনাধীন ছিল। অযোধ্যার তদানীন্তন নবাব ও দিল্লীশ্বরের উজীর সফ্‌দারজঙ্গ বলবন্তের প্রতাপবৃদ্ধিদর্শনে আশঙ্কিত হইয়া তাঁহার দমনে মনোযোগ করেন। কিন্তু বলবন্তকে তিনি কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। সফ্‌দারজঙ্গের পুত্র সুজা উদ্দৌলাও বলবন্তকে ক্ষমতাহীন করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতে সফলকাম হন নাই। যে সময়ে দিল্লীর বাদসাহ মহম্মদ আলি ও সুজা উদ্দৌলা, বাঙ্গলার নবাব মীরজাফরকে পদচ্যুত করিবার জন্য বাঙ্গলায় যুদ্ধ যাত্রা করেন, সে সময়ে রামনগর দুর্গাধিপতি বলবন্ত সিংহ বাঙ্গলার নবাবের বিশেষ সহায়তা করেন। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে ২৬ ডিসেম্বর দিল্লীর সাহ আলম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বারাণসী রাজ্য প্রদান করেন। সুজা উদ্দৌলার সহিত সন্ধির পর কোম্পানি—১৭৬৬ খৃঃ অব্দে আবার বারাণসী অযোধ্যার নবাবকে ছাড়িয়া দেন। এই সময় হইতেই বলবন্ত সিংহ—ইংরাজের মিত্ররাজ বলিয়া পরিচিত হন। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে আগষ্ট মাসে বলবন্ত সিংহ পরলোক গমন করেন। ইহার পর চেৎ সিংহ বলবন্তের উত্তরাধিকারী হন। চেৎ সিংহের সহিত হেষ্টিংসের বিগ্রহ ইতিহাসবিশ্রুত কাহিনী। তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস কর্ত্তৃক চেৎসিংহের সর্ব্বনাশ সাধিত হইলে, বলবন্তের কন্যা হেষ্টিংস সাহেবকে জানান তাঁহার পুত্র মহীপ নারায়ণ রাজ্যের একমাত্র অধিকারী। হেষ্টিংস মহীপ নারায়ণকেই বারাণসীর রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। এই মহীপ নারায়ণের বংশধর মহারাজ শ্রীপ্রভু নারায়ণ সিংহ বাহাদুর বারাণসীর বর্ত্তমান অধিপতি।

কাশীর পর পারেই রামনগরের রাজবাটী—দেখিবার জিনিস। বর্ত্তমান কাশী-নরেশ প্রভু নারায়ণ সিংহ বাহাদুর এখানে প্রায়ই অবস্থিতি করেন।

রামনগরে মহারাজের বাস ভবন অতি সুন্দর। ইংরাজী ধরণে তাহা সজ্জিত হইলেও তাহার মধ্যে দেখিবার জিনিস অনেক আছে। নৌকা করিয়া রামনগরে যাইতে হয়। এ পারে কাশী—পর পারে রামনগর। রামনগরে রাজার হস্তীশালা, অশ্বশালা, রাজভবন প্রভৃতি দেখিবার যোগ্য।

সৃষ্টির বিশালত্ব।

(১)

বায়ুতে যেমন ধূলিকণা ভাসে, আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবী সেইরূপ অতি দীন ভাবে অনন্ত আকাশে বিচরণ করিতেছে। এই সামান্য ধূলিকণার অধিবাসী আমরা যে

কতটুকু ক্ষুদ্র কীট, তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। আমরা আজ যে বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার বিশালতার উপলব্ধি করিবার পক্ষে আমাদের এই ক্ষুদ্রতা একটি মহৎ অন্তরায়। আমরা ক্ষুদ্রকে দেখিয়া সহজেই বিস্মিত হই, কিন্তু বাস্তবিক যাহা মহৎ, তাহা আমাদের বিস্ময়ের অতীত। আমরা কতটুকু দীর্ঘ সময়ের ধারণা করিতে পারি? বড় অধিক নহে। আমাদের ক্ষুদ্র জীবনটুকু যে পরিমাণ কাল অধিকার করে, তাহাকেও আমরা ভাল করিয়া ভাবিতে পারি না। সহস্র বৎসর, লক্ষ বৎসর, কোটি বৎসর--এ সকল কালের কথা লেখা সহজ, বলাও সহজ। কিন্তু একবার পরিষ্কাররূপে বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক, দেখি যে, কোটি বৎসর বলিলে বাস্তবিক কতখানি সময়কে বুঝায়। তখন দেখিব যে, আমাদের ধারণা শক্তিতে কুলায় না।

সময় সম্বন্ধে যেরূপ, বস্তুর আয়তন সম্বন্ধেও সেইরূপ। হাজার মাইল কিম্বা কোটি মাইল বলিলে বাস্তবিক কতখানি লম্বা জিনিসটার কথা হইল, তাহার একটা পরিষ্কার ছবি মনে আনিতে আমরা একেবারেই অক্ষম।

এই ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া অনন্তের পরিমাণ করিতে যাওয়া অপেক্ষা কঞ্চিদ্বারা সমুদ্রের গভীরতা মাপিবার চেষ্টা অধিক ফলপ্রদ হইবার সম্ভাবনা। বাস্তবিক ভগবান্ যদি তাঁহার ব্রহ্মাণ্ডকে খুব ছোট করিয়া সৃষ্টি করিতেন, তবে বোধ হয় আমরা তাহার মহত্ত্ব এতদপেক্ষা সহজে বুঝিতে পারিতাম। যাহা হউক, সৃষ্টির বিশালতা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা আমাদের সাধ্যের অতীত হইলেও আমাদের প্রাণে তাহার সংবাদ লইবার জন্য অসীম আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। আমাদের এই পৃথিবীটা কি? চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, এ সকলই বা কি? ইহাদের গতিবিধি এরূপ অদ্ভুত কেন? ইত্যাদি প্রশ্ন যাহাদের মনে উদয় হয় নাই এরূপ মানুষ অধিক জন্মিয়াছে কিনা সন্দেহের বিষয়।

এ সকল প্রশ্ন সকল সময়েই মানুষের মনে উঠিয়াছে, এবং তাহার তৎকালোচিত এক একটা মীমাংসারও ত্রুটি হয় নাই। পৃথিবীতে আমরা বাস করি, সুতরাং ইহার কথা প্রথমে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। পৃথিবী কাহাকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে, এই কথাটা অতি প্রাচীন কাল হইতেই উঠিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তখনকার লোকেরা ইহাকে কচ্ছপ, হস্তী এবং সর্পের হস্তে সমর্পণ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।* এ কথা তাঁহাদের মনে হয় নাই যে, কচ্ছপের খোলা যতই মজবুত হউক না কেন, তাহারও একটা দাঁড়াইবার স্থানের দরকার হয়, বাস্তবিক এ প্রশ্নের শেষ নাই। পৃথিবী কোথায় আছে? সাপের মাথায়। সাপ কোথায় আছে? হাতীর ঘাড়ে। হাতী কোথায় আছে? কচ্ছপের পিঠে। আর কচ্ছপ কোথায় আছে? এ কথার উত্তর নাই। সুতরাং চিন্তাশীল লোকেরা দেখিলেন যে, শেষ কালে এক জনকে শূন্যে দাঁড়াইতেই হয়। তাহাই যদি হইল, তবে মাঝখানে এই তিনটা প্রাণীকে রাখিয়া এত ক্লেশ দেওয়া কেন? এ কাজটা পৃথিবী নিজে করিলেই ত ল্যাঠা চুকিয়া যায়!

কিন্তু জিনিসকে শূন্যে রাখিলে যে তাহা পড়িয়া গুঁড়া হইবে না, একথা কি সহজে বিশ্বাস হয়? পৃথিবীকে যদি শূন্যে ছাড়িয়া দেও, তবে সে কি পড়িয়া যাইবে না?

এরূপ প্রশ্নকারীকে প্রাচীন কালের জ্যোতির্ব্বিদ আর একটি প্রশ্ন দিয়া নিরুত্তর করিয়াছিলেন।

"সমে সমন্তাৎ ক পতত্বিয়ং খে?"

চারিদিকেই আকাশ সমান ভাবে রহিয়াছে, পৃথিবী কোথায় পড়িবে?

যাহা হউক, এ প্রশ্নের শেষ মীমাংসা এখানেই হয় নাই। যদি হইত, তাহা হইলে জ্যোতিষ শাস্ত্রের অবস্থা আজ এতদূর উন্নত হইতে পারিত না। প্রাচীন কালের চিন্তাশীলগণ জিনিস পড়িয়া যাইবার কথাটা লইয়া অনেক ভাবিয়াছেন, কিন্তু জিনিস পড়ে কেন? এরূপ প্রশ্ন কাহারও মনে আসে নাই।

প্রবাদ আছে যে, বৃক্ষ হইতে একটি ফল পড়িতে দেখিয়া মহাপণ্ডিত নিউটনের মনে প্রথমে এই প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল; এবং সেই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া তিনি 'মাধ্যাকর্ষণ' আবিষ্কার করিয়াছিলেন।†

* "তখনকার লোকের"—কখনকার লোকেরা? অতি প্রাচীন কালের লোকেরা কি? অতি প্রাচীন কালে বা বৈদিক কালে হস্তিকচ্ছপাদির কল্পনা ছিল না,—ঋগ্বেদে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ও গোপথ ব্রাহ্মণে পৃথিবী গোলাকৃতি ও নিরাধারা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মধ্য যুগে বা পৌরাণিককালে গজকচ্ছপাদির উদ্ভট কল্পনা আবিষ্কৃত হয়। তখন প্রাচীন আর্য্যপ্রতিভা বহুপরিমাণে মলিন হইয়া গিয়াছিল ও অজ্ঞতার রাজ্য ভারতে বিস্তৃত হইতেছিল।—প্রদীপ সম্পাদক।

† নিউটনের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ভাস্করা-

বিধাতা জড় মাত্রকেই এই সাধারণ ধর্ম্ম দিয়াছেন যে, তাহারা পরস্পরকে আকর্ষণ করিবে। ইহারই নাম 'মাধ্যাকর্ষণ'। সামান্য ধূলিকণা হইতে, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি সকলেই এই আদেশের অধীন। এই মুহূর্ত্তে যদি ভগবান্ তাঁহার এই আদেশ রহিত করেন, তবে মুহূর্ত্তেই মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে। সূর্য্য তখন আর গ্রহগণকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। আমাদের পৃথিবী সেই মুহূর্ত্তেই তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া যাইবে; এবং আমরা সূর্য্যের উত্তাপ এবং আলোকের অভাবে ত্বরায় বিনষ্ট হইব।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, মাধ্যাকর্ষণ না থাকিলেই পৃথিবী কেন ছুটিয়া পলাইবে? আর মাধ্যাকর্ষণের যদি এতই প্রভাব, তবে আপাততঃ আমরা ঐ সূর্য্যে গিয়া পড়ি না কেন? সূর্য্য এবং পৃথিবী নিশ্চয়ই পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে; তবে কেন তাহারা ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হয় না?

দড়ির এক প্রান্তে পাথর বাঁধিয়া, সেই দড়ির অপর প্রান্ত ধরিয়া ঘুরাইলে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। দেখা যায় যে, ঐরূপ অবস্থায় পাথরটি দড়ি শুদ্ধ ছুটিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হয়, এবং হঠাৎ দড়ি ছাড়িয়া দিলে বাস্তবিকই ছুটিয়া চলিয়া যায়।

জড়ের প্রতি পরমেশ্বরের অপর একটি আদেশ এই যে, তাহাকে একবার ঠেলিয়া দিলে সে ক্রমাগত সোজা পথেই চলিতে থাকিবে। অন্য কোন জিনিসের চারিদিকে তাহাকে ঘুরাইতে হইলে বল প্রয়োগের আবশ্যক হয়। সেরূপ বল প্রয়োগ সে কিছুতেই পছন্দ করে না, এবং সে স্থান হইতে পলায়ন করিবার জন্য বিধিমত টানাটানি করে। দড়ি এবং প্রস্তরের এই দৃষ্টান্তই সে কথার প্রমাণ।

পৃথিবী যে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, ইহা গণিতসিদ্ধ সত্য ঘটনা। ঐরূপ ঘুরিয়া বেড়ান অপেক্ষা সোজা পথে চলাটা যে পৃথিবী অধিক পছন্দ করে, একথাও সহজেই অনুমেয়। সুযোগ পাইলে যে সে অবিলম্বে এ স্থান হইতে পলায়ন করিবে, তাহাতেও সন্দেহমাত্র নাই। তবে যে এত দিন সে এরূপ করে নাই, তাহার কারণ এই যে, মাধ্যাকর্ষণরূপ রজ্জু তাহাকে সূর্য্যের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এস্থলে পৃথিবী দুই শক্তির অধীন। একটি মাধ্যাকর্ষণের শক্তি ইহা কেন্দ্রাভিসারিণী অর্থাৎ ইহাতে তাহাকে সূর্য্যের দিকে টানিয়া লইতে চাহে। অপরটি তাহার নিজের সরল পথানুসরণের প্রবৃত্তি। ইহা কেন্দ্রাপগামিনী অর্থাৎ ইহার প্ররোচনায় সে সূর্য্যের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করে।

এই দুই শক্তির প্রভাবে আমাদের পৃথিবী যথেচ্ছা বিচরণ না করিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে বাধ্য হইতেছে। ইহাদের একটি অযথা প্রবল হইলে পৃথিবী তাহার বন্ধন ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাইবে। অপরটির আধিক্য হইলে সূর্য্য তাহাকে টানিয়া লইয়া ভস্ম করিবে। বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনস্, নেপ্‌চুন প্রভৃতি গ্রহগণ, চন্দ্র প্রভৃতি উপগ্রহগণ, সৌরজগৎভুক্ত ধূমকেতু এবং উল্কাপুঞ্জ, সকলেই এই দুই নিয়মের বশীভূত হইয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, এবং এই দুই নিয়মের গুণেই আপন আপন পথে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে সমর্থ হইতেছে।

বিধাতার আদেশ সৌরজগতের সীমার ভিতরেই আবদ্ধ নহে। এই আদেশ আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শাসন করিতেছে। অসংখ্য সৌরজগৎ এই অমোঘ আজ্ঞার অধীন হইয়া বিচরণ করে।

সৃষ্টির প্রারম্ভে পরমেশ্বর এই যে দুইটি আদেশ বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাবেই বিশ্বময় শান্তি এবং শৃঙ্খলা বিরাজমান। আর্য্য ঋষি কেমন সুন্দর বলিয়াছেন,—

"কো হ্যে বান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।"

"এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়।"

"কেবা শরীর চেষ্টা করিত, কেবা জীবিত থাকিত, যদি আকাশে এই আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মা না থাকিতেন" "ইনি লোক-ভঙ্গ-নিবারণার্থ সেতু স্বরূপ হইয়া সমুদয় ধারণ করিতেছেন।"

ইহা কি কেবলই কবির কল্পনা? না এ সকল কথার কোন প্রমাণ আছে? কেন্দ্রাভিসারিণী, কেন্দ্রাপগামিনী, ইত্যাদি কথা শুনিতে ভালই শুনায়। কিন্তু এই সকল বাক্যের মূল্য কতটুকু? পণ্ডিতেরা কি কেবল অনুমানের উপরেই নির্ভর করিয়া এই দুইটা কথাকে এত বাড়াইয়া তুলিয়াছেন, না বাস্তবিক ইহাদের কোন ভিত্তি আছে?

চার্য্য ভারতবর্ষে "মাধ্যাকর্ষণ" শক্তির বিষয় যে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এই স্থানে তাহা উল্লিখিত হইলে ভাল হইত। প্রঃ সং।

এই কথাটার এ স্থলে কিঞ্চিৎ সমালোচনা হওয়া দরকার। কারণ, দেখা যাইতেছে যে, এ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রয়োগ অসম্ভব; কেন না, মাধ্যাকর্ষণকে রজ্জুর ন্যায় চাক্ষুষ করিবার উপায় নাই।

মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্বানুসন্ধান গণিত শাস্ত্রের বিষয়; তাহার ভার আমরা পণ্ডিতদিগের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি। সুতরাং ইহার ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা হইলেই আমাদের উপস্থিত কাজ চলিয়া যাইবে।

সর্ব্ব প্রথমে ইহার অস্তিত্ব শুদ্ধ অনুমান মাত্রের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল; কিন্তু সেই অনুমান অচিরেই পণ্ডিতগণের আস্থা লাভ করিল। গণিতবিদ্‌গণ অবিলম্বে ইহার প্রমাণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। মাধ্যাকর্ষণ যদি সত্য হয়, তবে ইহার অধীন হইয়া সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি বিধি কিরূপ হওয়া উচিত? আর বাস্তবিক উহারা ঐরূপ পদ্ধতিতে বিচরণ করে কি না, কেপ্লার্‌ লাপ্লাস্‌ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপেও এ বিষয়েরও আলোচনা করিলেন। তাহাতে প্রমাণ হইল যে, জ্যোতিষ্কগণ মাধ্যাকর্ষণের বিধি বর্ণে বর্ণে পালন করিয়া চলে। ইহা অপেক্ষা এ বিষয়ের উৎকৃষ্টতর প্রমাণ অনাবশ্যক, কিন্তু তাহাও আছে।

হঠাৎ শুনিলে হেঁয়ালীর মত বোধ হইতে পারে, কিন্তু এ কথা অতি সত্য যে, যে সকল স্থলে জ্যোতিষ্কগণ গণিতের হিসাব মানিয়া চলে নাই, অনেক সময় সেই সকল স্থলেই মাধ্যাকর্ষণের অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই বিষয়টা পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে।

ইউরেনস্‌ গ্রহের যখন প্রথম আবিষ্কার হয়, তখন পণ্ডিতেরা তাহার গতি বিধি অতিশয় সূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইউরেনস্‌ কিরূপ বেগে, কোন্‌ পথ ধরিয়া চলে, তাহা যত্নপূর্ব্বক গণিয়া স্থির করা হইল। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম মানিয়া চলিতে হইলে কোন্‌ সময়ে আকাশের ঠিক কোন্‌ স্থানে তাহার অবস্থিতি করা আবশ্যক, তাহারও হিসাব করিতে বাকি রহিল না। কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল যে, ইউরেনস্‌ সকল সময় সে হিসাব মানিয়া চলে না। গণিত এবং মাধ্যাকর্ষণ তাহাকে যে স্থানে থাকিতে বলে, সে তাহার দুই এক পদ ব্যত্যয় করে। এই সংবাদ প্রচারিত হইবা মাত্র কিছু কালের জন্য জ্যোতিষিগণ নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। তবে কি মাধ্যাকর্ষণ মিথ্যা? না, একপ ঘটনার অন্য কোন কারণ আছে!

মাধ্যাকর্ষণ মিথ্যা হইতে পারে, একথা কেহই সহজে বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না। সুতরাং এরূপ ঘটনার কারণ কি, তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। অনেকে বলিলেন যে "ইউরেনস্‌ যে দৃষ্টতঃ মাধ্যাকর্ষণ বিধির অবাধ্য হইতেছে, ইহার কারণও সেই মাধ্যাকর্ষণ! এমন কোন গ্রহ থাকা আশ্চর্য্য নহে, যাহার কথা লোকে এখনও জানিতে পারে নাই। ইউরেনসের পথ নির্দ্দেশ করিবার সময় তাহার উপর অন্যান্য গ্রহাদির আকর্ষণের কথা ভাবিতে হইবে এবং সেই আকর্ষণের জন্য তাহার গতির কি পরিমাণ ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা, তাহাও হিসাব করিয়া স্থির করিতে হইবে। এখন কথা এই যে, এমন একটা গ্রহও ত থাকিতে পারে, যাহা ইউরেনসের নিকটবর্ত্তী, অথচ তাহার কথা না জানাতে তাহার কার্য্যের হিসাব হয় নাই। অর্থাৎ ইউরেনস্‌কে কোন অজ্ঞাত গ্রহ টানিয়া পথভ্রষ্ট করিতেছে; সেই গ্রহটীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেই হিসাব মিলিয়া যাইবে।

যদি তাহাই হয়, তবে সে গ্রহ কিরূপ? সে কোথায় থাকে? সে কোন্‌ পথে চলে?

ইংলণ্ডে পণ্ডিত আডামস্‌, এবং ফ্রান্সে লাভেরিয়ে, উভয়ে প্রায় একই সময়ে এই প্রশ্নের উত্তর বাহির করেন। নূতন গ্রহটিকে কোন্‌ সময়ে কোথায় দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাঁহারা তাহারও গণনা দ্বারা স্থির করিলেন। বলা বাহুল্য, সেই সময়ে সেই স্থানে অনুসন্ধান করিয়া সেই নূতন গ্রহটিকে দেখিতে পাওয়া গেল। এই গ্রহটী এখন নেপ্‌চুন নামে প্রসিদ্ধ।

যে অনুমানের সাহায্যে একটা গ্রহের আবিষ্কার হয়, তাহাকে নিতান্তই অনুমান বলিয়া মনে করা সঙ্গত হয় না। সুতরাং প্রথমে ইউরেনস্‌কে কিঞ্চিৎ উচ্ছৃঙ্খল দেখিয়া মাধ্যাকর্ষণের উপরে যদি লোকের বিশ্বাস একগুণ কমিয়া থাকে, নেপচুনের আবিষ্কারের পর তাহা দশগুণ বাড়িয়া গেল। মাধ্যাকর্ষণকে এখন আর কেহ অনুমান বলিয়া মনে করেন না। পৃথিবীর মেরুতে কেহই এ পর্য্যন্ত যাইতে পারে নাই; সে স্থানটি কি প্রকার, তাহা আমরা

জানি না। কিন্তু তথাপি এ কথা অকুতোভয়ে বলিতে পারি যে, সেখানে বায়ু আছে। সেইরূপ অকুতোভয়ে একথাও বলা যায় যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মাধ্যাকর্ষণের শাসনাধীন।

সুদূর নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যেও যে মাধ্যাকর্ষণের কার্য্য হইতেছে, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। দুই বা ততোধিক নক্ষত্র ঠিক পরস্পরের আকর্ষণে আবদ্ধ থাকিয়া ঘুরিতেছে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রটির নাম 'মৃগব্যাধ'। ইংরাজীতে ইহাকে Sirius কহে। ইহার উজ্জ্বলতার জন্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের দৃষ্টি বারংবার ইহার উপর পতিত হয়। ইহাকে দেখিলে আপাততঃ স্থির বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু উপযুক্ত যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, এই নক্ষত্রের একটা গতি আছে, তাহার পরিমাণ গড়ে মিনিটে প্রায় সহস্র মাইল! 'গড়ে' সহস্র মাইল বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, এই গতির বেগ সকল সময় একরূপ থাকে না, তাহার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। জড় বস্তুর এমন কোন শক্তি নাই, যদ্দ্বারা সে নিজের গতির কোনরূপ হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারে। তাহাকে চালাইয়া দিলে সে সোজা পথে ঠিক সমান বেগে চলিতে থাকে, বক্রপথে চলিতে পারে না, বিনা বাধায় থামিতে পারে না, গতির বেগ বদলাইতেও পারে না। সুতরাং সিরিয়সের ঐরূপ লঘুমন্দ গতি স্বভাবতঃই আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। সেই আলোচনায় স্থির হইল যে, সিরিয়সের একটা প্রদক্ষিণকারী সঙ্গী আছে। সেই সঙ্গী যখন সিরিয়সের চারিদিকে ঘোরে, তখন এক একবার তাহার সম্মুখে তাহাকে আসিতে হয় এবং এক একবার পশ্চাতে পড়িতে হয়, সম্মুখ হইতে টানিলে সিরিয়সের গতি কিঞ্চিৎ বাড়ে, পশ্চাৎ হইতে টানিলে একটু কমে।

এইরূপ করিয়া সিরিয়সের এক সঙ্গী খাতায় জমা হইল। সেই সঙ্গী কখন সিরিয়সের কোন্ দিকে থাকিবে তাহারও একটা নির্ঘণ্ট হইল—কিন্তু তখনও সেই সঙ্গীটিকে কেহ দেখে নাই।

আমেরিকায় য়্যাল্‌ভান্ ক্লার্ক নামক অতি প্রসিদ্ধ দূরবীক্ষণ নির্ম্মাতা আছেন। ইঁহারা পিতা পুত্রে মিলিয়া এই কার্য্য করেন। ১৮৬২ সালে ইঁহাদের কারখানায় একটি বড় দূরবীক্ষণ নির্ম্মিত হয়। কনিষ্ঠ ক্লার্ক্ ঐ দূরবীক্ষণের পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত উহাকে সিরিয়সের অভিমুখে স্থাপন করেন। ঐরূপ করিবার কিঞ্চিৎ পরেই তিনি তাঁহার পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাবা ইহার যে একটা সঙ্গী আছে!" যে সঙ্গীটি প্রথমে কেবল পুস্তকেই ছিল, এত দিনে তাহা প্রত্যক্ষ হইয়া তৎ সম্বন্ধে পণ্ডিতদিগের গণনা সপ্রমাণ করিল। ঐ সময়ে ঐ জ্যোতিষ্কটির যে স্থানে থাকিবার কথা খাতায় লেখা ছিল, কার্য্যতঃ দেখা গেল, যে সে ঠিক সেই স্থানে আছে।

অনেক স্থলে মাধ্যাকর্ষণের সাহায্যে জ্যোতিষ্কগণের সম্বন্ধে এমন সকল তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়, যাহা অন্য উপায়ে জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই। আকাশে যে সকল গ্রহ বিচরণ করে, তাহাদের কোন্‌টার কত ওজন, এরূপ প্রশ্ন হঠাৎ শুনিলেই বড়ই অদ্ভুত বোধ হয়। মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার হওয়ার পূর্ব্বে এরূপ প্রশ্ন কেহ উত্থাপন করিলে তাহার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে লোকের গুরুতর সন্দেহ উপস্থিত হইত। কিন্তু এখনকার পণ্ডিতেরা ওরূপ প্রশ্নকে কিছুমাত্র কঠিন মনে করেন না। গ্রহ নক্ষত্র ওজন করা নিতান্তই আশ্চর্য্য ব্যাপার, এবং তাহা নিষ্পন্ন করিতে অতিশয় গভীর পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার মূল প্রণালীটির কিঞ্চিৎ আভাস গ্রহণ খুব কঠিন বলিয়া বোধ হয় না। একবার চেষ্টা করা যাউক।

এই স্থলে আর একবার সেই দড়িতে বাঁধা পাথরের দৃষ্টান্ত স্মরণ করা ভাল। পাথরটিকে যত তাড়াতাড়ি ঘুরান যায়, দড়িতে ততই বেশী টান পড়ে, এবং তখন দড়ি ছাড়িয়া দিলে পাথরটি ততই দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। একটা আকর্ষণে আবদ্ধ থাকিয়া একটা জিনিসের চারি দিকে ঘুরিবার জন্য ঐ পাথরে কেন্দ্রাপগামিনী শক্তির সঞ্চার হইল, এবং সেই কারণে দড়িতে ঐরূপ টানের আমরা অনুভব করিলাম। ইহার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটাও বুঝা গেল যে, পাথর যত তাড়াতাড়ি ঘোরে, তত জোরে টান পড়ে।

এই সূত্র অবলম্বন করিয়া সিরিয়সের সঙ্গীটির সাহায্যে সিরিয়সের ওজন ঠিক করা হইয়াছে। উক্ত সঙ্গী উনপঞ্চাশ বৎসরে একবার সিরিয়স্‌কে প্রদক্ষিণ করে। সূর্য্য হইতে পৃথিবী যত দূরে, সিরিয়স হইতে তাহার সঙ্গী তাহার প্রায় সাঁইত্রিস গুণ দূরে।

সিরিয়সের সঙ্গী উনপঞ্চাশ বৎসরে একবার সিরিয়সের চারিদিকে ঘোরে। ইহার দরুণ যে পরিমাণে কেন্দ্রাপগামিনী শক্তি উৎপন্ন হইতেছে, সিরিয়স্ তাহা পরাস্ত করিলে তবে ঐ সঙ্গীটিকে ধরিয়া রাখিতে পারেন, নচেৎ সঙ্গী হাত ছাড়া হইয়া যায়। আবার বেশী জোরে টানিলেও মুস্কিল; কারণ তাহা হইলে সঙ্গী আসিয়া ঘাড়ে পড়িবে।

সুতরাং এবিষয়টিই সিরিয়সকে ওজন করিবার তুলাদণ্ড। এই ঘটনার উপর মাধ্যাকর্ষণের সূত্র প্রয়োগ করিলেই সিরিয়সের ওজন বাহির হইবে। এই ওজনের বাটখারা—আমাদের সূর্য্য। অর্থাৎ সিরিয়সে আমাদের সূর্য্যের কয়টার মতন বস্তু আছে, এই ঘটনা হইতে আমরা তাহা জানিতে পারিব।

সূর্য্যের চারিদিকে যে গ্রহগুলি ঘোরে, তাহারা নিজের সুবিধামত যত খুসী দূরে থাকিয়া যেমন ইচ্ছা ছুটিয়া চলিতে পারে না। ওরূপ করিলে যে কাজ চলিবে না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কারণ, ভয়ানক বেগে ঘুরিলে শেষটা একেবারেই ছুটিয়া পালাইবার, আর যথেষ্ট বেগে না ছুটিতে পারিলে সূর্য্যের উপরে গিয়া পড়িবার, ভয় আছে। ইহার উপর আবার, মাধ্যাকর্ষণের কার্য্য কাছের জিনিসের উপরে যত প্রবল, দূরের জিনিসের উপরে তত নহে। সূর্য্য হইতে যে গ্রহ যত দূরে, সূর্য্যের আকর্ষণ তাহার উপর তত কম, সুতরাং ঐ গ্রহের যদি সূর্য্যের সঙ্গে থাকিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তাহাকে নিজের বেগ সংযত করিয়া লইতে হয়। সূর্য্যের পরিবারভুক্ত যত জন আছেন, তাঁহাদের কেহই এই নিয়মের এক চুল অবাধ্য হইতে সাহস করেন না। বাস্তবিক গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি এতই অটল যে, তাহার সহিত তুলনা করিবার দৃষ্টান্ত জগতে আর নাই। এই জন্যই ইহাদের গতির সঙ্গে মিলাইয়া ঘড়ী ঠিক করা হয়।

সে যাহা হউক, সূর্য্যের চারিদিকে যাহারা ঘোরে, তাহাদের প্রত্যেকের দূরত্ব অনুসারে এক একটা বেগের হিসাব বাঁধা আছে। সূর্য্য হইতে কোন্ গ্রহটা কতদূরে আছে, ইহা জানিতে পারিলেই বলিয়া দেওয়া যায় যে, তাহাকে ঠিক এতখানি বেগে ঘুরিতে হইবে। পক্ষান্তরে, সূর্য্যের একটা অনুচরকে যদি একটা নির্দ্দিষ্ট গতিতে চলিতে দেখা যায়, তবে আর একথা জানিতে বাকি থাকে না যে, সে সূর্য্য হইতে কতখানি দূরে?

সিরিয়সের সঙ্গী সিরিয়স্ হইতে যত দূরে, সূর্য্যের যদি ঠিক ততখানি দূরবর্ত্তী একটী সঙ্গী থাকিত, তবে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে তাহার ২২৫ বৎসর লাগিত। এই ২২৫ বৎসরের কাজ সিরিয়সের সঙ্গী উনপঞ্চাশ বৎসরেই শেষ করে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তাহার বেগ এবং তদুৎপন্ন কেন্দ্রাপগামিনী শক্তি কত বেশী; আর তাহাকে ধরিয়া রাখিতে সিরিয়সের কত খানি বল প্রয়োগের আবশ্যক হয়। আমাদের সূর্য্যের ন্যায় কুড়িটা সূর্য্য একত্র না করিলে এত শক্তির সংগ্রহ হয় না। সিরিয়স আমাদের কুড়িটী সূর্য্যের সমান ভারি। আবার দেখুন, উহার সঙ্গীটী উহা হইতে এত দূরে থাকিয়াও ত উহাকে কম ব্যস্ত করে না! সুতরাং সেই সঙ্গীটীও যে নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে।

পৃথিবী হইতে সূর্য্য ৯২৭০০০০০ নয় কোটি সাতাইশ লক্ষ মাইল দূরে এবং সিরিয়স্ এই বিশাল দূরত্বেরও অন্ততঃ দশ লক্ষ গুণ দূরে অবস্থিত। সে মিনিটে হাজার মাইল ছুটিতেছে, তথাপি তাহাকে আমরা সাধারণ চক্ষে স্থিরই দেখিতেছি, ইহাও তাহার দূরত্বের আর একটি নিদর্শন! আর সেই খানে থাকিয়া তাহার সঙ্গী যে এতটা টানাটানি করিতেছে, এই খানে থাকিয়া জ্যোতির্ব্বেত্তারা তাহার প্রমাণ পাইতেছেন। এ বড় সামান্য কর্ম্ম নহে! আমাদের গ্রহগুলির ত এত ক্ষমতা নাই;—আমাদের সূর্য্যেরও তাহা নাই! সিরিয়সের ঐ সঙ্গীটি সাতটি সূর্য্যের সমান বড়!

এত বড় জিনিসটাকে দেখিতে প্রথমে এত কষ্ট হইবার কারণ এই যে, উহার উজ্জ্বলতা নিতান্তই কম। জিনিসটা সাতটা সূর্য্যের ন্যায় বড় বটে, কিন্তু উহার উজ্জ্বলতা সূর্য্যের একশত ভাগের একভাগও হইবে না।

সিরিয়সের আরো সঙ্গী আছে কিনা, তাহা এপর্য্যন্ত জানা যায় নাই। একটি সঙ্গী যে আছে, তাহা দেখা গেল। অতঃপর একথা মনে করা কি স্বাভাবিক নহে যে, আমাদের এই ক্ষীণপ্রাণ সূর্য্যটির অধীনে যতগুলি প্রজা আছে, তাহা অপেক্ষা কুড়িগুণ বৃহৎ সূর্য্যের অধীনে তদপেক্ষা অনেক বেশী আছে? আমাদের সূর্য্যকে সিরিয়সের নিকটে লইয়া গেলে তাহার কি দশা হইত? আমরা কি তখন তাহার এই সকল অনুচরকে দেখিতে পাইতাম? বলা বাহুল্য কখনই না। সূর্য্যকেই হয়ত অতি কষ্টে দেখিতে পাইতাম, কারণ সে

অতিশয় উজ্জ্বল। ওরূপ উজ্জ্বল না হইলে তাহাকেও দেখা যাইত না, অন্য গ্রহগণের কথা আর কি বলিব।

কিন্তু বাস্তবিক অবস্থাটা সেরূপ হইত, এ কথায় তাহা পরিষ্কার বুঝা গেলনা। 'সূর্য্য অথবা গ্রহগণকে দেখা যাইত না' ইহাত তেমন একটা বিস্ময়কর কথা নহে। সূর্য্য উজ্জ্বল বটে, কিন্তু আসলে জিনিসটা অনন্ত আকাশের হিসাবে নিতান্তই ছোট। এমন কি, এই সৌর জগৎটাই যে কতটুকু ক্ষুদ্র জিনিস, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। একবার একটু হিসাব করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে।

যে জিনিস যত লম্বা চওড়া তাহার পাঁচ হাজার গুণ দূরে লইয়া গেলে তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না, একথা পরীক্ষিত সত্য। অবশ্য জিনিসটি যদি জ্যোতিষ্মান্ হয়, তবে আমরা ইহার অপেক্ষা অনেক বেশী দূর হইতেও তাহার জ্যোতিঃ দেখিতে পাই; কিন্তু আসল জিনিসটাকে তাহার আয়তনের পাঁচ হাজার গুণ দূর হইতে দেখা যায় না। এই হিসাবে ধরিলে এক ফুট লম্বা চওড়া একটা জিনিস এক মাইল দূরে গেলে অদৃশ্য হইয়া যায়; চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল দূর হইতে মন্দিরটিকে দেখিতে পাওয়া যায় না। চারি কোটি মাইল দূর হইতে পৃথিবী অদৃশ্য হয়। চারি শত পঁচিশ কোটি মাইল দূর হইতে সূর্য্য এবং তৎসহ সৌর-জগৎটা অদৃশ্য হয়। সমস্ত সৌরজগৎটাকে যদি একটা বিশাল হাঁড়ির ভিতরে পোরা যাইত, তবে সেটা নাজানি কত বড় মস্ত হাঁড়ি হইত। কিন্তু হিসাব করিয়া দেখিলে, তাহাও দুই পদ্ম, আটাত্তর নিখর্ব্ব, মাইল দূরে থাকিলে অদৃশ্য হইয়া যায়। কথাটা যে নিতান্ত সামান্য হইল না, সৌরজগতের গঠন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

ক্রমশঃ—

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায়।

গৌতম আশ্রম।*

Art, glory, freedom fail, but Nature still is fair!
Byron

হেথা কিছু নাহি পুরাতন—
শ্যামল প্রান্তর নিরজন!
নাহিক পাষাণ স্তূপ
কালজয়ী অপরূপ,
যুগান্তের হর্ম্ম্যরাজি, শিলায় লিখন।
কেবল আকাশে বসি'
পুরাণো সে রবি শশী
নবীন জগতে করে আলো বিতরণ।
আর ধরণীর বুকে
মুর্চ্ছি' মনের দুখে
'সরযূ পাতকী' শুধু পড়ি অচেতন।
ইহাই কি পরিণাম—
ভারতে পবিত্র ধাম,
মহামুনি গৌতমের পুণ্য তপোবন!
এই কি সে স্থল হায়!
জগত বিহ্বলপ্রায়
শুনিল প্রথমে যথা ন্যায় দরশন!
এই সরযূর তীরে
নামিয়া আসিত ধীরে
নিশি দিন অহল্যার চকিত চরণ;
তটিনীর স্বচ্ছ গায়
সুন্দরী মুকুর প্রায়
হেরিত লাবণ্যরাশি, অতুল যৌবন।
নিরুপম শোভা মাঝে
প্রকৃতির হেন সাজে
মোহিল কি বিরাগিনী তাপসীর মন!
তেয়াগি' বিভূতি হায়!
কালিমা লেপিয়া গায়
অবহেলে কুলমান দিলা বিসর্জ্জন।
সে ঘোর কলঙ্ক কথা
আজ (?) বুঝি তরুলতা
রাখিয়াছে অঙ্গে হেথা করিয়া লেপন!
আজ (?) নভ-নীলিমায়
সে গান ভাসিয়া যায়—
পাপিয়ার কলকণ্ঠে, কোকিল কূজন!
একদিন এই পথে
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সাথে
ভাঙ্গিবারে হর ধনু করিলা গমন;

* আধুনিক ছাপরা সহর হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত ও এ অঞ্চলে 'গোধনা' নামে প্রসিদ্ধ।

পুণ্য রঘুকুল-সুত
চরণ কমল-পূত
আজিও ভারতে খ্যাত এ বন ভবন।
উঠিয়া ঊষার সনে,
এই স্থানে এক মনে,
সরযূর কলস্বনে মিলাইয়া তান—
মুনির বালক সবে
সুমধুর উচ্চ রবে
শুনাইত প্রতিদিন সামবেদ গান।
এবে সে কোথায় সব ?
সলিল প্রবাহ রব—
ধ্বনিত আজিও হায় এ মহাশ্মশান।
কোথা সে অক্ষয় কীর্ত্তি ?
পাষাণের প্রতিমূর্ত্তি—
শেষ চিহ্ন পড়ি' হেথা পুণ্য জনস্থান!

শ্রীমন্মথনাথ দে বি, এল্.

বর্ষশেষ।

বরষের আজি শেষ দিন!
সুদীর্ঘ জীবন পথ,
বহি' আসিয়াছ কত,
দেখ দেখি একবার হে পান্থ নবীন।
বরষের আজি শেষ দিন।

কোথা তব শৈশব সরল ?
প্রভাতের স্নিগ্ধ ফুল,
আজি মাখা মাটী ধূল,
মরু-মারুতের তাপে মলিন-বিকল,
কোথা তব শৈশব সরল ?

শ্বেত-স্বচ্ছ হৃদয় তোমার—
দেখ দেখি, মসীরাগ,
কত চিহ্ন—কত দাগ,
কত মলা ধরিয়াছে—সীমা নাহি তার!
শ্বেত-স্বচ্ছ হৃদয় তোমার!

পড়ে মনে কত স্নেহ মুখ!
কত করুণার ছবি,
কত আঁধারের রবি,
গেছে চলি অস্তাচলে, পিছে রেখে দুখ,
পড়ে মনে কত স্নেহ মুখ।

বুকভরা স্নেহ-প্রেম-রাশি।
আছে কতখানি তার,
দেখ দেখি, একবার,
কত বা গিয়াছে তার কালস্রোতে ভাসি'।
বুকভরা স্নেহ প্রেম রাশি।

হৃদয়ের সখা কত জন।
এবে কোথা গেল তারা,
সুখে দুখে আত্মহারা,
জীবনের সহযাত্রী কোথায় এখন ?
হৃদয়ের সখা কত জন।

বরষের আজি শেষ দিন।
অস্ত ডুবিতেছে রবি,
দিনের করুণ ছবি,
আধ ধরা পানে চেয়ে বিষাদ-মলিন!
বরষের আজি শেষ দিন।

ম্লানমুখী সন্ধ্যা নামে ধীরে!
সুপ্তি শান্তি বরষিয়া—
স্নেহের অঞ্চল দিয়া—
ঢেকে দিবে দয়াময়ী তাপিত প্রাণীরে!
ম্লানমুখী সন্ধ্যা নামে ধীরে!

খসাইয়া করের কুঠার!
দিবে মুছে রাগ দ্বেষ,
হিংসা অহঙ্কার লেশ,
পর-গ্লানি পর-নিন্দা নিষ্ঠুর আচার!
খসাইয়া করের কুঠার!

ওগো, সন্ধ্যে ভুলাইয়ে ভেদ—
দে মা দয়া,—দে মা ক্ষান্তি,

দে মা সুখ—দে মা শান্তি,
মুছে দে মা, হৃদয়ের পাপ-তাপ-ক্লেদ !
ওগো সন্ধ্যে ভুলাইয়ে ভেদ !

শত্রু মিত্র নহে চির দিন ;—
সুখ দুখ, আগে-পিছে,
চক্র মত ঘুরিতেছে,
এক যায় আর আসে নিয়ম অধীন !
শত্রু মিত্র নহে চির দিন।

শোক, দুঃখ, হর্ষ, বিসম্বাদ—
কত লঘু—কত ক্ষীণ,
দেখি, বুঝি অনুদিন,
তবু মানবের কেন মিটে না'ক সাধ !
শোক, দুঃখ, হর্ষ, বিসম্বাদ !

ভুল তবে আজিকার মত !
ক্ষুদ্র স্বার্থ অভিমান,
ভেঙ্গে কর খান্ খান্,
শুভাশুভ লয়ে দেখ অই বর্ষ গত।
ভুল তবে আজিকার মত।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

সাহজাহানের দৈনিক জীবন।

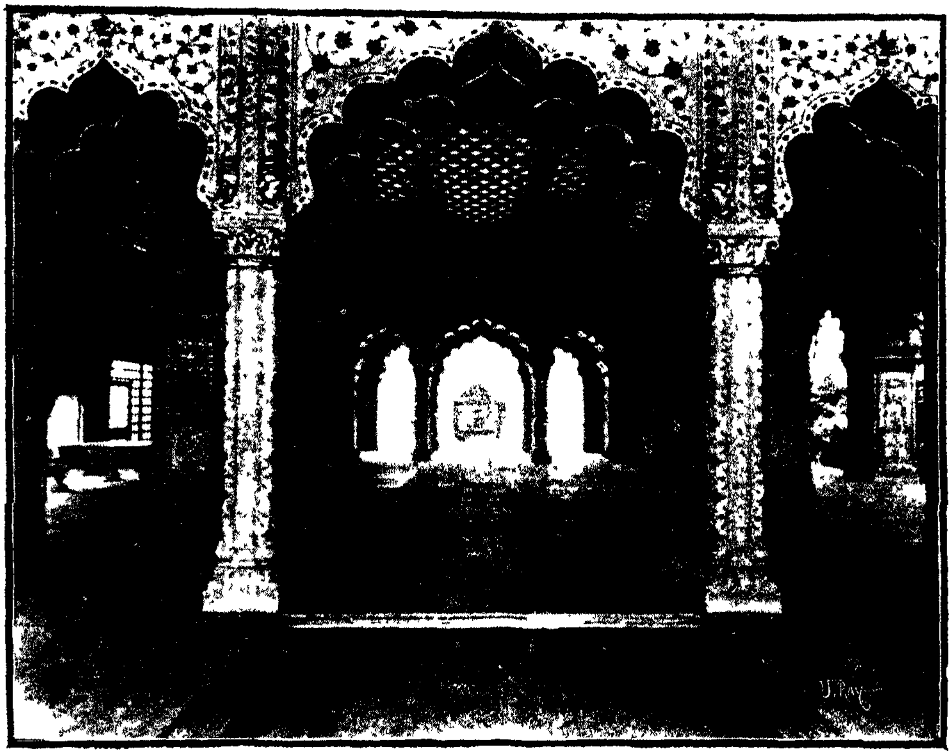
গুশলখানা।

(২)

দেওয়ান আমের কার্য্য শেষ হইবার পর, বাদসা গুশলখানায় প্রবেশ করিতেন। ইহার অপর নাম ছিল—"দেওয়ান—খানে—খাস," বা সোজা কথায় দেওয়ান খাস। দেওয়ান খাসের একখানি চিত্র প্রদীপের এই সংখ্যায় প্রদত্ত হইল। গুশলখানার অভিধান-প্রচলিত অর্থ স্নানাগার। কিন্তু এখানে তাহার কোন চিহ্নই ছিল না। গুশলখানা, প্রকৃত পক্ষে গোপনীয় বিশ্রামগৃহ। আম দরবারে বাদসাহ অনেকটা ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন—সে ক্লান্তি এই গুশলখানার দুর হইত। এই গুশলখানায় একখানি সিংহাসন থাকিত। বাদসাহ আসিয়া সেই সিংহাসনে বসিতেন। এখানেও প্রকৃত পক্ষে রাজ্যের আবশ্যক কার্য্যাদির সমাধা করা হইত। যে সকল কাজ অত্যন্ত জরুরি, সেইগুলি এই সময়ে বাদসাহের সম্মুখে উপস্থিত করা হইত। গুশলখানায় বিশেষ অনুগৃহীত রাজমন্ত্রীরাই থাকিতেন।

ভারতের নানা প্রদেশের পরাক্রান্ত ওমরাহ ও দেশাধিপতিগণ যে সমস্ত আরজী এবং অভিনন্দনপত্র বাদসাহ নামে প্রেরণ করিতেন, তাহাতে রাজ্য সংক্রান্ত অনেক গোপনীয় কথা থাকিত। বাদসাহ সেগুলির শীলমোহর ভাঙ্গা হইলে—নিজ হস্তে লইয়া পাঠ করিতেন। রাজ্য সংক্রান্ত যত সাধারণ চিঠি পত্র আসিত—তাহা সংক্ষিপ্ত আকারে বাদসাহের নিকট উপস্থিত করা হইত। যে গুলি গোপনীয় ও বিশেষ জরুরি, সেগুলির কোন অংশই পরিত্যক্ত হইত না। অনেক দরখাস্তের,—অভিনন্দনপত্রের বা আর্জীর উপর সম্রাট নিজ হস্তে হুকুম প্রদান করিতেন। সেকস্তা, নস্তালিক প্রভৃতি বিবিধ অক্ষরে স্বীয় রুচি ও ইচ্ছানুসারে এই সকল হুকুম লিখিয়া বাদশাহ অর্থী প্রত্যর্থীদের মনস্কামনা পূর্ণ করিতেন। সাধারণতঃ দ্রুতলেখক সুদক্ষ মুন্সীরা তাঁহার বজ্র নির্ঘোষ আদেশসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া লইতেন। মুন্সীরা অতি সাবধানে কার্য্য করিতেন। সাহানাসার আদেশগুলি লেখা হইলে তাহা তাঁহারা পুনরায় আবৃত্তি করিয়া বাদশাহকে শুনাইতেন। কাহারও কোনরূপ ত্রুটি ঘটিলে যথেষ্ট লাঞ্ছনাভোগ করিতে হইত মুন্সীদিগের সতর্ক দৃষ্টি লেখার দিকে থাকিলেও, কর্ণদ্বয় অতি সাবধানতার সহিত সম্রাটের আদেশবাণী শ্রবণের জন্য প্রস্তুত থাকিত।

মোগল সম্রাটের অধীনতায় অনেক আশ্রিত, করদাতা রাজা ও জমিদার ছিলেন। তাঁহাদের রাজ্যের আয় ব্যয়ের হিসাব, এই গুশলখানায় পঠিত হইত। "জেকাৎ" "তন্খা" প্রভৃতি আদায়ের সম্বন্ধে নানাবিধ আদেশ প্রচারিত হইত। যাহাতে সওদাগর, ব্যাপারী ও ব্যবসায়ীরা নির্ব্বিঘ্নে তাহাদের বাণিজ্য দ্রব্যাদি লইয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে পারে, রাজকর্ম্মচারীরা তাহাদের উপর কোনরূপ জবরদস্তি না করেন, তৎসম্বন্ধে আদেশও এইখানে দেওয়া হইত। যদি কোন আমিলদারের শাসনাধীন প্রদেশে, কোন ব্যবসায়ীর



দেওয়ান খাস (অন্তর্দৃশ্য)।

কোন দ্রব্য অপহৃত হইত, তাহা হইলে তাহার আরজী দরবারে পৌঁছিত। বাদসাহের আদেশে আমিলদার—ব্যবসায়ীর ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতেন ও কর্ত্তব্য কার্য্যে অমনোযোগের জন্য সরকার হইতে তাঁহার অর্থ দণ্ড হইত।

গুশলখানায় রাজ্যের ও ব্যবসায়ীদের হিতার্থে আরও অনেক কার্য্যের সূচনা হইত। সেগুলিরও এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক। হীরকের যত প্রকার কাজ হইতে পারে, বস্ত্রাদির উপর সোণা মতির যতদূর কাজ হইতে পারে—প্রত্যেক সুবা হইতে তাহার উৎকৃষ্ট নমুনা ব্যবসায়ীরা রাজধানীতে পাঠাইয়া দিতেন। বাদসাহ তাহাদের প্রত্যেকগুলি সযত্নে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। কোনটী কি হইলে ভাল হইবে—কোন স্থানে পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তৎসম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ লিখিয়া রাখিতে আদেশ করিতেন। যেগুলি পছন্দ হইত, সেগুলি রাজভাণ্ডারে রক্ষিত হইত। এতৎসম্বন্ধে সমস্ত আদেশ, শিল্পকার ও ব্যবসায়ীরা যথাসময়ে সদর মুন্সীর নিকট হইতে জানিতে পারিত। এই গুশলখানার এক স্থানে রাজকীয় পাঠাগার হইতে গ্রন্থকারগণের স্বহস্তে লিখিত পুস্তকাদি আনীত হইয়া সযত্নে রক্ষিত হইত। সেকস্তা, নস্তালিক প্রভৃতি বিবিধ শিল্পকলাময় অক্ষরে সুচিত্রিত গ্রন্থসমূহ উপযুক্ত হইলে বাদসাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাঁহার সময়ে ইয়াকুৎ, সারেফী, মোল্লা মীর আলি, সুলতান আলি মীর আম্মদ, মোল্লা দরবেশ প্রভৃতি সিদ্ধহস্ত লিপিকুশল লেখকগণের সুন্দর হস্তাক্ষরে রঞ্জিত নানাবিষয়িণী গ্রন্থাবলী বাদসাহের মনোরঞ্জনের জন্য প্রেরিত হইত। মনি, রেজাদ, নাদির উম্ জামান্ প্রভৃতি বিখ্যাত চিত্রকরগণের হস্তপ্রসূত, মনোহর চিত্রাদিও, এই সময়ে সম্রাটের কৃপা দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। এই গুশলখানায় বাদসাহের ইচ্ছা হইলে কখনও কখনও ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিচার ও আলোচনাদি হইত। কূট তর্কযুক্ত বিষয়সমূহ দিল্লীশ্বর নিজে সকলকে সরল ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন। রাজকবি ও ভট্টগণ এই সময়ে বন্দনা ও কবিতা আবৃত্তি করিয়া গুণানুসারে পুরস্কার লাভ

করিত। হাকিম, হিন্দু ভিষক্‌ ও ইরাণী চিকিৎসকগণ এই ক্ষেত্রে তাঁহাদের চিকিৎসা শাস্ত্রের নূতন তথ্যগুলি বাদসাহের কর্ণগোচর করিতে আদিষ্ট হইতেন। জ্যোতির্ব্বিদ গ্রহাচার্য্যগণ এই সময়ে সম্রাটের সমীপে আপনাদের গুণ-পণা প্রকাশ করিতেন। অনেক হিন্দু ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত এই সময়ে স্ব স্ব অধীত ও আলোচ্য বিদ্যার পরিচয় প্রদান করিয়া পুরস্কার লাভ করিতেন। শেলেখানার, তোপখানার কর্ম্মচারিগণ এই সময়ে আপনাদের অধীন কর্ম্মকারকের প্রস্তুত রত্নখচিত, অসি, বর্ম্ম, চর্ম্ম, বন্দুক প্রভৃতি বাদসাহের দর্শনের জন্য পাঠাইয়া দিতেন। রাজাদেশে নির্দ্দিষ্ট বীর পুরু-ষেরা উপস্থিত থাকিয়া এই সমস্ত যুদ্ধাস্ত্রের কার্য্য-শক্তি পরীক্ষা করিত। এই গুশলখানায় স্বর্ণখচিত রজ্জুসংলগ্ন স্বর্ণময় ঘণ্টা দোদুল্যমান থাকিত। এই ঘণ্টার রজ্জু বাহিরের রাজদ্বার পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। সামান্য প্রজা বিচারার্থী হইয়া এই ঘণ্টার রজ্জু আকর্ষণ করিলে দুনিয়ার অধীশ্বর তাহা বুঝিতে পারিতেন ও তৎসম্বন্ধে যথাযথ আদেশ প্রদান করিতেন। রাজকার্য্যাবসানে কলাবৎ (পুরুষগায়ক) তওয়া এফ্‌ (ধর্ম্মসঙ্গীতগায়িকা) প্রভৃতি আহূত হইত। অতি অল্প ক্ষণেই সেই মন্ত্রণাগার বিচিত্র মধুর সঙ্গীতধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিত।

বিচারের জন্য আইনজ্ঞ বিচারক সমূহ সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকিতেন। কিন্তু বাদসাহ সকল প্রকার অভিযোগ স্বকর্ণে শুনিবার জন্য সপ্তাহে একটী দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। সেই দিন তিনি সিংহাসনে আসীন হইয়া প্রত্যেক বাদী প্রতিবাদীর আরজী স্বকর্ণে শুনিতেন। এই দিনে ছিন্নকন্থা দরিদ্র হইতে কৌষেয় পরিহিত আমীর ওমরাহ পর্য্যন্ত সকলই সম্রাট সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বিচারপ্রার্থী হইতে পারিত। অপরাধীরা বজ্রনির্ঘোষবৎ কঠোর রাজাদেশ শুনিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিত। দণ্ডিত অপরাধী ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, সাহানসা অবস্থা বুঝিয়া ক্ষমা করিতেন। তাহারা জয়োচ্চারণ করিতে করিতে চলিয়া যাইত। মধ্যে মধ্যে বাদসাহ মৃগয়া প্রভৃতির উদ্দেশ্যে দূরতর স্থানে যাইতেন। সে সময়ে প্রত্যেক বিশিষ্ট, জনপূর্ণ গ্রামের মধ্যে তাঁহার শিবির স্থাপিত হইত। কেবল মৃগয়ার আনন্দ নহে, সাধারণ প্রজার অবস্থা স্বচক্ষে দেখাও এই মৃগয়া যাত্রার অন্যতম উদ্দেশ্যছিল। যখন বাদসাহ সফরে বাহির হইতেন—তখন অতি দীন দরিদ্র প্রজা হইতে মহাপরাক্রান্ত আমীর পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া আরজী পেশ করিত।

মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত বাদসাহ রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকি-তেন। সূর্য্যকিরণ প্রখর হইয়া উঠিলে দামামা ধ্বনি দ্বারা বাদসাহের অন্তঃপুর-প্রবেশবার্ত্তা বিঘোষিত হইত। বাদ-সাহ হারেমসরাই (অন্দর মহলে) প্রবেশ করিয়া আরাম বোধ করিতেন। এই স্থানে তাঁহার আহারের জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত থাকিত। প্রধানা মহিষীরা সযত্নে তাঁহার আহারের আয়োজন করিয়া দিতেন। স্বর্ণখচিত বস্ত্রাবরণের উপর সমস্ত সুবা হইতে সংগৃহীত—রসনার তৃপ্তিকর দ্রব্যাদি, কাশ্মীর হইতে আনীত সুবাসিত তুষার বারি, নানা বিধ ফল মূল ও পলান্ন মিষ্টান্ন প্রভৃতি স্তরে স্তরে স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্রে, তাঁহার জন্য রক্ষিত হইত। সুন্দরী ব্যজনকারিণীরা মুক্তা খচিত স্বর্ণাভ ব্যজন লইয়া স্বর্ণকঙ্কবৎ আহার গৃহে বাদসাহের সেবায় নিযুক্ত হইত। সমস্ত আহার দ্রব্য লোহিত মখমলে আবৃত থাকিত। পিতা-মহের গৌরবান্বিত নিয়মানুসারে, বাদসাহ সেই আস্তরণ খুলিয়া বিবিধ মুখরোচক খাদ্যের প্রতি একবার সহাস্য দৃষ্টিক্ষেপ করিতেন, সর্ব্বাগ্রে তাহার একাংশ অভুক্ত দরি-দ্রের, ও অপরাংশ, তাঁহার সভাসদ বর্গের ও অন্তঃপুরিকা-দিগের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ নিজের শরীর পোষণার্থ গ্রহণ করিতেন। আকবর সাহের ন্যায়—তিনি ফলমূলা-দির প্রতি অতি অনুরক্ত ছিলেন। আহার কার্য্য সমাপ্ত হইলে দরিদ্রদিগের নির্দ্দিষ্ট অংশ রাজবাহকেরা বাহিরে পৌঁছাইয়া দিত। তাহা প্রতিদিন নিয়মিত রূপে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরিত হইত। অন্তঃপুরিকাদের ভাগ—প্রত্যেক বেগমের গৃহে প্রেরিত হইত। সকলে রাজপ্রসাদ অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত ভোজন করিতেন। যখন বাদসাহ তাঁহার আমীর ওমরাহ ও রাজকুমারগণের সহিত একত্র ভোজন করিবার ইচ্ছা করিতেন, তখন বহিঃকক্ষস্থ কোন গৃহে তাহার আয়োজন হইত। এরূপ আয়োজন বাদসাহের ইচ্ছা বা মরজির উপর, অথবা কোন উৎসব পর্ব্বাদির উপর নির্ভর করিত।

দেওয়ান খাসের নিভৃত পুষ্পসজ্জিত কক্ষে, স্বর্ণময় খট্টায় সুবর্ণাস্তরণমণ্ডিত শয্যায় সুকোমল উপাধানে

মস্তক স্থাপন করিয়া বাদসাহ নিদ্রিত হইতেন। তাঁহার নিদ্রার সময়ও নির্দ্দিষ্ট ছিল; ঠিক সেই সময়ে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতেন। যে দিন ঘটনা ক্রমে, বা রাজকার্য্য-জনিত ক্লান্তিবশে, নিদ্রার নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইত, সে দিন পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে, সুমধুর বাদানিক্বণে অথবা কণ্ঠ বা যন্ত্র সঙ্গীতের সহায়তায় তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করা হইত। নিদ্রা ভঙ্গের পর সুবাসিত বারিতে মুখ প্রক্ষালন করিয়া, বাদসাহ দিনান্তের ঈশ্বরোপাসনায় ব্রতী হইতেন। তিনি একাকী সেই নিভৃত প্রাসাদ কক্ষের মর্ম্মর ফলকাস্তরণে বসিয়া দিলীশ্বর খোদা তাল্লার নিকট প্রার্থনা করিয়া শুদ্ধ চিত্ত হইতেন। প্রার্থনা শেষ হইলে দেওয়ান খাস-সংলগ্ন একটি বহিঃকক্ষে, খাদ্যাদির আয়োজন হইত। এই স্থানে অনেক আমীর ওমরাহ ও রাজকুমারগণ উপস্থিত থাকিতেন। বাদসাহের পার্শ্বে রাজকুমার এবং সম্মুখে পদস্থ উজীর ও বিশ্বস্ত রাজকর্ম্মচারিগণ বসিতেন বাদসাহ স্বহস্তে সকলকে আহার্য্য দ্রব্য তুলিয়া দিতেন।

দিবাবসানে যখন সন্ধ্যার অন্ধকার সেই দেবলোক-সদৃশ প্রাসাদতলকে নিমজ্জিত করিত, তখন স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্রে নানাবিধ দীপাবলী প্রজ্জ্বলিত হইয়া সে অন্ধকারকে বিনাশ করিত। প্রতি কক্ষ সুগন্ধি দীপাবলী, সুগ্রথিত পুষ্পমাল্যে ও পুষ্পস্তবকে শোভিত হইয়া অতি সুন্দর দেখাইত। দুর্গদ্বারে সন্ধ্যার সময় নহবৎ বাজিয়া উঠিত। সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে বাদসাহ উন্মুক্ত ছাদে উঠিয়া আজান দিয়া বিশুদ্ধ চিত্ত হইতেন। তাহার পর পুনরায় গুশলখানার নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিতেন।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

অভিনয়।

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কুমার নবীন কিশোর গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুর থিয়েটার নামক কল্পপাদকের একটি শাখা তাঁহার বাসস্থান স্বরূপপুর গ্রামে প্রোথিত করিয়াছিলেন। কিন্তু মাটির দোষে তাহা বিষ-বৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল।

শ্রীমান্ নবীন কিশোর বাহাদুর জমীদারের সন্তান, বিবাহ সত্ত্বেও তিনি কুমার নামে অভিহিত হইতেন। তাহার পিতা রাজা ছিলেন না, তথাপি ভক্ত প্রজাপুঞ্জ তাঁহাকে রাজস্বরূপ জ্ঞান করিয়া, নবীন কিশোরকে 'কুমার' বলিত। অর্থ পণ্যে তাঁহাকে এই খেতাব ক্রয় করিতে হয় নাই, তাহার সেরূপ উচ্চাভিলাষও ছিল না।

ভদ্র লোকের সহিত মিশিবার অবসর কুমার বাহাদুরের বড় অল্প ছিল। কারণ সময়ের সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার যেরূপ ধারণা ছিল, ভদ্রলোকদের ধারণা তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তদ্ভিন্ন ভদ্রলোকের সহিত আলাপ পরিচয় করা তিনি তাঁহার 'পজিসনের' পক্ষে অত্যন্ত বাহুল্য মনে করিতেন। শৈশবে ও যৌবনে তিনি যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, ভদ্রতার সহিত তাহার কিছুমাত্র পরিচয় ছিল না।

নবীন কিশোর শৈশবে মাতৃহীন হন, তাঁহার পিতা চন্দ্রকিশোর বাবু একমাত্র পুত্রকে তাঁহার আকাঙ্ক্ষানুযায়ী পিণ্ড-দানের যোগ্য পাত্র বিবেচনা না করিয়া 'পুত্র পিণ্ড-প্রয়োজনার্থ' দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু আশানুরূপ পিণ্ডদাতার আবির্ভাবের পূর্ব্বেই বিধাতা তাঁহাকে ইহলোক হইতে অপসারিত করিলেন। অতঃপর নবীন কিশোর পিসিমার রাজত্বে বাস করিতে লাগিল। তখন তাহার বয়স বার বৎসর। পিতার মৃত্যুর পর নবীন কিশোরের নিকট বিশ্ব সংসারটা নিতান্ত অন্ধকারময় বোধ হইয়াছিল, কিন্তু অল্প দিনের অভিজ্ঞতাতেই সে বুঝিতে পারিল, এ জগৎ বিধাতা বড় অপরূপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। ক্রমে এই পৃথিবী তাহার নিকট স্বর্গের ন্যায় মনোরম বোধ হইতে লাগিল। তাহার সহচরবর্গ ক্রমে তাহাকে সকল স্বর্গে ঘুরাইয়া আনিয়া তাহার পঁচিশ বৎসর বয়সেই দুর্লঙ্ঘ্য কামনা পাড়ি জমাইবার উপক্রম করিয়াছিল। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলিয়াছেন, আশার পার নাই। তাই সহসা এক নব বসন্তের আম্র মুকুল গন্ধামোদিত প্রভাতে স্বরূপপুরের ফুলবাগানে এক খানি পালঙ্কে শয়ন করিয়া বিদ্যাসুন্দর পাঠ করিতে করিতে নবীন কিশোর বলিলেন, "মালিনী মাসি!"

"কেন গো বোন পো?" বলিয়া কক্ষান্তর হইতে এক গৌর বর্ণ যুবক বাহির হইয়া আসিলেন। ইনি নবীন কিশোরের মাতৃস্বসারপুত্র বলরাম, নামে নবীন কিশোরের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী, কার্য্যে তাঁহার রহস্যাবৃত ডিপার্টমেণ্টের সর্দ্দার

খানসামা। বাল্যকাল হইতেই ইনি নবীন কিশোরের মস্তকচর্ব্বণের দন্তস্বরূপ হইয়া গাঙ্গুলি বাড়ীতে বিরাজ করিতেছেন।

নবীন কিশোর বলিলেন, "মালিনী মাসি, আর ত বাপু পারা যায় না, কত কাল আর এরকম নকল অভিনয় করা যাবে? একবার আসল অভিনয় আরম্ভ কর না, জীবনটা যে একদম দমে গেল। বেনল্ডের মিষ্ টী ফিষ্ টী গুলো ত সব পড়ে ফেলোচ,পড়া শুনাতে আর আমোদ নেই; কলকাতায় বসে রোজ রোজ থিয়েটার দেখা, সেও বড় সুবিধের কথা নয়; চারদিকে অনেক মাছি এসে জোটে, যেন পাকা কাঁটাল ভাঙ্গা পায়। তাই বলেছলেম, এসনা একটা থিয়েটারের দল খোলা যাক্, বিদ্যা সুন্দর পড়তে পড়তে আইডিয়াটা চট্ করে মাথার মধ্যে এসে পড়েছে। ভারি একটা 'সাব্লাইম আইডিয়া', নয়? গাঙ্গুলী বংশে যা কেউ কখন পারেনি, স্বরূপপুরে কেউ কোন পুরুষে দেখেনি, তাই করা হবে, চার দিক হতে লোকে বাহবা দেবে।"

বলরাম ঠিক পটের বলরামের মত বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া বলিল, "আর দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমাদের বুকের ছাতি এত খানি ফুলে উঠ্‌বে, চাই কি স্বর্গেও বাতি জ্বল্‌তে পারে!"

নবীন কিশোর মহা উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "তবে আর বিলম্ব করা নয়, আজ দুপুরে যখন পাশার আড্ডা পড়বে, তখন কি অভিনয় করা যাবে, স্থির কর। আর সিন, সাজ, ষ্টেজ প্রভৃতির বিষয় কি করা কর্ত্তব্য তাও স্থির করতে হবে।"

বলরাম বলিল, "ষ্টেজটা খুব জমকালো হওয়া দরকার। 'আগে দর্শনধারী পরে গুণ বিচারী'।" নবীন বলিল "তা বটে কিন্তু আপাততঃ বেশী টাকা খরচ ক'রে দরকার নেই। যদি 'প্রোফেসনে,' দাঁড় করান যায়, তবে তখন দেখা যাবে। চাইকি এখান হ'তে কল্‌কাতাতেও দল করে 'ট্রান্সফার' করে নিয়ে যেতে পারি। যত ব্যবসাদার থিয়েটার গুলো একেবারে কানা হয়ে যাবে।"

বলরাম—"কানা!—কানা ত ভাল,একেবারে অন্ধ হয়ে যাবে, দুটি চক্ষুতে সাফ্ অন্ধকার দেখবে! আঃ, তখন কি মজাই হবে, আমি কিন্তু দাদা, 'বিজনেস্ ম্যানেজার' হব।"

নবীন—"সে পরের কথা পরে হবে, আপাততঃ যে বড় একটা মুস্কিল।"

বলরাম—"যাহা মুস্কিল, তাঁহা আসান'—রূপচাঁদ যার সহায়, তার আবার মুস্কিল কি?"

নবীন "এক্ট্রেসের কি করা যাবে?"

বলরাম—এক্ট্রেসের ভাবনা কি? গুপে কামার, পরাণে মুদী, ফেলা তাঁতি, গোকুলো গাঁড়ার এরা সবাই বড্ড ভাল এক্‌ট করে! মস্ত মস্ত এক্টর, সেবার মনসার ভাষাণের পালা দেখনি বুঝি! গুপে মনসা সেজে যে বক্তৃতা করেছিল, একেবারে বলিহারি; কিযে গানের তারিপ, এক একটা গান গায়, আর চার দিক হতে দুশো 'এনকোর' পড়ে।"

নবীন—"আরে ছ্যাঃ—পুরুষ মানুষে এক্‌ট্রেস সাজ্‌বে! সে সব হবে টবে না। মরাল করেজ চাই, মালিনা মাসি, মরাল করেজ, আর্টের ডেভেলাপমেণ্ট!—কথা হচ্ছে, এক্ট্রেস সংগ্রহ করা যায় কোথা হ'তে? that's a difficult job." (গম্ভীরভাবে মস্তকান্দোলন)।

বলরাম—'কুচ পরোয়া নেই দাদা, গোটা কত ঢপের দল কুরলেই ঠিক হবে, কলকাতা সহরে টাকা হ'লে সব মেলে। গোটাকত কীর্ত্তনওয়ালীকে গ'ড়ে পিটে আয়েসা, তিলোত্তমা, কুন্দনন্দিনী, হীরে মালিনী সাজানো যাবে, ও সব কাজে আমি খুব এক্‌সপার্ট আছি।"

পাশার আড্ডায় ঠিক হইয়া গেল, স্বরূপপুরে গাঙ্গুলীদের চণ্ডীমণ্ডপের আঙ্গিনায় রঙ্গমঞ্চ বাঁধা হইবে, তাহার নাম হইবে "ত্রিদিব রঙ্গালয়।"—সাজ পোষাক সমস্ত কলিকাতা হইতে নুতন আমদানী করা হইবে। বলরাম দশটী এক্‌ট্রেস সংগ্রহ করিয়া আনিবেন। সেই সঙ্গে একজন মাষ্টারও আনা হইবে, তিনি সঙ্গীত ও অভিনয় শিখাইবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কয় সহস্র বলিতে পারি না, তবে কয়েক সহস্র বটে, মুদ্রা ব্যয় করিয়া দুই সপ্তাহ মধ্যে বলরাম কলিকাতা হইতে গৃহে ফিরিলেন। রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে পাঁচখানি পাল্কী বিকট হুঙ্কারে তাঁহার অনুগমন পূর্ব্বক ফুলবাগানে প্রবেশ করিল। সর্ব্বকার্য্যে সুদক্ষ বলরাম কলিকাতা হইতে ত্রিদিব রঙ্গালয়ের জন্য যে কয়েকটি অপ্সরার আমদানী করিয়াছিলেন, তাহাদের আবির্ভাবসংবাদ নবীন কিশোরের ধর্ম্মপত্নী বিরাজমোহিনী দেবীর অজ্ঞাত রহিল না। ক্রোধে তিনি গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কাব্যকলার প্রতি তাঁহার

স্বামার এই প্রকার অনুরাগ, তাঁহার মানসিক বিরাগ সম্বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল।

পত্নীর ক্রোধাতিশয্যে সে দিন নবীন কিশোরের বিন্দু মাত্র চিন্তারও অবসর ছিল না। তিনি অতিথি সৎকারে প্রবৃত্ত হইলেন, বিশেষতঃ বাহন-বর্জ্জিত কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় রূপবান্ একটি যুবা বন্ধু লাভ করিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। এই পার্থিব কার্ত্তিকটির নাম গণেশ বাবু, তিনি থিয়েটারের দলে শিক্ষক হইয়া আসিয়াছেন। মূর্খ জমীদারের দলে প্রতিপত্তি বিস্তারে গণেশ বাবুর আশ্চর্য্য দক্ষতা ছিল।

অতঃপর থিয়েটারের দল পুষ্টির জন্য গ্রামে রূপবান্ ছেলে সংগ্রহ হইতে লাগিল। ছকড়ি মুদীর ছেলে পটলা দিবা তেল নুন বিক্রয় করিত। বৃদ্ধ ছকড়ি বাতের রোগী, বাড়ীতে পড়িয়া রোগ যন্ত্রণা ভোগ করে। গ্রামের বাজারে তাহার একখান দোকান ছিল। তের বৎসরের ছেলে পটোল বাপের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের প্রধান সহায়। হঠাৎ এক দিন ছকড়ির দোকান বন্ধ দেখা গেল, ক্রেতাগণ অগত্যা অন্য দোকান হইতে জিনিষ পত্র সংগ্রহ করিতে লাগিল। দুদিন পরে যদি বা পটলাকে দোকানে বসিয়া থাকিতে দেখা গেল, কিন্তু তখন সে দাঁড়ি ত্যাগ করিয়া একখান খাতা হাতে লইয়া কেবলই মুখস্ত করিতেছিল,—

"ভাই রে লক্ষ্মণ,
এই কিরে রাজ্য ধন!"

সীতার বনবাসে সে রাম সাজিবে, গণেশ বাবু তাহাকে পাঠ দিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে ছকড়ি দত্তর দোকান নাটকের আড্ডায় পরিণত হইল। বামধন নাপিতের ছেলে বটকেষ্টো দাড়ি কামানোটা এক রকম শিখিয়াছিল, সে ভাঁ'ড় ফেলিয়া লবকুশের কুশ সাজিতে গেল। যাহারা বোধোদয় ধরিয়াই ইস্কুল ছাড়িয়া ছিল, তাহারা আবার নূতন করিয়া সরস্বতীর উপাসনায় মনঃসংযোগ করিল—অবশ্য প্রকারান্তরে। কাব্যকলা বিকাশের কোলাহলে ক্ষুদ্র স্বরূপপুর গ্রামের কানে তালা লাগিয়া গেল। কলিকাতার বাঙ্গালা সংবাদপত্রগুলিতে পর্য্যন্ত নবীন কিশোরের উৎকৃষ্ট প্রতিভার প্রশংসাবাদ আরম্ভ হইল; নবীন কিশোরের রত্নভাণ্ডারে মফঃস্বলের সংবাদদাতা-রূপ উজ্জ্বল রত্নের অভাব ছিল না।

গ্রাম কিরূপ 'সর গরম' হইয়া উঠিল, তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা এই আকিঞ্চিৎকর লেখকের নাই। ফুলবাগান নামক উদ্যান ভবনে সপ্তাহে তিন দিন "রিহার্স্যাল" চলিতে লাগিল। নবীন কিশোর পূর্ব্বে বাড়ী আসিবার বড় অবসর পাইতেন না, এখন বাড়ীর সংস্রব প্রায় পরিত্যাগ করিলেন। বাড়ীর কর্ত্তৃত্ব ভারপ্রধানতঃ গণেশ বাবুর উপরই ন্যস্ত হইল। তাঁহার সহিত নবীন কিশোরের প্রণয় যৎপরোনাস্তি প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল; সেই অধিকার গর্ব্বে গণেশ বাবু সময়ে সময়ে বৃদ্ধ দেওয়ানজীর প্রতিও চক্ষু রক্তবর্ণ করিতেন।

বিরাজমোহিনী অন্তঃপুরে বসিয়া বৃথা আক্ষেপ করিতেন। বিশেষ কোন আবশ্যক বশতঃ নবীন কিশোর দৈবাৎ গৃহে পদার্পণ করিলেও গৃহিণীর তর্জ্জনে অন্দর মহলে প্রবেশ করিতে সাহসী হইতেন না; সুতরাং গৃহিণী বহির্ব্বাটিতে আসিয়াই বর্ষণ করিয়া যাইতেন। হীরে খানসামা গুরুচরণ বেণের দোকানে বসিয়া একদিন গল্প করিতেছিল—সে অশ্রু বর্ষণ নহে, তাহা তদপেক্ষা সারবান এবং তীক্ষ্ণতর পদার্থ।

যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে "ত্রিদিব রঙ্গমঞ্চে" অভিনয় আরম্ভ হইল। পল্লী-দর্শকগণ করতলে চন্দ্র লাভ করিল। কি নাচ, কি শ্রবণ-মনোমোহন গান, অভিনেত্রীগণের কি শুভ্র চূর্ণানুলিপ্ত বদনকমল, বিদীর্ণ পটোল-নেত্রের কি মোহময় বঙ্কিম ভঙ্গী। দর্শকগণ স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া মুখ ব্যাদানপূর্ব্বক কাব্যকলার সুমধুর বিকাশ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, চতুর্দ্দিক হইতে ক্রমাগত 'এনকোর', 'বিউটিফুল', 'ভেরি নাইস' প্রভৃতি শব্দ-কুসুম বিদ্যাধরীগণের উদ্দেশে বর্ষিত হইতে লাগিল। সমস্ত গ্রামে ধন্য ধন্য রব উত্থিত হইল। গ্রামের ছোট ছোট ছেলেরা পর্য্যন্ত সুধা রসের আস্বাদনে জীবন সফল করিল। যে সকল পিতৃ মাতৃ পরিত্যক্ত যুবক বৃদ্ধ পিতার স্কন্ধচ্যুত হইয়া জগৎ অন্ধকার দেখিতেছিল, তাহারা লাঙ্গুল আস্ফালন পূর্ব্বক ফুলবাগানের বৃক্ষ শাখায় উপবেশন করিল। কনসার্ট পার্টিতে কাহারও স্থান হইল, কেহ বা নাটক রচনার ভার গ্রহণ করিল। 'সরকারী হুকুম মতে' গ্রামের সরাপের দোকানদার হরিশচন্দ্র সাহা একখানি দোতলা বাড়ী নির্ম্মাণের আয়োজন করিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নবীন কিশোরের সহধর্ম্মিণী বিরাজমোহিনী দেবীর বয়স একবিংশ বৎসর। দশ বৎসর হইল, নবীন কিশোরের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। পিসিমা অনেক সাধ করিয়া পঞ্চদশ বর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত বিরাজের বিবাহ দিয়াছিলেন। বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছিল, বৌটি তাঁহার মনের মতই হইয়াছিল। কিন্তু ভগবান মকর-কেতনের রহস্য কে বুঝিবে! বধূ নবীন-কিশোরের মনের মত হইল না। বিরাজমোহিনী ধনাঢ্যের সুন্দরী কন্যা। আশৈশব তাহার কেবল বিলাসিতাই শিক্ষা হইয়াছিল, স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য শিক্ষা সে কোন দিন পায় নাই। তাহার উপর নবীন কিশোরের কিছুমাত্র সুশিক্ষা হয় নাই, সুতরাং অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যা লইয়া সংসার করা অপেক্ষা অরণ্যে গমনই তাহার নিকট শ্রেয়ঃ জ্ঞান হইয়াছিল। তাহার পিতা বাল্যকালে তাহাকে চাণক্য-শ্লোক মুখস্ত করাইয়াছিলেন; কিন্তু অরণ্যে গমন না করিয়া নবীন কিশোর ফুলবাগানে গমন করিল। সেখানে কেবল উদ্ভিজ্জাত পুষ্পই ছিল না, একটি সচেতন পুষ্পও বর্ত্তমান ছিল। এই পুষ্পটি তাহার হৃদয় অরুণের সূর্য্যমুখী স্বরূপ দিবারাত্রি বিরাজ করিত এবং বিরাজমোহিনীর অন্তর্জ্জ্বালা বাষ্পাকারে তাহার হৃদয়াকাশে পুঞ্জীভূত হইয়া অশ্রুরূপে বর্ষিত হইত, কখন কখন দুর্লভদর্শন পতির পৃষ্ঠে বজ্রাঘাতও হইত।

গণেশ বাবুর কুঠুরী নবীন কিশোরের বৈটকখানার পাশেই। ফাল্গুনের জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রে গণেশ চন্দ্র চন্দ্রালোক বিধৌত বারান্দায় চেয়ারখানা টানিয়া একটা বিরহ সঙ্গীত গাহিতেছিলেন. গানটি অদূরবর্ত্তী বেড়ার ধারে নব প্রস্ফুটিত রজনীগন্ধার স্নিগ্ধ গন্ধের সহিত নৈশ সমীরণ হিল্লোলে ঊর্দ্ধ পথে ভাসিয়া যাইতেছিল।

সহসা গণেশ বাবুর অদূরে একটি নারী মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। গণেশ সবিস্ময়ে বলিলেন, "কে ওখানে ?"—গান তখন থামিয়া গিয়াছিল, সমস্ত প্রকৃতি নীরব।

নারী মূর্ত্তি বলিল, "আমি দামিনী।"

দামিনী বিধবা, বয়স পঁচিশের অধিক নহে। সে চূড়ী ও পেড়ে কাপড় পরে, দাঁতে মিশি দেয়, সকলের সঙ্গে হাসিয়া কথা বলে, বেশ বিন্যাসে ও প্রভুপত্নীর মনোরঞ্জনে অদ্বিতীয়া; দামিনী বিরাজমোহিনীর প্রধানা কিঙ্করী।

দামিনী বলিল, "বাবু গানটা আর একবার গান।"

গণেশ বাবু বলিলেন, "কেন রে দামিনী, আবার গাব কেন, তোর কি এত ভাল লেগেছে ?"

আমার ভাল লাগার জন্যে আপনাকে বল্‌তে ত আমার ভারি মাথা ব্যথা। বৌ দিদিমণি বলছেন, খুব ভাল গান। আপনি এত ভাল গাইতে পারেন, তা কে জান্‌তো।"

"কেন, জানলে কি তোমাদের বৌ দিদিমণি আমাকে তাঁর বাড়ীতে আশ্রয় দিতেন না ?"

দামিনী বলিল, "বৌ দিদিমণি বলেছেন, আপনি ত আমাদের কাঁধে চড়ে নেই; এখন গান, তাঁর বড় ভাল লেগেছে।"

গণেশ বাবু হাসিয়া বলিলেন, "আর একটা গাই, এটা আরও ভাল। একটু কাশিয়া সুমধুর স্বরে গাহিতে লাগিলেন,

এমন মধুর মধুনিশি মাঝে
সে যদি গো পাশে রহিত,
একবার শুধু সুধা হাসি হেসে
স্নেহে আঁখি তুলে চাহিত।
তাহ'লে আমার পরাণের মাঝে
দেখাতেম তারে কি ব্যথা বিরাজে;
তৃষিত হৃদয় কত ভয়ে লাজে
কি বিষাদ গাথা গাহিত।
জোছনায় ঐ ভাসে ধরাতল
সমীর বহিছে ফুল পরিমল
শিহরি ঝরিছে সেফালিকা দল
আজি, নিখিল প্রকৃতি মোহিত।
আমারই কেবল নয়নের জল
নয়ন ছাপায়ে করে টলমল,
সারা নিশি ধরি কাঁদিয়ে কেবল
আঁখি দুটি হ'ল লোহিত।

গানের সুর, বিরাজ মোহিনীর কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার প্রতিবর্ণ তাহারই অতৃপ্ত বাসনারূপে ঝঙ্কারিত হইতে লাগিল। এমন নবীন যৌবন, এমন শশধর-কিরণ-বিধৌত ধরাতল, এমন স্নিগ্ধ পুষ্পগন্ধ-সমাকুল রাত্রি এবং বসন্তের সুখস্পর্শ সমীরণ তাহার সেই একুশ বৎসরের বাসনাব্যাপ্ত বেদনাবিদ্ধ যৌবনের প্রতি প্রকৃতির তীব্র-

বিদ্রুপ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কি এক মোহময় স্বপ্ন চঞ্চল রক্তস্রোতের ন্যায় খরবেগে তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ পূর্ব্বক উন্মাদনাময় মাদকতা বসে তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। বিরাজ মোহিনী তাহার নির্জ্জন কক্ষে একখানি সোফায় বসিয়া বাতায়ন পথে হাস্যময়ী প্রকৃতির দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল—

"এমন মধুর মধু নিশি মাঝে
সে যদি গো পাশে রহিত ?
একবার শুধু সুধাহাসি হেসে
স্নেহে আঁখি তুলে চাহিত।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরদিন মধ্যাহ্নে দামিনী তাহার বৌ দিদিমণির চুল বাঁধিতেছিল, বিরাজ মোহিনী আরসিতে মুখ দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "হ্যাঁলো দামিনি, তুইত নাটক দেখে এসে ভারি সুখ্যাতি কচ্ছিলি, গানটান গুলো কি রকম হয়, বল্ দেখি।"

"খুব ভাল বৌ দিদি, তোমাকে এক মাস হতে সাধচি, যদি একবার দেখ; কত ভদ্দোর লোকের ঝি বৌ দেখ্তে যায়, আর তোমার ত বলে ঘরের জিনিষ, দেখে একবার চক্ষুদুটা স্বার্থক কর বৌ দিদিমণি। আমাদের বাবু নিজে লক্ষ্মণ সাজেন, আর মেঘনাদ সাজে ঐ গণেশ বাবু, কেমন মানায়, ঠিক যেন কার্ত্তিক গণেশ। আর প্রেমিলার গানগুলি প্রাণ একেবারে কেড়ে নেয়। যাবে বৌ দিদি ?"

"আবার কবে নাটক হবে, মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিস্ তো।"

শুক্রবারে বিরাজ মোহিনী থিয়েটার দেখিতে গেল। সে দিন বঙ্কিম বাবুর দুর্গেশ নন্দিনীর অভিনয়। অভিনয়ে কিছু নুতনত্ব ছিল। শ্রীমতী বেলা দেবী অর্থাৎ যে অপ্সরাটী কলিকাতার অপ্সর-লোক হইতে স্খলিত হইয়া নবীন কিশোরের মর্ত্ত-উপবনের সজীব পুষ্পরূপে অধিষ্ঠিতা ছিলেন, তিনি জেদ করিয়াছেন, দুর্গেশ নন্দিনী নাটকে তিনি আয়েসার অংশ অভিনয় করিবেন। সুতরাং জগৎসিংহ নবীন কিশোর ভিন্ন অন্য কাহাকেও মানাইল না।

এই অভিনয়ের দিন বাহিরের বাজে লোকদিগকে রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল না, নিকটস্থ ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হইতে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে অভিনয় দর্শনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হইল। তাঁহাদের অনেকেই জমীদারের পুত্র, কেহ অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট, কেহ মিউনিসিপাল কমিশনার, কেহ বা লোকাল বোর্ডের মেম্বর। সকলেই স্বদেশের গৌরব দীপের পলিতা স্বরূপ। সেই পলিতায় উপযুক্ত পরিমাণে তৈল সঞ্চার করিবার জন্য কেল্নারের বাড়ী হইতে কয়েকটা পার্শেলও আসিল।

সে দিনের অভিনয় অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। আয়েসা জগৎসিংহ, ও ওসমান যেন কাব্য জগৎ হইতে উড়িতে উড়িতে এই সুখদুঃখ-সঙ্কুল, আশা ভয়-বিষাদ-বিজড়িত বাস্তব জগতে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। ওসমানের হৃদয় আয়েসার প্রেমে পরিপূর্ণ, কিন্তু আয়েসা জগৎসিংহের অনুরাগিনী, ওসমান আয়েসার চক্ষুশূল। বিরাজ মোহিনীর মনে হইতে লাগিল, আয়েসার এ'ক বিবেচনা! ওসমানের কাছে জগৎসিংহ, সূর্য্যের তুলনায় চন্দ্র, ওসমানের এমন অচঞ্চল গাঢ় প্রেম আয়েসা কেন এ ভাবে উপেক্ষা করিল? আর জগৎসিংহই বা নবাব-পুত্রীকে ভাল বাসিলেন না কেন? আয়েসার ত রূপের অভাব ছিল না। বিরাজ মোহিনী স্পন্দমান বক্ষে অভিনয় দেখিতে লাগিল। তাহার বোধ হইল সে সম্মুখে যাহা দেখিতেছে তাহাই সত্য, আর সব মিথ্যা। সে বাল্যকালে কলিকাতায় পিত্রালয়ে থাকিতে দুই একবার অভিনয় দেখিয়াছিল, কিন্তু তখন ইহার রস মাধুর্য্য, উন্মাদনার আস্বাদন, প্রেম রঙ্গের উদ্দাম তরঙ্গ তাহার হৃদয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত না। তাহার অতৃপ্ত, প্রেমামৃত-বঞ্চিত, তৃষিত হৃদয় এতদিন শুষ্ক হইয়াছিল, আজ সে সম্মুখে প্রথম বারিপাত নিরীক্ষণ করিল। সে ভাবিতে লাগিল, পৃথিবী যদি ঐ রঙ্গভূমির মত সমুজ্জ্বল হইত তাহার সহিত যাহার বিবাহ হইয়াছে, সে যদি ঐ প্রেমময় ওসমানের ন্যায় তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইত, তাহা হইলে তাহার জীবনে আর কি অভাব থাকিত? ওসমান্ হতভাগ্য, তাহার হৃদয়ে কি উন্মাদনাময় ভালবাসা! আগুনের মত তাহা দগ্ধ করে, অথচ তুষারের মত তাহা শীতল করিতে পারে। এমন হৃদয় ঢালা প্রেম লাভ করিয়াও আয়েসা তাহা প্রত্যাখ্যান করিল? আয়েসা মন্দ ভাগিনী।

বিরাজ মোহিনী আবার ভাবিতে লাগিল,—আমি যদি আয়েসা হইতাম, তাহা হইলে কি এমন করিয়া প্রেমপ্রকাশ

করিতে পারিতাম না? আমার কি ঐ রূপ দুখানি কোমল চরণ নাই? মৃণাল বাহু নাই? আয়ত নেত্রের দীপ্তি কি এই প্রথম যৌবনেই নিভিয়া গিয়াছে, আমার ওষ্ঠাধরের বর্ণ বিম্ব-বিনিন্দিত না হইতে পারে, কিন্তু ইহা পবিত্র। আমি যদি আয়েসা হইতাম, তাহা হইলে ওসমানের ঐ হৃদয় ভরা প্রেমের প্রতিদান দিতাম, তাহাকে সুখী করিতাম। আমি হতভাগিনী আয়েসা অপেক্ষাও মন্দভাগিনী। আয়েসাকে ত একজন ভাল বাসিবার ছিল, কিন্তু আমার? —বিশ্ব সংসারে আমি যে কাহারও প্রেম লাভ করিতে পারিলাম না। আমার কোন অভাব নাই, তথাপি আমি অভাগিনী। পৃথিবীতে সকল সম্পদ লাভ করিয়াও যে কাহারও হৃদয়ে স্থান লাভ করিতে পারে নাই, তাহার নারী যৌবন বৃথা।

পট পরিবর্ত্তন হইল, উপেক্ষিত প্রেমিক ওসমান করুণ-স্বরে একটি ব্যর্থ প্রেমের গান গাহিতে গাহিতে রঙ্গভূমে অবতরণ করিলেন। সেই সঙ্গীতের প্রতিশব্দ বিরাজের হৃদয় তন্ত্রীতে আঘাত করিতে লাগিল, সমবেদনায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। গণেশ বাবুর গান কি মিষ্ট!—গণেশ বাবুই ওসমান্ সাজিয়াছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিরাজমোহিনী দিবারাত্রি ভাবে। কি ভাবে তা সেই বলিতে পারে। সে বড় লোকের বধূ, সংসারের কোন ভাবনা নাই। সে সকল ভাবনা ভাবিবার জন্য অনেক ঝি, চাকর ছিল; সুতরাং চিন্তার অন্য বিষয় না থাকায় নিজের ভাবনা লইয়াই বিরাজ ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাহার জন্য ভাবিবার আরও একজন লোক ছিল, সে দামিনী। দামিনী বিরাজের দক্ষিণ হস্ত।

কিন্তু দামিনীর সঙ্গেও বিরাজ আজ কাল বড় বেশী মন খুলিয়া কথা বলে না। চতুরা দামিনী তাহার মনের কথা টানিয়া বাহির করিবার জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিত, কিন্তু আসল কথার বড় সন্ধান পাইত না। অবশেষে দামিনী হা'ল ছাড়িয়া দিল; দামিনী যখন হা'ল ছাড়িল, তখন বিরাজ তাহা চাপিয়া ধরিল। কিন্তু নদীর স্রোত অত্যন্ত প্রবল, তরিও প্রায় ডুবু ডুবু। বিরাজ কোন মতে সামলাইতে পারিল না।

একদিন মধ্যাহ্নে দামিনী বিরাজের পিঠের দিকে বসিয়া তাহার নিবিড় কুন্তলরাশির ভিতর অঙ্গুলি চালাইতে চালাইতে নানা রকম গল্প করিতেছিল, শেষে থিয়েটারের কথা উঠিল।

বিরাজমোহিনী বলিল, "আচ্ছা দামিনী বল দেখি, সে দিন যে আয়েসা সেজেছিল, তার চুল ভাল না আমার চুল ভাল।"

দামিনী বলিল, "তা কি আর বল্‌তে বৌ দিদিমণি? এ যেন চাঁচর কেশ, আর সে মাগীর মাথায় যেন কালি মাখানো একটা খড়ের বোঁদলা, কতকগুলা গুছির রাশ বৈত নয়!"

বিরাজ যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া বলিল, "দামিনী, তোর পছন্দ খুব, হাজার হোক, বড় লোকের ঘরে আছিস্ কি না! আচ্ছা, আর একটা কথার জবাব দে দেখি, নাটক ত দেখ্‌লি, বলত ওসমানের সঙ্গে কার ভাব?

"কেন, বিদ্যে দিগ্‌গজ ঠাকুরের!

"আমর, আমি কি পুরুষ মানুষের কথা বল্‌ছি?

"বিদ্যে দিগ্‌গজ বুঝি পুরুষ! পুরুষ মানুষের অত ভূতের ভয়?

"দূর ছুঁড়ি, তুইত নাটকে অনেক মেয়ে লোক দেখ্‌লি, তার মধ্যে ওসমানের প্রাণের টান কা'র উপর বুঝলি?"

দামিনী বলিল, "কেন তিলোত্তমা? আমি কি এতই হ্যাকা দিদি ঠাকুরণ?

বিরাজ বলিল, "নাটকের যদি তুই কিছু বুঝিস! খালি চাবির গোছা ঘুরিয়ে দাসী মহলের সর্দ্দারী করে বেড়াস্।"

দামিনী বলিল, "বৌ দিদিমণি, রাগ ক'রো না, সকলে চাবির গোছা এমন ক'রে, ঘুরোতে পারে না, সত্যি, বল্‌তে কি, তুমিও না; যদি পারতে তবে কি আর বাবু গোল্লায় যায়?"

বিরাজ বলিল, "জানি সে ফিরবে না, কিন্তু আমি তাকে এখন শিক্ষা দেব!"

"তা তুমি পারবে না বৌদিদি! ওর জন্যে আলাদা শিক্ষার দরকার। সেদিন নাটক দেখ্‌তে গিয়েছিলাম, দেখ্‌লাম শ্রীরাধিকে কৃষ্ণের পায়ে ধ'রে বল্‌ছিলেন,—

"বঁধুহে পায়ে ধরি ব্রজ ত্যেজে যেও না
তোমার প্রেমের আমি ভিখারিণী রাই।"

তুমি ত সে রকম পারবে না।"

বিরাজ কথা ঘুরাইয়া বলিল, "আবার কবে নাটক হবে জানিস্?"

"কেন?"

"কেন কি জানি, নাটকের রাজ্য বড় ভাল লাগে। মনে হয় এ যেন সত্যি, আর বাইরের যা কিছু সব মিথ্যা, খালি দুঃখ, কষ্ট, শোক! যে যা'কে চায়, সে তা'কে নাটকেও পায় না বটে, কিন্তু তাকে প্রাণ খুলে ভাল বাসতে ত পায়। আচ্ছা দামিনী, আমি যদি আয়েসা হতেম, তা হলেও কি ওসমান্ আয়েসাকে ভাল বাস্‌তো?"

"না, তা আবার বাসতো না! ভালবাসার লোক বদ্‌লে গেলেও ভালবাসা থাকে।"—দামিনী এই উত্তর দান করিল।

নিশীথে বন্দি সহবাসে আয়েসা, ওসমানকে বলিয়াছিল, 'এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর!' বিরাজের মনে পুনঃ পুনঃ সেই কথা ধ্বনিত হইতে লাগিল। 'আয়েসার কি সাহস, কি তেজ, আমার কি সাহস নাই? দেখা যাউক।' —বিরাজের চিন্তার বিরাম নাই। বেশ বিন্যাস করিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। একটা সুদৃশ্য স্ফটিক পাত্রে গোলাপবাসিত জলে বিরাজমোহিনী মুখ মার্জ্জনা করিতে করিতে শুনিল, অদূরবর্ত্তী কুসুমোদ্যান হইতে স্তব্ধ সন্ধ্যাকাশ স্বরলহরীতে প্লাবিত করিয়া কে গাহিতেছে—

তোরা যাগো ফিরে আমি আর যাব না,
কলঙ্ক সাগরে কভু কুল পাব না।
যৌবন তরণী মম ভাসিছে তরঙ্গে
কাণ্ডারী নাহিক কেহ কে যাইবে সঙ্গে।
অকূলে ভাসিল তরি আকুল পরাণ,
তবু জানি সখি মম বৃথা এ ভাবনা।

বিরাজমোহিনী বাতায়ন প্রান্ত হইতে চাহিয়া দেখিল, গায়ক স্বয়ং গণেশ বাবু। সঙ্গীতাকৃষ্টা মুগ্ধা হরিণীর ন্যায় সে বসিয়া বসিয়া গান শুনিতে লাগিল। তাহার প্রবল বাসনা মোহে পরিণত হইয়া তাহার হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। বিরাজ স্থির করিল, 'আমার এ যৌবন তরণী অকূলে ভাসাইব, দেখি কোথাও কূল পাওয়া যায় কি না! যদি ডুবিবার হয় ডুবিবে, কত দিন আর এ ভাবে তাহা সুখহীন, আশাহীন জীবননদীর শুষ্ক বালুকাময় চড়ায় বাঁধিয়া রাখিব?'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে দেখা গেল, শ্রীমতী বিরাজমোহিনী দেবী কুল ত্যাগ করিয়া অকুল সমুদ্রে তাহার যৌবন তরি ভাসাইয়াছে।—মাষ্টার গণেশচন্দ্রও অন্তর্হিত। কাণ্ডারীগিরিটা বোধ করি, তাহারই ভাগ্যে জুটিয়াছিল। কুলত্যাগিনী হতভাগিনী বিরাজ সঙ্গে যে অলঙ্কার লইয়াছিল, তাহার মূল্য দশ সহস্রের কম নহে।

যথা সময়ে এ সংবাদ নবীন কিশোরের কর্ণে প্রবেশ করিল। সে বসিয়াছিল, কথাটা শুনিয়া অবিচলভাবে বসিয়া রহিল, কাহাকেও কোন প্রশ্ন করিল না। আজ সর্ব্ব প্রথম তাহার মনে হইল, তাহার স্ত্রীর কুলত্যাগের জন্য সেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দায়ী, এতদিনে সহসা তাহার অন্ধ নয়ন উন্মীলিত হইল। নবীন কিশোর অনুতপ্ত হৃদয়ে ফুলবাগান হইতে গৃহে ফিরিল সমস্ত দিন শয়ন কক্ষে রুদ্ধ দ্বারে পড়িয়া রহিল। প্রায় দশ বৎসর পরে সে সেই গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে। যে সকল স্মৃতি একদিন তাহার নিকট সুখের স্মৃতি ছিল, আজ তাহা ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক বোধ হইতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি তাহার নিদ্রা হইল না, সকল দুর্ভাবনা তাহার হৃদয়ে সূচি বিদ্ধ করিতে লাগিল।

পুলিশে কোন সংবাদ দেওয়া হইল না। বিভিন্ন স্থানে লোক পাঠান দেওয়ানজীর অভিপ্রায় ছিল, নবীন কিশোর তাঁহাকে নিবৃত্ত করিল। দেওয়ানজি ব্যাকুলভাবে কুলপুরোহিত মাধব চন্দ্র স্মৃতিভূষণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন, স্মৃতিভূষণ মহাশয় গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "না হবে কেন? সিংহ সিংহশাবকই প্রসব করে, কত বড় পিতার পুত্র! কুলকলঙ্ক কি বাহিরে প্রকাশ করিতে আছে? কুমার বাহাদুর ইচ্ছা করিলে ত কল্যই পঞ্চবিংশতিটি রূপসী কন্যা বিবাহ করিয়া গৃহ পরিপূর্ণ করিতে পারেন,—আজ্ঞার অপেক্ষামাত্র, ভাল কন্যার অনাটন কি?"

নবীন কিশোরের হিতৈষী অমাত্যবৃন্দ তাহার আর একটা বিবাহের কল্পনায় আনন্দ উচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া উঠিল।

কিন্তু নবীন কিশোর বিবাহ করিল না, ফুলবাগানের সহিত সকল সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিল। অর্দ্ধপথে অভিনয় বন্ধ

হইয়া গেল, অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ বিদায় হইল। নবীন কিশোর ভাগিনেয় নৃপেন্দ্র কুমারকে উইল করিয়া সর্ব্বস্ব দান করিল; সংসারে আর তাহার স্পৃহা রহিল না।

লোকে ভাবিল, কুমার বাহাদুর উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন। অনেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সদুপদেশ দান করিতে আসিল, কিন্তু নবীন কিশোর কাহারও সহিত দেখা করিল না। গুরু ঠাকুর আসিলেন. তাঁহাকে বলিল, 'আপনার উপদেশের সময় অতীত হইয়াছে। অনর্থক বাক্য ব্যয় করিতেছেন; আমার কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছি।'—কি কর্ত্তব্য, তাহা সে কাহার নিকট প্রকাশ করিল না।

দুই তিন দিন পরে নবীন কিশোরকে আর গৃহে দেখা গেল না, কোথাও দেখা গেল না, নৃপেন্দ্র অনেক স্থানে লোক পাঠাইয়া সন্ধান লইল, কোথাও তাহাকে পাওয়া গেল না। মামা অদৃশ্য! নবীন কিশোর সংসারের দোকান পাট তুলিয়া ছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হতভাগিনী বিরাজমোহিনীর চিত্র আঁকিতে পারিব না। সে আয়েসা সাজিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিল, কিন্তু জীবিকা অর্জ্জনের জন্য অবশেষে তাহাকে পান সাজিয়া দিনপাত করিতে হইল।

দশ বৎসর পরে একদিন বিরাজমোহিনী মদনমোহনের দোল দেখিতে গিয়াছিল। সেদিন বসন্ত পূর্ণিমা। সানাই দেবদম্পতির মিলন সঙ্গীত গাহিতেছিল। সেই স্বর লহরীতে যেন গগন প্লাবিত হইতেছিল, উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে চতুর্দ্দিক শুভ্র দেখাইতেছিল। সেই আলোকে পথের গ্যাসালোক নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল, এবং চিত্রবৎ পরিস্ফুট রাজপথে জনস্রোত বহিয়া যাইতেছিল।

একখানি গাড়ী হইতে একটি সম্ভ্রান্ত রমণী নামিয়া দেবদর্শনের জন্য দোল মঞ্চের সন্নিকটে গমন করিলেন, সঙ্গে একটি পরিচারিকা, প্রৌঢ়া তথাপি সৌখিন বেশ-ধারিণী—এ সেই সেই দামিনী।

চলিতে চলিতে দামিনী সহসা স্তব্ধভাবে দাঁড়াইল। সেই উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে পথপ্রান্তবর্ত্তিনী একটি অর্দ্ধবয়সী বারনারীর মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিতে লাগিল। তাহার পর ব্যগ্রভাবে নৃপেন্দ্রকুমারের স্ত্রী কমলিনীকে বলিল, "বৌ দিদিমণি, ঐ দেখ তোমার মামী-শাশুড়ী,—যিনি কুল-ত্যাগ করিয়াছিলেন।"

অত্যন্ত বিস্ময়ভরে কমলিনী দুইহাত সরিয়া দাঁড়াইল।

হতভাগিনী বিরাজ কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, "দামিনী, তোকে চিনিতে পারিয়াছি, আজ তুইও আমাকে ঘৃণা করি-তেছিস্!"—কমলিনীর দিকে ফিরিয়া কাঁদিয়া বলিল, 'বৌমা, আমার পরিচয় দিবার পথ আমি রাখি নি, আমি বুঝিতে না পারিয়া নিজের পায়ে কুড়ুল মারিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।"

কমলিনী বলিল, "আমার দুর্ভাগ্য, যে আজ দেবদর্শনে আসিয়াছিলাম। যাহার স্বামী হইতে আমার সর্ব্বস্ব, যিনি আমার প্রধান ভক্তির পাত্রী, আজ তাঁহাকে প্রণাম করিতে পারিলাম না।"

বিরাজ বলিল, "বৌমা আমি জ্বলিয়া মরিলাম, আমার কোন সান্ত্বনা নাই, একবার তোমার হাত খানি আমার এই কলঙ্কভরা জ্বলন্ত হাত দুখানার মধ্যে লইতে দাও।"

কমলিনী বলিল, আমাকে সে অনুরোধ করিবেন না। আপনি গৃহত্যাগিনী, কুলটার অঙ্গে আমি অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিব না।"

"হায়, দেবতার পদছায়াও আমাকে পবিত্র করিতে পারে না, এত অপবিত্র আমি! সংসার আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, সংসারে আমার স্থান নাই। হরি হে, লোকে তোমায় দয়াময় বলে, আমার পাপের কি মার্জ্জনা নাই?" ঊর্দ্ধাকাশ হইতে চন্দ্র সুধাময় হাস্যে জগৎ স্নিগ্ধ করি-তেছিল, উজ্জ্বল দীপালোকে মদনমোহনের সুগঠিত মুখ দর্শকগণের হৃদয়ে মধুর ভক্তিরস উদ্বেল করিতেছিল, এবং চতুর্দ্দিকের স্তব্ধ প্রকৃতি সুপ্তভাব ধারণ করিয়াছিল। সর্ব্বত্র শান্তি, কেবল বিরাজ মোহিনীর হৃদয় দুঃখ ও অনু-তাপে বিদীর্ণ হইতেছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আরও পাঁচ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। হিমালয়ে একটি উপত্যকায় আজ কয়েক বৎসর একটি সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। উপত্যকাবাসিগণ তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করে। সন্ন্যাসী রোগীর শুশ্রূষা করেন, অনাথগণকে নিজের আশ্রমে আশ্রয় দান করেন, সমগ্র গ্রামবাসিগণকে পুত্র কন্যার ন্যায়

স্নেহ করেন। সমস্ত দিন তিনি পরের কার্য্যে ঘুরিয়া সন্ধ্যাকালে আশ্রমের অতি নিভৃত স্থলে বসিয়া ইষ্ট দেবতার আরাধনায় নিযুক্ত হন। সন্ন্যাসীর প্রকৃতি গম্ভীর, তাঁহার হাস্তে সহানুভূতির সহিত একটা বেদনার আভাস পরিব্যক্ত হইত। সময়ে সময়ে তাঁহার হৃদয়ের বেদনা তাঁহার আয়ত নেত্রের স্থির দৃষ্টিতে প্রতিফলিত হইত, কিন্তু ভাষায় তাহা কোন দিন কাহারও নিকট প্রকাশিত হয় নাই। সন্ন্যাসী কে, কোথা হইতে আসিয়াছেন; তাঁহার সাধনার উদ্দেশ্য কি, তাহা কেহ জানিত না।

একদিন অপরাহ্ণ কালে একটি অনাথা রুগ্ন রমণী সন্ন্যাসীর আশ্রম দ্বারে উপস্থিত হইল,—এমন প্রায়ই হইত। সন্ন্যাসীর দ্বার হইতে উপেক্ষিত হইয়া কাহাকেও ফিরিতে হইত না, পৃথিবীতে যাহার কোন আশ্রয় নাই, সে সন্ন্যাসীর নিকট আশ্রয় পাইত। দূর হইতে এই অভাগিনী সেই কথা শুনিয়া দুর্ব্বহ দেহভার লইয়া অতি কষ্টে সন্ন্যাসীর দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে। তাহার দেহ মলিন, পদদ্বয় রক্তাপ্লুত, সর্ব্ব শরীর হইতে খড়ি উঠিতেছে, মস্তকে ধূলিলিপ্ত বিবর্ণ জটাভার, কেশের অধিকাংশ শুক্ল। তৃষ্ণায় অভাগিনীর কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছে, ক্ষুধায় তাহার উদরের মধ্যে প্রদাহ উপস্থিত হইয়াছে। রমণী একটি বিল্ববৃক্ষ মূলে তাহার জীর্ণ চীর খানি প্রসারিত করিয়া নিতান্ত অবসন্ন ভাবে তাহার উপর লুটাইয়া পড়িল।

সন্ন্যাসী তাহাকে দেখিয়া তাহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি বাছা, তোমার কি কষ্ট?

অভাগিনী পলকহীন উর্দ্ধ দৃষ্টিতে উন্মাদিনীর মত চাহিয়া বলিল, "পিপাসা,—প্রাণ যায়,—বড় কষ্ট।"

সন্ন্যাসী ঝরণার নির্ম্মল জল অঞ্জলি পুরিয়া তাহার মুখের কাছে ধরিলেন, সে কয়েক বিন্দু জল পান করিল; সুমিষ্ট ফল ভাঙ্গিয়া তাহার মুখে তুলিয়া দিলেন, কয়েক দিন পরে অতি সামান্য খাদ্য তাহার পাকস্থলীতে প্রবেশ করিল।

সন্ন্যাসী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?"

"আমি বড় পাপিষ্ঠা, দেবচরণেও আমার স্থান হয় নাই।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "খুব বড় পাপিষ্ঠাও ভগবানের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হয় না। বোধ হয়, তুমি বড় অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিয়া আসিয়াছ? তোমার পাপ কি বল?"

"স্বামী ইন্দ্রিয়পরায়ণ অন্যাসক্ত ছিলেন, আমি প্রতিশোধ দানের জন্য কলঙ্ক সাগরে ডুবিয়াছিলাম, আর উঠিতে পারি নাই।"

সন্ন্যাসী উঠিয়া সরিয়া বসিলেন। বিস্ফারিত নেত্রে বলিলেন, "তোমার নাম?"

"কলঙ্কিনীর নাম—বিরাজ।"

"বিরাজ তুমি? কে জানিত, আজ এই জীবন সন্ধ্যায় এ ভাবে তোমার সঙ্গে দেখা হইবে? আমি সংসার ছাড়িয়া নগর হইতে বহুদূরে পর্ব্বত প্রান্তের এই অরণ্যে আসিয়া পত্নীর প্রতি আমার কর্ত্তব্যভ্রংশ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি, তুমি তোমার মুমূর্ষু কালে আমার কাছেই আসিয়া পড়িয়াছ, বেশ করিয়াছ,—কিন্তু এখন আমি সর্ব্বত্যাগী!"

"প্রিয়তম, এতক্ষণে চিনিয়াছি। আজ এ অন্তিমকালে তোমাকে আমার অবলম্বনরূপে পাইয়াছি; আমাকে ত্যাগ করিও না। আমি বড় হতভাগিনী, এক দিন ত তুমি আমাকে গ্রহণ করিয়াছিলে, আজ আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত, আজিও গ্রহণ কর।"

বিরাজ তাহার দেহের সমস্ত বলের উপর ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর টলিতে টলিতে সন্ন্যাসীর পদ প্রান্তে আছড়াইয়া পড়িয়া বলিল, "দেখ আমার চোখে আর জল নাই, কথা কহিবার শক্তি ফুরাইয়াছে, বক্ষের স্পন্দন থামিয়া আসিতেছে, জগৎ সংসার অন্ধকার দেখিতেছি, আর সময় নাই; বল আমাকে ক্ষমা করিলে?"

সন্ন্যাসী সেই মৃত-প্রায় দেহ অতি সাবধানে বক্ষে তুলিয়া নত মুখে বলিলেন, "প্রিয়তমে, আজ তোমাকে ক্ষমা করিলাম। প্রার্থনা করি, সর্ব্বদর্শী দয়াময় বৈকুণ্ঠেশ্বরও তোমায় ক্ষমা করুন। সংসারে তুমি বড় যন্ত্রণা পাইয়াছ।"—সন্ন্যাসীর ওষ্ঠ অভাগিনীর শুষ্ক, বিশীর্ণ ওষ্ঠ স্পর্শ করিল, দেখিতে দেখিতে তাহার কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষুর অন্তিম আলোকচ্ছটা নিবিয়া গেল। অভাগিনীর সংসারযন্ত্রণা বিদগ্ধ প্রাণহীন মৃতদেহ সন্ন্যাসীর প্রেমালিঙ্গন পাশে আবদ্ধ রহিল। তখন অপরাহ্নের লোহিত তপন বিরাজের চিরনীরব মুখে স্বর্ণ কিরণ ঢালিয়া দিতেছিল, স্বর্গ হইতে যেন তাহা ক্ষমা ও করুণা বহন করিয়া আনিতেছিল।

সেই সন্ধ্যাকালে গ্রামবাসিগণ মরুভূমে বৃষ্টিপাত হইতে দেখিয়া বিস্ময় দমন করিতে পারে নাই। তাহারা, সন্ন্যাসীর চক্ষে অশ্রু ঝরিতে দেখিয়াছিল।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সঙ্গিনী।*

শ্রীমতী সুরমাসুন্দরী ঘোষ প্রণীত।

এই নবীনা লেখিকা তাঁহার কাব্যখানি হস্তে লইয়া যেন ভয়ে ভয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহার নিজের শক্তির উপর এখনও বিশ্বাস জন্মে নাই, পাছে শ্রোতার ভাল না লাগে, এই ভয়ে যেন গায়কের কণ্ঠ বাধ বাধ হইয়া যায়।

"আহত মুকুল প্রায়,
গান যদি ঝরে যায়,
তারে আমি জীয়াব কি দিয়া
বীণা যদি রহে মুরছিয়া।"

তাই তিনি সলজ্জ সাবধানতার সহিত যেন অতি সন্তর্পণে বীণাটী স্পর্শ করিতেছেন। কখনও বা বাগ্‌দেবীর বীণা ফিরাইয়া দিয়া দ্বিগুণতর ভক্তির সহিত তাঁহার পদে আত্ম সমর্পণ করিতেছেন:—

"রাঙ্গা পা রাখ মা হৃদয়ে
বীণা বেণু রাখিনু সকল।"

বনের পাখীরাও কূজন করিয়া হৃদয়ের ভার লঘু করে, কবির যেন সে শক্তিও নাই, এই আক্ষেপ। বাস্তবিক এই কাব্য কুসুমটী যেন একান্ত ভয বিহ্বল বিনয়ের সহিত সাহিত্যের বাগানে ফুটিতে অনুমতি চাহিতেছে—যেন সমালোচকের একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেই ইহা শুকাইবার জন্য প্রস্তুত! কিন্তু সুখের বিষয় এতটা বিনয় ও দৈন্যের কোন প্রয়োজন ছিল না; কাব্যখানির সহজ সৌন্দর্য্য ও লিপি নৈপুণ্য অতীব প্রশংসনীয় হইয়াছে, আমরা ইহা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি।

লেখিকা প্রেমের কথা লইয়া বেশী নাড়া চাড়া করেন নাই। তরুণ বয়সেই যেন জীবনের নশ্বরতা উপলব্ধি করিয়া একটুকু গম্ভীর ভঙ্গী অবলম্বন করিয়াছেন। বিকশিত কুসুমোদ্যানে তিনি ধ্বংশের ছায়া দেখিয়া বিষণ্ণ হইয়াছেন; সুন্দর প্রস্ফুট কুসুম কি সুপক্ক ফলটী দেখিয়াও তাঁহার দীর্ঘ নিশ্বাস পতিত হয়—

"তবু এই ফুল ফল
কোন ত্রাসে ছল ছল,
আসন্ন মরণ ত্রাসে বুঝি কেঁপে মরে।

একি বিষম ঔদাস্য!—

পঙ্কজিনী বসু বালিকা বয়সে প্রতিভার অদ্ভুত স্বপ্ন দেখাইয়া ইহ সংসার হইতে চলিয়া গিয়াছেন, সঙ্গিনী-রচয়িত্রী তাঁহার উদ্দেশ্যে যে কবিতাটি লিখিয়াছেন, তাহার গম্ভীর বৈরাগ্য ভাব আমাদিগকে চমকিত করিয়া ফেলে। কবি মৃত্যুর জন্য যেন আকুলিত হইয়া ব্যাকুল স্বরে খুঁজিয়াছেন;—

"নীলিমার কোন্ ধারে,
ভব জলধির পারে
কোথা আছে, কোথা আছে
ঘুমের নিবাস।"

এই উপলক্ষে সমস্ত সুখ স্বপ্নের মূলীভূত আদি কারণ এবং সমস্ত সুখ স্বপ্নের গৌরব হীন শেষ পরিণতি—ধূলি রাশির প্রতি কবির দৃষ্টি সহজে পতিত হইয়াছে। যে ধূলি লইয়া শিশুকালে কবি ক্রীড়া করিয়াছিলেন—

"ধূলি তুই খেলা ঘরে নিয়েছিলি ডেকে।"

সেই ধূলির নিকট নিবেদন করিতেছেন—

"মানিব তোমার ডাক আর এক দিন"

সে দিন এ খেলার ঘর ভাঙ্গিবে।

যাহার মৃত্যুর পানে চক্ষু পড়িয়াছে, তাহার অন্য এক দিকে দৃষ্টি পড়া অবশ্যম্ভাবী; জীবের শেষ আশ্রয় মৃত্যুঞ্জয় ভগবানের কথা বলিতে যাইয়া সুরমা সুন্দরী ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। যাঁহার অদ্বিতীয় ভাণ্ডারের সম্পদ অগাধ। "বিন্দু বিন্দু অনুকম্পা সাজে না তাহার।" বলিয়া কখনও আবদার করিয়াছেন, কখন ও বা চাঁদের আত্ম কাহিনীর রূপকে তিনি বুঝাইয়াছেন, তাঁহার প্রেম লাভ করিবার আশা কবির পক্ষে দুরাশা।

"কোন্ বলে চাই তারে বন্দী করিবারে,
কলঙ্ক লাঞ্ছিত অন্ধ হৃদয় আগারে।"

প্রবৃত্তির দীপ্তিশালী চিত্র হইতে নিবৃত্তির এই করুন ছবি আমাদিগের চিত্ত সমধিক-আকৃষ্ট করে।

এরূপ চিন্তাময়ী ব্যথিতা লেখিকা পরের অপরাধের বিচার করিবেন কিরূপে? পতিতার উপরও তাঁহার অপার করুণা; তিনি যেন মূর্ত্তিমতী দয়ার মত কোমল হস্তখানি ব্যথিতের বিদ্ধ হৃদয়ে বুলাইতেছেন;—

"ঘৃণা লাঞ্ছনার কারো নাই অধিকার
সংসার খেলার ঘরে,
ওলো কেনা ভুল করে
আয় আয় হৃদয়ে আমার।"

এই কাব্য খানির কয়েকটি সনেট্ বড় সুন্দর হইয়াছে, আমরা স্থানাভাব বশতঃ তাহা হইতে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। "সতী চিত্র" শীর্ষক সনেটটি পড়িয়া আমাদের কবি প্রমথ নাথের অত্যুৎকৃষ্ট "চিতাভিবিক্তা" সনেটটি মনে-পড়িয়াছিল। বঙ্গীয় রমণী কবিগণের মধ্যে যে সুরমা সুন্দরী অচিরে একটি উচ্চ আসন পাইবেন, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

* কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ১ টাকা।

২৩ নং, ঝটুস্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত ও ২০৮।২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে বৈকুণ্ঠনাথ দাস কর্তৃক প্রকাশিত।



মহীশূরের বর্ত্তমান মহারাজা
শ্রীল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরাজ ওদেয়ার।

KUNTALINE PRESS.



চতুর্থ ভাগ। } বৈশাখ, ১৩০৮। { ৫ম সংখ্যা।

কতদিন।

কত দিন বল আর আসিব যাইব
কতদিন দু'টি করে
ভাঙ্গাবুক চেপে ধরে,
তোমার মুখের পানে চাহিয়া থাকিব ?

চাঁদের হাসিটি দেখ, নিবিল—নিবিল।
দিবার দুরন্ত গর্ব্ব—কোথায় টুটিল
নিশিদিন এই ভাবে
কত নিশিদিন যাবে—
ভাঙ্গাতরী জলে বুঝি ডুবিল—ডুবিল !

যে তরুটি পুঁতেছিলে কাননের কোলে,
সৌরভে—সঙ্গীতে আজ সমীরণে দোলে।
শিখাইতে যে পাখীরে সোহাগের বাণী
মধুর রহস্য করে তুলি পুচ্ছখানি।

আমি শুধু স্বপ্ন দিয়া
বুঝাব—ভুলাব হিয়া
সুদূর তারকা পানে হারা দুনয়ন !
দিবস ফুরায়ে যাবে
রজনী ফুরায়ে যাবে
ফুরাবেনা কভু হায় মোর শোক গান !

১২৮৬ শ্রীপ্রিয়নাথ সেন।

রাজবিদ্যা।

গীতার ৯ম অধ্যায়ে ভগবান্ অর্জ্জুনকে গুহ্যতম রাজবিদ্যা উপদেশ দিয়াছেন। এই রাজবিদ্যা কি এবং এ বিদ্যাকে রাজবিদ্যা বলে কেন, তাহা আমাদের অনুসন্ধান-যোগ্য। কারণ এ বিদ্যা অশেষ ফলকরী। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

"জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ।"
বিজ্ঞান সহিত এই জ্ঞান আয়ত্ত করিলে জীব অশুভ হইতে মুক্ত হয়।

প্রাচীন ভারতে জ্ঞান, গুরু শিষ্য পরম্পরা ক্রমে প্রবাহিত হইত। সে জ্ঞান সাধারণ প্রচলিত জ্ঞান নহে—তত্ত্বজ্ঞান। তাহার অপর নাম ছিল ব্রহ্মবিদ্যা। এই ব্রহ্মবিদ্যা গ্রন্থে লিখিত হইত না। গুরুর মুখ হইতে শিষ্য পরম্পরায় উপদিষ্ট হইত। সেইজন্য ইহার নাম ছিল "শ্রুতি"। গুরু শিষ্য পরম্পরাক্রমে জ্ঞানের প্রবাহকে সম্প্রদায় বলিত। যাহাতে সম্প্রদায়ের বিচ্ছেদ না ঘটে—বিদ্যা, পরম্পরা-ক্রমে নির্ব্বিঘ্নে প্রবাহিত হয়, তদ্বিষয়ে প্রাচীনেরা বিশেষ সতর্ক ছিলেন। যে বিদ্যা বা জ্ঞান সম্প্রদায় বর্জ্জিত—যাহা কোন ব্যক্তি বিশেষের চিন্তা বা কল্পনা প্রসূত, তাহার প্রতি তাঁহারা আস্থাবান ছিলেন না। সেইজন্য উপনিষদ্ প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রন্থের অনেক স্থলেই সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখা যায়। ঈশ উপনিষদের ঋষি, *বিদ্যা ও অবিদ্যার ভেদ নির্দ্দেশ করিয়া* বলিয়াছেন—

"ইতি শুশ্রুম ধীরাণাম্ যে নস্তদ্ বিচচক্ষিরে।"

এইরূপ আমরা ধীর (জ্ঞানী) মহাজনগণের নিকট শুনিয়াছি।

মুণ্ডক উপনিষদের শেষে কথিত হইয়াছে যে এই সত্য ঋষি অঙ্গিরা পুরাকালে বলিয়াছিলেন ("তদেতৎ সত্যং ঋষিরঙ্গিরা পুরোবাচ। অঙ্গিরা ইহা কোথা হইতে পাইলেন? ইহা কি তাঁহার স্বকপোলকল্পিত অথবা তিনি গুরু শিষ্যপরম্পরা ক্রমে ইহা লাভ করিয়াছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর, মুণ্ডক উপনিষদ্ নিজেই দিয়াছেন;—

ব্রহ্মা দেবানাম্ প্রথমঃ সম্বভূব
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ব বিদ্যা প্রতিষ্ঠাম্
অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠ পুত্রায় প্রাহ॥
অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মা
থর্ব্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।
স ভারদ্বাজায় সত্য বাহায় প্রাহ
ভারদ্ব জোঽঙ্গিরসে পরাবরাম্॥

বিশ্বস্রষ্টা, জগৎ ভর্ত্তা, আদিদেব ব্রহ্মা, সর্ব্ব বিদ্যার আশ্রয় ব্রহ্ম বিদ্যা আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বাকে কহিয়াছিলেন। সেই ব্রহ্মবিদ্যা অথর্ব্বা পুরাকালে অঙ্গিরকে দান করেন। অঙ্গির সেই শ্রেষ্ঠবিদ্যা ভারদ্বাজ সত্যবাহকে এবং সত্যবাহ অঙ্গিরাকে দান করেন।

সে কালে এই ব্রহ্ম বিদ্যা যে ব্রাহ্মণের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল তাহা নহে। ক্ষত্রিয়েরাও এই বিদ্যার অনুশীলন করিতেন। এমন কি উপনিষদের বিবরণ পাঠে জানা যায়, যে সময় সময় তাঁহারা বিদ্যার্থী ব্রাহ্মণগণকেও এই বিদ্যা উপদেশ দিতেন। বৃহদারণ্যকে যে বিদেহাধিপতি রাজর্ষি জনকের উল্লেখ দেখা যায়, তিনি এইরূপ ব্রহ্মবিদ্যাভিজ্ঞ ক্ষত্রিয়ের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। যাজ্ঞবল্ক্য, অশ্বল, আর্ত্তভাগ প্রভৃতি বিদ্বান ব্রাহ্মণগণ তাঁহার যজ্ঞে এবং একরূপ তাঁহারই সভাপতিত্বে, ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন। এবং অবশেষে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে নিগূঢ় ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে রাজর্ষি জনকের পরিচয় স্থলে এই ব্যাপার উল্লিখিত হইত।

"যাজ্ঞবল্ক ঋষির্যস্মৈ ব্রহ্ম পারায়ণম্ জগৌ"

এইরূপ কৌষিতকী উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে কাশীশ্বর অজাতশত্রুর জ্ঞান জ্যোতিতে আপনার বিদ্যা নিষ্প্রভ জানিয়া ব্রাহ্মণ বালাকি তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। এইরূপ ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত আছে যে, কয়েকজন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য ক্ষত্রিয় *রাজা অশ্বপতি কৈকেয়ের সমীপস্থ হইয়া ছিলেন।* গীতার চতুর্থাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে কর্ম্মযোগ উপদেশ দেন, তাহা পুরাকালে ক্ষত্রিয় রাজর্ষি সম্প্রদায়ে প্রচলিত ছিল।

"ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবান্ অহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবে ব্রবীৎ॥"
"এবং পরম্পরা প্রাপ্তং ইমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥"
"স এবায়ং ময়া তুভ্যং যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ॥"

'এই অব্যয় যোগ আমি বিবস্বানকে উপদেশ করিয়াছিলাম। বিবস্বান্ মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে ইহা প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপে পরম্পরাক্রমে প্রবাহিত এই যোগ পূর্ব্ব রাজর্ষিরা অবগত ছিলেন; কিন্তু ইহা দীর্ঘ কালপ্রভাবে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। অদ্য তোমাকে সেই পুরাতন যোগ আমি পুনরায় উপদেশ করিলাম।'

এই পরম্পরাপ্রাপ্ত তত্ত্ববিদ্যাই রাজবিদ্যা। এই বিদ্যা বিশেষ ভাবে রাজর্ষি সম্প্রদায়ে প্রবাহিত ছিল বলিয়াই বোধ হয় ইহার নামকরণ হইয়াছিল রাজবিদ্যা। * এ সম্বন্ধে যোগবাশিষ্ঠে ভগবান্ বশিষ্ঠ যাহা বলিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে এ বিদ্যাকে রাজবিদ্যা বলে কেন, সে বিষয়ে আর কোন সংশয় থাকে না।

"অতো মং ঈশ্বরঃ সৃষ্ট্বা জ্ঞানেনা যে জাতা সকৃৎ।
বিসসর্জ্জ মহী পীঠং লোকস্যাজ্ঞান শান্তয়ে॥
অধ্যাত্ম বিদ্যা তেনেয়ং পূর্ব্বং রাজসু বর্ণিতা।
তদনু প্রসৃতা লোকে রাজ বিদ্যেত্যুদাহৃতা॥

---

* ভাষ্যকার শ্রীশঙ্করাচার্য্য গীতা ভাষ্যে রাজবিদ্যা শব্দের অন্যরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন—'বিদ্যানাং রাজ্ঞী রাজবিদ্যা।' তাঁহার মতে ব্রহ্মবিদ্যা সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহার নাম রাজবিদ্যা। মুণ্ডক উপনিষদে ইহাকে পরাবরা (শ্রেষ্ঠতমা) বলা হইয়াছে।

"রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম্ অধ্যাত্মজ্ঞানমুত্তমম্।
জ্ঞাত্বা রাঘব রাজানঃ পরাং নির্দুঃখতাং গতাঃ॥"

মুমুক্ষু প্রকরণ, ১১।৭ ১০, ১৮॥

পরে ভগবান আমাকে সৃষ্টি করিয়া তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন করিলেন এবং লোকের অজ্ঞান নিবৃত্তির জন্য মহীতলে প্রেরণ করিলেন। * * * এই অধ্যাত্ম বিদ্যা পূর্ব্বে রাজাদিগকে উপদিষ্ট হইয়াছিল এবং সেই রাজগণ হইতে লোকে প্রচারিত হয়, সেই জন্য ইহার নাম রাজবিদ্যা। এই উত্তম গুহ্যতম অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করিয়া রাজগণ পরম দুঃখের সীমা অতিক্রম করেন।

এই রাজবিদ্যা কি? অতঃপর তাহারই আলোচনা করিব। শৈবেরা ইহাকে শাম্ভবী বিদ্যা বলেন। ব্রহ্মবাদীরা ইহাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলেন। কিন্তু ভগবান ইহার রাজবিদ্যা নামেরই অনুমোদন করিয়াছেন। অতএব আমরা ইহাকে রাজবিদ্যাই বলিব। ইহা এক সময় গুহ্যতম গুপ্তবিদ্যা ছিল। কিন্তু ভগবানের কৃপায় এই রাজবিদ্যা জীবের অভ্যুদয়ের জন্য জগতে প্রচারিত হইয়াছে। এই রাজবিদ্যা কি?

রাজবিদ্যার সার কথা ঈশ্বরতত্ত্ব। বৈদান্তিকের ব্রহ্ম, অবাঙ্‌মনসগোচর। 'নেতি, নেতি' (ইহা নয়, ইহা নয়) এইরূপে মাত্র ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করা যায়, কারণ তিনি নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্দ্বন্দ্ব নিরঞ্জন। এই ব্রহ্মের সহিত জীবের কোন সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না। তিনি উপাসনা, জ্ঞান অথবা ধ্যানের বিষয় হইতে পারেন না। এই ব্রহ্ম মায়া দ্বারা আপনাকে আবরণ করিয়া আপনার অসীমতাকে সঙ্কুচিত করেন। তখন তিনি ঈশ্বর পদবাচ্য হন।

"যস্তূর্ণনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ।
স্বভাবতো দেব একঃ স্বম্ আবৃণোৎ॥

শ্বেতাশ্বতর ৬।১০

স্বভাবতঃ অদ্বিতীয় দেব (পরব্রহ্ম) ঊর্ণনাভের ন্যায় প্রধানতত্ত্ব দ্বারা আপনাকে আবরণ করেন।

আলোককে ফানসের মধ্যে ভরিলে যেমন তাহার জ্যোতির হ্রাস হয়, ব্রহ্ম মায়ার আবরণে আবৃত হইলে সেইরূপ তাঁহার অসীমতার সঙ্কোচ হয়। এই আবরণের ফলে বিশ্বের সৃষ্টি সাধিত হয়। প্রলয়ে যখন এই আবরণ ঘুচিয়া যায় তখন এক অসীম ব্রহ্মসত্তা ভিন্ন কিছুই বিদ্যমান থাকে না।*

এই আবরণ ব্রহ্মের প্রত্যক্ দৃষ্টিতে (subjective point of view) মায়া। আর পরাক্ দৃষ্টিতে (objective point of view) ইহাই প্রকৃতি। এই প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী—তিনটী বিরোধী প্রবণতার লীলাভূমি প্রকৃতি ঈশ্বর কর্তৃক অনুপ্রাণিত। তিনি সূক্ষ্মরূপে ইহাকে ব্যাপিয়া আছেন।

"তৎ সৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ।"
জগৎ সৃষ্টি করিয়া ভগবান তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন।

ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতম্ সূত্রে মণিগণা ইব।
মণি যেমন সূত্রে অনুস্যূত থাকে তেমনি সমস্ত জগৎ আমাতে (ঈশ্বরে) অনুস্যূত রহিয়াছে।

রাজবিদ্যা উপদেশ কালেও ভগবান্ এই কথাই বলিয়াছেন।

"ময়া-ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।"

অব্যক্ত মূর্ত্তিতে আমি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি। কিন্তু ভগবান্ জগতে এইরূপে অনুস্যূত (immanent) থাকিলেও তিনি বস্তুতঃ প্রপঞ্চাতীত (transcendent)। জগৎ তাঁহাতে আছে বটে, কিন্তু তিনি জগৎ ছাড়া। পুরুষ সূক্তে উপদিষ্ট হইয়াছে, যে 'পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।" ভগবানের এক অংশ মাত্র সমস্ত ভূত। আর অপর তিন অংশ প্রপঞ্চের অতীত অমৃত স্বরূপ। ৯ম অধ্যায়ে ভগবানও এই কথা বলিয়াছেন—

"মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥'
"নচ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥"

সমস্ত ভূত আমাতে অবস্থিত, কিন্তু আমি তাহাতে অবস্থিত নহি। কারণ ভগবান প্রপঞ্চাতীত। ভগবানের ঐশ্বরিক যোগ এমনই যে ভূত সকল তাঁহাতে থাকিয়াও নাই। কারণ তিনি নিঃসঙ্গ, নির্লেপ; ভূত সম্বন্ধ তাঁহাতে কোন দাগ স্পর্শিতে পারে না।

এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি ভগবান কর্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া পরিণাম প্রাপ্ত হয়। এই পরিণাম হইতেই চরাচর সমস্ত ভূতের সৃষ্টি। ভগবান অন্তর্য্যামীরূপে প্রকৃতির পরিচালনা করেন বলিয়াই বিচিত্র বিশ্ব বিবর্ত্তিত হয়। এই জন্যই "অন্তর্য্যামী" শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—

"যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীম্ অন্তর যময়তি; যস্যাত্মা শরীরম্ যঃ আত্মানম্ অন্তর যময়তি"—ইত্যাদি।

গীতার ৯ম অধ্যায়েও উক্ত হইয়াছে যে—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃপুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥"

ভগবানের অধিষ্ঠান বশতঃই প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব প্রসব করিয়া থাকে এবং এই সংযোগ হেতুই জগতের বিপরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। ভগবান আপন প্রকৃতিকে আশ্রয়

---

* Ishwara, enveloped in Mava, brings forth and is enclosed, as it were, in the universe of which He is the Light. Breaking the shade, the light shines forth in every direction. Dissolving the universe, He still remains. The centre remains, but the circumference that circumscribed it is gone.

Annie Besant's Evolution of life and form p. 19.

করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রকৃতির পরবশ ভূত সকলকে উৎপাদন করিয়া থাকেন। ভগবানের যে শক্তিবশে মূল প্রকৃতির পরিণাম ঘটে, তাঁহাকে দৈবী বা পরা প্রকৃতি বলে। বৌদ্ধ গ্রন্থে ইহার নাম "কোহং"। কি প্রণালীতে এই শক্তির সংযোগে অপরা প্রকৃতির পরিণাম সাধন হয়, তাহার আভাষ ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে প্রদত্ত হইয়াছে। "আনীৎ অবাতম্" ইত্যাদি। সৃষ্টি ও প্রলয় এক হিসাবে ভগবানের নিশ্বাস প্রশ্বাস মাত্র।

"এতস্য মহাভূতস্য নিশ্বসিতমিদং" ইত্যাদি।*

কল্পাবসানে যখন সৃষ্টি প্রলয়ের অভিমুখে ধাবিত হয়, যখন লোকের পর লোক, ভূতের পর ভূত, তত্ত্বের পর তত্ত্ব বিলোম ক্রমে, স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর—সূক্ষ্মতমে পর্য্যবসিত হয়, তখন ক্রমশঃ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভগবানে বিলীন হইয়া যায়। প্রকৃতি পরম পুরুষে অব্যক্ত হইয়া যায়। এবং অবশেষে মায়ার আবরণ উন্মোচন করিয়া ঈশ্বর ও ব্রহ্মে নিমজ্জিত হইয়া "একমেবাদ্বিতীয়ং" সত্তা মাত্র বিরাজিত থাকেন। ভগবান নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে এই অবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন—

"সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাং।
কল্পক্ষয়ে * * ।"

কল্পাবসানে (প্রলয় কালে) সমস্ত ভূত ভগবানের প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। জগৎ থাকে না কিন্তু জগতের বীজ সংস্কাররূপে ঈশ্বরের মায়াতে বিলীন হইয়া থাকে।†

ইহা গেল সৃষ্টি ও লয়ের কথা। স্থিতি সম্বন্ধে রাজবিদ্যার উপদেশ এইরূপ—

"পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ॥
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্।"

আমি (ঈশ্বর) এই জগতের পিতা, মাতা, বিধাতা ও পিতামহ। আমিই গতি, আমিই ভর্ত্তা, আমিই প্রভু, আমিই সাক্ষী রক্ষক ও সুহৃৎ। জগতের উৎপত্তি আমা হইতে, স্থিতি আমা দ্বারা, লয়ও আমাতে। আমিই জগতের আশ্রয়, আধার ও অব্যয় বীজ স্বরূপ।

অর্থাৎ ভগবানই সর্ব্বপ্রকারে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রক্ষা, পালন, পোষণ, ধারণ ও বর্দ্ধন করিতেছেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া জগৎ কিছুই নহে। কারণ তিনি সৎ অসৎ, জড় চিৎ সকলই। যে শক্তি দ্বারা জগৎ বিধৃত রহিয়াছে এবং পরিচালিত হইতেছে, সে শক্তি তাঁহারই। সেই জন্যই তাঁহাকে জগতের পিতা, মাতা ও ধাতা বলা হইয়াছে। জগৎ শক্তিপুঞ্জের লীলা ক্ষেত্র। ঐ শক্তি যে তাঁহারই, তাহা গীতার অন্যত্রও উপদিষ্ট হইয়াছে।

"যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥
গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥"

সূর্য্য, চন্দ্র ও বহ্নির যে তেজে জগৎ উদ্ভাসিত হইতেছে, সে তেজ আমারই। আমি পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া স্বতেজে ভূত সকলকে ধারণ করি এবং রসযুক্ত চন্দ্রমারূপে সমস্ত ওষধি পোষণ করি।

ঈশ্বরই যে সকল শক্তির আধার ও হেতু, তাহা উপনিষদেও উপদিষ্ট দেখা যায়।

য একো জালবানীশত ঈশনীভিঃ
সর্ব্বাংল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ।
য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

যে অদ্বিতীয় মায়াবী নিজ শক্তি সমূহের দ্বারা সমস্ত লোক নিয়মিত করেন, তিনি জগতের উদ্ভব ও স্থিতির একমাত্র কারণ, যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমরত্ব লাভ করেন।

অতএব রাজবিদ্যার শিক্ষা এই যে, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় ভগবান হইতে নিষ্পন্ন হইতেছে। সেই জন্য শ্রুতি তাঁহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব; তদ্ব্রহ্ম।" যাঁহা হইতে এই ভূত জন্মিতেছে, জন্মিয়া যাঁহার দ্বারা জীবিত আছে এবং অবসানে যাঁহাতে প্রতিগমন করিতেছে, তাঁহাকে বিশেষ রূপে অবগত হও; তিনিই ব্রহ্ম।

অতএব দেখা যাইতেছে যে ভগবানই রাজবিদ্যার কেন্দ্র স্বরূপ। জীব কি উপায়ে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে পারে? রাজবিদ্যা শুধুই ভগবানের নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; কি উপায়ে তাঁহাকে পাওয়া যায় তাহারও উপদেশ দিয়াছে। এক কথায় সে উপায়—যোগ। যোগ

* The Life breath goes forth. Ishvara, the centre of all, enveloped in Maya, sends forth His breath; as that vibrating breath falls on the enveloping Maya, Maya becomes Prakriti, or Matter—rather, perhaps, Mula prakriti, the root of Matter. As that breath, with its triple vibratory force falls on this matter, it throws it into three modifications or attributes—Tamas Rajas and Sattva.—Ibid p 24.

† Finally when Ishvara, whose consciousness was the one consciousness in the universe, whose life was the one life, who supported every form, gathers up his universe into himself ere he energes himself in the one, everything has vanished that we know as force. Ibid p. 25.

চতুর্ব্বিধ। কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ও ভক্তিযোগ। গীতার ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে এ চতুর্ব্বিধ যোগেরই উল্লেখ আছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই চতুর্ব্বিধ যোগের একত্র নির্দ্দেশ দেখা যায়।

"ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্ম যোগেন চাপরে॥
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বা হ্যন্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥"

কেহ ধ্যানযোগ দ্বারা আত্মাতে আত্ম দর্শন করে। অপরে সাংখ্য যোগ এবং অন্যে কর্ম্ম যোগ দ্বারে আত্ম দর্শন করে। আবার কেহ বা এ উপায় না জানিয়া গুরুর উপদেশ মতে আত্মার উপাসনা করে এবং ঐরূপে তাহারাও মৃত্যু অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। এই আত্মদর্শন বা আত্মার উপাসনার ফলে পরমাত্মা ভগবানেরই সাক্ষাৎকার লাভ হয়।

এই চতুর্ব্বিধ যোগই গীতাতে সবিস্তারে উপদিষ্ট হইয়াছে। জ্ঞান যোগ (যাহার অপর নাম সাংখ্য যোগ) ২য় অধ্যায়ে; কর্ম্ম যোগ ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়ে; ধ্যান যোগ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে; এবং ভক্তি যোগ ১২শ অধ্যায়ে উপদিষ্ট দেখা যায়। রাজবিদ্যাতে চতুর্ব্বিধ যোগেরই সার সঙ্কলিত হইয়াছে।

"মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥
সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥"

দৈবী প্রকৃতি সম্পন্ন মহাত্মা ব্যক্তিগণ আমাকে (ভগবানকে) সর্ব্বভূতের অব্যয় কারণ জানিয়া অনন্য মনে ভজনা করে। সতত আমার সঙ্কীর্ত্তন, প্রযত্ন সহকারে দৃঢ় ব্রত ধারণ এবং ভক্তি পূর্ব্বক আমাকে নমস্কার করিয়া নিষ্ঠ যুক্ত চিত্তে আমার উপাসনা করে। ইহাই ভক্তিযোগের সার কথা।

জ্ঞানযোগের উপদেশ এইরূপ—

"জ্ঞান যজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥"

অপরে বিশ্বতোমুখ আমার একত্ব বা বহুত্ব লক্ষ্য করিয়া জ্ঞান যোগ দ্বারা আমার যজন করে। তত্ত্বজ্ঞানের চরম লক্ষ্য—একত্ব সিদ্ধি—এক ভগবানই আছেন, অপর কোন কিছু নাই, এই তত্ত্বের উপলব্ধি। ("বাসুদেব সর্ব্ব মিতি।")

নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে কর্ম্মযোগের সারমর্ম্ম—ফলাকাঙ্খা রহিত হইয়া, আপন কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিহার করিয়া ভগবানে কর্ম্ম সমর্পণ—উপদিষ্ট হইয়াছে।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥"

হে অর্জ্জুন! যে কিছু অশন, যজন, দান, তপস্যা, কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, সে সমস্তই আমাতে অর্পণ কর।

ধ্যান যোগের সার কথা ঈশ্বর প্রণিধান—একাগ্র হইয়া বিষয়াসক্ত হইতে মন ব্যাবৃত্ত করিয়া ভগবানে চিত্ত সমাধান। এই ধ্যান যোগ রাজবিদ্যা অধ্যায়ে এইরূপে আদিষ্ট হইয়াছে—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥"

আমাতে মন অর্পণ কর, আমাকে ভজন কর, আমার যজন কর, আমাকে নমস্কার কর। এইরূপে আমার শরণাগত হইয়া আমাতে আত্মযোগ করিলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

এইরূপে দেখা যায় যে গীতোক্ত রাজবিদ্যায় সৃষ্টি স্থিতি লয়, জগৎ জীব ঈশ্বর এবং কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ ও ধ্যানযোগ সম্বন্ধে গূঢ়তত্ত্ব সমূহ সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। এই রাজবিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারিলে, মনুষ্য যে অশুভ হইতে মুক্ত হইয়া পরম কল্যাণ অর্জ্জন করিবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। কারণ এই রাজবিদ্যাতে সকল ধর্ম্মের, সকল তত্ত্বের, সকল সাধনার সার নিবদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত।

সৃষ্টির বিশালত্ব।

(দ্বিতীয় প্রবন্ধ)

সৌর জগতের কোন্ জিনিসটার কত আয়তন এবং সূর্য্য হইতে তাহার দূরত্ব কিরূপ, তাহা বুঝাইবার জন্য হার্শেল একটি অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। মনে করুন, আমরা খুব বড় একটা মাঠের মাঝ খানে দাঁড়াইয়াছি; সেই মাঠটি আড়াই মাইলের কিঞ্চিৎ বেশী বড়। এই মাঠের ঠিক মধ্য স্থলে দুই ফুট ব্যাসবিশিষ্ট একটি গোলা স্থাপন করিয়া মনে করুন যেন তাহা সূর্য্য। এখন এই সূর্য্যের ৮২ ফুট দূরে একটি সরিষা স্থাপন করিলে তাহা বুধ গ্রহের অনুরূপ হইবে। ঐ কাল্পনিক সূর্য্য হইতে ১৪২ ফুট দূরে একটি ছোট মটর রাখিলে তাহাকে শুক্র গ্রহ মনে করা যায়। পৃথিবীকে দেখাইতে হইলে ২১১ ফুট দূরে আর একটী মটর রাখুন। ৩১৭ ফুট দূরে একটি খেসারির দানা রাখিয়া মনে করুন যেন তাহা মঙ্গল। ইহার পরে চারি পাঁচ শত ক্ষুদ্র গ্রহের স্থান। আমাদের কাল্পনিক সূর্য্যের ১০০০ হইতে ১২০০ ফুটের মধ্যে ইহাদিগকে রাখিতে হইবে। ইহাদের আয়তন সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন দেখা যাইতেছে। কারণ, ইহারা এতই ক্ষুদ্র যে ইহাদের ৬৬০টিকে পাশাপাশি রাখিলেও এক ইঞ্চি হইবে না। আমরা উহাদের স্থানে কিঞ্চিৎ ধূলা ছড়া-

ইয়া দিয়া বোধ হয় নিশ্চিন্ত হইতে পারি। ইহার পর সৌর জগতের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ গ্রহ বৃহস্পতির স্থান। এই স্থানটি সূর্য্য হইতে সিকি মাইল অর্থাৎ ৪৪০ গজ দূরে নির্ব্বাচন করিতে হইবে; এবং তথায় একটি কমলা লেবু রাখিলে বৃহস্পতির আয়তনের উপযুক্ত হইবে। বৃহস্পতির পরে শনি; ইহার জন্যও একটি ছোট খাট কমলা লেবু চাই। এই লেবুটিকে ৭-৫ গজ দূরে রাখুন। অতঃপর প্রায় পৌণ মাইল দূরে একটি আমলকী রাখিয়া ইউরেনস্ এবং সওয়া মাইল দূরে আর একটি খুব বড় আমলকী রাখিয়া নেপ্‌চুন্ আর উপগ্রহগুলির জন্য কয়েকটি পোস্তদানা সাজাইলেই সৌর গজতের আদর্শ প্রস্তুত হইল।

আমাদের এই ছোট সৌর জগতের গ্রহগুলি যদি তাহাদের সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, তবে আড়াই মাইল স্থানের ভিতরেই সেই কার্য্য সমাধা হইবে। এই আড়াই মাইল ব্যাস বিশিষ্ট একটা হাঁড়ি প্রস্তুত করিতে পারিলে তাহা সেই সৌর জগৎ রাখিবার প্রকাণ্ড হাঁড়ির আদর্শ হইত। কোথায় আমাদের দুই ফুট চওড়া সূর্য্য, একটি সরিষা, দুটি মটর, দুটি লেবু, একটি খেসারির দানা, দুটা আমলকি, রতি খানেক ধূলি ও কয়েকটি পোস্ত দানা, আর কোথায় সেই ২½ মাইল ব্যাস বিশিষ্ট সাংঘাতিক হাঁড়ি!

সৌর জগৎটাকে যদি এতই ছোট করিয়াছি, তবে আর একটু ছোট করিয়াই দেখা যাউক না, কিরূপ হয়। মনে করুন আমাদের সাধারণ হাঁড়ির ন্যায় সৌর জগতের হাঁড়িও বাজারে বিক্রয় হয়; আর সেইরূপ একটা হাঁড়ি সৌর জগৎ শুদ্ধ কিনিয়া আনিবার জন্য আপনারা আমাকে টাকা দিয়াছেন; আর আমিও বিশ্বাসী ভৃত্যের ন্যায় উচিত মূল্যে খাঁটি জিনিস কিনিয়া আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছি। এখন সেই হাঁড়ির ভিতরে সাগ্রহে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আপনারা কি দেখিতে পাইবেন? দেখিবেন যে হাঁড়িটা একেবারেই খালি। আমি ঠকিয়া আসি নাই! উহার ভিতর সৌর জগৎ ঠিক্ আছে, কিন্তু তাহার সূর্য্য গ্রহ ইত্যাদি এত ছোট যে তাহা চক্ষে মালুমই হয় না!

দুই পদ্ম আটাত্তর নিখর্ব্ব মাইল দূরে গেলে সৌরজগৎপ্রাণী সেই মহা হাঁড়িরও চিহ্ন লোপ পাইবে। দুই পদ্ম আটাত্তর নিখর্ব্ব মাইল বলিলে যে কত বড় বিশাল দূরত্বের কথা বলা হইল আমরা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম। এই অঙ্কটিকে কেবল মাত্র গণনা করিতেই পাঁচ লক্ষ বৎসরের অধিক সময় লাগে। কিন্তু এত দূরে আসিয়াও আমরা সিরিয়সে উপস্থিত হইতে পারি নাই, কারণ তাহা এখান হইতে নয় পদ্ম মাইলেরও অধিক দূরে!

সুতরাং আমাদের গ্রহগুলির ন্যায় গ্রহ সিরিয়সের সঙ্গে থাকিলেও তাহাদিগকে দেখিবার উপায় আমাদের নাই। সিরিয়স এত দূরে, যে এ পর্য্যন্ত কোন দূরবীক্ষণ দিয়াই তাহার কোনরূপ চেহারা দেখা যায় নাই। যাহা আমরা দেখি, উহা কেবল সিরিয়সের জ্যোতিঃ মাত্র। দূরবীক্ষণের ভিতরে নক্ষত্রমাত্রকেই পরিষ্কার বিন্দুর মতন দেখায়, তাহার কোনরূপ আয়তন উপলব্ধ হয় না। বরং দূরবীক্ষণের ক্ষমতা যত বাড়ে এই বিন্দু ক্রমে ততই পরিষ্কার এবং ক্ষুদ্র হইয়া আইসে। তেমন ক্ষমতাশালী দূরবীক্ষণ এ পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হয় নাই, যদ্দ্বারা বাস্তবিক নক্ষত্রগুলিকে দেখা যাইতে পারে—অর্থাৎ যদ্দ্বারা উহাদের আসল চেহারার আমরা কোনরূপ আভাস পাইতে পারি।

ইহাতে, নক্ষত্রগুলি যে কত দূরে, তাহাই প্রমাণ হয়। ঐ সকল নক্ষত্রের নিকট সূর্য্যকে লইয়া গেলে, তাহাও ঐরূপ অদৃশ্য মূর্ত্তি হইয়া যায়। আকাশে এরূপ নক্ষত্রও অনেক দেখা যায় যে তত দূর হইতে সূর্য্যের কোনরূপ চিহ্নই পাওয়া যাইবে না। ঐ নক্ষত্রগুলি এক একটি বিশাল সূর্য্য। সম্ভবতঃ তাহারা প্রত্যেকে এক একটি স্বতন্ত্র সৌর জগতের শাসন কর্ত্তা।

নক্ষত্রগুলির সঙ্গেও যে গ্রহ আছে, এ কথাটাকে কেবলই অনুমানের উপরে ফেলিয়া রাখিবার বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না। দুটি বা ততোধিক নক্ষত্র মাধ্যাকর্ষণ বশবর্ত্তী হইয়া ঘুরিতেছে, এরূপ ব্যাপারের প্রায় সহস্র দৃষ্টান্ত আকাশে দেখা যায়। ইহাদের প্রায় সত্তরটির গতিবিধি নির্ণীত হইয়াছে। যে স্থলে একটি নক্ষত্র অপর একটিকে প্রদক্ষিণ করে, সেখানে তাহার সঙ্গে আর সামান্য একটা গ্রহের সঙ্গে এই মাত্র প্রভেদ থাকে যে গ্রহের নিজের জ্যোতিঃ নাই, আর নক্ষত্র স্বয়ংই জ্যোতিষ্মাণ। গ্রহদের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে ইহাও জানা যায় যে উহারাও এক সময়ে ঐ সূর্য্য এবং নক্ষত্রগুলির ন্যায় দীপ্যমান্ ছিল, তৎপর ক্রমশঃ শীতল হইয়া তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা পাইয়াছে। সুতরাং যাহা আপাততঃ গুরুতর প্রভেদ

বলিয়া বোধ হইতেছে, সময়ে তাহা দূর হইয়া যাইবে। কালে ঐ নক্ষত্রও শীতল হইয়া গ্রহের দলে আসিবে। দুঃখের বিষয় এই যে তখন তাহার জ্যোতিটুকু লোপ পাওয়ার দরুণ তাহাকে আর দেখিবার উপায় থাকিবে না। সুতরাং, কয়েক কোটি বৎসর পরে যখন এই কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটিবে, তখন মনুষ্য জাতি এই পৃথিবীতে উপস্থিত থাকিলেও উহার কোন সংবাদ পাইবে কি না সন্দেহ।

'সন্দেহ' বলার কারণ এই যে, এক এক বার মনে হয় বুঝিবা সংবাদ পাইতেও পারে। ঐরূপ সংবাদের আভাস আমরাই কোন্ আর দু এক জায়গায় না পাইতেছি। প্রমাণ স্বরূপ একটা বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এরূপ অনেক নক্ষত্র আছে যে তাহারা চিরকাল সমান উজ্জ্বল থাকে না। কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের ভিতরে উহাদের উজ্জ্বলতা একবার বাড়িয়া আবার কমিয়া যায়। এইরূপ সময় গণিয়া উজ্জ্বলতার হ্রাসবৃদ্ধি হওয়ার কারণ কি? ইহার একটিমাত্র সন্তোষজনক কারণ দেখা যায়। মনে করুন ঐরূপ একটা নক্ষত্রের চারিদিকে একটা গ্রহ ঘুরিতেছে, আর মনে করুন, সেই গ্রহ ঘুরিতে ঘুরিতে এক একবার ঐ নক্ষত্র আর আমাদের পৃথিবীর মাঝখানে আইসে। ঐ সময়ের জন্য সেই গ্রহ সেই নক্ষত্রকে আড়াল করিয়া দাঁড়ায়, সুতরাং তখন সেই নক্ষত্রের জ্যোতিঃ কমিয়া আইসে। এইরূপে নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর নক্ষত্রের গ্রহণ হওয়াতে আমরা তাহার উজ্জ্বলতার হ্রাস বৃদ্ধি দেখিতে পাই।

নক্ষত্র সকলের সঙ্গে আমাদের সূর্য্যের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে। সূর্য্যের ন্যায় উহারাও উজ্জ্বল এবং বৃহৎ; সূর্য্যের ন্যায় উহারাও সম্ভবতঃ গ্রহাদি পরিবৃত; সূর্য্যের ন্যায় উহারাও মাধ্যাকর্ষণের অধীন।

উহারা কিরূপ উপাদানে নির্ম্মিত, তাহাও উহাদের আলোক পরীক্ষা করিয়া কতক জানা গিয়াছে। এ সকল উপাদানের মধ্যে আমাদের পরিচিত অনেক পদার্থ পাওয়া যায়।

কাচের কলমে সূর্য্যের আলোক পড়িয়া কেমন সুন্দর রং উৎপন্ন করে তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। সূর্য্যের সাদা আলো মোটামুটি সাত রকম রঙ্গিণ আলোর সমষ্টি। ঐ আলো ত্রিকোণ কাচের ভিতর দিয়া আনিলে তাহার উপাদান স্বরূপ সাতটি রঙ্গিণ আলো পৃথক হইয়া পড়ে। শুধু সূর্য্যের আলোকের স্থলেই যে এরূপ হয়, তাহা নহে, যে কোন আলোককে ইচ্ছা এই উপায়ে বিশ্লিষ্ট করা যায়।

খুব সূক্ষ্মরূপে আলোকের বিশ্লেষণ করিতে পারিলে দেখা যায় যে, কোন দুইটি পদার্থ জ্বলিবার সময় একরূপ আলোক বিকীরণ করে না। অঙ্গার জ্বলিবার সময় যেরূপ আলোক নির্গত হয়, গন্ধক জ্বলিবার সময় তদপেক্ষা বিভিন্ন প্রকৃতির আলোক নির্গত হইতে দেখা যায়। এইরূপে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, অম্লজন, জলজন, প্রভৃতি যে কোন জিনিস লইয়া পরীক্ষা হউক না কেন, প্রত্যেক স্থলেই এক একটি বিভিন্ন প্রকৃতির আলোক উৎপন্ন হইবে। সুতরাং এইরূপে আলোক পরীক্ষা করিয়া নিশ্চিত বলিয়া দেওয়া যায় তাহা কোন্ জিনিসের আলোক। একাধিক পদার্থ এক সঙ্গে জ্বলিলেও তাহাদের আলোক বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদিগকে চিনিতে বিশেষ ক্লেশ হয় না। যে যন্ত্র দ্বারা এইরূপে আলোকের বিশ্লেষণ করা যায়, তাহার নাম spectroscope। জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সম্বন্ধে অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব ইহার সাহায্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সূর্য্যের মধ্যে আমাদের পরিচিত প্রায় কুড়িটি মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব এই উপায়ে প্রমাণিত হইয়াছে।

এই উপায়ে গ্রহ উপগ্রহগণের আলোক পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহা নিরবচ্ছিন্ন সূর্য্যালোক ব্যতীত আর কিছুই নহে। বাস্তবিক গ্রহদিগের কেহই নিজে আলোক বিকীরণ করে না। উহাদের আলোক উহারা সূর্য্যের নিকট প্রাপ্ত হয়।

নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে আমাদের পরিচিত অনেক মৌলিক পদার্থের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

Spectroscopeএর কার্য্য এইখানেই শেষ হয় নাই। জ্যোতির্ব্বিদগণ ইহাকে দিয়া নিতান্ত আশ্চর্য্য সংবাদ সকল সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

আকাশের অনেক স্থানে মেঘের ন্যায় কতকগুলি পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাকে লোকে ছায়া-পথ অথবা 'যমের জাঙ্গাল' বলে, তাহা এই শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু এতদ্ভিন্ন এই জাতীয় আরো অনেকগুলি পদার্থ আকাশে আছে তাহাদিগকে নীহারিকা বলে। এ সকল জিনিস বাস্তবিক কি, তাহার মীমাংসা অনেক দিন হয় নাই।

অনেকে বলিতেন উহারা বাষ্পরাশি, অনেকে বলিতেন উহারা তারকাপুঞ্জ। অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র এক স্থানে পুঞ্জীকৃত হইয়া থাকিলে বাষ্পরাশির ন্যায় দেখা যায়। সুতরাং এ প্রশ্নের মীমাংসা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল।

এই সময়ে হর্শেল বড় বড় দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দ্বারা এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্ব্বে যাহাদিগকে মেঘের ন্যায় দেখা যাইত, হর্শেলের দূরবীক্ষণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহারা একে একে তারকাপুঞ্জে পরিণত হইতে লাগিল। সুতরাং তিনি স্থির করিলেন যে ঐরূপ জিনিসগুলির সমস্তই তারকাপুঞ্জ। তাঁহার দূরবীক্ষণের ভিতরেও যে গুলিকে মেঘের মতনই দেখাইল, তাহাদের সম্বন্ধেও তিনি বলিলেন যে উহারাও তারকাপুঞ্জ; তবে আমার দূরবীক্ষণ অপেক্ষা ক্ষমতাশালী দূরবীক্ষণ না হইলে উহাদের যথার্থ রূপ প্রকাশ পাইবে না।

কিন্তু spectroscope আবিষ্কার হওয়ার পরে এ সকল প্রশ্ন অতি সহজেই মীমাংসিত হইয়াগেল! তখন দেখা গেল যে উহাদের ভিতরে দুই প্রকারের পদার্থই আছে। অর্থাৎ উহাদের কতকগুলি জলন্ত বাষ্প, আর কতকগুলি নক্ষত্রপুঞ্জ।

আকাশে এমন অনেক তারা আছে যে তাহারা দ্রুতবেগে পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইতেছে অথবা পৃথিবী হইতে দূরে গমন করিতেছে। এ সকল তারার গতি দূরবীক্ষণে ধরা পড়ে না, কিন্তু spectroscope দিয়া তাহা সহজেই টের পাওয়া যায়। এবং ঐ গতির বেগ কিরূপ তাহাও অনুমান করা সম্ভব হয়।

এরূপ ঘটনাও ঘটিয়াছে যে কোন নক্ষত্র যুগল পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, অথচ তাহারা পরস্পরের অতিশয় নিকটবর্ত্তী হওয়াতে দূরবীক্ষণে তাহাদিগকে যুগল বলিয়া দেখায় নাই। কিন্তু spectroscpeএর দৃষ্টিতে তাহাদিগকে ধরা পড়িতে হইয়াছে। তাহাদের আনুমাণিক বেগ, প্রদক্ষিণ কাল, এমন কি মোটামুটি একটা ওজন পর্য্যন্ত স্থির করিয়া তবে তাহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া গিয়াছে।

নক্ষত্রগণের সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি কয়েকটী কথার আলোচনা করিয়াছি। উহারা এত দূরবর্ত্তী হইলেও নিতান্ত আমাদের অপরিচিত বলিয়া বোধ হয় না। অনেক বিষয়ে আমাদের নিকটস্থ পদার্থ সকলের সঙ্গে উহাদের সাদৃশ্য দেখা গেল; এতদ্ভিন্ন আরো অনেক বিষয়ে এইরূপ সাদৃশ্য থাকা নিতান্ত সম্ভব বলিয়া মনে করা যায়।

আমাদের সূর্য্যের ন্যায় উহারাও এক একটি সূর্য্য। সূর্য্যের ন্যায় উহারাও মধ্যাকর্ষণ বিধির অধীন। সূর্য্যের ন্যায়, দু একটি অনুচর উহাদেরও অনেকেরই আছে।

এ সমস্তই দেখা গেল। অতঃপর কি একথা সম্ভব মনে করা যায় না যে নক্ষত্রদের রাজ্যেও জীব নিবাসের উপযুক্ত লোক আছে? আর তাহাতে মানুষের সমকক্ষ অথবা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীবও হয় ত থাকিতে পারে? ভগবানের এই সুবিশাল বিশ্বমন্দিরের হীনতম কোনের একটি ধূলিকণার যোগ্যও হয় ত আমাদের এই পৃথিবী হইবে না। তাহার অধিবাসী হইয়া আমরা কি মনে করিব যে ব্রহ্মের আনন্দ কেবল আমাদের জন্যই প্রবাহিত হইয়াছিল, আর তাঁহার অমৃতের অধিকারী হইয়া কেবল আমরাই জন্ম গ্রহণ করিয়াছি? ইহা কখনই বিশ্বাসের উপযুক্ত কথা নহে। বরং আমরা মনে করিতে পারি যে জড় রাজ্যে যেমন বিশ্বময় এক ভাব দেখা গেল; আধ্যাত্মিক রাজ্যেও তেমনি। এই ভাব প্রণোদিত হইয়াই কবি বলিতেছেন—

"নির্ভয়ে অযুত সহস্র লোক ধায় হে
গগনে গগনে সেই অভয় নাম গায় হে।"

সে নাম যে গগনে গগনে গীত হইতেছে, তাহাতে কোন ভুল নাই।

এতক্ষণ আমরা সৌর জগৎকে অনেক দূর হইতে দেখিয়াছি; তজ্জন্য হয়ত উহা আমাদের নিকট ক্ষুদ্র বোধ হইয়াছে। সুতরাং এখন একবার উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক ইহার সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করা আবশ্যক।

সূর্য্য ইহার কেন্দ্র এবং অধিপতি, এই জন্যই ইহাকে সৌরজগৎ বলা হইয়া থাকে। বিধাতা ইহাকে অনন্ত আকাশে একটি দ্বীপের ন্যায় রাখিয়া দিয়াছেন। নক্ষত্র সকলকে উহা হইতে এতদূরে রাখা হইয়াছে যে তাহাদের কোনরূপ প্রভাবই ইহার উপর কার্য্যকর হয় না। সূর্য্য সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে নিজ রাজ্যে প্রভুত্ব করিতেছেন। এই রাজ্যের ব্যাস ৫৫৬ কোটি মাইল। এই স্থানের ভিতরে আটটি বৃহৎ গ্রহ, কুড়িটির অধিক উপগ্রহ, ও প্রায় পাঁচ শত ক্ষুদ্র গ্রহ নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট পথে ভ্রমণে নিযুক্ত

এতদ্ভিন্ন বহু সংখ্যক ধূমকেতু এবং উল্কা বলয় সূর্য্যের শাসনাধীন।

এতগুলি জ্যোতিষ্ককে ধারণ এবং শাসন করিবার ক্ষমতা যাহার আছে, সেই সূর্য্য যে কিরূপ বিশাল, তাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে কিরূপে সমর্থ হইব? ইহার ব্যাস সাড়ে আট লক্ষ মাইলেরও অধিক। বাষ্পীয় যান ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে অবিশ্রান্ত ধাবমান হইয়াও ৫ বৎসরের ন্যূন সময়ে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে পারিবেনা।

আমাদের পৃথিবীর ন্যায় তিন লক্ষ পৃথিবীকে একদিকে, আর সূর্য্যকে একদিকে রাখিয়া ওজন করিলে সূর্য্যই অধিক ভারি হইবে। আয়তনের হিসাবে ধরিলে সূর্য্যকে পৃথিবীর তুলনায় এতদপেক্ষাও বৃহত্তর দেখা যায়। ১৩ লক্ষ পৃথিবী দিয়া একটা পিণ্ড প্রস্তুত করিতে পারিলে তবে তাহা সূর্য্যের সমান হয়।

সূর্য্য পৃথিবী হইতে নয় কোটি সাতাইশ লক্ষ মাইল দূরে। এত দূরে থাকিয়াও সে যে আমাদিগকে নিতান্ত অল্প তেজ দিতেছে না, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ২ বর্গ ফুট পরিমিত স্থানে যে পরিমাণ সূর্য্য কিরণ পতিত হয়, তাহা ঘনীভূত করিতে পারিলে তদ্দ্বারা লৌহ প্রভৃতি ধাতুকেও গলাইয়া ফেলা যায়। এই হিসাবে ধরিলে পৃথিবীতে এক সময়ে কি পরিমাণ সূর্য্যোত্তাপ পতিত হয় একবার ভাবিয়া দেখুন। অথচ এই উত্তাপ সূর্য্য কর্ত্তৃক বিকীর্ণ উত্তাপের সমষ্টির দুই শত বারো কোটি আশী লক্ষ ভাগের একভাগ মাত্র। গ্রহগণ সকলে মিলিয়া এই উত্তাপের দুই কোটি চৌত্রিশ লক্ষ ভাগের একভাগ মাত্র উপভোগ করে!

এত উত্তাপের ভিতরে কোন জিনিসই কঠিন অবস্থায় থাকিতে পারে না। লৌহ প্রভৃতি ধাতুও সেখানে প্রদীপ্ত বাষ্পে পরিণত হইয়া আছে। সূর্য্যের অভ্যন্তরে তরল বা কঠিন পদার্থ কিছু আছে কিনা বলা যায় না; কিন্তু আমরা যাহা দেখিতে পাই তাহা জ্যোতির্ম্ময় বাষ্প রাশি। প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাভিঘাতে সেই বাষ্প অবিশ্রান্ত মথিত হইতেছে। সেই ঝটিকার তাড়নায় কখন কখন সূর্য্যের শরীরে ভীষণ গহ্বর সকল উৎপন্ন হয়। পৃথিবী হইতে দূরবীক্ষণ যোগে আমরা সেই সকল গহ্বরকে কৃষ্ণবর্ণ কলঙ্কের ন্যায় দেখিতে পাই। এই সকল গহ্বরের এক একটা এত বৃহৎ হয় যে তাহার অভ্যন্তরে গ্রহগণের সব কয়েকটিকে রাখিবার স্থান হইতে পারে।*

ক্রমশঃ—

শ্রীউপেন্দ্র কিশোর রায়।

বেদে বালিকা।

(গল্প)

১

নারায়ণগঞ্জে কতকগুলি বেদে বাস করে। বিজুলী নলু বেদের মেয়ে; মাতৃহীনা বালিকা, নলুর একমাত্র সংসারের দায়। মা-মরা শিশুর পিতাকে মা সাজিতে হয়, সে কি বিপদ তাহা বুঝাইবার নহে। বিজুলী তিন বৎসর বয়সে মাতৃহীনা হয়, এক মাস পরে নলু এক দিন রাগিয়া মেয়েকে বকিয়াছিল, 'যা তুই আমার নিকট হ'তে দূর হ'; বালিকা খানিকটা চুপ করিয়া রহিল, তার পর জলপূর্ণ চক্ষে চাহিয়া বলিল "তবে যাব কোথা?" এ কথার চেয়ে নলু বেদে দুঘা সহিতে পারিত। 'যাব কোথায়'? আর যাইবার স্থান নাই, এই অতিসংক্ষিপ্ত মাতৃঅভাবব্যঞ্জক ইঙ্গিতে বেদের পাষাণ হৃদয় গলিয়া গেল, নলু চক্ষের জল সামলাইতে পারিল না। তদবধি সে বিজুলীকে আর সামান্য একটা কটু কথাও বলিত না। বেদেরা কতকগুলি দুর্ব্বাক্য ও অপভাষা সর্ব্বদা কথাবার্ত্তায় ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু মূর্খ নলু সেই সকল কথার কোনটি ভদ্রের, কোনটি ইতরের তাহা এক জন নীতিকারের ন্যায় বাছিয়া লইতে পারিত। সেই মাতৃহীনা বালিকা তাহাকে অনেক নূতন তত্ত্ব শিখাইল, সেই শিশুটির ক্রিয়াকলাপ ও আবদার ছোট একখানি শাস্ত্রের মত; মূর্খ বর্ব্বর নলু তৎসাহায্যে পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্বে, সময় সময়ে দেবত্বে পৌঁছিত। যখন বিরহব্যথিত শোকাকুল নলু কেরোসিনের বাক্সগুলির উপর শুইয়া

---

* গতবারে মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার সম্বন্ধে প্রদীপ সম্পাদক যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, তদুত্তরে আমার বক্তব্য এই—

"সমে সমন্তাৎ ক পতত্বিয়ং খে"

এই কথাগুলি যে শ্লোকের অংশ, তাহাতেও এই বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে। সমগ্র শ্লোকটি এইরূপ—

"আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী তয়া যৎ
স্বস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা।
আকৃষ্যতে তৎ পততীব ভাতি
সমে সমন্তাৎ ক পতত্বিয়ং খে॥"

"আকর্ষণ করিবার শক্তি পৃথিবীর আছে। তৎকর্ত্তৃক যে অব্যাহত রূপে অবস্থিত গুরুবস্তু পৃথিবীর নিজের শক্তি দ্বারা তদভিমুখে আকৃষ্ট হয়, তাহাই পড়িতেছে বলিয়া মনে হয়। চারিদিকেই সমানভাবে অবস্থিত আকাশ, পৃথিবী কোথায় পড়িবে?"

এই শ্লোকের ভিতরে মাধ্যাকর্ষণের বীজ নিহিত রহিয়াছে, একথা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তথাপি ইহা দ্রষ্টব্য যে, 'মাধ্যাকর্ষণ' বিষয়টা এতদপেক্ষা অনেক বিভিন্ন প্রকৃতির। পৃথিবী যে অন্য পদার্থকে আকর্ষণ করে তাহাই এই শ্লোকে বলা হইতেছে; কিন্তু জগতের যাবতীয় পদার্থই যে পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে, এ ব্যাপারের কোন আভাস ইহাতে নাই। বাস্তবিক পক্ষে মাধ্যাকর্ষণের বিষয় প্রাচীন পণ্ডিতেরা কেহ বলিয়া যান নাই।—লেখক।

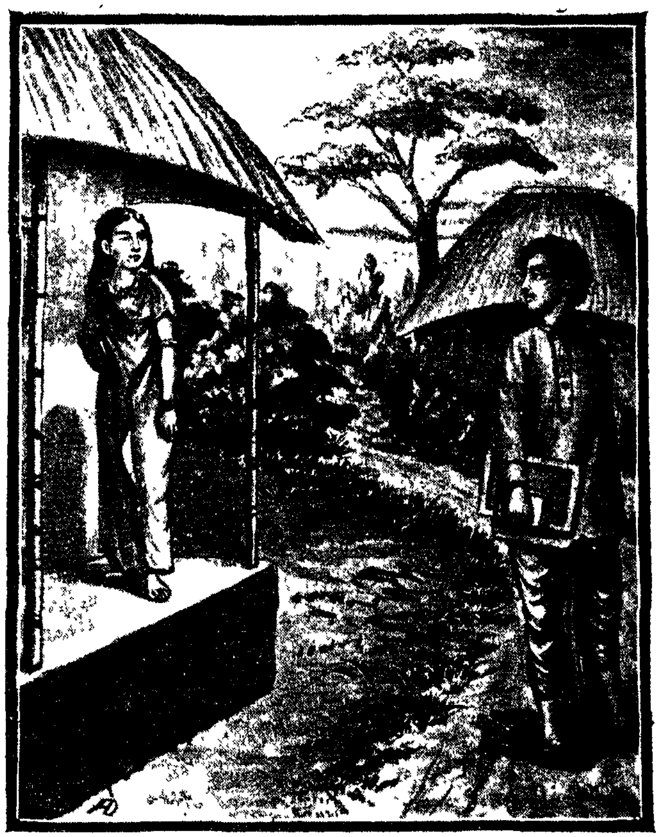
শীতরাত্রে বিজুলীর মার জন্য অতি গোপনে কাঁদিত,—মনে হইত এখন যদি সে একবার আসে, তাহার মেয়েটির মুখখানি দেখিতে,—নলুর মনের বেদনা দূর করিতে একবার মাত্র আসে,—তবে এই শীতের রাত্রে মেয়েটির কাছে স্ত্রীকে শুইতে দেখিলে নলুর প্রাণ জুড়াইবে, সে তাতে স্বর্গ পাইবে। পুরাতন কথা মনে পড়ে, গুঞ্জমালা ও হাঁসুলিশোভিত কণ্ঠ, হাসি হাসি মুখখানি, নলুর মনে জাগিয়া উঠে; নলু ভ্রমবশে বাদিয়া শয্যায় হাত দিয়া খুঁজিতে থাকে। এই ভাবে নলুর অনেক রাত্রি কাটিত। মাঝে মাঝে বিজুলী জাগিলে নলু অমনি চুপ করিয়া শুইত,—যেন গুরু-মহাশয়ের ভয়ে ছাত্র—তাহার চক্ষে জল দেখিলে বিজুলীর কোমল প্রাণে বড় লাগিবে। তথাপি বিজুলী বুঝিত। সে এক এক দিন বলিত "বাবা তোমার কি হয়েছে?" ও তাহার মুখে কচি হাতখানি বুলাইত। সেই স্নিগ্ধ কচি করপল্লব স্পর্শে নলুর দুঃখ শোক ঘুচিয়া যাইত, নলু মেয়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া ঘুমিয়ে পড়িত। এই ভাবে নলুর বহু কষ্ট ও স্নেহপালিত হইয়া বিজুলী ত্রয়োদশ বর্ষে একটি বন্য সুন্দর ফুলের মত, আব্দারে উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীন প্রকৃতির মেয়ে হইয়া দাঁড়াইল।

নলু নানারূপ ঝুঁটা মুক্তা, পাহাড়ের ওষধ, কাঁচের খেলনা বিক্রয় করিত। তাহা ছাড়া নারায়ণগঞ্জবাসী বেদেরা ডোমেদের ন্যায় ঝাঁপি, ধুচনি, কুলা, ও বেতের মোড়া তৈয়ার করিতে শিখিয়াছিল। নলু এ সকল বিষয়ে সকলের অপেক্ষা বেশী উপায় করিত; বেদে সমাজে তার বিলক্ষণ মান ছিল, বুড়ো বেদে বলিত, 'দাদা বিজুলীর বর আচ্ছা দেখে আনা চাই, জোনপুরে আমাদের বাজনি বেদের এক ব্যাটা আছে, আমি এবার দেশে যেয়ে তার সঙ্গে বিজুলীর বে'র কথা বলে আসব।' নলু বলিল 'হুম্! এত শিগগির।' তার অর্থ বিজুলী যে পরের ঘরে যাবে, এ কথা নলু সহ্য করিতে পারিত না।

বিজুলী দুপুরবেলা খড়ের চালের ছোট্ট একটি ঘরে কেরোসিনের বাক্সের উপর বসিয়া রাস্তা ঘাট দেখিত। মাথায় পাগড়ি, পায়জামা পরা সে কালের কেরাণী বাবুরা সাহেবদের হাউসে কর্ম্ম করিতে যাইতেন। বিজুলী মনে মনে তাঁহাদের শুভ্র বস্ত্র ও গম্ভীর ভাবের প্রশংসা করিত। কোন দিন ফেরিওয়ালারা সোলা নির্ম্মিত ফুল কি ফল লইয়া যাইত, নলুকে বলিয়া সে তাহার একটা কিনিয়া দু তিন ঘণ্টা ধরিয়া তাহাই লইয়া ব্যস্ত থাকিত। বেদের মেয়েদের একটা স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি আছে, তাহারা স্বচ্ছন্দে বনের ফুল মাথায় পরে, লতার সহিত ফুল গাঁথিয়া গলায় পরে, চঞ্চল চক্ষে চারি দিকে চায়; তুমি চাহিলে তোমার দিকে চাহিবে, তাহাতে বড় একটা লজ্জা বোধ করিবে না; আবার কখনও কখনও তোমাকে নিবিষ্ট চিত্তে তাহাদের দিকে তাকাইতে দেখিলে তোমায় হাসিয়া পাগল করিবে। বনের কুরঙ্গীর মত, তাহারা যৌবনে পা দিয়াও দৌড়িয়ে বেড়ায়। বিজুলি আবদারে মেয়ে, সে বেদে মেয়েদের মধ্যেও বড় বেশী স্বাধীন প্রকৃতি। এই স্বভাব সুন্দর বালিকারা এক জিনিষ দিয়া পৃথিবী জয় করিতে পারে—তাহা প্রেম; ইহারা এক জিনিষে ধরা দেয়,—তাহা প্রেম।

২

রোজ স্কুলে যাওয়ার সময় শশী নলুবেদের বাড়ীর পাশ দিয়ে যায়। শশীর বয়স পোনের, সে বিজুলীর মুখখানি দেখিতে দেখিতে যায়, বিজুলীও তাহার পানে তাকাইয়া থাকে, বিজুলী ভাবে 'ভদ্রলোকের ছেলেরা কেমন সুন্দর!' শশী ভাবে 'বেদের মেয়েরা কেমন সুন্দর!' যায়, আর ফিরে চায়,—"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং" ভাবে; শশী রোজ রোজ প্রতিবাত নীয়মান চিনাংশুক কেতুর ন্যায় চিত্তটি নলু বেদের ঘরের দিকে স্থির রাখিয়া চলিয়া যায়। বীজ ভূতলে পড়িলে অঙ্কুর জন্মে। আধ্যাত্ম জগতে চক্ষুর দৃষ্টি বীজের মত কার্য্যকরী,—পুষ্পরেণু যে বায়ু-পথে প্রবাহিত হয়, সেই বায়ু পথে বালকের সুকুমার পূর্ব্বরাগময় দৃষ্টি চালিত হইয়া নলু বেদের বাড়ীতে একখানি কোমল হৃদয়ের উপর পড়িত, তাহাতে বালিকার প্রেম ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল।



এই ভাবে কতকদিন কাটিয়া গেল; এ সাময়িক স্বপ্নজনিত সুখের ন্যায়, শশীর মনে তত একটা কিছু থাকিত না; সে স্কুলে পড়িয়া আসিবার বেলা বেদের বাড়ীর দিকে চাহিতে চাহিতে যাইত; যে দিন বিজুলীকে দেখিতে না পাইত, সে দিনও যেন মনে হইত, বিজুলীর অশরীরি রূপ সেই খড়ের চালে, নিকটবর্ত্তী গুল্ম লতায়, কেরোসিনের বাক্সে ছড়াইয়া আছে, তাহার সুনির্ম্মল রূপে মুগ্ধ হইয়া শশী চলিয়া যাইত। খেলা বেড়া, পড়া শুনায়, প্রাইভেট টিউটারের গঞ্জনায়, মামীর প্রস্তুত নানারূপ মিষ্টান্ন ভক্ষনে, সে আবার তাহা ভুলিয়া যাইত। তখনও সে সুমিষ্ট একটি বন্য ফল এবং সুন্দরী একটি বন্য মেয়ে—ইহাদের কোনটি জীবনের বেশী উপাদেয় ও কামনার দ্রব্য, তাহার তারতম্য করিতে পারিত না; এক সময়ে এটি, অন্য সময়ে অপরটি তাহাকে ভুলাইত।

একদিন স্কুলে যাইতে দেরি হইয়াছে, ১২টা বাজে বাজে, শশী দ্রুত চলিয়াছে, ক্লাসে যাইয়া লাষ্ট দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। মাষ্টার নরেন বাবু অতি কড়া; সেদিন শশী বেদের মেয়ের কথাও ভুলিয়াছে—সে তাড়াতাড়ি যাইতেছে; কিন্তু বেদের মেয়ে তাহার কথা ভোলে নাই। আজ বড় সুযোগ—রাস্তায় লোক জন কেহ নাই, ১১ টার পর আপিসের লোক, স্কুলের ছাত্র রাস্তায় বড় একটা থাকে না। স্ফুরন্ত যৌবনা বিজুলী বনের ফুল কানে দোলাইয়া, সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে শশীর দিকে চাহিতেই শশীর চক্ষু তাহার উপর পড়িল; শশী স্কুলের কথা ভুলিয়া বিভোর হইয়া দাঁড়াইল—তখন রাস্তায় কেহই নাই; নির্জ্জন স্থান যেন প্রেমের নিভৃত নিকেতন; স্বভাবের ফুল, পল্লব, সূর্য্য সেই নির্জ্জন লীলায় সুরার বিহ্বলতা ঢালিয়া দেয়। বেদের মেয়ে বলিল, "বাবু একবার হেথায় এস না, তোমায় দেখি, ভাল করিয়া একদিনও ত দেখিতে পাই না!" শশী সে আহ্বানে মুগ্ধের ন্যায় বেদের গৃহে প্রবেশ করিল, প্রথম চোরের ন্যায় বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল। বেদের মেয়ে তাহাকে ঘরে নিয়া বসাইল, বলিল "বাবু পান খাবে। আমার হাতে পান খেলে কি তোমার জাত যাবে?" শশী বলিল "পান ত আমরা বাজারে যে সে লোকের হাতে কিনিয়া খাই। তোমার হাতে খাইব, সে ত আমার ভাগ্য।" বিজুলী একটা পান দিল, শশী তাহা মুখে পুরিয়া বলিল, 'এখন আসি' বলিয়া শশী দ্রুত পদে বাহির হইয়া চলিল। কিন্তু সে দিন শশীর চিত্তে যুগান্তর উপস্থিত হইল। সেদিন সে কৌমার বয়সের সীমান্তে পা দিয়া যৌবনস্বর্গ দেখিতে পাইল, একটি সুমিষ্ট বন্য ফল হইতে যে সুন্দরী বন্য বালিকা জীবনের পক্ষে ঢের বেশী উপাদেয়, তাহা শশী সে দিন প্রথম বুঝিল। আজ শশী আর বালক নহে, আজ পৃথিবী স্বর্গের ন্যায় নূতন বর্ণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, কল্পনা নূতন জীবন পাইয়াছে—খেলার ময়দান ছাড়িয়া নিকুঞ্জ বনের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে।

৪

পঞ্চদশ বর্ষীয় বালকের মনে প্রথম প্রেম-সঞ্চার, একজন ইংরেজ কবি লিখিয়াছেন, সে যেন প্রথম সমুদ্র দর্শন। অসীম এক রস-সঞ্চারে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া পড়ে, বালক তাহার নিজেই ইয়ত্তা করিতে পারে না। শশী সে দিন সন্ধ্যায় শীতললক্ষ্যা নদীর তীরে বেড়াইতে লাগিল কিন্তু হৃদয়ে কি একটা মধুর ব্যথা বদ্ধ মূল হইয়া রহিল। গ্লাস্কোর হত্যাকাণ্ড সে দিন স্কুলে পড়িয়াছে; মাষ্টার মহাশয় তৎসঙ্গে অন্ধকূপ হত্যার তারতম্য করিতে বলিয়াছেন,—জ্যামিতির ৩২শ প্রতিজ্ঞাটি সে ভাল করিয়া বোঝে নাই। এই সকল সে ভাবিতে লাগিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। আকাশ কত দূরে? আঁকষী দিয়া তারাগুলি যদি ধরা যাইত। আকাশ ছোঁয়া যায় না? দেরি হইলে বাড়ীতে মামা বাবু বকিবেন। প্রাইভেট টিউটার মহাশয় বসিয়া থাকিবেন। সহাধ্যায়ী বন্ধুর কি সুন্দর চরিত্র। তাহাকে কত স্নেহ করে। এই প্রকার কত কি চিন্তা করিয়া সে শীতললক্ষ্যা নদীর ঢেউগুলি দেখিতে লাগিল, সফেন জল রাশির হৃদয়ে কি অসীম উদ্বেগ। রাত্রি দিন কোথায় চলিয়াছে? এই সকল ভাবিয়া সে শেষে বিজুলীর দুইটি সুন্দর চক্ষের কথা ভাবিল। বালক তখন অন্য সকল চিন্তা ভুলিয়া গেল, মনে হইল, 'আর একবার কাছে যাইতে পাইতাম! তাহার আঁচলখানি একবার ছুঁইতে পাইতাম! তাহার কাণের বনফুলের সুরভি আর একটিবার পাইতাম! তাহার কথাগুলি কেমন মিষ্ট! আর একটি বার শুনিতে পাইতাম!' বালক ভাবিতে ভাবিতে গৃহে ফিরিয়া আসিল।

৫

বেলা দুইটার সময় নলু বেদে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছে, সে রাঁধিয়া মেয়েকে খাওয়াইয়া, নিজে খাইয়া কার্য্যে গিয়াছিল, একটা বেতের মোড়া ছিঁড়িয়া গিয়াছে, নলু ঘরের দাওয়ায় বসিয়া তাহা বুনাইতে লাগিল। আজ বিজুলীকে দেখিতে পাই না কেন? আর দিন কাজ হইতে ফিরিয়া আসিলে বিজুলী ছুটিয়া আসে, গলা জড়াইয়া ধরে, আজ সে কোথায়? বেণী বাবুর বাড়ীতে যে ঝাঁপি বেচিয়াছি, তাহার দাম পাই নাই। আর একটা ঝাঁপি চাহিয়াছে, আগের দাম চুকিয়ে না দিলে নূতন ঝাঁপি দেবো না;" এইরূপ নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে ডাকিল, 'হ্যাদে বিজুলী, বিজুলী, মা একবার এদিক পানে আয়।" ঘরের ভিতরে একটা ছেঁড়া মাদুরে বিজুলী শুইয়াছিল, মাথা তুলিয়া বলিল—"আমি এখন যাইতে পারব না।" 'কেন মা অসুখ করেছে নাকি?' নলু বেদে মোড়া ফেলিয়া বিজুলীর নিকট আসিল, দেখিল বিজুলী কাঁদিতেছে। বিজুলীর চক্ষে জল দেখিয়া নলু আর সকল কথা ভুলিয়া গেল, সে ত এমন ভাবে কখনও কাঁদে নাই—সে যে প্রফুল্লতার একখানি ছবি বিশেষ, সে পিতার কষ্ট দেখিলে বিমর্ষ হয়; নতুবা বনে বনে গাহিয়া বেড়ায়, বন ফুল ও গুঞ্জমালা পড়িয়া বেড়ায়, পাড়াপরসী বেদেনীদের ছেলে কোলে করিয়া খেলিয়া বেড়ায়। "কে তোকে বকেছে?"—"বাবা কেউ নয়,"—"তবে এমন কাচ্ছিস্ কেন?"—"না বাবা কিছু নয়"—"কিছু না"—বালিকা, জীবনে এই প্রথম দিন নলুর কাছে কথা গোপন করিল; নলুর বুকে তা লাগিল—"মা তুই বল, তোর কি হয়েছে? আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি। তুই কিছু খাবি, দশটার সময় খেয়েছিস, বেলা ঢলে পড়েছে, আর দিন এম্নি সময় খেতে চা'স," এই বলিয়া নলু কিছু দুধ, চিড়ে, গুড় ও একটা শশা বিজুলীর নিকট লইয়া আসিল,—বিজুলী বলিল, "না বাবা আমি খাব না।"

বিজুলীর কি হয়েছে? বিজুলীর এক দিনে হৃদয়ে প্রেম হইয়াছে, সে প্রেমে মজিয়াছে, সে মরিবে তার এই পণ। সন্ধ্যা চলিয়া গিয়াছে; নলু ভাত রাঁধিয়াছে, বিজুলী রোজই রান্না করিতে চায়, নলু তাহাকে রাঁধিতে দেয় না—নলুর প্রতিজ্ঞা যে অবধি সে আছে, বিজুলীকে কোন কষ্ট করিতে দেবে না। বিজুলী ভাল খাবার পাইলে কিনিয়া নলুকে খাওয়ায়, যে জিনিষটি ভাল দেখে বাবার জন্য কিনিয়া আনে। নলুর এমন সুখ দুঃখের সঙ্গী, এমন ব্যথার ব্যথী কে? দুহিতার স্নেহ কি মিষ্ট, তাহা দুহিতার পিতারা জানেন, সংসারের কষ্ট লঘু করিতে, এমন জিনিষ আর নাই। নলু বর্ব্বর, নলু মূর্খ কিন্তু নলু পিতা, সমধিক পরিমাণে নলু পিতৃত্ব উপলব্ধি করিয়াছে। রান্না করিয়া নলু বিজুলীকে খাওয়াইতে চেষ্টা করিল, বিজুলী খাইল না।

"তবে কি হয়েছে—মা বল, মা তোর চক্ষের জল. তোর কষ্ট দেখিলে বুক ফেটে যায়,—তোর কষ্ট দেখিতে হলে এ জীবন দিয়া কি দরকার? কি হয়েছে বল্।" জ্ঞাতি ভাই ঝুমো বেদে পাশের বাড়ীতে; নলু বলিল "মা, আমি তাকে ডেকে আনি?" বিজুলী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বাবা কাউকে ডাকতে হবে না, আমি মরব, বাবা আমি তোমায় বলতে পারি না, কেমন বাধ বাধ লাগে, তুমি আমার কষ্ট দূর করতে পারবে না।"

"তুই বল্ তোর জন্য আমি সকলই করব,—তা তুই জানিস্ আমাকে তথাপি অবিশ্বাস করিস্ কেন?"

"তবে বলি, আমার কথা তুমি রাখতে পারবে না জানি, তবু বলি, ওই কায়স্থ পাড়ার শশী বাবু, একটি ছেলে, তুমি দেখেছ—"

"দেখেছি। সে তোমায় কটু বলেছে, তা হো'ক ভদ্রলোক—আমি তাকে দেখাব।"

"না বাবা, আমার সহিত তার বে দিয়ে দেও।"

একি আবদার! নলু হতবুদ্ধি হ'য়ে দাঁড়াল, বিজুলী ক্ষেপেছে নাকি? ভদ্র কায়স্থের ছেলে, তাহারা বড় মানুষ, নলু কি বল্‌বে? ভাত বেড়ে নলু সারা রাত্রি মেয়েকে তোষামোদ করিল, মেয়ে খাইল না। সেও খাইল না।

আমাদের কি কখন দুরাশা হয় না? যখন চা'র ঘোড়ার গাড়ী জুড়িয়া মহারাজা তুরুকসোয়ার সঙ্গে করিয়া সেলাম পাইতে পাইতে যান, তখন

কি মনে হয় না "হায় যদি মহারাজা হইতাম।" যখন কোন গবাক্ষ হইতে সতৃষ্ণ সুন্দর দুইটি চক্ষু, পদ্ম ফুলের মত একখানি মুখ ও চূর্ণ কুন্তল প্রক্ষেপে কপোলে গোলাপী প্রভা ফুটিয়া উঠে, তখন সেই লাবণ্যময়ীর মূর্ত্তি দেখিয়া কি অতি গোপনে মনে হয় না, "আমি যাহার পাণি পীড়ন করিয়াছি তিনি যদি এরূপ সুন্দরী হইতেন।" যখন কোন ধর্ম্মবীরের ইতিহাস পাঠ করি, সংসারের জ্বালা যন্ত্রণার ঊর্দ্ধে প্রেমের নিজ নিকেতনে দাঁড়াইয়া মহাপুরুষ কিরূপে জীবের দুঃখের অমূল্য ঔষধ স্বরূপ উপদেশ দিতেছেন প্রত্যক্ষ করি, তখন কি মনে হয় না 'হায়! যদি চৈতন্য, বুদ্ধ কি খ্রীষ্ট হইতাম।" অর্জ্জুনের গাণ্ডীব, বাল্মীকির কবিত্ব, নারদের বীণা, কি স্বপ্নেও পাইবার আশা আমাদের হয় না? হয়—মন অমনি নিজের প্রতি উপহাস করে—বাবধান মনে করিয়া।

কিন্তু যে বিধাতা উঁহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি আমাদিগকে সৃষ্টি করেন নাই, তাঁহারা যা পাইয়াছেন, আমরা কি চাহিলে পাই না? বিশ্বাসে ও তপস্যায় সকলই পাওয়া যায়। ওই দেখ প্রকৃতির ক্রোড়ে বৃক্ষটি, মার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর, নিরবলম্ব বিশ্বাস; উহাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না, ধূলি হইতে ইন্দ্রধনুর যাবতীয় বর্ণ একত্র করিয়া মা তাহাকে ফুল দিতেছেন, স্বর্গের সৌরভ দিয়া ফুলগুলি বিবৃত করিতেছেন, ক্ষুধা তৃষ্ণাহর ফল দিতেছেন। যোগিগণ এক স্থানে আসন করিয়া এই ভাবে সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন, কাম্য বস্তু তাঁহাদের খুঁজিয়া আনিতে হয় না, তাহা আপনা হইতে তাতে আসিয়া পৌঁছে। আমরা সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সে ভাবে চাহিতে জানি না। বেদে বালিকা কি অসম্ভব আশা করিতেছে? প্রেমের নিকট সম্ভব অসম্ভব কিছুই নাই, প্রেম অতি দূরকে অতি নিকট করে, সূর্য্যকে পদ্মের অঙ্কে আনিয়া দেয়। শশী কায়স্থ—বড় লোকের ছেলে, সে বেদের মেয়ে, সমাজে ইহা হইতে দুরত্ব আর কি হইতে পারে?

কিন্তু বেদে বালিকা মনে মনে প্রাণ সঁপিয়া যেন বুঝিয়াছে, তাহাকে ছাড়া সে বাঁচিবে না। এক দিনে লোক এমি হয়, ইহা অবিশ্বাস্য নহে। প্রেম বৈজ্ঞানিক ক্রিয়ার মত ধীরে ধীরে জন্মে না, বাজিকরের ভেল্কির মত এক মুহূর্ত্তে হয়। গয়ায় পিণ্ড দিতে যাইয়া মহাপ্রভুর প্রথম প্রেম হইয়াছিল, সেই দিনই তিনি ভাসিয়া গিয়াছিলেন। এ বেদে বালিকার মনেও সহসা একটি প্রেমের প্লাবন আসিয়াছে ও সে তৃণের মত তাহার মুখে ভাসিয়া চলিয়াছে।

এস আরাধনার ধন! কত যুগ যুগ তোমার জন্য তপস্যা করিয়াছি, কত জন্ম জন্ম তোমার জন্য কাঁদিয়াছি, কত দিন রজনী প্রাণ ব্যাকুল ভাবে তোমাকে আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিতে চাহিয়াছে। নতুবা এক দিনে কি ইহা হয়? কত দৃশ্য দেখিয়া দেখিয়া চক্ষু ক্লান্ত, কত কথা ভাবিয়া ভাবিয়া মন ব্যাকুল, আজ প্রথম দর্শনে কেন চক্ষু নিশ্চল হইয়া বলিল,—"আর কিছু দেখিতে চাই না।" প্রথম দিন পাইয়াই কেন প্রাণ বলিল—"আমি যাহা খুঁজিয়াছি, পাইয়াছি।" বেদে বালিকা অজ্ঞাতসারে জীবনটি কাব্যকথার ন্যায় এক অপূর্ব্ব প্রেমের পথে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছে—সে শশীর দুইটি স্থির কৌমারোজ্জ্বল চক্ষু-তারকায় বিশ্বের সমস্ত শাস্ত্রের পাঠ অধ্যয়ন করিয়া লইয়াছে; কালিদাস তুমি যাও, এ বালিকাকে তুমি আর কি শিখাইবে?

৭

পর দিন বেলা ১০টা অবধি বালিকা কিছুই খায় নাই, প্রায় ২৪ ঘণ্টা চলিয়া গিয়াছে, বালিকা বিছানা হইতে উঠে নাই। মৃত্যুর নিকট অঙ্গীকারবদ্ধা বিরহবিধুরা বালিকা বিছানায় অবলুণ্ঠিতা হইয়া পড়িয়া আছে। স্নেহময় পিতার উৎকণ্ঠিত চক্ষু দেখিয়া সে আজ অভ্যস্তরূপ ত্রাস্তভাবে উঠিয়া পড়িতেছে না—আজ—

"অতি ক্ষীণ তনু জনু কাঞ্চন রেহা।
চেতন মুরছন বুঝই না পারি।"

নলু দেখিল অনাহারে ও নৈরাশ্যে বালিকা মরিতে বসিযাছে। নলু আর কিছু ভাবিতে পারিল না, এখন আর তাহার ভাবিবার কিছু নাই; মেয়ে না বাঁচিলে, জীবনের হিসাব পত্র লইয়া, কায়স্থ ও বেদের সামাজিক খাতা পত্র খুঁজিয়া পরস্পরের তারতম্য উপলব্ধি করিয়া সে কি করিবে? মেয়েকে দেখিয়া দেখিয়া সে মেয়ের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া গিয়াছে, তাহার মনে একটা সংকল্প জাগিয়াছে। সে এবার স্নেহসূচক কাতর অনুনয় ছাড়িয়া বিজুলীর নিকট দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ পুরুষের ন্যায় উপস্থিত হইয়া বলিল,—"মা, উঠ খাও, তুমি যাহা চাও আমি দেবো, তোমার সঙ্গে যেরূপে হয় শশীর বে' হইবে।"

৮

কথিত আছে, চৈতন্য দেব প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় এক ধোপাকে স্পর্শ করিয়াছিলেন, ধোপা সেই স্পর্শে কাপড় কাচা ছাড়িয়া নিজেও প্রেমোন্মত্ত হইয়া নাচিতে আরম্ভ করিল; প্রেমের ন্যায় সংক্রামক ব্যাধি আর নাই। শশী কি রাত্রে ঘুমাইতে পারিয়াছে? বেদে বালিকা কখনও পরী সাজিয়া তাহাকে মেঘে মেঘে লইয়া গিয়াছে; কখনও দেবী সাজিয়া তাহাকে স্বর্গে তুলিয়াছে। শরীরে শরীরে স্পর্শ হয়, কিন্তু এ যে অশরীরি স্পর্শ, চক্ষের দৃষ্টিতে দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অমৃত প্রবাহিত হয়, শশী সারারাত্রি বিজুলীকে দেখিয়াছে,—স্বপ্ন নহে এ যেন বাস্তব অনুভূতি, চাক্ষুষ মিলন।

শশীকুমার বসু নারায়ণগঞ্জে তাঁহার মাতুলালয়ে প্রতিপালিত, সে পিতৃ মাতৃহীন, তাহার মাতুল কালীনাথ রায় তথাকার জনৈক বড় জমিদারের নায়েব; বেশ সঙ্গতিপন্ন অবস্থা নায়েব মহাশয় নিঃসন্তান; শশী আশৈশব মাতুল এবং মাতুলানীর নিকট পিতা মাতার স্নেহ পাইয়াছে, সে ইংরাজী বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে; পড়া শুনায় ভাল। পর দিন শশী যথা সময়ে স্কুলে গেল না, পূর্ব্ব দিনের মত দেরী করিল; ১২টা বাজে বাজে, শশী উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে বেদের বাড়ীর নিকট দিয়া যাইতেছে, তাহার কল্পনায় মূর্ত্তিখানি সহসা জীবন্ত হইয়া উঠিল, শশী দেখিল বিজুলীর মুখখানিতে বিষাদব্যঞ্জক প্রীতি, সেই পরিক্লিষ্ট মাধুরী তাহার নিকট বড় মিষ্ট বোধ হইল। বিজুলী আজও হাসিয়া ডাকিল, 'এস'। বালক মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তখনি বেদের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

বিজুলী বলিল "আজ খানিকক্ষণ ব'স, একটি পান খাও", শশী কম্পিত হস্তে পানটি লইতে উহা মাটিতে পড়িয়া গেল,—বিজুলী বলিল, "আর একটি এনে দেই," শশী বলিল, "তোমার হাতের পান ফেলতে পারি না," বলিয়া ধূলি মুছিয়া পানটি লইল। তাহার বড় সাধ হইল বিজুলীকে বাহু দ্বারা জড়াইয়া ধরে, একবার তৃষিত অধরে একটি চুম্বন অঙ্কিত করে, কিন্তু ভরসা করিয়া সে এত দূর অগ্রসর হইতে পারিল না; নবযৌবনের প্রেম এমন সুন্দর, এমন ভীরু, এবং নিরাশাময় এমন অসম সাহসী আর কিছুই নহে। বালক সেই স্থানটীতে বসিয়া বিজুলীর মুখখানি দেখিয়া জীবন কাটাইয়া দিতে পারিত, কিন্তু সে তথাপি ছুটিয়া যাইতে ব্যস্ত হইল; কি যেন তাহাকে তথা হইতে তাড়াইয়া লইতে লাগিল। যেন অনির্দ্দিষ্ট কিছু তাহাকে সুখের স্বর্গ হইতে অতি কঠোর স্কুল গৃহে ছুটিয়া যাইতে বাধ্য করিল। ইহা কি ভয় না লজ্জা? কি তাহা নব প্রেমিকগণ জানে, যাহাকে পাইলে হৃদয়ের সমস্ত ব্যথা যায়,—তাহার কথা উঠিলে চোরের মত বলিতে হয়, "না আমি উহাকে চাই না।" বিদেশগত শিশু মার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরে, কিন্তু কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলে "মার জন্য প্রাণ পোড়ে না।" মৌন প্রেম নিজের সর্ব্বস্ব সুখ জলাঞ্জলী দিয়া কি একটা লজ্জার খাতিরে ব্যক্তিত্বের পার্শ্ব হইতে চলিয়া যায়, নিজের হৃদয় ছিঁড়িয়া যায়, তবু লজ্জার সম্মান রাখে। বালিকার সান্নিধ্যে বসিয়া সে সুখ স্বপ্ন দেখিতেছিল, যেন সে অমৃত হ্রদের তীরে বসিয়া স্বর্গীয় সুখপূর্ণ বায়ু হিল্লোলে পরিতৃপ্ত হইতেছে, তবুও শশী থাকিতে পারিল না। একবার মাত্র মনে হইয়াছিল যেন বিজুলীর অঁচলখানির পরিশীলনকোমল বায়ু তাহার শরীর ছুঁইল, ভাবিতে

তাহার চিত্তে একটা যুগ উলটিয়া গেল। শশী পানটি খাইয়া স্কুলাভিমুখে ছুটিল, পানটি নলুর হাতের সাজা।

সতৃষ্ণ, একান্ত বিহ্বল দৃষ্টিতে বিজুলী পথের পানে চাহিয়া রহিল, তাহার বিদ্যাপতি পড়া থাকিলে সে বলিতে পারিত :—

"সই ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘমালা সঙ্গে তড়িত লতাজনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল"।

৯

স্কুলে যাইতেই নরেন মাষ্টার উগ্র হইয়া তাহাকে বেঞ্চার উপর দাঁড়া হওয়ার হুকুম দিলেন ; পূর্ব্বের দিন বিলম্ব হওয়াতে সে নীচে দাঁড়াইবার শাস্তি পাইয়াছিল। শশী এ শাস্তি বড় একটা গ্রাহ্য করিল না। প্রেমের জন্য কত লোক প্রাণ দিয়াছে। ইতিহাস ও কাব্য খুঁজিয়া সে তাহার দৃষ্টান্ত সংকলন করে নাই, তথাপি তাহার মনে হইল এ দণ্ড অতি অকিঞ্চিৎকর। সে বেঞ্চীর উপর দাঁড়াইয়া নন্দন কাননের সুখ স্বপ্ন দেখিতে লাগিল।



নারায়ণগঞ্জ।

সহসা শশী মনে করিল, সে আর দাঁড়াইতে পারিতেছে না, একজন ছাত্র তাহার গায় হাত দিয়া দেখিল, তাহার বেশ জ্বর হইয়াছে। স্বয়ং নরেন মাষ্টার বেত হাতে তাঁহার কপাল পরীক্ষা করিয়া বলিলেন —"বেশ জ্বর হইয়াছে। তুমি ব'স। তোমার বাড়ীতে খপর দি।" কিন্তু বসিতে বসিতে শশী বসিতে পারিল না, বেঞ্চের উপর ঢলিয়া পড়িল। হেড মাষ্টার শ্রীশ বাবুর বাক্সে একটি তাপমান যন্ত্র ছিল, তাহার উত্তাপ লওয়া হইল, কি ভয়ানক জ্বর, ১০৫°৪'। শশী ১৫ মিনিটের মধ্যে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। পাল্কীতে তাহাকে বাড়ী পাঠাইয়া কালী-নাথ বাবুকে আপিসে খপর পাঠান হইল, তিনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিলেন। নারায়ণগঞ্জের সিভিল সার্জ্জনকে আনা হইল। তিনি বলিলেন "টাইফয়েড জ্বর।"

১০

নারায়ণগঞ্জের সম্মুখে শীতললক্ষ্যা নদী; শীতললক্ষ্যা সমুদ্রের একটি স্বল্পায়তন প্রতিবিম্ব ; নৌকা লইয়া কতক দূরে গেলে "দূরাদয় শ্চক্র নিভস্তন্বী" শ্লোকটি মনে পড়িবে ; মেঘনা ব্রহ্মপুত্র ও ধলেশ্বরী এই তিন প্রবাহ মিলিত হইয়াছে, এই তিন প্রবাহের জল কোথাও গভীর কৃষ্ণ, কোথায় দপ্তরীর কাটা খাতার পাতার ন্যায় ধব ধবে শাদা, বাতাসে উড়িয়া উড়িয়া খেলা করিতেছে। এই মিশ্রবর্ণ সলিল রাশি দেখিলে "ক্বচিত্ প্রভা লেপিভিরিন্দ্রনীলৈ." প্রভৃতি শ্লোক মনে পড়িবে। এই নদীর তীরে সহরখানি বেশ সুন্দর, ছোট ছোট দালানগুলি, পাশে ছোট ছোট খড়ের ঘর, যেন ধনী সহোদরের পাশে দীন দরিদ্র ভ্রাতা। পাটের কলের অবিরত ধূম নিঃসরণ-শব্দে, এবং রেলের গাড়ীর গতিতে যেন ক্ষুদ্র সহরটি কাঁপিতেছে। নদীর তীরে, এই সহরটি যেন একটি চিত্র লেখা। কোন চিত্রকর আঁকিয়া যেন সূর্য্যের সম্মুখে শুকাইতে রাখিয়াছে। বড় বড় সুপারি গাছ যেন সূর্য্যকিরণে ঝলসিতেছে, ছোট ছোট গুল্ম লতাও সে কিরণ হইতে বঞ্চিত নহে। রৌদ্র বড় বড় বৃক্ষের ললাটে উজ্জ্বল হীরকের ন্যায় এবং ক্ষুদ্র গুল্মের পত্রলীন শুভ্র ফুল খণ্ড মুক্তার ন্যায় শোভা পাইতেছে।

আজ বৈকালে নদীর-অপর পার হইতে একখানি কাল মেঘ ধীরে ধীরে আসিয়া আকাশ ছাইয়া ফেলিল। শীতললক্ষ্যার জল গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া পড়িল এবং সন্ধ্যা না হইতে হইতেই ভয়ানক দুর্যোগ আরম্ভ হইল, দোকানীরা দোকান বন্ধ করিল। প্রবলবৃষ্টি ও বায়ুর তেজে সহরখানি ভিজিয়া ভিজিয়া স্খলিতঅঞ্চলা, সিক্তশরীরা সুন্দরীর মত এলোথেলো হইয়া কষ্টে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। প্রকৃতির পার্শে রক্ষিত ছবিখানি যেন আর শুকাইবার সুবিধা পাইল না।

রাত্রি চারিদণ্ডের পরে, এই নদীর তীরে, গভীর তমিস্রা ও জল প্রপাত ভেদ করিয়া চারি জন লোক একটি শব লইয়া চলিয়াছেন। নারায়ণগঞ্জের শ্মশান ঘাট অনেকটা দূরে, চারি জনের পশ্চাতে এক জন কাট লইয়া চলিয়াছে। পথে চলিতে অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। অতি ধীরে তাঁহারা চলিয়াছেন। বালক শশীর শব ; অহো বেদে বালিকার প্রেম কি ভয়ানক! যে সুখ টুকু পাইয়াছিলে, শশী আজ তার প্রায়শ্চিত্ত

করিলে। প্রকৃতি আমাদিগকে ইন্দ্রিয়াদি দিয়া খেলা করেন,—কি নিষ্ঠুর খেলা! দুষ্ট ছেলেটি যেরূপ প্রজাপতির পা বাঁধিয়া একটুকু উড়িতে দেয়, তারপর ছিঁড়িয়া ফেলে; যাহা দিয়াছ, মা প্রকৃতি সকলই ত ফিরিয়া লইবে, ফর্দ্দ দেখিয়া এ মৃৎ ভাণ্ডের প্রত্যেক অণু বুঝিয়া লইবে। আমাদিগকে তবে এত সুখের আশা দিয়া প্রমত্ত কর কেন? এই মেঘ বৃষ্টিতে বালক শশী শ্মশানে নীত হইতেছে, তাহার মাতুলানীর তীব্র চীৎকার ও কালীনাথ বাবুর অবস্থা আমরা চিত্রিত করিতে সাহসী হই নাই। মাতুলানীর ক্রোড় হইতে শশীকে কাড়িয়া আনিতে হইয়াছে। কালীনাথ বাবু "কি হইল"! বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছেন, সে মূর্চ্ছা তাহার তখনও ভাঙ্গে নাই।

আকাশে নিরবচ্ছিন্ন বজ্রের শব্দ,—বৃক্ষ ভাঙ্গার শব্দ ও শীতললক্ষ্যার প্রলয় আলোড়ন শব্দ—যেন করাল যমের অনুচরের মত বোধ হইতেছে। "ছেলেটাকে কি জ্বরেই ধর্‌ল! তা ভাই ও না যেয়ে যদি আমরা কেউ যেতুম, কালীনাথ বাবুর এত সম্পত্তি খাবে কে?"

"ভাই, আমার নিকট একখানি ছবির বই চেয়েছিল, যদি সে দিন দিতুম। তবে মনের কষ্ট একটু লঘু হইত।" অন্ধকারে বক্তার গণ্ডে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। এই ভাবের কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে তাঁহারা শ্মশান ঘাটে উপস্থিত হইলেন। একখানি ছোট টিনের ঘরে বসিবার স্থান, সেইখানে যাইয়া সকলে বসিলেন, একজন কেবল বাহিরে শব ছুঁইয়া রহিলেন। ঝড় ও বৃষ্টি আরও বাড়িল, টিনের ঘরের একটা চাল উড়াইয়া নেওয়ার মধ্যে। বৃষ্টি ও বিদ্যুত শ্মশান যাত্রিদিগকে অন্ধ ও বধির করিল। একটা বজ্র ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া নিকটে কোথায় পড়িল, বাহিরের লোকটি সংজ্ঞাহীনের মত খানিকটা শবের খাটুলির প্রান্ত ভাগ ছুঁইয়া বসিয়া রহিলেন। ২০।২৫ মিনিট কি ভাবে গেল বলা যায় না। তাঁহারা বিমূঢ়, চকিত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ঘরের কোণে ও বাহিরে কে কি ভাবে রহিলেন বলা যায় না। যখন ঝড় ও বৃষ্টির বেগ হ্রাস পাইল, তখন তাঁহারা ডাকাডাকি করিয়া পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। একজন কষ্ঠে আলো জ্বালাইবার চেষ্টায় অনেক-বার বিফল হইয়া শেষে সফল হইলেন, কিন্তু একি, খাটুলিতে শব নাই। তাঁহারা আলো লইয়া চারিদিকে খুঁজিলেন কোথায়ও নাই। শীতললক্ষ্যা অনেকটা দূরে, শব গড়াইয়া জলে পড়িল নাকি? ঝড়ে লইয়া গেলে খাটুলি শুদ্ধ যাইত; এ যেন দড়ি ছিঁড়িয়া লইয়া গিয়াছে। কতক্ষণ পরে ঝড় বৃষ্টি একবারে থামিয়া গেল। তাঁহারা সকলে মিলিয়া নিকটে দূরে খুঁজিতে লাগিলেন। এক এক স্থান বারংবার খুঁজিয়া আসিলেন খুঁজিতে খুঁজিতে শীতললক্ষ্যার তীরে উপস্থিত হইলেন। নক্ষত্রালোকে সেই বিশাল উত্তাল তরঙ্গসংকুল জলরাশির অস্পষ্ট অবয়বের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। "কোথায় গেল?" পরস্পরের মুখপানে বিস্ময় বিমূঢ় হইয়া পরস্পরে এই একই প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। একজন বলিলেন, "শেয়ালে নিয়াছে।"

"একটা শেয়ালে কি করে নেবে ভাই?"

"তুমি দেখতে পাওনি, দুটো তিনটে শেয়াল একত্র বড় কাঁটাল নিয়া যায়।"

অপর এক জন তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী ভদ্র লোকটিকে বলিলেন—

এ বড় আশ্চর্য্য, তুমি ধরে ছিলে তুমি টের পাওনি।"

"তখন ঝাপটা বাতাসে আমার যেন গলাধাক্কা দিতেছিল, আর একটা বজ্র আমার চখের সামনে পড়ে আমায় হতবুদ্ধি করে ফেলে, তখন আমার নিজের শরীরটা টেনে নিলেও বুঝতে পারতুম না।" এখন কি করা কর্ত্তব্য? এ কথায় প্রচার হওয়া ভাল নহে, লোকে তাদেরই



কালীনাথ বাবুর আত্মীয় চারি জন লোক শশীকে লইয়া যাইতেছেন। ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি, শীতললক্ষ্যা তাঁহাদের মনে স্থান পায় নাই। তাঁহারা কাঁদিতে কাঁদিতে চলিতেছেন। শ্মশান ঘাটে যাঁহারা শব লইয়া যাইতে অভ্যস্ত, তাহারা সচরাচর কেমন একটা প্রাণহীনতা দেখাইয়া থাকে; শবের পার্শ্বে বসিয়া তামাক খায়, কোন্ শবটা পুড়িতে কত সময় লাগিয়াছিল তাহার গল্প করে; মৃতের জন্য শ্রদ্ধা কিম্বা শোকের কোন লক্ষণই প্রকাশ করে না। একটি শব দেখিয়া বুদ্ধ সংসার ছাড়িয়াছিলেন, তাহারা কত শব পোড়াইয়াও একটি বার জীবনের নশ্বরত্ব ভাবিয়া গম্ভীর হয় না। কিন্তু আজ যাঁহারা শশীকে লইয়া চলিয়াছেন, শশী তাঁহাদের বড় আদরের ছেলে; ছোট গাছটি রোপণ করিয়া তাহার পত্র-বিকাশ দেখিতে রোপনকারীর কত সুখ! তাহার একটি কচি পাতা গরুতে খাইলে, তাহার হৃদয়ে লাগে। তাঁহারা শশীকে আঙ্গিনায় খেলা করিতে দেখিয়াছেন, হাতে খড়ি দিয়াছেন, পাঠশালায় যাইবার পথে কাপড় খসিয়া পড়িলে কাপড় পরাইয়া দিয়াছেন। সেই শশীর এই হঠাৎ শোচনীয় মৃত্যু! তাঁহারা এই নিদারুণ শোকে বিহ্বল হইয়া যেন মৃত্যুর অবয়ব দেখিতে পাইয়াছেন;—ধাবীর কাস্তের মত, যাহাতে ছোটটি বড়টি এক সঙ্গে কাটে, যাহা করুণার বক্ষে পদাঘাত করিয়া স্তন্যপায়ী শিশুকে মায় বক্ষ হইতে কাড়িয়া নেয়, যাহা নিয়ত পৃথিবীর কুসুমোদ্যান নষ্ট করে, সেই মৃত্যুর চিত্র আজ তাঁহারা কাঁদিয়া দেখিতে পাইয়াছেন

দোষ দিবে, আর কালী বাবু ও তাঁহার স্ত্রী এই শোকের সময় এ কথা শুনিলে মর্ম্মভেদী বেদনা পাইবেন। একজন বলিলেন, "কাটগুলি লইয়া এসেছি, সেগুলি জ্বালাইয়া যাই, আর এ কথা কাউকে জানান হবে না।"

তখন ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে শীতললক্ষ্যার তীরে তাঁহারা বহুকষ্টে ভিজা কাটগুলি জ্বালাইয়া একটা চিতা প্রস্তুত করিলেন। শ্মশানে এই বাঙ্গ চিতা ধীরে ধীরে এক নিবিড় প্রকাণ্ড ধূম্রমণ্ডলীর সৃষ্টি করিয়া জ্বলিতে



লাগিল; বহ্নি দব সিক্ত কাঠগুলির মধ্যে শোলেমানকর্ত্তৃক সিন্দুকে আবদ্ধ দৈত্যের ন্যায় অতি কষ্টে জীবিত রহিলেন।

বহুক্ষণ ধরিয়া কাঠগুলি পুড়িল, শ্মশানে যাত্রিগণ শীতললক্ষ্যার জলে স্নান করিয়া যখন গৃহে ফিরিলেন, তখন শীতললক্ষ্যার জলরাশির পূর্ব্ব সীমান্ত হইতে এক অত্যুজ্জ্বল আলোকবিমণ্ডিত গোলক উঠিয়া ঊষার সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রাতঃকালের স্নিগ্ধ মধুর বায়ু তাঁহাদের দেহ স্পর্শ করিতেছিল, তাঁহারা সকলেই বিমর্ষভাবে ভাবিতেছিলেন, "শশীর শব কি হইল?"

১০

পদ্মা নদীতে কতকগুলি নৌকা চলে, তাহাদিগকে "ছান্দির নৌকা" বলে; সে গুলি ষ্টীমারের ন্যায় পদ্মার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে দাঁড়ায় না, পদ্মার পাকে যখন ষ্টীমার পড়ে, তখন ঝড় ও তরঙ্গ ভীষণ রবে আক্রমণ করিয়া ষ্টীমার খানিকে ঘিরিয়া ফেলে; ষ্টীমারও ফোঁস ফোঁস করিয়া যথাসাধ্য আত্মরক্ষা করে। কিন্তু "ছান্দির নৌকা" গুলি সেরূপ প্রতিদ্বন্দ্বীতার জন্য প্রস্তুত হয় না, তাহারা যেন পদ্মার নিজ সন্ততিবর্গ,—পদ্মাকে 'মা, বলিয়া যেন তদঙ্কে আশ্রয় পাইয়াছে। পদ্মা যখন অতি প্রবলবেগে তট বিপ্লাবী উর্ম্মি লইয়া গর্জ্জিতে থাকে, তখনও যেন এক খানি বরাভয় প্রদায়ী হস্ত বিস্তার করিয়া "ছান্দির নৌকা" গুলিকে রক্ষা করে। জল রাশির আলোড়নের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া ফিরিয়া "ছান্দির নৌকা" উপরে ভাসে, তড়িৎএর মত উর্ম্মির মধ্যে উড়িতে উড়িতে ভাসিয়া যায়। বাঘিনী যেমন শাবকটি ক্রোড়ে রাখিয়া যুদ্ধ করে, উত্তাল পদ্মাও তদ্রূপ বক্ষে ছাঁদির নৌকা গুলিকে আশ্রয় দিয়া বিক্রম প্রকাশ করে, এই ছান্দির নৌকা গুলি শীতললক্ষ্যায় মধ্যে মধ্যে দেখা যায়।

শীতললক্ষ্যায় ছান্দির নৌকা গুলির সঙ্গে বেদের নৌকা গুলিও তুল্যরূপ নিরাপদ ও স্বচ্ছন্দ ক্রীড়াশীল দৃষ্ট হয়; বেদের নৌকা গুলি দীর্ঘ, যেন ক্ষুদ্র একটি পল্লীর স্বল্পায়তন প্রতিকৃতি; ছান্দির নৌকার মত ইহারাও জলের ভাবে ভাবে বহিয়া যায, বিরোধ করিয়া জয়ী হইতে চায় না; পৈঁরেকের পরিবর্ত্তে বেদের নৌকা গুলি মাঝে মাঝে বেত দিয়া আঁটা, সুতরাং জলের বেগে কতকটা ডুবিয়া গেলেও আবার ভাসিয়া উঠে।

এইরূপ একখানি দীর্ঘাকৃতি নৌকা সেইরাত্রে শীতললক্ষ্যায় বহিয়া চলিয়াছে। তখন ঝড় থামিয়া গিয়াছে, কয়েকজন বেদে দ্রুত বেগে দাঁড় টানিয়া চলিয়াছে। শশী চক্ষু মেলিয়া কিছু বুঝিতে পারিল না, সে ভাব গুলি ভাল করিয়া মনে করিতে পারিল না; বিজুলি চীৎকার করিয়া বলিল "বাবা, চক্ষু মেলিয়াছে।" নলু নিকটে আসিয়া শশীকে দেখিল; বলিল "এখুনি ভাল হবে, তুমি এই *প্রলেপটি বারে বারে মাথায় দেও।"* ক্রমে শশী অনেকটা ভাল হইল, তখন তরঙ্গের অবিরাম স্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল, এবং পার্শ্বে এলো চুলে বেদে বালিকাকে দেখিয়া সে কিছু বুঝিতে পারিল না। একটা ক্ষুদ্র কেরোসিনের ল্যাম্প মিট মিট করিয়া জ্বলিতে ছিল, সে তাহার আলোকে বিজুলীর মূর্ত্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইল—সে যেন কতদিনের জীর্ণজ্বরে শুকাইয়া গিয়াছে।

তাহার চুলে ফুল নাই, মলিন বাস পরিহিতা কাতর দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতেছে, সেই দৃষ্টিতে যেন মাতা, ভগ্নী, দাসী এসকলের স্নেহ জড়াইয়া আছে; শশীর মনে পড়িল তাহার ভয়ানক জ্বর হইয়াছে, তখন বোধ হইল এ সকল স্বপ্ন। মনে মনে বলিল স্বপ্ন তুই যাস্ না, তুই যদি সত্য হ'স্। বিজুলীর কি তার মত জ্বর হইয়াছে? সে এত শীর্ণ হইয়াছে কেন? জ্বরের কি ভীষণ কষ্ট, বিজুলী যেন তার মত জ্বরে কষ্ট না পায়, ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিল।

শশী কথা বলিতে চেষ্টা করিল, মুখে কথা ফুটিল না, মাথা উঠাইতে পারিতেছে না, তবুও মাথা উঠাইতে চাহিল, দেখিয়া বিজুলীর গণ্ড বহিয়া অশ্রু বিন্দু পড়িতে লাগিল।

প্রাতে শশী অনেকটা ভাল হইয়াছে, সে উঠিয়া বসিতে পারে। বিজুলীকে বলিল "আমায় কে কোথায় এনেছে? আমার মামী কোথায়? আমি তাদের কাছে যাব? তোমারও কি জ্বর হয়েছে, তোমায় কে ধরে এনেছে?" নলু শশীর নিকট আসিয়া তার হাত দুখানি ধরিয়া বলিতে লাগিল "শোন ছেলে, আমি তোমায় কয়েকটা কথা ব'লব। তোমার বড় জ্বর হয়েছিল, আমি মেয়েকে পান সাজিয়ে দিয়া ছিলাম, তাহাতে একরূপ বিষ ছিল, তাহা খাইলে জ্বর হইয়া মৃত্যুর সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। তোমাদের বড় বড় ডাক্তার এই অবস্থায় প্রাণ নাই বলিয়া শ্মশানে লইয়া যাইতে বলে, আমাদের বেদের ঔষধের গুণ বুঝিতে তাদের ঢের বাকী। তুমি সেই ঔষধ খেয়ে মড়ার মত হইয়াছিলে, তোমায় পোড়াইতে আনিয়াছিল তখন আমরা লয়ে এসেছি, অনেকটা জল পড়াতে তোমার শরীর এমনিই সুস্থ হইয়াছিল, আর কিছুকাল জলের মধ্যে থাকিলে তুমি হয়ত শ্মশান ঘাটেই উঠে বস্‌তে। তুমি অন্য ঔষধ খাওয়া

মাত্র তোমার বিষের দোষ সম্পূর্ণরূপে কাটিয়াছে। তুমি কয়েকটা দিন দুর্ব্বল থাকিবে এই মাত্র। যে দিন পান খাইয়াছিলে তার পর দিন অনেক রাত্রে তোমার মড়ার মত হইয়া পড়িবার কথ। যে সময়ই তোমাকে শ্মশানে লইয়া আসিত, আমরা যেরূপে হউক তোমাকে জোর করিয়া লইয়া যাইতাম। আমাদের সে জন্য সকল বন্দোবস্ত ঠিক ছিল। কিন্তু এ সকল বিষয়ে হিসাব ঠিক থাকে না, দিন থাকিতেই তোমার মড়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইল, ভাগ্যে ঝড় বৃষ্টি খুব হইল, তোমাকে লইয়া আসিতে অনেকটা দেরি হইল,—ঝড়, বৃষ্টি, অন্ধকার আমাদের সাহায্য করিল,—তোমাকে লইয়া আসিতে কেহ টের পায় নি। এত করেছি কেন? আমার মেয়ে তোমার জন্য পাগল, সে তোমাকে না পেলে প্রাণে মরিবে এরূপ স্থির করিয়া দু দিন না খেয়ে ছিল। যদি আমার মেয়েকে বে' ক'রে বেদে সেজে থাকতে স্বীকার কর, তবে আমার মৃত্যু হইলেও যদি তোমাদের উপকার হয়, তবে আমি মরিতে প্রস্তুত। তা না ক'রে যদি তুমি গোল কর, ফের বাড়ী যেতে চাও, তবে এখুনি লগুড় দিয়া তোমায় মাথা ভেঙ্গে জলে ফেলে দিব, তুমিত মরা মানুষ, তোমায় মারতে ভয় কি?" বিজলী বলিল "বাবা তুমি আর কঠোর কথা বল না, আমার জন্য ওঁর ঢের হয়েছে, এখন আমি এই জলে ডুবে মরলে ঠিক হয়।" বলিয়া বেদে বালিকা অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

প্রণয়ের একি বিষম সমস্যা? নন্দন বনের কুসুম চয়নে নিযুক্ত বালক অকস্মাৎ একি কঠোর জগতে আসিয়া পড়িল? এত দূর হয়েছে। বেদেরা তাকে মারিতে চক্রান্ত করিয়াছে? এখন তাহার বেদে সাজিতে হবে. মামী ও মামা তাকে না দেখে জীয়ন্তে মরা হইয়া থাকবেন, সেই বা তাঁহাদিগকে ছাড়া হইয়া কিরূপে থাকবে? তাহাকে মাটীতে মাদুর পাতিয়া শুইতে হইবে, কুখাদ্য খাইতে হইবে, অসভ্য পশুগুলিকে আপনার ভাবিতে হইবে, চিরসুহৃদগণের সঙ্গে সম্বন্ধ জলাঞ্জলী দিতে হইবে, পূতি গন্ধময় স্থানে একাও ঘৃণ্য জীবন বহন করিতে হইবে। বালক ভাবিল কি অন্যায়? মুহূর্ত্তের জন্য বিজলীকে তাহার রাক্ষসী বলিয়া বোধ হইল। কল্পনার কুসুম হার ছিঁড়িয়া গেল, ফুল দিয়া যেন শূল প্রস্তুত হইল। মরিয়া গিয়াছিলাম, আবার মরিব ভয় কি? সে এই উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু পরক্ষণে হঠাৎ তাহার মনে আর একটি চিন্তার উদয় হইল। সহসা বিপদ্‌পাতে বালক বৃদ্ধের ন্যায ভাবিতে শেখে,—যে চক্ষু চার দিকে চাহিয়া পরের দোষ খুঁজিয়াছে, তাহা হঠাৎ নিজের দিকে পড়ে, তখন নিজের অপরাধ প্রকাণ্ড অবয়ব ধারিয়া চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হয়—বালক ভাবিল "এই বেদের মেয়ের ঘরে আমি চোরের মত চুপে চুপে প্রবেশ করিয়াছিলাম কেন? তাহার দিকে তাকাইতে তাকাইতে রাস্তায় যাইতাম কেন? তাহাকে যে আমি ভালবাসি, একথা মুখে প্রকাশ করি নাই সত্য কিন্তু নানা ভঙ্গীতে বুঝাইয়াছিলাম কেন? এত ব্যগ্র হইয়া পান খাইতে গিয়াছিলাম কেন? এখন যাহাকে ভুলাইবার জন্য এতটা করিয়াছি সে যদি ভুলিয়া থাকে, তবে কি তাহার দোষ? তাহার জন্য ফাঁদ পাতিয়াছিলাম, সে ফাঁদে পা দিয়াছে একি তাহার দোষ? এখন মুগ্ধা হইয়া সে যদি আমা ভিন্ন আর কাহাকেও না চায়—সেত রমনীর প্রেমের ধর্ম্ম, আমি কি এখন তাঁকে মনে মনে ব্যভিচারিণী হইতে উপদেশ দিব? তবে আমার মনে মনে এত রাগ হইতেছে কেন? এ অপরিণামদর্শী কাজের জন্য আমার একটা ভয়ানক দণ্ড সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া? মেয়ে না খাইয়া মরিবে সন্তানবৎসল পিতা তজ্জন্য এই সকল কঠোর কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহাতে আমার রাগ করিবার কারণ কি? মুহূর্ত্তের অন্যায়-আচরণে লোকের ফাঁসি হয়, আর অল্পকাল ব্যাপক হইলেও আমার অন্যায়াচরণে একটি বালিকা মরিতে বসিয়াছিল, তজ্জন্য কে দায়ী? সে যে বেদে বালিকা, আমি যে ভদ্র সন্তান, ইহাত জানিতাম, আমার মন এবং চক্ষুকে ওপথে যাইতে প্রশ্রয় দিয়াছিলাম কেন? এখন শাস্তি হওয়া কাহার উচিত, আমার না উহার? আমার মামা মামী সহায় সম্পত্তি সমস্ত ছাড়িতে হইবে? আজ আমি অনাথ হব, তা কি করব, দোষ অন্য কাহারও নহে।

এই ভাবটী ঠিক আমাদের লেখার শৃঙ্খলায় না হইলেও বালকের মনে অসম্বদ্ধ ভাবে উদয় হইয়াছিল। যাহা প্রেম বলিয়া সে আলিঙ্গন করিতে চাহিয়াছিল, তাহা যেন একটি কঠোর কর্ত্তব্যের আকার ধারণ করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে যাহার পল্লবে পল্লবে সুগন্ধ ও সৌন্দর্য্য পাইয়াছিল এখন যেন তাহাতে সে শাণিত ছুরি দেখিতে লাগিল, কিন্তু তথাপি এই কঠোর কর্ত্তব্য তাহাকে আলিঙ্গন করিতে হইবে,—তাহার সম্মুখে অন্য পন্থা নাই। এখন সে কোমল সুখ উপভোগ চাহে না, আত্ম তৃপ্তির জন্য তাহাকে এই পথ অবলম্বন করিতে হইবে। বিবেকের তাড়না এই প্রকার, বিবেক যখন বলিবে তুমি মর, তখন বুকে ছুরি বিঁধিলেও লোক হাসিয়া মরে। পৃথিবীতে বিবেকের তাড়নার ন্যায় তাড়না এমন সম্পূর্ণ চিত্ত শোধক দণ্ড আর নাই। মামা, মামীর কথা সে ভাবিল, "যদি আমি কাউকে খুন করে ফাঁসি যেতেম, তবে তোমরা আমায় রাখতে পারতে না।"

কম্প্র, বিঘূর্ণিত মস্তকে প্রণয়ের কোমল কথা কর্ত্তব্যের কঠোর আদর্শ পরিণত করিয়া সে একবার বিজুলীর মুখের পানে চাহিল—দেখিল একটি নিরাশা-কঠিন, প্রেম কোমল, একান্ত নির্ভীক হৃদয় ভীরুর ন্যায তাহার উত্তরের প্রতীক্ষায় প্রাণান্ত আগ্রহে যেন দুরু দুরু কাঁপিতেছে এ উত্তরে তাহারও যেন বাঁচিবার, মরিবার সমস্যা স্থির হইবে। তাহার মুখখানিতে নৈরাশ্য ও আকুল আত্মোৎসর্গ এক উজ্জ্বল প্রতিভা দান করিয়াছিল। "পদ্মে দিক্ষেব পদ্মিনী বিভাতি ন বিভাতি চ" সেই বালিকা আধ উজ্জ্বল ও আধ লীন অবস্থায় যেন মরিতে মরিতে বাঁচিতেছিল ও বাঁচিতে বাঁচিতে মরিতেছিল।

১১

আট বৎসর চলিয়া গিয়াছে। শশীর কথা সকলে ভুলিয়া গিয়াছে, কেবল তাহার মামী ভোলেন নাই, কেবল তাহার মামা মধ্যে মধ্যে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া এখনও হৃদয়ের ভার হ্রাস করেন।

আট বৎসরে অনেক পরিবর্ত্তন হয়; যে ময়দানে শিশুগণ খেলা করিত, কম বাড়ন্ত সাংসারিক হিসাবে তাহা আর খেলিবার জন্য পড়িয়া থাকে না, হয়ত তাহার উপর খড়ের ঘর উঠিয়াছে, না হয় রবিকরোজ্জ্বল ধান্যশীষ স্বর্ণের মত তাহার উপর ঝলসিতেছে। মৃত বন্ধুর সমাধির ন্যায় সেই স্থানের এই রূপান্তর দেখিলে কষ্ট হয়।

আট বৎসর চলিয়া গিয়াছে, ২৩,২৪ বৎসর বয়স্ক একটি বেদে নারায়ণগঞ্জে শীতলক্ষ্যার তীরপথে চলিয়াছে, তাহার কোকড়ান চুল স্কন্ধের উপর ঝাঁপিয়া পড়িয়াছে। তাহার কাণে দুইটী পিত্তলের কড়া ও গলায় রূপার কণ্ঠী, সুকুমার মুখখানিতে কঠোর জীবনের বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে, তাহার এক হাতে কতকগুলি পট ও আর এক হাতে একখানি লাঠী।

বেদে যুবক নিতান্ত অন্যমনস্ক, সহসা মাটীর জীব স্বর্গ দেখিলে যেরূপ মুগ্ধ হয়, নারায়ণগঞ্জ দেখিয়া যেন বেদে ঠিক সেই রকম যাদুগ্রস্ত হইয়াছে। একটা স্কুল ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল—সহসা একটা দেবদারু বৃক্ষ দেখিয়া যেন সে চমকিয়া উঠিল, যেন তার পত্রে পত্রে কত কি লেখা রহিয়াছে। একটা তৃণাচ্ছাদিত মঠ দেখিয়া সে খানিকটা বসিল, যেন কোন পূর্ব্ব জন্মের স্বপ্ন তাহাকে ভুলাইয়া ফেলিল। বেদে যেন "রম্যানি বীক্ষ মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান" প্রভৃতি শ্লোকটি আদায় করিয়া মূর্ত্তিমান ভাবুক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পথ পার্শ্বে একটা হিজল গাছ ছিল, তাহার গোটাকতক ফুল গাছে ঝুলিতেছিল, হিজলের ফুলগুলি একত্র হইয়া এক একটা পীতবর্ণ মালার ন্যায় দেখায়; গাছটি



দেখিয়া বেদের চক্ষে অশ্রুকণা দেখা দিল তাহার মনে হইল সেই গাছের এক একটি ফুল তাহার প্রাণ তুল্য প্রিয়, ওগো তোমরা যে বড় বড় ঐতিহাসিক মনুমেণ্ট উঠাও, তাহা হইতে যে আমার শৈশবের খেলার গাছটি আমার নিকট অধিক মূল্যবান তত্ত্ব প্রচার করে। বিদেশে যখন হতাশ্বাস হইয়া হইয়া রোগের শয্যায় নৈরাশ্যের ঘোরে হাবুডুবু খাই, তখন সেই শৈশবের আরোহণমঞ্চ হিজলের শাখাটি মনে পড়িলে আমার প্রাণ জুড়াইয়া যায়,—একটি পল্লী পুকুরের চিত্র ঠিক আয়নার মত, তাহার কোণে শৈবালের আচ্ছাদন—যেন আয়নার একটি জায়গার পারা উঠিয়া গিয়াছে, সেই পল্লীসরঃ কাবেরী কি গঙ্গার ন্যায় আমার নিকট পবিত্র বোধ হয়। স্বীয় জন্ম স্থান কত ভাল লাগে, তাহা প্রবাসী ভিন্ন কে বুঝিবে? বৃক্ষপরিবৃত ক্ষুদ্র পল্লীটি মায়ের মুখের মত, ভাবিতে প্রাণ জুড়াইয়া যায়। কিন্তু বিদেশীর ফিরিবার আশা ও শক্তি আছে; যাহার তাহা নাই, যে স্বগৃহে স্বগ্রামে প্রবেশ করিতে শক্তি রহিত, তাহার চক্ষে বাল্য কালের ক্রীড়া ভূমি স্বর্গের ন্যায়; ইডেন-উদ্যান-তাড়িত এডাম যেরূপ সকাতর নৈরাশ্যের সহিত তাহার স্বর্গীয় আভাস ভূমি ছাড়িয়া যাইবার কালে দেখিতে দেখিতে কাঁদিয়াছিল; হাতের শাখা ভাঙ্গিয়া যেরূপ বঙ্গীয় রমণী স্বামীর গৃহে অবলম্বনাভাবে অশ্রুসিক্ত দৃষ্টিতে ফিরিয়া ফিরিয়া সেই গৃহ দেখে ও ছাড়িয়া যায়, যে ব্যক্তি নিজের বাড়ীতে প্রবেশাধিকারে বঞ্চিত হইয়া তাহা দেখিয়া যায়, তাহার সেইরূপ কষ্ট, অহো, তাহার কি কষ্ট! বেদে যুবার মনের ভাব আমরা বুঝাইতে পারিলাম না, সে যেন ভাবিতেছে পৃথিবীতে এমন একটি আঙ্গিনা আছে, মরিতে হইলে যেন সেই আঙ্গিনায় নারায়ণ বলিয়া তনুত্যাগ করিতে হয়, এজন্মে তাহা হইবে না। আমি গঙ্গাতীর চাহি না; যেথানে জন্মেছি, যেথানে মা বাপ মরেছেন সেখানে যেন মরিতে পাই, হায় তাহা ভাগ্যে ঘটিবে না।

ক্রমে বেদে যুবক লোকালয়ের নিকট আসিল; দূর হইতে একটি গৃহের ঊর্দ্ধে সমুত্থিত বৃক্ষরাজির শীর্ষ সে দেখিতে পাইল; তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল,—সে যে স্বর্গ, সে যে তাহা হইতে চিরবঞ্চিত, সেই বৃক্ষগুলি দেখিতে দেখিতে তাহার পা আর চলে না, অতিশয় শোকভরে সে দুর্ম্মনা হইয়া পড়িল, বেদে যুবার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে—কি যেন কত কি মনে পড়িয়াছে: সে কোথায় যাইবে? যেখানে তাহার প্রকৃত স্থান, অথচ তাহার স্থান নাই, সে আর তথায় কিরূপে যাইবে? পা ভাঙ্গিয়া পড়ে। ধীরে ধীরে চোরের মত সে বাহির বাটীতে আসিয়া দাঁড়াইল। "পট নাচাবে গো" একবার অতি অস্ফুট স্বরে এই অভ্যস্ত ডাক তাহার মুখ হইতে বাহির হইল। পট নাচানো বেদেদের পুরুষ এক কাজ ছিল। পুরাঙ্গনাদিগের নিকট পৌরাণিক চিত্রাবলী দেখাইয়া গান গাহিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়া দুপয়সা উপার্জ্জন করিত। বাহির বাটিতে একজন চাকর তামাক খাইতেছিল। সে বলিল "বাবু এখন আপিসে, এখন কে পট নাচাবে?" কিন্তু বেদে যুবক সে কথায় কর্ণপাত করে নাই। তাহার কর্ণে সে কথা পৌছে নাই। মন্ত্র-মোহিত, অলস লুলিত ও মুগ্ধ ভাবে প্রতি বৃক্ষ, প্রতি স্থান স্নেহের সহিত দেখিতে দেখিতে সে একবারে বাটীর ভিতরে যাইয়া পড়িল। চাকরটা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বকিতে বকিতে পেছনে গিয়াছে। কালীনাথ বাবুর স্ত্রী গোল শুনিয়া বাহির হইলেন, দেখিলেন পট হস্তে এক বেদে যুবক। দেখামাত্র তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া মাটিতে পড়িলেন। একি হইল? পাড়া-পরশীগণ আসিল, মামী বলিতে লাগিলেন, 'এ ত তেমি চেহারা, বাছা এত কালো ছিল না। বাছা এর চেয়ে সুন্দর ছিল, এর চেয়ে অল্প বয়স ছিল—সহসা "মামী গো—মা গো—বেদে ছেলেকে কোলে কর" বলিয়া পট ফেলিয়া যুবক মামীর কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিল। আমি মরি নাই। আমি তোদের নিকট মরিয়াছি। মরা ছেলেকে—বেদে ছেলেকে একবার কোলে কর। তার পর না হয় স্নান করিস্। আমি কত কষ্ট সহিয়াছি। মামি, তোমার কোলে শুইয়া ছোট বেলায় দুধ খাইতাম। তোমার কোলে শুইয়া আমার মরিবার সাধ। তাই এসেছি গো।"

১২

আমরা যাহা চাই, যাহা না পাইলে প্রাণ যায়, তাহা পাইয়াও অনেক সময় প্রাণ জুড়ায় না। নলু বেদে নারায়ণগঞ্জ ছাড়িয়া বহুদুরে নিজ আবাস স্থাপন করিয়াছিল। বিজুলী হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইয়াছে। শশীর সঙ্গে তার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। শশী বেদে সাজিয়া তাহার স্বামী হইয়াছে। কিন্তু বিজুলীর সুখ হয় নাই। বিজুলী প্রফুল্ল বন্য বালিকা ছিল—এখন সে বিষণ্ণ মৌন একখানি চিত্রের ন্যায় হইয়া পড়িল। শশী যে দিন প্রথম বেদের হাতে ভাত খাইল, শশীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ভাতের থালার উপর পড়িয়াছিল। বিজুলী তাহা বুঝিয়া যেন মরমে মরিয়া গেল; বেদের মত কাপড় পরিয়া শশী যখন বেদের কাজ করিতে আরম্ভ করিল,—শশী যাহা কখনও করে নাই, ভদ্র-লোকের ছেলেরা যাহা কখনও করে না,—এত আদরে যত্নে পালিত শশী যখন ম্লান মুখে সেই সকল কাজ নিঃশব্দে করিত, তাহা দেখিয়া বিজুলী মরমে মরিয়া যাইত; অল্প বয়স্কা বালিকাকে প্রথম দিন হাতের শাঁখা ভাঙ্গিয়া থান কাপড় পরিতে দেখিলে মায়ের যেরূপ কষ্ট হয়, বিজুলীর তেমনি কষ্ট হইত। সে প্রথম প্রথম লুকাইয়া কাঁদিত, তার

পর আর কাঁদিত না। একখানি বিষণ্ণ অনন্ত নৈরাশ্যের ছবির ন্যায় ম্রিয়মাণা বিজুলী নিজে ঘোর অনুশোচনায় গৃহের এক কোণে নিশ্চল হইয়া পড়িয়া থাকিত, তাহার সে বন্যউদ্দাম আনন্দ নাই, শশী তাহাকে ফুল কানে পরিতে বলিলে, তাহাকে আদর করিলে তাহার চক্ষু জলে ভাসিয়া যায়। সে চক্ষের জল তাহাকে দেখায় না, নিরিবিলি দগ্ধ হয়। যেন হেমন্তের পদ্মিনী, শুকাইয়া গিয়াছে, তথাপি কি রকমের একটা ম্লান মাধুরী আছে, তাহা কোমল কারুণ্যে চিত্ত বশীভূত করিয়া ফেলে। কখনও বেদেদের সঙ্গে কাজ করিতে বাহির হইয়া অনভ্যস্ত পরিশ্রম ও অর্দ্ধসম্ভাতখেদে শশী অতি দুর্ব্বল ও পরিক্লিষ্ট হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হয়,—বিজুলী শুশ্রূষা করে। প্রাণ লাগাইয়া শুশ্রূষা করে। গোপনে চক্ষু জল মুছিতে মুছিতে তাহাকে বাতাস করে। আর ভাবে আমি মরিলাম না কেন? যে প্রেম নিজের সুখ চায়, তাহাতে সুখ নাই। বালিকা বুঝিতে পারিল, তাহারই জন্য তাহারই দোষে শশীর এ দুরবস্থা। যে কত সুখে জীবন কাটিতে পারিত, ভালবাসার নামে সে তাহাকে এ নিরয়ে ডুবাইয়াছে; ইহা কি ভালবাসা, ইহা ঘোর স্বার্থপরতা। হায়। তাহার প্রেমাভিষপ্ত এক দেবতা মর্ত্তের কষ্ট সহিতে যেন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?

শশী নিজে সুখী নহে। এ ভাবে কি সুখ হয়? তাহার আহারে কষ্ট, থাকিবার স্থান অতি কদর্য্য; সে কষ্টের সাগরে ভাসিতেছে। কিন্তু গভীর অনুতাপদগ্ধা বালিকার কষ্ট দেখিয়া যেন তাহার নিজ কষ্ট পরাজিত, সে বিজুলীকে সুখী দেখিবার জন্য মিথ্যা মিথ্যা সুখের ভাণ করে। কিন্তু বিজুলী কি আর প্রফুল্ল হইবে? সে বন্য কুরঙ্গীর মত দৌড়িয়া বেড়াইত, তাহার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তির অবধি ছিল না; এখন নিরুৎসাহ, নিরুদ্যম, উপবাসকৃশা অতি মলিনা যেন চিত্রার্পিত বিষণ্ণ সৌন্দর্য্য মৌন ভাবে করুণা ও কৃপার অনন্ত প্রার্থনা জানাইতেছে। কিন্তু আগুনে পুড়িয়া সোনার খাঁটি অংশ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। তাহার স্বার্থান্ধ ভালবাসা এই অনুতাপে পুড়িয়া নিঃস্বার্থ পবিত্রতা লাভ করিয়াছে। সে এখন শুধু শশীর সেবা করিয়া সুখী। সেই সেবা-সুখই, তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত। একদিন তাহা হইতে বঞ্চিত হইলে সে যেন মরিয়া যায়। এ বার কাম ভস্ম হইয়াছে—প্রেম জন্মিয়াছে।

১৩

শশীর অনেক দিনের সাধ ছিল তাহার মামা মামীকে দেখিবে, লুকাইয়া একবার তাহাদিগকে দেখিয়া আসিবে। নলুকে এ কথা বলিল, বিজুলীও পিতাকে বিশেষ করিয়া ধরিল; তাই সকলে একত্র নারায়ণগঞ্জ আসিয়াছে। তাহাদিগকে নৌকায় রাখিয়া শশী পট নাচাইবার ছলে মামার বাড়ীতে গিয়াছিল। গোপনে দেখিয়া আসিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু ভয়ানক গোল হইয়া পড়িল। দুঃখ দুর্ব্বল হৃদয়ে কর্ত্তব্যের সাবধানতা অবলম্বন করা অসম্ভব। যেখানে নিজের কোমল অন্তঃকরণ তোমার বিপক্ষে, সেখানে তোমাকে কেহ রক্ষা করিতে পারে না; শশী সেই দিনের স্নেহোচ্ছ্বাসে অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়াছে।

কালিনাথ বাবু জমিদারের নায়েব, প্রজাগণ তাঁহাকে যমের মত ভয় করে। একটা সামান্য বেদের চক্রান্তে তাঁহার জীবনের সর্ব্বস্ব পুত্র তুল্য প্রিয় শশীর এই দুরবস্থা হইয়াছে, তিনি রাগিয়া অগ্নি হইলেন। তখনই নালিস রুজু হইল; বিজুলি ও তাহার পিতা হাজতে গেল, দণ্ড বিধির ৩৯০ ধারা অনুসারে নালিস—নরহত্যার চেষ্টা, খুন নহে, এই অপরাধে কন্যা ও পিতা অভিযুক্ত হইল।

ক্ষুদ্র নারায়ণগঞ্জের সহরে এই ঘটনা লইয়া ভয়ানক আন্দোলন পড়িয়া গেল, সকলের মুখেই এই এক কথা এবং এরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনায়, সকলেরই মনে হইল, বেদেদের দৃষ্টান্তস্থলীয় গুরুতর শাস্তি হওয়া উচিত। সহরে অনেক ঘর বেদে ছিল, তাহাদিগকে উঠাইয়া দেওয়ার জন্য জমিদারের নায়েবগণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন এবং শশীর দুরবস্থা দেখিয়া সকলেই হতবুদ্ধি ও ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইলেন।

যে দিন নালিস রুজু হইল, এবং পিতা ও কন্যা হাজতে গেল, সে দিন শশী তাহার মামাকে বলিল "আমি যে ভাবেই হউক যাহাকে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বিবাহ করিয়াছি, তাহাকে ও তাহার পিতাকে আপনি হাজতে পাঠাইলেন, ইহা আমার সহ্য হয় না। আপনি এ বিষয়ের প্রতিকার করুন।" কালী বাবু বলিলেন "ছেলেটা ক্ষেপে গিয়াছে এখন আবার বেদের পক্ষে ওকালতী কচ্ছে।"

শশী, মামার বাড়ী ছাড়িয়া সেই বেদের নৌকায় রহিল, তাহাকে কোন ক্রমেই আর বাড়ীতে আনা গেল না, সামাজিক জাতিভেদ শ্রেণীতে শ্রেণীতে বৈষম্যের সৃষ্টি করে, কিন্তু মনুষ্যত্বের হিসাবে, কোন প্রভেদ নাই, বিজুলীর প্রশান্ত পতি সেবায় শশী তাহারই হইয়া গিয়াছিল, বেদেনী তাহাকে বাহিরে বেদে সাজাইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহাকে ভালবাসা দেখাইয়া বেদেনীর একান্ত নিজের জিনিষ করিয়া তুলিয়াছিল। বিজুলী ছাড়া হইয়া, বিজুলীর কষ্ট ভাবিয়া শশী পাগলের মত হইল; শীতললক্ষ্যার তীরে ঘুরিতে লাগিল, তাহার মামা বাড়ীর লোক আসিয়া জোর জুলুম করে, বন্ধুবর্গ তাহাকে দেখিতে আসিয়া নানারূপ মন্তব্য দ্বারা জ্বালাতন করে, এই ভয়ে সে দিবারাত্র লুকাইয়া থাকে। শীতললক্ষ্যার তীরে একটি অশোক বৃক্ষ আছে, তাহার ফুলগুলি বড় সুন্দর, নুতন পল্লবগুলি এলোচুলের ন্যায়, শশী ভাবে আমার বিজুলী এ ফুলের চেয়ে ঢের বেশী সুন্দর; শীতললক্ষ্যার জল এক মর্ম্মব্যথা গাহিয়া গাহিয়া ঘোরে, শশী ভাবে আমার বিজুলীর স্বরে এর চেয়ে ঢের বিষণ্ণতা মাখানো মাধুর্য্য আছে, আর পাখা কিম্বা জলের গ্লাস হস্তে নিত্য সেবাপরায়ণা তাহার জন্য হাজতে বাস করিতেছে, শশী ক্ষেপার মত হইল। স্বর্গাদপি গরিয়সী জন্মভূমি; এই জন্য তোমার অঙ্কে জুড়াইতে আসিয়াছিলাম! তোমার জলে কতবার সাঁতার কাটিয়া খেলিয়াছি, তোমার লহরী লীলা দেখিয়া চক্ষু জুড়াইয়াছে, আজ আমায় স্থান দেও, এ মুখ আর দেখাইব না, যে বিজুলী আমার জন্য মরিতে বসিয়াছিল, সে আমার দুঃখ দেখিয়া যেন মরিয়া গিয়াছে—তাহাকে আমি হাজতে দিয়াছি! বিজুলীর নাম অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করিতে শশীবেদের চক্ষু জলে ভাসিয়া যায়; সে চতুর্দ্দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া দেখে; স্মৃতি হইতে বিজুলীর মূর্ত্তি বাহিরে আসিয়া দিশ দিশ অধিকার করিয়া আছে, বিজুলী আর তার প্রাণের এক নাম, বিজুলী ছাড়া তাহার আর প্রাণ নাই, তাহার প্রাণে বিজুলী যেরূপ আছে, এরূপ সে কোথায়ও নাই। ক্ষেপার মত শশীবেদে কারাধ্যক্ষের নিকট গেল, সেখানে অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া একবার বিজুলীকে দেখিতে অনুমতি পাইল, কিন্তু তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল; বিজুলীর চির ম্রিয়মাণ মূর্ত্তি যেন এক নবীন আনন্দে অধীর ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে, অতিশয় শীর্ণ পাণ্ডুর মুখখানিতে যেন এক স্বর্গীয় সুখ স্বপ্নের ছায়া প্রতিভাত হইতেছে। শশীকে দেখা মাত্র বলিল, "যাহাতে বাবা বাঁচেন তাই কর। আমাকে বাঁচাইতে চাহিও না। তোমার পায় পড়ি। আজ আমার পাপের একটুকু প্রায়শ্চিত্ত হইতে দাও। আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছিলাম—"হে ভগবান একবার আমার প্রায়শ্চিত্ত করিতে সুবিধা দাও"—আজ সেই মনের বাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে; তুমি ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া যাও। শুনিয়াছি হিন্দুর ঘরে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া ভদ্রলোকের মত থাকা যায়, তুমি তাহাই করিও। আমার মনের দারুণ কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাই, আমি মরিয়া বাতাসে মিশিয়া গেলেও তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিব, আমি স্বর্গে যাইতে চাই না। তোমার মামা মামীর নিকট ফিরিয়া যাও, বাবাকে বাচাইও আর আমার ফাঁসি হইলে, মরণ কালে তুমি আমার কাছে একবার দাঁড়াইও, তোমায় দেখিতে দেখিতে যেন চক্ষু মুদিয়া যায়। আমি যেথায় বড় সুখে আছি, তোমার পদ সেবার অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছি, তাহাতেও কষ্ট

হইতেছে, তুমি তোমার মামা মামীর কাছে ফিরিয়া গেলে সে কষ্ট কতক পরিমাণে দূর হইবে।" উৎসাহে বেদে বালিকা আর বলিতে পারিল না, তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল, সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

১৪

যথা সময়ে বিচার আরম্ভ হইল, ছয় জন শ্মশানযাত্রী সাক্ষ্য দিল, শব তাহারা খুঁজিয়া পায় নাই। কাঠগুলি তাহারা পুড়িয়া আসিয়াছিল। কালীনাথ বাবু কয়েক জন সাক্ষী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাদের কেহ বলিল, বেদের ঘরে শশীকে ঔষধ খাইতে দেখিয়াছে। কেহ বলিল নৌকায় লইয়া যাইতে দেখিয়াছে। মোক্তারবর্গ এই ঘটনা ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ভদ্র সন্তানের দুর্গতির যে চিত্র প্রদান করিল—মানবশিশু অপহারী ভল্লুকের সঙ্গে তুলনা করিয়া বেদেকে ভীষণতর প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া যে উত্তেজিত বক্তৃতা প্রদান করিল, তাহাতে শ্রোতাগণ ভীত ও আড়ষ্ট হইয়া গেল। হাকিম নিজেও এই অপরাধের গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া বেদে ও তাহার কন্যাকে সেসনে পাঠাইতে স্থির সংকল্প করিলেন। কালীনাথ বাবু এজাহারে প্রকাশ করিয়াছিলেন, শশীকে বেদেরা ঔষধ খাওয়াইয়া পাগল করিয়া রাখিয়াছে, তাহার জবানবন্দীর কোন মূল্য নাই, সুতরাং সিভিল সার্জ্জনের নিকট সে পরীক্ষার জন্য প্রেরিত হইল। সিভিল সার্জ্জন এণ্ডারসন তাহাকে নানারূপে পরীক্ষা করিলেন। তাহার মাথা বিকৃত হইয়াছে, এই মত দেওয়ার জন্য কালীনাথ বাবু সাহেবের কাছে নানা ভাবে দরবার করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে এণ্ডারসনের মত প্রকাশিত হইল—শশীর মস্তকে কোনও বিকৃতি ঘটে নাই। শশী অল্প বাক্যে জবানবন্দী দিল, সে বেদের মেয়ের রূপে ভুলিয়া গিয়াছিল, তাহাকে মৃত মনে করিয়া শ্মশান যাত্রিগণ তাহাকে পোড়াইতে লইয়া গিয়াছিলেন, নলুবেদে তাহাকে অনেক চিকিৎসা করিয়া বাঁচাইয়াছিল, সে স্বেচ্ছায় বিজুলীকে বিবাহ করিয়া বেদে সাজিয়াছে। এ সম্বন্ধে অন্য কেহ দায়ী নহে। পুনর্ব্বার প্রশ্ন করা হইলে শশী দুইটি মিথ্যা কথা বলিল। জ্বর হইবার পূর্ব্বে তাহাকে বেদে কিম্বা বেদের মেয়ে কিছু খাইতে দেয় নাই। বৃষ্টির জলে কতকটা চৈতন্য লাভ করিয়া সে গড়াইতে গড়াইতে নদী তীরে যাইয়া পড়ে, বেদেরা তাহাকে তদবস্থায় পাইয়া নৌকায় তুলিয়া লয়।

সুতরাং মোকদ্দমা দাঁড়াইতে পারিল না, নলু ও বিজুলী খালাস পাইল।

পরদিন প্রাতে শীতললক্ষ্যা নদীতে নৌকায় শশী বেদে তাহার স্ত্রী ও শ্বশুরকে লইয়া ভিন্ন দেশে যাত্রা করিল, জন্মভূমি দেখার সাধ তাহার মিটিয়াছে। শশী কোথায় যাও? তোমার মাতুলানীর শোকক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখখানি তোমার মনে পড়ে না? অভাগিনীর অঞ্চলের ধন কোথায় যাও? তিনি যে আট বৎসরের মধ্যে পলিতকেশা বৃদ্ধা সাজিয়াছেন, তাহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে যে শশী বেদের চাঁদমুখ মনে পড়িবে, তখন তোমার মুখোচ্চারিত "হরি নাম" শুনিতে যে তিনি মুমূর্ষু শয্যায় ব্যাকুল হইয়া তাকাইবেন, সেই আসন্ন মৃত্যুর মুহূর্ত্তে তিনি শূন্য ক্রোড় ও বিদীর্ণ হৃদয়ের স্মৃতি লইয়া চক্ষু মুদিবেন। ওই দেখ শশী যেন তাহাই মনে করিতেছে। দুইটী অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে উদ্যত ছিল, কিন্তু সে বিজুলীর ভয়ে তাহা মুছিয়া ফেলিয়াছে। বিজুলীর প্রফুল্লতা গিয়াছে, সেই দীনহীনা মূর্ত্তি ধরিয়া সে পতি-সেবা-ব্রতের অধিকারিণী হইয়াছে। যাও শীতললক্ষ্যা যাও, চিরকাল বিদায়। আর শশী বেদে তোমার জলরাশি দেখিতে আসিবে না, মধুময় নারায়ণগঞ্জ! ভিখারী শশী আজ তোমার ছাড়িয়া চলিয়াছে, এ জীবনে আর ফিরিয়া আসিবে না: তোমার কদম তলে বসিয়া সে আর পাখীর গান শুনিবে না, তোমার রৌদ্রে বসিয়া সে আর শীতকালে আরাম পাইবে না। নিদারুণ গ্রীষ্মে আর তোমার পবন হিল্লোলে জুড়াইবে না। তোমার বিস্তীর্ণ রক্তবর্ণ রাস্তায়, তোমার সুপারিবাগিচা প্রান্তভূমিতে আর তাহার পা পড়িবে না। বিদায়, চির বিদায়। ভগ্নমণ্ডলি! সে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতিতে আর প্রয়োজন নাই! এখন শশী—বেদে; বাজি দেখাইয়া, পট নাচাইয়া, পাহাড়ভাত ঔষধ বেঁচিয়া সে জীবন কাটাইবে। সকলই গিয়াছে। কিন্তু সেই সকলের সমাধির উপর অনুতপ্ত প্রেমের দুইটি চক্ষু অশ্রুপরসদৃষ্টিতে তাহাকে দেখিবে, সে তাহাতেই জুড়াইবে।*

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

সমাপ্ত।

মহীশুরে রাজোদ্বাহ।

বহুদিন হইতে আদশ দেশীয় রাজা মহীশুর দর্শনের বাসনা অন্তরে জাগরূক ছিল। মহারাজের ও রাজকুমারীর বিবাহোপলক্ষে রাজমাতা মহারাণীর নিমন্ত্রণ পাওয়ায়, সুযোগের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। যথাসময়ে যাত্রা করিয়া, নব নির্ম্মিত লৌহবর্ত্মের সুবিধায় 'ইষ্ট কোষ্ট' রেলে মান্দ্রাজ হইয়া মহীশুরে যাওয়াই স্থির করিলাম। কলিকাতায় পৌছিয়া, বজবজের অপর পাড়ে 'বেঙ্গল নাগপুর' রেলে উঠা গেল। চতুর্থ দিবসের প্রাতঃকালে আমাদিগকে লইয়া ট্রেইন মান্দ্রাজে পৌছিল। এখানে ভয়ানক গরম, ১০৯ ডিগ্রী তাপ। আমাদের পক্ষে এরূপ গরম নিতান্ত অসহনীয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; সুতরাং পরদিন বিকাল বেলাই দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রেলে মহীশুরাভিমুখে রওয়ানা হইলাম। তৎপর দিবস প্রাতে মহীশুরের কেন্দ্র রাজধানী বেঙ্গালোরে পৌছিলাম: এখান হইতেই আমরা মহীশুর রাজের আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। এখানকার বন্দোবস্ত ব্যাপার দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, ব্যাপারখানা সামান্য নয়। উচ্চ শ্রেণীর একজন কর্ম্মচারী ষ্টেশনের নিকটে তাম্বু খাটাইয়া, অতিথি সৎকারের নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছেন। ট্রেইন ষ্টেসনে যাইয়া দাঁড়াইবা মাত্র মহীশুরের অতিথিগণকে সাদর সম্ভাষণে নিজ নিজ ছাউনিতে লইয়া যাওয়া হইতেছে। তথায় স্নান আহারাদি কার্য্যে যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন সমস্তই প্রস্তুত। আমরা মহীশুর প্রদেশীয় মিষ্টান্ন দ্বারা সুচারুরূপে উদর দেবের অর্চ্চনা করিয়া, নির্দ্দিষ্ট সেলুন গাড়ির আশ্রয় লইলাম। এ গাড়িতে কেবলই নানা দেশ হইতে আগত অতিথিগণ চলিয়াছেন। ঠন্ ঠন্ করিয়া ষ্টেশনের ঘড়ির ১১ টা বাজিয়া গেল, সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ট্রেইনও উচ্চৈস্বরে সকলের নিকট বিদায়

---

* সত্য ঘটনামূলক।

গ্রহণ করিয়া বেঙ্গালোর ছাড়িয়া চলিল। ৮১ মাইল যাইতে, পথ বন্ধুর বলিয়া, ছোট গজের গাড়ির পক্ষে সমস্ত দিন লাগিয়াছিল। পথে দ্রষ্টব্য কিছুই নাই, কেবলই মাঠ। ছোট বড় প্রস্তর খণ্ড মাঠময় ছড়িয়া রহিয়াছে, কৃষকগণ তাহারই মধ্যে হলকর্ষণ ও বীজবপন করিতেছে। এখানে 'ইরিগেশন্' আছে। পয়োপ্রণালী হইতে অহরহঃ কৃষিক্ষেত্র জল পাইতেছে। প্রান্তর গুলিতে লক্ষ্মীর দৃষ্টি আছে বলিয়াই অনুভূত হইল। এখানে অন্নকষ্টের বা দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ক্রমে আমরা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শ্রীরঙ্গ-পট্টনের দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম। সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে কাবেরী নদী পার হইয়া শ্রীরঙ্গপট্টনে পৌছিলাম। সেই টিপুর রাজভবন, শ্রীরঙ্গজির মন্দির, জুম্মা মস্‌জিদ এবং নবনির্ম্মিত রেল-ষ্টেসন, সমস্তই প্রসিদ্ধ দুর্গের অভ্যন্তরে অবস্থিত। এ স্থানের বিস্তৃত বিবরণ পরে বলিবার অভিপ্রায় রহিল।

রেল-ষ্টেসন-গৃহের বারাণ্ডায় কাল পাথরের পায়ার উপর কাষ্ঠের কারুকার্য্যবিশিষ্ট থাম দেখিয়া স্বতঃই মনে হইল, এই সকল থাম আধুনিক জিনিস নহে।—সঙ্গীয় একজন সহযাত্রী বলিলেন, হতভাগ্য টিপুর বিলাশ ভবনের ভগ্নাবশেষ হইতে এই সুন্দর ও সুদৃঢ় থামগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমরা মহীশুর ষ্টেসনে পৌছিলাম। একজন "আমিলদার" (ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট) আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং রাজশকটে নির্দ্দিষ্ট আবাসে লইয়া গেলেন। সেখানে প্রাচীন হিন্দু প্রথানুসারে আমাদিগকে বরণ করিয়া, মাঙ্গল্য দ্রব্যাদি দ্বারা অভ্যর্থনা করা হইল। আমিলদার মহাশয় আমাদের আগমনবার্ত্তা গোচর করিবার নিমিত্ত রাজপ্রাসাদাভিমুখে গেলেন। দেখিলাম, প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত অতিথির জন্য সুন্দর ও সুসজ্জিত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। চাকর, সিপাহী, সোয়ার, খান্‌সামা, পাচক প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত, ব্যবহার্য্য অব্যবহার্য্য দ্রব্যজাতেরও অভাব নাই।

সমস্ত দিনের পর আহার ও নিদ্রা লোলুপ পরিশ্রান্ত, দেহখানা কেবলই বিশ্রাম-শান্তি অন্বেষণে লালায়িত। সুতরাং অতিথি সৎকারের প্রধান আয়োজন ও প্রাথমিক আবশ্যকীয় আহারটার তল্লাস লইয়া জানিলাম, আহার প্রস্তুত। আর তর সইল না—বীরাসনে পিঁড়ি জুড়িয়া আহারে বসিয়া গেলাম। কিন্তু দেখিলাম, দাক্ষিণাত্যে আহার্য্যের ঘটা যতই থাকুক না কেন, তদ্দ্বারা বঙ্গদেশীয় অতিথির প্রাণ বাঁচান দায় হইবে। সবই নিরামিষ—তাহার মধ্যে আবার টকের মাত্রাই অধিক। আরও বিপদ—কোন কোন ব্যঞ্জন নারিকেল তৈলসংযোগে পাক হওয়ায়, আমাদের অখাদ্য হইয়াছে। সে দেশে ইহাই সুখাদ্য ও আদরণীয়। কোনমতে নাকে মুখে চারিটা গুঁজিয়া সঙ্গীয় পাচককে বলিলাম,—"ঠাকুর পৈত্রিক প্রাণটা বাঁচাইয়া দেশে যাইতে চাও ত কাল থেকে নিজহাতে রান্না কর, এ রাজভোগ গরিবের পেটে সইবে না ?"

শয়নের যোগাড় করিতেছি, এমন সময় রাজবাড়ী হইতে জনৈক কর্ম্মচারী আসিয়া, কুঙ্কুম সুবাসিত তণ্ডুল আমাদের হাতে দিয়া, রাজকন্যার বিবাহে নিমন্ত্রণ করিলেন। স্বস্তি বচনের মত, চাউলগুলি হাতে লইয়া, সঙ্গীয় রাজ-পুরোহিত কর্ত্তৃক উচ্চারিত বচন শুনিতে লাগিলাম। বচনের মর্ম্ম,—"বিবাহ শুভ কামনায়, আপনার আশীর্ব্বাদ প্রাপ্তি ইচ্ছায় আমন্ত্রণ করিতেছি।" আমি "স্বস্তি" উচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহাদের এই প্রাচীন প্রথার মর্য্যাদা রক্ষা করিলাম। পরে, কর্ম্মচারিটি আমাদের বস-বাসের সুবিধা ও আমার মঙ্গলবার্ত্তা ইত্যাদি বিষয়ক আলাপ করিয়া এবং সর্ব্বোপরি রাজমাতার সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়া, বিদায় লইলেন; আমরা রাজাশ্রয়ে সুখে নিদ্রিত হইলাম।

পরদিবস সকালে ১০টার সময় বিবাহ। আমরা নগরের পশ্চিম প্রান্তে বাস করিতেছি,—রাজপ্রাসাদ পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। একঘণ্টা পূর্ব্বে বিবাহমণ্ডপে উপস্থিত থাকিতে হইবে। এখানকার দরবারে জুতা নেওয়ার ব্যবস্থা নাই। স্বয়ং মহারাজ পর্য্যন্ত খালিপায়ে দরবারে আসিবার নিয়ম। কাজেই দেশীয় পোষাকে সজ্জিত হইয়া প্রস্তুত রহিলাম। রাজশকট (State-carriage) সহ প্রাসাদের জনৈক কর্ম্মচারী আমাকে নেওয়ার জন্য আসিলেন। এবং বিবাহ উপলক্ষিত অদ্যকার নিয়মাবলী একখণ্ড আমাকে দিলেন; সেটা আমার অপাঠ্য, কারণ কেণাড়ি ভাষায় তাহা মুদ্রিত ছিল। কর্ম্মচারী মহাশয় গাড়িতে যাইতে যাইতে নিয়মাবলীর মর্ম্মটা আমাকে বুঝাইয়া দিলেন এবং বলিলেন,—"অদ্যকার বিবাহে রাজকীয় ঘটা তত্টা নাই। মহারাজের বিবাহে

দিনে উচ্চ অঙ্গের রাজকীয ঘটা দেখিতে পাইবেন।” আমার আনীত যৌতুকগুলি এখানকার প্রথানুসারে পালকিতে মিছিল সহ পশ্চাতে আসিতেছিল। যথা সময়ে বিবাহ মণ্ডপে পৌঁছা গেল, দেখিলাম বিরাট ব্যাপার।

মহীশুরে দুইটী রাজপ্রাসাদ। একটী দুর্গমধ্যস্থ। ইহা কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্ম্মিত। ইতিপূর্ব্বে অন্য একটী রাজকুমারীর বিবাহোপলক্ষে অগ্ন্যুৎপাতে এই প্রাসাদের বড় দরবার হল ও অন্যান্য অনেকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অন্য প্রাসাদটী অধুনা নির্ম্মিত, তাহা বর্ত্তমান মহারাজের পিতামহ মহারাজ কৃষ্ণরাজ ওদেযারের সময় পাশ্চাত্য অনুকরণে তৈয়ারি। এই প্রাসাদ “জগন্মোহন প্রাসাদ” নামে প্রসিদ্ধ। এই প্রাসাদ প্রাঙ্গণে বিবাহোপলক্ষে দুই লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে ইষ্টক ও কাষ্ঠ দ্বারা প্রকাণ্ড একটী মণ্ডপ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। মণ্ডপটী দেশী বিলাতি সংমিশ্রণে ১৫০ × ৭০ ফুট পরিমাপে নির্ম্মিত এবং দুই হাজার লোকের সমাবেশ যোগ্য। এই প্রকারের মণ্ডপ বর্ণনার যোগ্য বটে। ভিতরে দুইধারে মহিলাগণের জন্য দুইটী গেলারি নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে স্ত্রী স্বাধীনতা আছে, কোন কোন পরিবারে এবং রাজ-পরিবারের মধ্যে ‘গোশা’ বা পর্দ্দা প্রথা সম্প্রতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এজন্য এই গেলারিতে ইয়ুরোপীয়, দেশীয় ও গোশা মহিলাগণের নিমিত্ত পৃথক পৃথকভাবে বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। গেলারি দোতালা। নিম্নে সাধারণ দর্শকবৃন্দের দাঁড়াইয়া বিবাহ দেখিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ভিতরের সাজ সজ্জা অতি মনোরম এবং জমকালো। তাঞ্জোর প্রদেশায় প্রসিদ্ধ কারিকরগণ দ্বারা, বাদলা, সল্মা, চুমকি এবং রাং দ্বারা অভিনব আদর্শে ফুল, পাতা ইত্যাদি নানাবিধ কারুকার্য্য দ্বারা ছাদ হইতে দেয়াল পর্য্যন্ত সাজান হইয়াছে। মনে হয় দিল্লীর দেওয়ান খাসের কাজ এখানে হার মানিয়াছে। দিল্লীর কাজ চিরস্থায়ী—একাজ অস্থায়ী। কিন্তু এমন সুন্দর কারুকার্য্য সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। চন্দটী বাদামি খিলানের, তাহাতে বৈদ্যুতিক ও গ্যাসের আলোর বড় বড় ঝাড় ঝুলান। পাশ্চাত্য ও ভারতীয় শিল্পের সংমিশ্রণে যে কত সুন্দর সাজ গোজ হইতে পারে, এখানে তাহার আদর্শ দেখা গেল। অর্থ ও মস্তিকের সদ্ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে হইয়াছে।

এই মণ্ডপে দুইটি বিবাহ বেদিকা ছোট মন্দির ধরণে পূর্ব্বোক্ত মত তাঞ্জোরী কারুকার্য্যে প্রস্তুত হইয়াছে। বেদিকায় নানা রঙ্গের কাচের পদ্মে বৈদ্যুতিক আলো ঝুলান হইয়াছে।—

মধ্য স্থলের বেদিকায় মহারাজার বিবাহ হইবে। তাহারই দক্ষিণ দিকস্থ অপেক্ষাকৃত ছোট অপর বেদিকাটিতে অদাকার রাজ কন্যার বিবাহ কার্য্য সমাধা হইবে। সমস্ত মণ্ডপটি বিলাতি ভেল্‌ভেট্ ও কার্পেট্ দ্বারা মোড়া। কেবল বিবাহ বেদিকার সম্মুখস্থ খানিকটা জায়গা মিন্‌টন টাইল দ্বারা মণ্ডিত হইয়াছে। মধ্যস্থলে একটী হোমকুণ্ড। দক্ষিণের বেদিকার সম্মুখে নানাবিধ মাঙ্গল্য দ্রব্যাদি দ্বারা সাজান হইয়াছে। যৌতুকের সামগ্রীগুলি স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। সোণার পিলশুজে প্রদীপ, রূপার ত্রিপদীতে সোণার থালায় কুঙ্কুম রঞ্জিত কদলি, তণ্ডুল, নারিকেল এবং পান সুপারি, পুষ্পমালা, পুষ্পধনুশর পুষ্পদণ্ড এবং নানাবিধ পুষ্পরচিত দ্রব্যাদি সাজান রহিয়াছে। এই সকল পুষ্পাভরণ, পুষ্পাস্তরণ এবং ফুলবাণ ইত্যাদি দেখিয়া, কামদেবের সাজ সজ্জার কথা একবার মনে পড়িল। এখানে গৃহাদিতে পত্র পুষ্পের সাজ বড় একটা দেখা গেল না। কারণ অনুসন্ধানে জানিলাম, এখানে বঙ্গদেশের ন্যায় প্রচুর পরিমাণে পুষ্প পত্রাদি সুলভ প্রাপ্য নহে। কেবল বেল, চাম্বেলি ও জেস্‌মিন জাতীয় ফুলই প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এ বিবাহ ব্যাপারে ঐ সকল শ্রেণীর পুষ্পের প্রচুর পরিমাণে সমরবাহ দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি।

বিবাহ লগ্নের কিছু পূর্ব্বে বর মিছিলসহ বিবাহে প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। সভাস্থ সকলে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক দক্ষিণের বেদিকায় তাঁহাকে বসাইয়া আপন আপন আসন গ্রহণ করিলেন। এই বিরাট সভার বিবরণ মহারাজার বিবাহ সভা উপলক্ষে বলিবার প্রতীক্ষায় রহিলাম।

যথা সময় মহারাজ পাত্রমিত্রসহ সভাস্থ হইলেন। বন্দিগণ উচ্চৈঃস্বরে বন্দনা গাহিতে লাগিল,—নকিব ফুকারিয়া সভাস্থ সকলকে মহারাজের আগমন বার্ত্তা জানাইল। সকলেই খালি পায়,—মহারাজ পর্য্যন্ত। উপস্থিত রাজন্যবর্গের সহিত যথাযথ সম্ভাষণ করিয়া মহারাজ নিজ আসনে এবং অপর সকলে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হওয়ার পর, হঠাৎ সভামধ্যে নৃত্য-বাদ্য রব সমুত্থিত হইল। মাথা তুলিয়া দেখিলাম, তাঞ্জোরের প্রসিদ্ধ নর্ত্তকীগণ অঙ্গ ভঙ্গি করিয়া নানা

ছাঁদে নৃত্য করিতেছে। পশ্চাতের বাদ্যকরগণ গান গাহিতেছে, আর নর্ত্তকীগণ হাব ভাব বাৎলাইয়া, তাহারই রস ফুটাইয়া নাচের মহিমা বিস্তার করিতেছে। এমন সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর নৃত্য আর কখনও দেখি নাই। নানা ধরণের নাচ, সভার নানা স্থানে চলিতে লাগিল। মেপোল নাচ—হাতে কাঠি, একে অন্যের হাতের কাঠিতে কাঠি ঠেকাইয়া ষোড়শটী যুবতীর নৃত্য নূতনতর দেখিলাম। ইতিমধ্যে বিবাহ কার্য্য আরম্ভ হইল।

এখানে এক অভিনব প্রথা দেখিলাম, মাতুলের নিকট ভাগিনেয়ীকে বিবাহ দেওয়া হয়। বর্ত্তমান মহারাজার মাতুল তাঁহার প্রথমা ভগিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন এবং অদ্যকার বিবাহেও ঐ বংশীয় একটী পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করা হইতেছে। আর একটী প্রথা এই, সস্ত্রীক হইয়া কন্যা সম্প্রদান করিতে হয়। মহারাজ এখনও অবিবাহিত, রাজ মাতা বিধবা, কাজেই প্রতিনিধিস্বরূপ অদ্য মহারাজার মাতুল অথচ ভগ্নীপতি কন্যা দাতা। প্রথা মতে বরকে অর্চ্চনা ও পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা বরণ করার পর, যথা সময় কন্যাকে সভাস্থ করা হইল। এক খানা লাল বস্ত্রের দ্বারা বর ও কন্যার মধ্যে অন্তরাল করা হইল। পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক পরদা সরাইয়া লইলেন—বর ও কন্যার শুভ-দৃষ্টি হইল। ইহার পর, দুইটী তণ্ডুলপূর্ণ ও কিংখাপ মোড়া ছোট ধামার উপর পদ স্থাপন করিয়া, উভয়ে উভয়কে সপ্তবার পুষ্প তণ্ডুল বর্ষণ করিলেন। এই সকল কার্য্য সম্পাদনের পর, সম্প্রদান কার্য্য আরম্ভ হইল। হিন্দু-বিবাহ প্রথা সর্ব্বত্রই প্রায় এক; এখানে পার্থক্য এই, সম্প্রদানান্তে কন্যা বরের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিলেন, ইহাই প্রথা। পুরোহিত হোম আরম্ভ করিলেন, বর-কন্যা এক গ্রন্থিতে গ্রন্থিত হইয়া, হোমানলে মন্ত্রঃপূত ঘৃত ও লাজাহুতি প্রদান করিলেন। সপ্তবার যজ্ঞবেদিকা প্রদক্ষিণ করিয়া দুইজনে দুই খানা পিঁড়িতে উপবিষ্ট হইলেন। অতঃপর "টালি" অর্থাৎ তদ্দেশীয় সধবা চিহ্ন, কাল মৃত্তিকার মালা, স্বর্ণ হাঁসলি সংযোগে বর স্বহস্তে কন্যার গলায় পরাইয়া দিলেন। এখন সপ্তপদি-ক্রিয়া আরম্ভ হইল। একখানি শীলা খণ্ডে সাতটী ময়দার দাগ দিয়া বর ও কন্যা মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সপ্তবার তাহাতে পা ছোঁয়াইলেন। সপ্তপদি-কার্য্য এখানে নাকি এই রকমেই হইয়া থাকে। অর্থাৎ শীলারোহণ ও সপ্তপদ গমন কার্য্য একবারেই শেষ হয়। বিবাহান্তে সভাস্থলে মালা, আতর ও পান বিতরণ আরম্ভ করা হয়। উপস্থিত অতিথিগণ নিজ নিজ যৌতুকগুলি বর ও কন্যার সম্মুখে ধরিলে, উভয়ে তাহা স্পর্শ করিয়া গ্রহণ-সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। সভাস্থ ভদ্র ইতর সকলকেই মালা ও পান দেওয়ার রীতি। এই মালা পান বিতরণ কার্য্য সমাধা হইতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। সভা ভঙ্গের পূর্ব্বে সমবেত কর্ম্মচারিগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া মহারাজাকে অভিবাদন করিলেন, প্রতি নমস্কার দ্বারা মহারাজ হাস্যমুখে সকলকে সন্তুষ্ট করিলেন। সভাভঙ্গ হইলে, আমরা জনতা ভেদ করিয়া, বিবাহ মণ্ডপ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

বিকাল বেলা দরবার-বকসী খবর দিলেন, মহারাজার "কাশীযাত্রা" ব্যাপারে আমাদের উপস্থিত থাকিতে হইবে। শুনিয়া ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ধরা চূড়া পরিয়া আমরা রাজবাড়ীতে যাইয়া দেখি, বিষম জনতা—আমাদের ন্যায় অনেক কাশীযাত্রী জুটিয়াছেন। মিছিল প্রস্তুত, মহারাজ গৈরিক বসন পরিহিত, ব্রহ্মচারী-বেশে সভাষদ ও সম্ভ্রান্ত অতিথিবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া, নগ্ন পদে বাহিরে আসিলেন, হাতে একটী দণ্ড। পার্শ্বস্থ রাজকর্ম্মচারীর বর্ণনায় জানিলাম, ইহা এখানকার বিবাহের পূর্ব্ব প্রথা। অর্থাৎ অবিবাহিত ব্যক্তি মাত্রেই ব্রহ্মচারী, গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশের পূর্ব্বে কাশীবাস করিয়া, শাস্ত্র শিক্ষার পরে গৃহী হইবার অধিকার পায়। তাই, মহারাজ আজ ব্রহ্মচারী বেশে নগর ভ্রমণচ্ছলে কাশীযাত্রা করিতেছেন। আমরা মহারাজার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট মিছিলসহ সহরের পূর্ব্ব দিকে প্রায় দুই মাইল হাঁটিয়া সন্ধ্যার পরক্ষণে কন্যা কর্ত্তার বাটির সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। এখানে কন্যাযাত্রিগণ আমাদিগকে একটী বিরাট চন্দ্রাতপতলে অভ্যর্থনা করিলেন। সকলেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। কন্যা কর্ত্তা আম্রাণ রঞ্জিত নারিকেল ফল হাতে লইয়া, মহারাজের নিকট মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গোচর করিলেন,—"সর্ব্বাপেক্ষা গার্হস্থ্য আশ্রমই মানুষের প্রধান আশ্রম। অতএব আপনি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পরিত্যাগ করিয়া, আমার কন্যার (নামোচ্চারণ করা হয়) পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক গৃহস্থ হউন।" এই কামনায় কন্যা দান করিলে, মহারাজ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি

দান করিলেন। ইহার পর আমরা মিছিলসহ দুর্গ মধ্যস্থ প্রাসাদে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। রাজ মাতা মহারাণী উপরের বারাণ্ডা হইতে পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সকলে নত-শিরে মহারাণীকে নমস্কার জানাইয়া বিদায় লইলেন। আমরাও শুভ্র চন্দ্রালোকে নগরের শোভা দেখিতে দেখিতে বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম।

এই কাশীযাত্রা ব্যাপার আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। ইহা দেখিয়া আমার হৃদয়ে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের উদয় হইয়াছিল। হর্ষের কারণ—একটী নূতন ব্যাপার দেখিতে পাইলাম, অথচ ইহা হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত একটী প্রধান অনুষ্ঠান। পক্ষান্তরে, হিন্দুর শাস্ত্র ও আচার বিধি সঙ্কোচিত হইয়া কত দুরবস্থাপন্ন হইয়াছে, এ স্থলে তাহার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দেখিয়া বিষাদিত হইয়াছিলাম। শাস্ত্র বলেন :—

"ষট্ ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যাং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম।
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিক মেব বা॥
বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথা ক্রমম।
অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রম মাবসেৎ॥"

মনুসংহিতা—৩য় অং, ১২ শ্লোক।

ইহার মর্ম্ম এই ;—ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে ষট্ ত্রিংশৎ বর্ষ কাল বেদত্রয় অধ্যায়নার্থ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম-বিহিত ধর্ম্মের আচরণ করিবেন। অথবা তাহার অর্দ্ধেক কাল, কিম্বা চতুর্থাংশ কাল কিম্বা যতদিন পর্য্যন্ত তিন বেদের সম্পূর্ণ গ্রহণ না হয়, ততকাল গুরুগৃহে যাপন করিবেন। তিন বেদ, দুইবেদ অথবা একবেদ শাখাদি যথাক্রমে অধ্যয়ন করিয়া, বিদ্যালাভ হইলে, স্ত্রী সংপ্রয়োগ হইতে অস্খলিত ভাবে নিবৃত্ত থাকিলে পর, তবে গার্হস্থে অর্থাৎ দার পরিগ্রহে অধিকারী হওয়া যায়।

ইহা ভিন্ন ব্রহ্মচারীর আচার ব্যবহারাদির কাঠিন্য বিষয়ে শাস্ত্রে অনেক ব্যবস্থা রহিয়াছে। সেই সকল শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা, এখন কিয়ৎকাল নগর ভ্রমণ দ্বারাই পালন করা হইতেছে। কালে আরও কি হইবে, ভগবান জানেন।

কৈফিয়ৎ।

গত কার্ত্তিকের "প্রদীপে" প্রকাশিত "বায়ুনভোবিদ্যা" শীর্ষক প্রবন্ধোক্ত বিষয়ে সন্দিহান হইয়া শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র রায় মহাশয় গত মাঘের "প্রদীপে"—"আবহ ও চন্দ্র সূর্য্য" নামক প্রবন্ধে লেখকের কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছেন। যোগেশ বাবুর প্রতি কথার কৈফিয়ৎ দিবার প্রবৃত্তি আমাদের নাই। যে কথার উত্তর দেওয়া একান্ত আবশ্যক, আমরা তাহাই এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। অন্যান্য কথা সামান্য বিজ্ঞানাভিজ্ঞ পাঠক মাত্রেই সহজে ও নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিবেন। সুতরাং তাহার অযথা ব্যাখ্যা করিয়া প্রদীপের স্থানের অপ-ব্যবহার করা অনাবশ্যক।

প্রথমেই যোগেশ বাবু "বায়ুনভোবিদ্যা" নামটাতেই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। লেখক "বায়ু" শব্দের অর্থ জানেন এবং "নভস্" শব্দের সহিতও পরিচিত আছেন লিখিতেছেন। কিন্তু "বায়ুনভঃ" বিষয়টা কি বুঝেন নাই। ব্যাপারটা কতকটা এইরূপ,—বিজ্ঞ লেখক "বায়ু" ও "নভস্" (অর্থাৎ মেঘ) চেনেন কিন্তু "বায়ুনভঃ বা "বায়ু মেঘ" এই দ্বন্দ্ব সমাস নিষ্পন্ন পদটাকে বুঝেন না। ইংরাজি মেটেওরোলজি (Meteorology) শব্দটাকে বাঙ্গালায় "বায়ুনভোবিদ্যা" না করিয়া "আবহবিদ্যা" করিলে যোগেশ বাবু খুব খুসী হইতেন দেখিতেছি। অধ্যাপক Wilson প্রমুখ জগৎবিখ্যাত অভিধানকারকগণ "আবহের" ভিন্নার্থ প্রকাশ করিলেও দুই একখানি অভিধানে "আবহের" অর্থ "ভূবায়ু" লেখা আছে সত্য, কিন্তু যোগেশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করি, ইংরাজি মেটেওরোলজি শব্দে যে অর্থ প্রকাশ করে, তাঁহার "আবহ" শব্দের পশ্চাতে "বিদ্যা" জুড়িলে কি তাহাই বুঝায়? Meteorologyকে কেবল "আবহ" অর্থাৎ "ভূবায়ু"—প্রধান বিদ্যারূপে না গড়াইয়া, Meteorologyর অন্তর্ভূত আর একটা বিষয় অর্থাৎ "মেঘটাকেও" পরিভাষার অন্তর্গত করিলে উক্ত ইংরাজি পারিভাষিক শব্দটার ভাব আরো অধিক ব্যক্ত হয় না কি? যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন "আবহবিদ্যা" কথাটা নূতন এবং আংশিক তাঁহার রচিত। কিন্তু প্রতিবাদকারী বোধ হয় জানিতেন না "বায়ুনভোবিদ্যা" শব্দটা "পুরাতন" এবং সম্পূর্ণরূপে সেটী বিখ্যাত অভিধানকার পণ্ডিতবর আপ্তে মহাশয়ের রচিত *। এইজন্য পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহের জন্য অশেষশাস্ত্রবিদ্ অধ্যাপক আপ্তের ইংরাজি-সংস্কৃত অভিধান অন্বেষণ আমি যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিলাম এবং যে পর্য্যন্ত যোগেশ বাবু প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিদ্যাবত্তায় প্রবীণ আচার্য্য আপ্তেকে পরাভব করিতে না পারিতেছেন, বৈজ্ঞানিক শব্দ-ভাণ্ডার পূরণের জন্য, অন্ততঃ সে পর্য্যন্ত আপ্তে প্রমুখ পণ্ডিতগণেরই শরণাপন্ন হইতে থাকিব।

আমার প্রবন্ধের প্রথম পংক্তিতে "বায়ু ও আকাশের উচ্ছৃঙ্খল পরিবর্ত্তন" লেখা দেখিয়া যোগেশ বাবু উদ্ধৃতাংশস্থ "আকাশকে" সেই "বায়ুনভোবিদ্যার" "নভের" প্রতিশব্দ বলিয়া অনুমান করিয়া ফেলিয়াছেন। এই প্রকার অদ্ভুত অনুমানের ভিত্তি কি বহু চিন্তাতেও স্থির করিতে পারিলাম না,—যোগেশ বাবু তাঁহার প্রতিবাদে ইহার একটু আভাষ দিলে ভাল করিতেন। যাহা হউক পরবর্ত্তী অংশের সহিত উদ্ধৃতাংশটী পাঠ করিলে, "আকাশ" শব্দ দ্বারা "আকাশের অবস্থা" সূচিত হয় কি না দেখিবার জন্য যোগেশ বাবুকে অনুরোধ করি। তা'র পরেই "চির-নিয়ত বিশ্বের কার্য্যে বিশৃঙ্খলা" দেখিয়া বিজ্ঞ প্রতিবাদকারী চমকাইয়া গিয়াছেন,—কিন্তু দৃশ্যতঃ চির নিয়ন্ত্রিত বিশ্বের কার্য্যে বিশৃঙ্খল আছে বলিয়াই যে লেখক সেই প্রবন্ধটা রচনা করিতে বসিয়াছিলেন, এ কথা যোগেশ বাবু বুঝলেন্ না কেন? আশা করি যোগেশ বাবু এখন সেটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

* Vide, prof. Apte's "English-Sanskrit Dictionary."

ইংরাজি Revolution শব্দের অর্থপ্রকাশক "আবর্ত্তন" শব্দটা যোগেশ বাবুর মনঃপুত হয় নাই। এখানে তিনি প্রাচীনদের দোহাই দিয়া বলিতেছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই অপর আর একটা শব্দ ব্যবহার করিতেন ;—একজন বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক-লেখকের পক্ষে বরাহমিহির ভাস্করাচার্য্য পাঠ করিয়া পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহ করা এবং তার পর তৎ সাহায্যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রচার করা কতদূর সহজ-সাধ্য যোগেশ বাবু বিবেচনা করেন নাই। তিনি বরাহমিহির হইতে পারিভাষিক শব্দোদ্ধার করিয়া সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করুন, বিদ্বজ্জন-গ্রাহ্য হইলে লেখক অবশ্যই নতশিরে তাহা ব্যবহার করিবে।

বৈদ্যক শাস্ত্রে আমারও মোটেই বুৎপত্তি নাই, কাজেই অধ্যাপক Wilson ও অন্যে প্রমুখ পণ্ডিতগণ ইংরাজি Reumatism ব্যাধির যে প্রতিশব্দ স্থির করিয়া গেছেন, তাহাই অভ্রান্ত বোধে সামান্য বাতের পীড়াকে "বাত ব্যাধি" নামে আখ্যাত করিয়াছি। এই শব্দ প্রয়োগ যদি কোন পাঠক পাঠিকা প্রবন্ধের মর্ম্ম গ্রহণের অন্তরায় বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তবে আমি সেই আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পাঠকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। লেখাটা দুই তিনবার পাঠ করিয়া দেখিলাম, "নির্ম্মল শারদীয়া পূর্ণিমা রজনী" ব্যতীত অপর ঋতুর পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় যে বাত ব্যাধির বৃদ্ধি হয় না, এমন কথা প্রবন্ধের কোন অংশে লিখি নাই। পূর্ণিমায় রোগবৃদ্ধি চান্দ্রাকর্ষণ জন্য হয় বলিয়া আমার বিশ্বাস, তাই সে কথা লিখিয়াছি, শ্লেষাজনক দ্রব্যাহারে বা অপর তিথি বিশেষে রোগ বৃদ্ধির কারণ, আমার আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত বলিয়া তাহার উল্লেখ করি নাই।

"বিষুব মণ্ডল" আকাশে, বায়ুও আকাশে—সেই বিষব মণ্ডলের মধ্যাগত কাল্পনিক সমতলস্থ প্রদেশের বায়ুকে বুঝাইবার জন্য "বিষুব প্রদেশের" বায়ু প্রবাহের কথা লিখিয়াছি। যোগেশ বাবু বোধ হয় শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন, "বিষুব" ও "নিরক্ষ" এই দুই শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থের সহিত লেখক আবাল্য পরিচিত আছেন।

"বায়ু নভোবিদ্যার শৈশব কাল অদ্যাপি উত্তীর্ণ হয় নাই"—একথাটা ত আমি স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছি এবং "স্মরণীয় শারদীয়া পঞ্চমীতে" যে ঝড় হইয়াছিল এখন তাহার কারণ সম্পূর্ণ আবিস্কৃত হইয়াছে, তাহাও ত লিখি নাই, তবে কেন এত বিভ্রাট? ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি কতকগুলি স্থূল প্রাকৃতিক কার্য্যের যে স্থূল কারণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, প্রবন্ধে কেবল তাহারই আভাষ দিয়াছি মাত্র। প্রতিবাদে দেখিলাম যোগেশ বাবু আমার বক্তব্য বেশ বুঝিয়াছেন, তবে কেন এত লেখালেখি?

বঙ্গদেশে পূর্ণিমা অমাবস্যায় হলচালনা নিষিদ্ধ কিনা যখন প্রবাসী যোগেশ বাবুর স্মরণ নাই, তখন সে কথাটা উত্থাপন না করাই উচিত ছিল। ওড়িশার (উড়িষ্যার?) মাপ কাঠিতে বঙ্গদেশ মাপিলে হিসাব ভুল হওয়াই ত সম্ভব। অপরাপর অশুভ দিনের ন্যায় যে সকল দিন জনপ্রবাদমূলে কৃষিকর্ম্মের জন্য নিষিদ্ধ তাহারও একটা তালিকা পাইবার জন্য বিজ্ঞ যোগেশ বাবু পঞ্জিকার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন দেখিতেছি,—পঞ্জিকাকার যদি জনপ্রবাদে চালিত না হইয়া থাকেন, তজ্জন্য কি নিরীহ লেখক দায়ী হইবেন?

চন্দ্রাকর্ষণে বায়ুনভের জোয়াড়-ভাটা হওয়ায় কথাটা যোগেশ বাবুর নিকট নূতন ও সন্দেহজনক ঠেকিয়াছে। একটা অমূলক সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া আমার উক্তিতে অবিশ্বাস করিবার পূর্ব্বে তিনি বায়ুনভো-সম্বন্ধীয় যে কোন এক গ্রন্থ খুঁজিলে, সহজে এই সন্দেহের নিরাশ করিতে পারিতেন। যাহাহউক আশা করি যোগেশ বাবু এখন অধ্যাপক বুকাননের (Prof. A. Buchanon L. L. D. F. R. S. E.) নিম্নোদ্ধৃত উক্তি দৃষ্টে লেখককে ক্ষমা করিবেন ;—Fifteen years hourly observations have been made at Batavia and discussed by the late Dr. Bergsma in their relation to the lunar day, * * * * The result of the enquiry is that the atmospheric pressure has lunar tide as distinctly marked as ordinary diurnal barometric tide except that its amplitude is less."—*Prof. Buchanon's article on Meteorology* Encyclcpædia Britanica vol. xvi. তথাকথিত বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকগণের স্বাধীন পর্য্যবেক্ষণের উপযোগী উদ্যম অধ্যবসায় ও সুযোগ নাই। তবে কেন সেই স্বল্পদর্শিগণ অপর পণ্ডিতগণের আবিস্কৃত তথ্যে বিশ্বাস স্থাপনে কুণ্ঠিত হন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

সৌর বিম্ব হইতে দুই জাতীয় তেজঃ বিকীরিত হওয়ার কথা যোগেশ বাবুর নিকট নূতন ঠেকিয়াছে দেখিতেছি। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ সৌররশ্মিকে তেজোৎপাদক রশ্মি, রাসায়ণিক রশ্মি প্রভৃতি যে কয়েক শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন, আমার প্রবন্ধ পাঠকালে যোগেশ বাবুর মাথায় কেবল সে গুলিরও কথা ঘুরিতেছিল দেখিতেছি। কলঙ্ক বিরলকালে সৌরবিম্ব হইতে যে তেজঃ বিকীরিত হয় তাহার সহিত কলঙ্কাধিক্যকালের তেজের পার্থক্য সূচনা করিবার জন্য জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত বালফর ষ্টুয়ার্টের পন্থায় আমি সৌরতেজকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলাম মাত্র *।

সৌরবিম্বোদ্ভূত দুই জাতীয় তেজের অস্তিত্ব জানিবার জন্য তাপমান যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতে না বলিয়া দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করিতে বলিয়াছি দেখিয়া যোগেশ বাবু বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছেন দেখিতেছি। প্রবন্ধ পাঠকালে বোধ হয় যোগেশ বাবুর স্মরণ ছিল না, যে সৌরবিম্বজাত পূর্ব্বোক্ত তেজদ্বয়ের পার্থক্য তাপমান যন্ত্র দ্বারা সাধারণ উপায়ে ধরিতে পারা যায় না। উক্ত তেজদ্বয়ের পার্থক্য প্রকাশে তাপমান যন্ত্র পরাভূত বলিয়া তাহাদের অস্তিত্ব দর্শনার্থে দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা তেজোৎপাদক সৌরকলঙ্ক পরীক্ষা ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই। অধ্যাপক Balfour Stewart এর নিম্নোদ্ধৃত উক্তি পাঠ করিলে বোধ হয় যোগেশ বাবু স্বীয় ভ্রম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন এবং বর্ত্তমান লেখক যে তাপমান যন্ত্র ও দূরবীক্ষন যন্ত্রের ব্যবহার জানেন তাহাও বোধ হয় বুঝিতে পারিবেন। কলঙ্কাধিক্য কালের সৌরজগতের সম্বন্ধে উক্ত পণ্ডিত বলেন,—"We are unable to confirm these conclusions (i. e about the difference of the properties of the ra s) by direct observasion of the sun's heating power. Actions-metrical determinations have not yet been made with sufficient accuracy and persistance to decide this point experimentally. We have however evidence of indirect nature etc."—*Vide encyclopædia Britanica vol. xvi. P. 181.*

গত বৎসরের সৌর পর্য্যবেক্ষণে একটু নিয়ম ভঙ্গের আভাস পাইয়া যোগেশ বাবু যে সৌর কলঙ্কোৎপত্তির সেই বিখ্যাত কালানুক্রমিকের নিয়মটাকে উড়াইয়া দিবার প্রয়াস করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা বাস্তবিকই স্তম্ভিত হইয়াছি। বহুকালের পর্য্যবেক্ষণের ফল স্বরূপ সেই নিয়মের ঈষৎ ব্যভিচার দেখিয়া, আধুনিক বিখ্যাত দার্শনিকগণের মধ্যে কেহই অদ্যাপি উক্ত নিয়মের অযথার্থতার আভাষ পর্য্যন্তও দিতে সাহসী হন নাই। যোগেশ বাবুর সাহসকে ধন্যবাদ,—যাহা হউক বিজ্ঞ প্রতিবাদকারী স্বীয় মতবাদটী সুধী সমাজে প্রচার করুন, পণ্ডিতানুমোদিত হইলে লেখক তাহা অবনত মস্তকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে।

---

* Vide prof. Balfour Stewart's article on meteorology in the Encyclopædia Britanica (Edinburg Edition) Vol XVI. P. 187.

কয়েকটী অজ্ঞাতনামা পণ্ডিতের দুর্ব্বল পক্ষ অবলম্বন করিয়া, যোগেশ বাবু যে সৌরোৎপাতের সহিত ভূচৌম্বকশক্তির নিত্য সম্বন্ধতা অস্বীকার করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে আমার বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। Bulfour Stewart, Lackyed, Leverrier, Dr. Leyd এবং Chambers প্রমুখ শত শত দেশ বিদেশের জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতগণ বহুবর্ষব্যাপী পর্য্যবেক্ষণের ফলস্বরূপ যে সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন, তাহা "প্রদীপে"র পাঠকপাঠিকাগণের নিকট জ্ঞাপন করিয়া আমি বিশেষ অন্যায় করিয়াছি, তাহা মনে করিতে পারিতেছি না।

প্রবন্ধশেষে যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন, "প্রত্যক্ষসিদ্ধ ফল ব্যতীত কোনও মতই বৈজ্ঞানিক মত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।" আমিও তা'ই বলি,—বিখ্যাত পণ্ডিতগণ বহুবর্ষব্যাপী পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা যে নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন এবং বহু পরীক্ষান্তে যাহা অপ্রাপ্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়া আছে, সামান্য কারণে তাহা অসত্য বলিয়া প্রচার করা বড় দুঃসাহসিকতার কাথা।

প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় মল্লিখিত মতবাদের পরিপোষক যুক্তি সবিস্তারে লিখিতে পারিলাম না এবং তৎ-পোষক সুদীর্ঘ পর্য্যবেক্ষণ তালিকাও উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। সহজে সকল ব্যাপার জানিবার জন্য Encyclopædia Britanica (Edinburgh) অভিধানের সপ্তদশ ভাগস্থিত "বায়ুনভোবিদ্যা" সম্বন্ধীয় অংশটী যোগেশ বাবুকে পড়িতে অনুরোধ করি।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

কবি-সম্ভাষণ।

কিরণের অগ্রদূত যেন পূর্ব্বাকাশে
নম্র পদে আসে;—
পরিপূর্ণ প্রতিভার অসম্পূর্ণ ছবি,
হে কিশোর রবি!
সন্ধ্যাসুন্দরীর রূপে ঢালিয়া পরাণ
কি গাহিলে গান!
কৈশোর স্বপনে ভোর, বন্ধন বিহীন
সাধনা নবীন।
মেঘে মেঘে খুঁজি ফিরে বাঞ্ছিতের লাগি,
আলিঙ্গন মাগি।
ভাষা-ভাবে মাখামাখি, মগ্ন একাকার;
ঝরে গীতধার।

পশিলে যৌবন-বনে নেশা-তৃষা সাথে
বীণাবেণু হাতে।
বদনে অন্তর-রোষ এল ছিন্ন করি'
মানসী সুন্দরী।

জাগি উঠি বঙ্গবাসী পুলকিত চিতে
উন্মাদন গীতে,
দেখিল প্রাণের গান তব কণ্ঠতানে
ধ্বনিত পরাণে।
তাই শত সুখ-দুঃখ আশা সাধমনে
তুমি পড় মনে।
কাব্য-মন্দিরের সেই মানস-মহিমা,
লক্ষ্মীর প্রতিমা।

তার পরে ছুটিয়াছ কোন্ ঊর্দ্ধপানে,
কল্পনা-বিমানে।
চারি দিকে দীপ্ত-রশ্মি পড়ে ঠিকরিয়া,
আঁখি ঝলসিয়া।
বিচিত্র প্রেমের মন্ত্রে প্রিয়ার বন্দনা,
করিছ রচনা।
শত সকরুণ গাথা, মহত্ত্বের ছবি,
অভিনব সবি!
অলোক-আলোকে বসি আজি ঘোষে বাঁশী
পূণ্য শ্লোকরাশি।
হে মহৎ, হে সুহৃৎ, হে বরণ্যে রবি,
নমোনমঃ কবি!

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

প্রবাসে এক রাত্রি।

আবার অনেক দিন পরে হিমালয়ের কথা লিখিতে বসিলাম। আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের অল্প কয়েক বৎসরে হিমালয়ের যে টুকু দেখিয়াছি, সমস্ত জীবন বসিয়া বসিয়া সেই টুকুর বিবরণ দিলেও ফুরায় না; কিন্তু যেটি যেমন করিয়া বলিলে হিমালয়ের মহত্ত্ব রক্ষা পায়, যেটি যেমন করিয়া দেখিলে ঠিক দেখা হয়, তাহার কিছুই আমি পারি নাই। যে গভীর সৌন্দর্য্যবোধ থাকিলে মানুষ গাছের পাতায়, নির্ঝরিণীর কুলকুল্ শব্দে, ক্ষুদ্র একটী পাখীর গানে বিমোহিত হইয়া তাহার বিশ্ববিমোহন চিত্ত মানুষের নয়ন সমক্ষে ধরিতে পারে, সে সৌন্দর্য্য বোধ আমার কোন দিনই ছিল না, এখনও নাই। আমি উদাস দৃষ্টিতে হিমালয়

দেখিয়াছি, সে সৌন্দর্য্য ভাণ্ডারের দ্বারদেশে হা করিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, কত বার সে ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছিল, কত বার সকল সৌন্দর্য্যের দেবতা আমাকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যসাগরে ডুববার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সকল আমার কর্ণে পৌঁছে নাই, সে আহ্বান আমি শুনিতে পাই নাই ; দূরে—বহু দূরে শস্য শ্যামলা বঙ্গভূমির এক নিভৃত অজ্ঞাত পল্লীর ক্ষুদ্র নদী সৈকতের চিতাবহ্নি তখনও আমারও বুকে ছিল, তখনও আমি শয়নে স্বপনে জাগরণে সেই শ্মশান দৃশ্যই দেখিতাম। হিমালয়ের শোভা দেখিবার জন্য চক্ষু চাহিলে আমি সেখানে সেই নদীতীরের শ্মশান দেখিতাম ;—সেই এক দৃশ্য দেশ দেশান্তরে আমার সাথের সাথী হইয়াছিল। এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা, এত অশান্তি বুকে বহিয়া আর কেহ কখন হিমালয় গিয়াছেন কি না জানি না। দেব দর্শনে যাইতে হইলে একাগ্রচিত্ত হইতে হয়, দেবতার মোহন মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে তীর্থযাত্রী অগ্রসর হয় ; আমিও দেব-দর্শনেই যাত্রা করিয়াছিলাম—হিমালয়ের মত এমন দেবতা কোথায় পাইব—এমন ষড়ৈশ্বর্য্যবান, সর্ব্বগুণময়, শোভা-সৌন্দর্য্যের অনন্ত ভাণ্ডার, এমন জাগ্রত জীবন্ত দেবতা কোথায় পাইব ? আমি সেই দেবদর্শনেই গিয়াছিলাম ; কিন্তু না ছিল একাগ্রতা, না করিয়াছিলাম সে দেবতার রূপ ধ্যান ;—তাই আমি দেখিয়া আসিয়াছি গাছ আর পাথর, নির্ঝর আর বঙ্কর ; দেবতার বাহিরের সাজই আমি দেখিয়াছি ; তাঁহার ভিতরে যে কত প্রেম, কত স্নেহ, কত সত্য, কত জ্ঞান, কত অমৃত লুক্কায়িত আছে, তাহা আর আমি দেখিতে পাই নাই। তাই আমার হিমালয় কিছুই হয় নাই, তাই আমার প্রাণের তৃষা কিছুতেই মিটে নাই। হিমালয় আমাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই, হিমালয় আমার প্রাণের জ্বালা দূর করিতে পারে নাই ;—আমি যেমন তৃষিত ছিলাম তেমনই ফিরিয়া আসিলাম। হায় অদৃষ্ট !

তবুও হিমালয়ের কথা লিখিবার সাধ আমার মিটে নাই, কোন দিন মিটিবে কি না ভগবান জানেন। এখনও যে দিন সংসারের সহিত সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হইয়া ক্লান্ত হৃদয়ে সহরের কোলাহল ছাড়িয়া দূর গ্রামের জঙ্গলের ধারে গিয়া উপবেশন করি, তখন কি জানি কাহার আদেশে সেই হিমালয় আমার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়, আর আমি তখন বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে সেই দৃশ্যের দিকে চাহিয়া থাকি। এত সৌন্দর্য্য—এত শোভা—এমন মূর্ত্তি তখন দেখি নাই। তখন দেখিয়াছি শুধু পাষাণস্তূপ—শুধু গাছ পাথর। আর এখন এই বাঙ্গালা দেশের এক প্রান্তে বসিয়া এক এক দিন গগনপটে চিত্রিত দেখি সেই বিরাট মূর্ত্তি! কি বিশাল, কি অপার, কি মহান ! কি নাই ঐ পাষাণ স্তূপের মধ্যে ? জীবতত্ত্বানুসন্ধায়ীর জন্য হিমালয় কত যুগযুগান্তর ধরিয়া কত জীবের কঙ্কাল সযত্নে হৃদয়ে গোপন করিয়া রাখিয়াছেন, প্রকৃতির সঙ্গে কালের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সেই জীব কল্পনাগুলি বহিয়া বেড়াইতেছেন। উদ্ভিদ তত্ত্বজিজ্ঞাসুর জন্য কত তরু লতা গুল্ম শৈবাল, কত ফুল ফল হিমালয় বক্ষে ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন, আর যখন জ্ঞানপিপাসু সে দিকে অগ্রসর হইতেছেন তখনই শাখাবাহু নাড়িয়া স্পষ্ট ভাষায় তাঁহাকে ডাকিতেছেন। খনিবিদ্যা-বিশারদের জন্য কৃপণের মত কত ধন রত্ন, কত কি পাষাণ আবরণে রক্ষা করিতেছেন। আর আমার মত পাপীর জন্য, ক্ষুদ্রচেতার জন্য, পরশ্রীকাতরের জন্য দাঁড়াইয়া আছেন ঐ অভ্রভেদী হিমালয়, কি উন্নত ঐ দেবতার মস্তক, কত প্রেম মন্দাকিনী ঐ পাষাণ হৃদয়ের মধ্যে প্রবাহিত, কি উদার কি সহানুভূতি মাখা ঐ দেবমূর্ত্তি। অভ্রংলিহ হিমা-লয়ের দিকে চাহিলে বুঝিতে পারি আমি কত ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। এত বড় হিমালয় নীরবে নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া আছেন, নীরবে নিজের কাজ করিয়া যাইতেছেন, নীরবে বিধাতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছেন। আর ক্ষুদ্র—এত টুকু আমি—আমার আগমনে আমার দাপাদাপিতে প্রতিবেশী অস্থির ; আমার আত্মম্ভরিতার গর্ব্বে বন্ধুবান্ধব অতুষ্ট, আমার স্বার্থপরতার দুর্গন্ধে মনুষ্যত্ব নামক পদার্থটী নাকে কাপড় দিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। অবনতি আর কাহাকে বলে ?

তবুও হিমালয়ের কথা বলিব—যে কয় দিন বাঁচিয়া থাকিব—যে কয় দিন জিহ্বা স্ববশে থাকিবে—যে কয় দিন লেখনী ধারণের ক্ষমতা থাকিবে—সে কয় দিন ঐ কথাই বলিব। আর যে দিন জীবনদীপ নিবিবার জন্য প্রস্তুত হইবে—যে দিন আত্মীয় বন্ধু বান্ধব নারায়ণের নাম শুনাইবে—সেই দিন—সেই মুহূর্ত্তে যদি একবার—এক নিমিষের জন্য জ্ঞান সঞ্চার হয়—তখনও এক বার প্রাণপণে 'হিমালয়'

নামটী মুখে লইয়া এ পাপ জীবন শেষ করিব, এ অপবিত্র রসনা ঐ নাম উচ্চারণ করিয়া নীরব হইবে। কেন?—সেই কথা বলিবার জন্যই আজ এই চেষ্টা। Sentiment স্রোতে পড়িয়া কথা বলিতেছি না—ও জিনিষটা আমার নাই। ক্ষুধিত, তৃষিত, তাপিত প্রাণে Sentimentএর স্থান নাই।

একদিন আমি আমার দেরাদুনের প্রবাসগৃহের ক্ষুদ্র পাঠমন্দিরে বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলাম, পুস্তকখানি নভেল। বেলা তখন তৃতীয় প্রহর, সমস্ত সহর নিস্তব্ধ, জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রচণ্ড রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, আকাশ হইতে অগ্নি বৃষ্টি হইতেছে। এমন রৌদ্রতাপ যে, কাহারও ঘরের বাহির হইবার সাধ্য নাই; পাখী পর্য্যন্ত ও ডাক ভুলিয়া গিয়াছে। আমি যে পুস্তকখানি পাঠ করিতেছিলাম তাহা প্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক বুলওয়ার লিটনের লিখিত Zanoni। আমি একাগ্রচিত্তে পুস্তকখানি পাঠ করিতেছিলাম, সমস্তটা পড়া শেষ না করিয়া আসন ত্যাগ করিব না স্থির করিয়া বসিয়াছিলাম। জ্যাননীর জীবনের ঘটনাবলী আমাকে অত্যন্ত অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল।

বেলা চারিটার সময় পুস্তকখানি পড়া শেষ হইল। পড়া শেষ হইল বটে, কিন্তু কত চিন্তা, কত ভাবনা যে আমার এই ক্ষুদ্র মস্তকের মধ্যে আসিয়া জুটিল তাহার আর সীমা নাই। আমি ধারাবাহিক রূপে কিছুই ভাবিতে পারিতেছিলাম না; একটা কথা যখন ভাবিতে যাই তখন আর একটা কথা আসিয়া উপস্থিত হয়। জ্যাননার চরিত্র আমাকে এক বিষম সমস্যার মধ্যে লইয়া উপস্থিত করিয়াছিল; আমি কোন কথারই মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া পাঠগৃহ ত্যাগ করিলাম। তখন আর বাসায় বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হইল না। ধীরে ধীরে ভ্রমণে বাহির হইলাম; তখনও রৌদ্রের তাপ বেশ আছে; কিন্তু আমি আর সে দিকে দৃক্‌পাত করিলাম না। প্রখর রৌদ্র মাথায় করিয়াই বাহির হইলাম। কোথায় যাইব তাহার স্থিরতা নাই—ভ্রমণে বাহির হইলে কোন দিনই আমার গন্তব্য স্থান পূর্ব্বে স্থির করিতে পারিতাম না; বাসার বাহির হইয়া যে দিকে হয় এক দিকে চলিয়া যাইতাম। আজও তাহাই করিলাম। বাসার নিকটেই একটা নদী—নদীর নাম বিচপানা। নদী বটে কিন্তু তাহাতে জল নাই—নদী গর্ভ একেবারে শুষ্ক। যখন পাহাড়ে খুব বৃষ্টি হয় তখনই সেই বৃষ্টির জল এই নদী দিয়া বহিয়া চলিয়া যায়; সে সময়ে আর কেহ নদী পার হইতে পারে না, তখন স্রোতো এমনই তেজ হয়! তাহার পর আবার সব শুকাইয়া যায়। আমি এই জলহীন বিচপানা নদী পার হইয়া অলস মন্থর গমনে নাগাথানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিছু দূরেই শ্মশান ভূমি। আমার পরিচিত বন্ধু বান্ধব দুই চারিজনের চিতাভস্ম এখনও সেখানে রহিয়াছে। আমি সেই শ্মশান ভূমিতে উপস্থিত হইলাম এবং প্রস্তর নির্ম্মিত একটা ক্ষুদ্র সমাধি মন্দিরের ছায়ায় উপবেশন করিলাম। সে সময়ে আমার মনের যে প্রকার অবস্থা তাহাতে এই শ্মশান আসনই ঠিক হইয়াছিল! সেখানে বসিয়া কত আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম—না আছে তাহার শৃঙ্খলা, না আছে তাহার কিছু। শেষে যেন ভাবনাও নিজের খেই হারাইয়া ফেলিল; আমি শূন্য হৃদয়ে সেখানে বসিয়া যেন কি করিতে লাগিলাম!

হঠাৎ নিকটের একটী শাল বৃক্ষ হইতে একটা পাখী কাঁদিয়া উঠিল—সত্যই পাখী প্রাণের গভীর আবেগে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। পাখী যখন মনের আনন্দে গাছের ডালে বসিয়া ডাকে তখন সে রব শুনিলে প্রাণ জুড়ায়; কিন্তু এ পাখীত তেমন ডাকিল না, শ্মশানের সঙ্গী পাখী অস্তোন্মুখ গোধূলীর দিকে চাহিয়া কাতর কণ্ঠে হিমালয়ের নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল! আমি সেই ক্রন্দন শব্দে শিহরিয়া উঠিলাম; চাহিয়া দেখি দূরে পাহাড়ের কোলে সূর্য্যদেব অস্ত যাইতেছেন, শালবনের মধ্যে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে।

গৃহে ফিরিবার অভিপ্রায়ে শ্মশান ভূমি ত্যাগ করিলাম। কিছু দূর আসিয়া আবার মতি ফিরিয়া গেল, একবার গুরখা স্মৃতিস্তম্ভ দেখিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। তখন সন্ধ্যা হয় হয়, অন্ধকার একটু একটু করিয়া নামিয়া আসিতেছে। আমি সহরের পথ ছাড়িয়া আবার দক্ষিণ দিকের একটা পথ ধরিলাম। কলুঙ্গার যুদ্ধের স্মৃতি রক্ষার জন্য, গুরখা বীর বলভদ্র সিংহের অতুলনীয় বীরত্বের সম্মান প্রদর্শনের জন্য, মহাশয় ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট পর্ব্বতের পাদদেশে এই

স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। স্থানটী বড়ই নির্জ্জন, কেহ বড় একটা সেখানে যায় না।

আমি যখন স্তম্ভের নিকট উপস্থিত হইলাম তখন অন্ধকার হইয়াছে। পথ ঘাট আমার পরিচিত। যদিও কৃষ্ণ পক্ষের রাত্রি তবুও আমার ভয় হইল না। একাকী সেই স্তম্ভের সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইলাম, শরীর বড়ই অবসন্ন বোধ হইতে লাগিল, সে স্থান হইতে নড়িতে ইচ্ছা করিল না। স্তম্ভের চারি পার্শ্ব রেলিং দ্বারা বেষ্টিত; একটা দ্বার আছে, তাহাতে চাবি বন্ধ, সুতরাং সেখান দিয়া ভিতরে প্রবেশ করা যায় না। আমি সেই রেলিঙ্গে পৃষ্ঠ দিয়া বসিয়া পড়িলাম। আমি কোন দিন পথ হাঁটিয়া এত অবসন্ন হই নাই। আমার অবসন্নতা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল; নিজের শরীরের শক্তি যেন অপহৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ক্রমেই অন্ধকার গাঢ় হইতে লাগিল; আমার বাসাও সেখান হইতে প্রায় দেড় মাইল; পথে জঙ্গল নাই; বরাবর রিচপানা নদীর ভিতর দিয়া গেলেই বাসার সম্মুখের রাস্তায় যাইয়া উঠিতে পারি; কিন্তু পা দুখানি আজ এই অসময়ে আমাকে জবাব দিয়া বসিল। বুঝিলাম, এই রাত্রিটা এই স্তম্ভের পার্শ্বেই কাটাইতে হইবে। তাহাতে আমার বড় আপত্তি ছিল না; কোন রকমে দিন রাত্রি কাটিয়া গেলেই বাঁচিতাম। বাসায় তখন এমন কেহ ছিল না, যে আমার পথ পানে চাহিয়া থাকিবে। বঙ্গের ক্ষুদ্র গ্রামে সে সব রাখিয়া আসিয়াছি।

তখন ধরাসন ত্যাগ করিয়া রেলিঙ্গের উপর চড়িয়া ভিতরে লাফাইয়া পড়িলাম। রাত্রিকালে হিংস্র জন্তু আসিলেও আমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না; সঙ্গে যে বস্ত্র ছিল তাহাতেই রাত্রি কাটিয়া যাইবে। রাত্রে কি খাইব সে কথা তখন আমার মনেই হয় নাই। এমন অবসন্ন শরীরে ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ থাকে না।

আমি ভিতরে প্রবেশ করিয়াই শুইয়া পড়িলাম। সেই নির্জ্জন স্থানে হাত পা ছড়াইয়া শয়ন করিয়া বেশ আনন্দ অনুভব করিলাম। মাথার উপর আকাশে দূরে দূরে তারকা-রাজি ঝিক মিক্ করিতেছে, চারিদিকে উন্নত কায় শালবৃক্ষ সকল প্রহরীর ন্যায় নিঃশব্দে দণ্ডায়মান, দূরে নদীর ভিতরে চুণওয়ালাদিগের চুণের পাঁজা হইতে যে আগুনের হলকা বাহির হইতেছিল তাহারই আলোক কথঞ্চিৎ দেখা যাইতেছিল। জন সমাগম শূন্য সেই স্মৃতি স্তম্ভের পার্শ্বে বসিয়া সেই অন্ধকারের মধ্যে আমিও ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিশিয়া যাইতে লাগিলাম। কেমন একটা মোহের ভাব আমাতে উপস্থিত হইতে লাগিল।

আমি তখন দেশ কাল পাত্র ভুলিয়া গেলাম। কোথায় যে বসিয়া আছি তাহা পর্য্যন্তও ভুলিয়া গেলাম। মনে হইল আমি যেন একটা অন্ধকারের সাগরে পড়িয়াছি; চারিদিকে —উত্তরে দক্ষিণে পূর্ব্বে পশ্চিমে, উর্দ্ধে অধোদেশে আর কিছু নাই—শুধু অন্ধকার—গাঢ় অন্ধকার! সেই অন্ধকার সাগরে আমি সন্তরণ করিতে লাগিলাম। দুই হাতে সেই পুঞ্জীভূত অন্ধকার ঠেলিয়া যেন আমি অগ্রসর হইতে লাগিলাম। জলের মধ্যে মানুষ যেমন সাঁতার কাটে, আমি এই অন্ধকার রাশির মধ্যে সাঁতার কাটিতে লাগিলাম; সজোরে দুই হাতে অন্ধকার ঠেলিতে লাগিলাম; কে যেন আমার দুই বাহুতে অমিত বল সঞ্চার করিয়া দিল। মনে হইল যেন এই অন্ধকার রাশি ঠেলিয়া ফেলিতে পারিলে, ইহার পারে—ইহার শেষ সীমায় মহা আলোকের রাজ্য! কোন প্রকারে চেষ্টা করিয়া এই অন্ধকার ভেদ করিয়া যাইতে পারিলেই আলোকের রাজ্যে পৌঁছিতে পারা যায়; তাই প্রাণপণ আগ্রহে আমি সাঁতার কাটিতে লাগিলাম।

ক্রমে যেন অন্ধকার কমিয়া যাইতে লাগিল; ক্রমে যেন গাঢ়তা হ্রাস হইতে লাগিল; অন্ধকারের ভিতর দিয়া দূরে, অতি দূরে যেন জ্যোতিঃর রেখার বিকাশ দেখিতে পাইলাম। তখন প্রাণে আরও বল হইল, সাহস যেন আরও বাড়িয়া গেল, বাহুতে যেন দ্বিগুণ শক্তি সঞ্চারিত হইল। আমার মনে হইল কে যেন আকাশ পাতাল ধ্বনিত করিয়া সমস্ত বিশ্ব প্লাবিত করিয়া, গভীর অন্ধকার মথিত করিয়া বলিতেছে "ঐ, ঐ, চল, চল"। আমি ক্রমেই আলোক রাজ্যের নিকটবর্ত্তী হইলাম, আমার চক্ষু যেন আলোকে ঝলসিয়া যাইতে লাগিল; ক্রমে অন্ধকার রাশি অপসারিত হইতে লাগিল, আমার গতি মন্থর হইতে লাগিল। আমি একেবারে মহা আলোকের মধ্যে যাইয়া পড়িলাম— আমার সংজ্ঞা লোপ হইল।

যখন আমার জ্ঞান সঞ্চার হইল তখন দেখি প্রভাত হইয়াছে; চারিদিকে চাহিয়া দেখি, আমি সেই স্তম্ভ পার্শ্বেই শয়ন করিয়া আছি; কোন্ দিক দিয়া রাত্রি চলিয়া গিয়াছে

তাহা আমি জানিতেও পারি নাই। হাত পা আর নাড়িতে পারি না। ভয়ানক পরিশ্রম করিলে শরীরে যেমন বেদনা হয় আমারও হাত পায়ে সেই প্রকার বেদনা হইয়াছে।

প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া উঠিয়া বসিলাম, চারি দিকে নানা জাতীয় পক্ষী প্রভাতী গান ধরিয়াছে, পূর্ব্বকাশে আলোক দেখা দিয়াছে, কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর চন্দ্র অস্তগমনোন্মুখ হইয়াছে।

হঠাৎ পূর্ব্ব রাত্রির সেই অন্ধকার সমুদ্রের কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। চারিদিকে চাহিয়া দেখি তখনও সমুদ্রের চিহ্ন রহিয়াছে, তখনও বৃক্ষের গোড়ায় আমার সেই পূর্ব্ব রাত্রের অন্ধকার জমিয়া রহিয়াছে। কিন্তু কোথায় সেই আলোক!

তাহার পর কতদিন এমনই করিয়া অন্ধকার ঠেলিয়াছি, এখনও অন্ধকার রাত্রে একাকী বসিয়া বসিয়া তেমনি করিয়া দুই হাতে অন্ধকার ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে চাহি। এখনও কত অন্ধকার রাত্রে নির্জ্জনে বসিয়া সেই আলোক দেখিবার জন্য এই অদ্ভুত সাধনা করি, এই অন্ধকার সাগরে সাঁতার কাটি, কিন্তু সে আলোকের মধ্যে আর পৌঁছিতে পারিলাম না! এক দিনও সে আলোকের সামান্য রেখাও দেখিতে পাইলাম না।

সেই রাত্রে হিমালয়ের নিকট হইতে যে সাধনা শিক্ষা করিয়াছি তাহা আর এ জীবনে ভুলিতে পারিলাম না। একদিনও আলোক দর্শন হইল না, কিন্তু যখন একাকী নির্জ্জনে বসি তখনই সেই আলোক দেখিবার জন্য আঁধার রাশি ঠেলিতে থাকি। তাই হিমালয় এমন করিয়া আমার হৃদয়ে গাঁথিয়া গিয়াছে। মনে হয় আবার যদি তেমনি করিয়া সেই স্থানে যাইতে পারি, তেমনই করিয়া বসিতে পারি, তাহা হইলে হয় ত আবার সেই আলোক দেখিতে পাইব!

আর সেই স্মৃতি স্তম্ভ মূলে বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। অবশ শ্রান্ত শরীর চলিতে চাহে না, ক্ষুধা তৃষ্ণা যেন কোথা হইতে আসিয়া আমাকে চাপিয়া ধরিল। আমি ধীর পদে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া নগরাভিমুখে আসিতে লাগিলাম। নদীর মধ্যে নামিয়া একটু অগ্রসর হইলেই দেখি, একটী হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক দূর গ্রাম হইতে একটা কলসী মাথায় লইয়া আসিতেছে। আমি তাহারই অপেক্ষায় সেই নদীগর্ভে প্রস্তরের মধ্যে বসিয়া পড়িলাম। সেও আমাকে দেখিয়া আমার দিকেই আসিতে লাগিল; এবং আমার নিকটে আসিলে তাহার মাথায় কি জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল তাহার মাথার কলস দুগ্ধে পরিপূর্ণ। দূরের ঐ গ্রামে তাহার ঘর, সে প্রত্যুষে প্রতিদিন দেরাদুনের সাহেব দিগের বাড়ীতে দুগ্ধ যোগান দেয়; তাই এই প্রত্যুষে সহরে যাইতেছে। আমি তাহার নিকট কিছু দুগ্ধ প্রার্থনা করিলাম এবং তাহার মূল্য দিতে স্বীকার করিলাম। তখন আমার কাছে একটী পয়সাও ছিল না, সে কথাও তাহাকে



বলিলাম; দুগ্ধের মূল্যের জন্য তাহাকে আমার সঙ্গে বাসায় যাইতে হইবে, অথবা সে যদি তখন যাইতে না পাবে তবে তাহার দুগ্ধ বণ্টন শেষ হইলে ঘরে ফিরিবার সময়ে করণপুরে পূরণ সিংহের কুঠীতে বাঙ্গালী বাবুর নিকটে গেলেই দুগ্ধের দাম পাইবে। স্ত্রীলোকটী বলিল সে আমাকে আধ সেরের বেশী দুগ্ধ দিতে পারিবে না। আমি তাহাতেই সম্মত হইলাম; কিন্তু সে তাহার দুগ্ধের চোঙ্গাটী মুখে লাগাইয়া দুগ্ধ পান করিতে দিতে অস্বীকার করিল। আমি অন্য উপায় না দেখিয়া অঞ্জলি বদ্ধ করিলাম, সে আমার সেই অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া দুগ্ধ ঢালিয়া দিতে লাগিল, আর আমি প্রাণ ভরিয়া সেই অমৃত পান করিতে লাগিলাম। আধ সের দুগ্ধ আমি পান করিতে পারিলাম না; অল্পেতেই আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইয়া গেল। ফিরিবার সময় পয়সা লইয়া যাইবে বলিয়া সে তাড়াতাড়ি নদী পার হইয়া সহরের দিকে চলিয়া গেল; আমি তখন সেই উপলাসন ত্যাগ করিয়া বাসার দিকে আসিতে লাগিলাম।

বাসায় পৌঁছিলে মাষ্টারজী আমার কোথায় রাত্রিবাস হইল সেই সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন; আমার পক্ষে মধ্যে মধ্যে বনে জঙ্গলে রাত্রি কাটান নূতন ব্যাপার নহে; সুতরাং তিনি যখন শুনিলেন যে আমি দূরের সেই স্মৃতি স্তম্ভ তলে রাত্রি কাটাইয়াছি, তখন তিনি নানা গল্প জুড়িয়া দিলেন; মাষ্টারজী থিওসফিষ্ট দলভুক্ত ছিলেন; তিনি অনেক অতিপ্রাকৃত ব্যাপারে ঘোর আস্থাবান; সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে সেই প্রকারের অনেক কথা শুনিলাম। আমি কিন্তু তাঁহাকে পূর্ব্ব রাত্রের ঘটনা কিছুই বলিলাম না। অনেক দিন পরে দুই একজন বন্ধুর নিকট এ গল্প করিয়াছি; আর আজ প্রদীপের পাঠকগণের নিকট আমার প্রবাসের সেই এক রাত্রির ঘটনা বিবৃত করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

শ্রীজলধর সেন।

কিন্তু ও এবং

কিন্তুর উক্তি।

আমার নাম "কিন্তু", আমার সঙ্গে আবার চালাকী? আমার মাথায় পাগড়ী হাতে মুগুর, তুমি যদি শতস্কন্ধ রাবণও হও, তবু এক ঘায়ে আমি তোমার মাথা চূর্ণ করিব। আমার মাথা ভাঙ্গে সাধ্য কা'র? "এবং" ভায়া ভেবেছিলেন কিনা আমার চক্ষে ধূলি দিবেন, তা বুঝেন নাই যে আমার সারাটী শরীরেই চক্ষু, এমন কি আমাকে চক্ষু বিশেষ বলিলেই হয়, আমার সঙ্গে আবার লুকোচুরী? জগতে যা কেউ দেখে না আমি রাত দিন তাই দেখে বেড়াই। তোমরা হয়ত আকৃতি দেখে প্রকৃতির বিচার কর, তোমাদের মহাকবি বলেছেন "আকৃতি সদৃশ প্রজ্ঞঃ", তাই তোমরা ধরে বসেছ—যার আকৃতি ভাল তার প্রকৃতিটীও ভাল। কিন্তু তোমাদের কবি ত সে কথা বলেন নাই, তাঁর নায়কের যে আকৃতির মতন বুদ্ধিটী, তিনি সেই কথাই বলেছেন। তোমরা কিন্তু একটা সংস্কৃত কথা পেলেই তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আপনার মনোমত করে প্রয়োগ কর। তোমাদের অত সংস্কৃতানুরাগের দোষেই "এবং" আজ প্রবঞ্চনা কর্ত্তে গিয়ে ফাঁদে পড়ে গিয়েছেন। ভায়ার আকৃতিটী দেখিয়া তোমরা মনে করিতে পার—"আহা, ছেলেটী বড় লাজুক বড় নম্র, কেমন মাথাটী হেঁট করে উহার চলা বলা।" কিন্তু তোমরা নিশ্চিত জানিও যে উহার হেঁট মাথা, নম্রতা বা লাজুকতার পরিচায়ক নহে, উহা নিদারুণ বোঝা বওয়ারই ফল। আগে ভায়ার ইতিহাসটা শুন।

অনেক দূর থেকে আমি দেখতে পেলেম, "এবং" ভায়া মাথাটী হেঁট ক'রে কিন্তু বুকটা বেজায় সটান রেখে বড়ই তেজে ছুটে আসছেন। তোমরা জানো আমি কাহারও সটান বুক দেখতে ভাল বাসিনা। তখনই মনে হলো এক মুগুরে ওর মাথা চূর্ণ করে ফেলি। কিন্তু গলায় একটা অনুস্বার রূপী যজ্ঞ সূত্র দেখে ব্রহ্মবধ কর্ত্তে হঠাৎ সাহস হলো না, একটু নিকট হলে একটু তীব্র দৃষ্টি করে দেখি, লোকটার আকৃতিটী ব্রাহ্মণের বটে, কিন্তু প্রকৃতিটা ষোল আনাই ম্লেচ্ছ, একেবারেই বিদেশী।* ভায়া ম্লেচ্ছ হ'য়ে ব্রাহ্মণ সেজেছেন। তোমাদের মনে একটা সন্দেহ হ'তে পারে, ইংরেজ রাজত্বের প্রভাবে ও ইউরোপীয় সভ্যতার চাকচিক্যে আজকাল হিন্দু সন্তানগণই টিকির উপর হ্যাট আঁটিয়া সাহেব সাজিতেছে, সাহেব যে ব্রাহ্মণ সাজিবে তাহার ত কোনও কারণ দেখা যায় না। কারণের খোঁজ রাখা আমার অভ্যাস নাই; আমি উপস্থিত লইয়াই ব্যস্ত, পূর্ব্ব-

* সংস্কৃত এবম্ শব্দ ও বাঙ্গলা এবং শব্দ একার্থবোধক নহে। বাঙ্গলা এবংএর অর্থ ঠিক ইংরাজী and এর মতন।

বর্ত্তী পরবর্ত্তীর তেমন ধার ধারি না, কাজেই আমি উচিত কথা বলিয়া যাইব। বর্ত্তমানে আমি দেখিতে পাই, যে কারণেই হউক অনেক ইউরোপীয় ম্লেচ্ছ হিন্দু সাজিতে ইচ্ছুক। প্রমাণ দেখ "ভট্ট মোক্ষমূলর শর্ম্মণঃ", এটার মধ্যেও একটু গঙ্গা যমুনা আছে কিন্তু "শ্রীমতী নিবেদিতা" একেবারেই পরিষ্কার। অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই; ইহারা কিছু আধুনিক "এবং" ভায়া কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী এইমাত্র পার্থক্য। প্রকৃত ঘটনা এই যে এণ্ড্ (and) মহাশয় ইউরোপীয় ভাষা সমাজে নগদা মুটের কার্য্য করিতেন। সাহিত্য রঙ্গভূমে যেখান হইতে যাহা কিছু টানিয়া বহিয়া আনিতে হইবে, ভাষা রাণীর হুকুম মত ইহার ঘাড়েই সমস্ত চাপান হইত। সেখানে ইহার নিস্তার থাকার উপায় ছিল না। একই বোঝা শতবার বওয়া, এক রাস্তায় শতবার হাঁটা, কেবল টানাটানি হাঁটাহাঁটি আর বোঝা লইয়া হুজুরে হাজির হওয়াই ইহার কর্ম্ম। বেচারী একঘেয়ে খাটুনী খাটিয়া খাটিয়া বড়ই হয়রাণ হইয়া পড়িল। যখন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যব্যপদেশে এদেশে আসে, ভায়া তখন খালাসী সাজিয়া লুকাইয়া সেই সঙ্গে আসিলেন। এখানে আসিয়া বুটজুতা আর হ্যাটকোট পরিত্যাগ করিয়া কটকী চটী ও যজ্ঞ সূত্র গ্রহণ করেন। ও দেশে বোঝা বহিয়া ঘাঁড়টী হেঁট্ হইয়া গিয়াছিল সেইটাকে ব্রাহ্মণ্য বিনয়ের চিহ্ন ব'লে প্রকাশ করেন। কিন্তু ইংরাজ জাতির গর্ব্বোন্নত সটানবক্ষ ত আর ঢাকিবার উপায় নাই, উপবাস করিয়াও বুক ফুলাইয়া চলা উহাদের অভ্যাস, আমি সেইটা ধ'রেই ভায়াকে চিনে ফেল্লেম, ভায়ার গায়ে যে জোর তত জোর ইংরাজ ভিন্ন বাঙ্গালীর সম্ভবে না। ঘাঁড়টী যেন হাতীর শুঁড়, দেখ্তে যেমন কাজেও তেমন। ইহার অধ্যবসায়কে বলিহারি যাই। শরীরখানি দেখে আর প্রকৃতিটী বুঝে আমি ভাবলেম এ জানোয়ার মারা অপেক্ষা পোষা ভাল। বাল্য কাল হইতে আমার স্বভাব এই যে আমি গড়া জিনিস ভাঙ্গতে বড় ভালবাসি। বিধাতা আমার বাহুতে এমন শক্তি আর হাতে মুগুর দিয়াছেন, জগতে এমন কোনও কঠিন বস্তু নাই যাহা আমি এক আঘাতে ভাঙ্গিতে না পারি! "এবং" কে পেয়ে আমার ভারি একটু আনন্দ হলো। ভাবলেম, লোকটা যদি রাশি রাশি জিনিস টেনে এনে জড় করে, আর আমি যদি ব'সে ব'সে এক এক ঘায়ে সব ভাঙ্গতে পারি, তবে বড়ই মজা হয়। সেই হইতে আমি প্রায়ই এবংএর পেছনে লেগে আছি। ভায়ার সারাদিনের পরিশ্রম আমি এক ঘায়ে পণ্ড করি। আবার ওরই দুঃখে গান গাই, একটী গানের নমুনা দিয়া আমি তোমাদের নিকট আজ বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

গান।

এবংএর দুঃক্ষে দেখে বক্ষ ফাটে—
বেচারী, ফাটিয়ে ছাতি, দিবারাতি
নগ্দা মুটের খাট্নি খাটে।
আগে ভায়ার ছিল না সে জ্ঞান,
ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ভান্তে হবে ধান,
সাত সাগরের পার হলেও, বিধি লিপি তায় না কাটে,
হায়রে যেমন বাঙ্গালীর অভাগ,
হাজার ধু'লেও যায় না ভালের দাদখেরি দাগ।
সাহেব সেজে লাঞ্ছনা সার, ঢাকবে কত কোটে হ্যাটে।

এবংএর উক্তি।

তোমরা এতক্ষণ 'কিন্তু' ভায়ার বক্তৃতা শুনিলে এখন আমার দুটী কথা শুন। আমার নাম "এবং", তোমরা জান যে যাহারা কাজের লোক তাহারা বেশী কথা বলে না। আমার বক্তৃতা অভ্যাস নাই, তবু "কিন্তু" ভায়ার সম্বন্ধে দুচারিটী কথা না বলিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ভায়া যেরূপ অহংকার করিতেছেন তাহা দেখিলে বোবারও মুখ ফোটে। ভায়ার চরিত্রটী অতি চমৎকার। আমাদের ভাষা সমাজে এমন কেউ নাই, যে নাকি ভায়াকে বিশ্বাস করে! ভায়া যেখানে এগিয়ে বসেন, অন্য দশজন সেখান থেকে সরে দাঁড়ায়, এমনই চরিত্রের আকর্ষণ! বাজারে খৃষ্টান প্রচারকের মতন ইহাকে সকলেই পাশ কাটিয়া পালায়। হাঁ কে না করা, আর না কে হাঁ করা ইহার অভ্যাস। দশজন যাহা বলিবে তাহার বিপরীত কিছু একটা ভায়াকে বলিতেই হইবে। ইহার দুহাতে দুটী তুলী আছে—তার একটীতে শাদা রং, অপরটীতে কাল রং মাখানো থাকে। ভায়া কাহারো কালমুখ দেখিলে তাহাতে শাদা রঙ্গের তুলী, আর কাহারো শাদা মুখ দেখিলে তাহাতে কাল তুলী চালাইয়া থাকেন। তোমরা বলিতে পার, যে ব্যক্তি কালকে শাদা করে সেত ভাল লোক। মনে রাখিও কাহারও ভাল করা 'কিন্তু' ভায়ার উদ্দেশ্য নহে, একটা উলট্ পালট্ করাই ইহার মতলব। এক কলসী গোদুগ্ধের মধ্যে এক বিন্দু গোমূত্র যেমন সর্ব্বনাশক, আমাদের বহুযত্নকৃত সাজানো গোজানো সুন্দর পদাবলীর মধ্যে কিন্তুও তেমনি মারাত্মক। আমরা প্রাণপণ যত্নে হরিদাসী বৈষ্ণবীকে কতই না সুন্দর করিয়া সাজাইলাম,

কোথা হইতে ঐ হিংসুক কিন্তুটা আসিয়া একদম তাহাকে ‘হ্যাক্ ছি’ করিয়া ফেলিল। কোনও গ্রামে হরি ঠাকুর নামে একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিত। তাহাকে খাওইয়া কেহ কখনও সুখ্যাতি লাভ করিতে পারিত না। খাদ্য বস্তুর একটা না একটা দোষ কীর্ত্তন সে করিবেই। এক দিন এক নিমন্ত্রণে সকলে আহার করিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। বলিল এমনই উৎকৃষ্ট রান্না হইয়াছে, মনে হয় যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা পাকশালে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। হরি ঠাকুর বলিল, “কথা সত্য বটে ‘কিন্তু’ পায়েসটায় আর একটু মিষ্টি বেশী হইলেই খারাপ হইত,” সেই দিন হইতে হরি ঠাকুরকে সকলে “কিন্তু ঠাকুর” বলিয়া ডাকিত। ইহাতেই তোমরা কিন্তু ভায়ার চরিত্রটী বুঝিতে পারিবে। যাহারা পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া খায় তাহাদের অহঙ্কার কিছু বেশী থাকে। যাহারা কোনও কাজে আসে না তাহারা সকল কাজেই বাধা দিয়া থাকে। তোমাদের বঙ্গদেশে “এবং” অপেক্ষা ‘কিন্তুর’ সংখ্যা অনেক বেশী। সংবাদ পত্র মহলে, কংগ্রেস মণ্ডপে, ধর্ম্ম সমাজে, সমাজ সংস্কার সভায়, অনেক “কিন্তু” দেখিতে পাওয়া যায়। তা ছাড়া কতকগুলি “কিন্তু” কোনও দলেই থাকে না, তাহারা নিঃসঙ্গ ঘুরিয়া বেড়ায় এবং সকল নৈবিদ্যেই সুবিধা বুঝিয়া ঠোকর মারে।

কিন্তু ভায়ার দুই প্রকার আকৃতি। একটী সাকার, একটী নিরাকার। যেখানে কিন্তু কিছু বলেন, সেখানে তাহার মূর্ত্তি সাকার। যেখানে কিছু বলেন না, কেবল আবির্ভূত হইয়া চুপ করিয়া থাকেন সেখানে তাহার মূর্ত্তি নিরাকার। সাকার অপেক্ষা নিরাকার মূর্ত্তি অধিকতর ভয়াবহ। সাকারের একটা সীমা আছে, নিরাকার যে অসীম। সেই অসীমের মধ্যে না ভাবিয়া লওয়া যায় এমন কিছুই নাই। আমরা অনেক কষ্টে একটী লোককে অনেক অলঙ্কারে সাজাইলাম। বলিলাম সে ব্যক্তি ধনী এবং জ্ঞানী এবং দেশ হিতৈষী।’ তোমার মনে যাই সে ব্যক্তি সম্বন্ধে একটু ভাল ভাবের সঞ্চার হইল অমনি খপ্ করিয়া যেথানে ‘কিন্তু’র আবির্ভাব। ভায়া বলিলেন “কিন্তু লোকটা যশোলিপ্সু।” এইটী কিন্তুর সাকার মূর্ত্তি। আর ভায়া যখন যশোলিপ্সু প্রভৃতি কিছু না বলিয়া কেবল কিন্তু রূপেই বসিয়া থাকেন তখন সে লোকটার যে কতই দোষ, সে যে কত গো হত্যা ব্রহ্ম হত্যা করিয়াছে, তাহা ত ভাবিয়াই অন্ত করা যায় না। ইহাই ভায়ার নিরাকার মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিটী লইয়া অনেক খল স্বভাবের লোকেরা বিলক্ষণ স্বার্থ সিদ্ধি করিয়া থাকে, যেথানে কোনও যুক্তি নাই, প্রমাণ নাই, ধরিয়া ছুঁইয়া দেখাইবার কিছু নাই, অথচ অন্যায় রূপে কাহারও নিন্দা কি প্রশংসা করিতে হইবে, সেই থানে কৈফিয়ৎশূন্য নিরাকার কিন্তু মূর্ত্তিটী বসাইলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। আমরা বলিলাম রাম বাবু পিতৃ ভক্ত এবং বদান্য ব্যক্তি। যদি তোমার রাম বাবুকে অপদস্থ করিতে হয় এবং তাঁহার কোনও দোষ জ্ঞাত না থাক, একটু মৃদু হাসিয়া ‘কিন্তু’ ভায়ার নিরাকার মূর্ত্তিটী বসাইয়া দাও—তোমাকে কিছু বলিতে হইবে না, অথচ যাহারা শুনিবে তাহারা বুঝিবে, রাম বাবুর কিছু নিগূঢ় চরিত্রদোষ আছে। আবার রঘু ডাকাইতের কথায় ঐ নিরাকার ‘কিন্তু’ মূর্ত্তি বসাইয়া দাও, লোকেরা বুঝিবে রঘুর ভিতরেও বিশেষ কিছু গুণ ছিল। বস্তুতঃ এমন কৈফিয়ৎ শূন্য নিন্দা প্রশংসা তুমি ‘কিন্তু’র সাহায্য ভিন্ন কিছুতেই করিতে পারিবে না। বলিব কি ভাই এই ‘কিন্তু’ ভায়া যেমন আমাদের ভাষাসমাজ তেমনই তোমাদের লোক সমাজও ঝালাপালা করিল। উঁহার যেমন আকৃতি তেমনই প্রকৃতি। শরীরটী যেমন বাঁকা মনটী তদপেক্ষাও বাঁকা, নিরাকার ‘কিন্তু’ মূর্ত্তি যে কত পবিত্র প্রণয় নষ্ট করিয়াছে, কত বন্ধু বিচ্ছেদ জন্মাইয়াছে, কত সরল মনে সন্দেহের সঞ্চার করিয়াছে, কত ঘরে আগুণ লাগাইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। নিরাকার ‘কিন্তু’ একটী সংশয় সমুদ্র বিশেষ।

বলিতে বলিতে অনেক কথা হইয়াগেল। আমি প্রথমে বলিয়াছিলাম আমার বক্তৃতা শক্তি নাই, সে কথা মনে করিয়া তোমরা হয়ত এখন হাসিতেছ। কি করিব বল? এদেশের মাটির এমনই গুণ, এখানে বোবারও মুখ ফোটে। শুনিয়াছি এদেশে বক্তৃতা করিতে না পারা একটা মহা পাপ! এদেশে নাকি বক্তৃতা করিয়াই মাথা উঁচু করিতে হয়। বিশেষতঃ আমি একদিন দেখিয়াছি কোনও এক সভায় একজন বাঙ্গালী বক্তৃতা করায় বিরুদ্ধে তিন ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এ অবস্থায় দেশ কাল বিবেচনায় আমার দোষ কি বল? যাহা হউক উপসংহারে তোমাদিগের নিকট আমার নিবেদন যে, তোমরা বিবেচনা না করিয়া কখনই ‘কিন্তু’ সঙ্গ করিও না, যদি কর, মজিবে মজাইবে, জ্বলিবে জ্বালাইবে, ঠকিবে ও ঠকাইবে জানিও। আমাদের ভাষা সমাজে ‘কিন্তু’ চরিত্রপ্রকা[illegible] যে গানটী প্রচলিত আছে আমি তোমাদিগকে সেইটী উপহার দিয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

গান।

দুরন্ত ‘কিন্তু’ জীবে [illegible] বিধি কোন্‌বা ছাঁচে।
(এর) [illegible] পাশে, যে ঘেসেছে
সেই পুড়েছে দারুণ আঁচে।
কি চরিত্র, কি ভায়ার কাণ্ড,
(ভায়া) যেথানে যান সেই খানেই সব লণ্ডভণ্ড,
যার ঘাঁড়ে চেপেছে “কিন্তু” কৃতান্ত তার দাঁড়িয়ে পাছে।
কে বুঝে ওর বিষম চক্র পাক,
যে ঘরে ঢুকেছে কিন্তু সুখের সংসার ফাঁক,
সাবধানে তাই, সাধুরে ভাই. যাবে কিন্তু ভায়ার কাছে।

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ।

২০ নং, [illegible] লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত ও ২০৮।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে বৈকুণ্ঠনাথ দাস কর্তৃক প্রকাশিত।



স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি

৺বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর।

KUNTALINE PRESS.



চতুর্থ ভাগ। } জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি

৺বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর।

(১)

একটী সাধারণ লোকের জীবন এবং একটী স্বাধীন রাজার জীবন সম্পূর্ণ বিভিন্ন উপাদানে ও বিভিন্ন আদর্শে গঠিত। সাধারণ লোকের জীবন সমাজের কঠোর শাসনে ন্যূনাধিক পরিমাণে সুসংযত, সুমার্জ্জিত ও কৃত্রিম ভাবাপন্ন। এক জন স্বাধীন রাজার জীবনে সংযমের অপেক্ষা উদ্দাম-স্ফূর্ত্তি বেশী, কারুকার্য্য অপেক্ষা কাঠিন্য অধিক, সভ্যতা অপেক্ষা স্বাভাবিকতা বেশী। সে জীবনে অভাব অতি অল্প, সমাজের প্রভাব ততোধিক অল্পতর। পার্ব্বত্য শাল তরুর ন্যায় উহা বিকট বিশাল ও অশোভন হইলেও উহার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে প্রকৃতির করচিহ্ন বর্ত্তমান। পার্ব্বত্য নদীর উপলখণ্ডের ন্যায় সেই জীবনের কোণ-কণিকাগুলি অক্ষত ও সুস্পষ্ট। পক্ষান্তরে আমাদের জীবনে সেগুলি চতুষ্পার্শ্বস্থিত পদার্থ সমূহের ঘর্ষণে মর্দ্দনে আঘাতে ঝাঘাতে শাসনে লাঞ্ছনায় এত দূর ক্ষয়প্রাপ্ত যে, আমরা শালগ্রাম-শিলার ন্যায় নিরীহ সুডৌল ও সুগঠিত। ঘড়ী দেখাইবার ছলে কেহ আমাদের কর্ণ মর্দ্দন করিলে আমরা কিয়ৎ পরিমাণে মাথার উপরের দিকে চাহিয়া, অধিক পরিমাণে নিজের উদরের দিকে চাহিয়া, এবং অধিকতর পরিমাণে স্বকীয় আশ্রিত দ্বি-সপ্ত সংখ্যক বুভুক্ষু মুখের দিকে চাহিয়া সহিষ্ণুতার সহিত সেই গোলাপী হস্তপ্রদত্ত তিক্ত জিলিপি-খানা গলাধঃ করিয়া থাকি, অন্তরে দ্বিতীয় পাণ্ডবের মত হইলেও বাহিরে যুধিষ্ঠিরের বেশে বাহির হই। ফলতঃ আমরা অষ্টপ্রহরই মুখস পরিয়া আছি, এবং ইদানীং আমাদের মুখ ও মুখস সর্ব্বপ্রকার দলাদলি পরিত্যাগ করিয়া এমনি মাখামাখি ভাবে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে যে, এখন কোন্‌টী কে, তাহা চিনিয়া লওয়া দুষ্কর। বোধ হয় কার্য্যতঃ আমাদের দেহ রাজ্যের উপরে মুখ অপেক্ষা মুখসের দাবীই বেশী। রাজনৈতিক ও সামাজিক অধীনতা

এবং আর্থিক অসচ্ছলতাই বোধ হয় ইহার মূল কারণ। কিন্তু একজন স্বাধীন রাজার পক্ষে, বিশেষতঃ একজন পার্ব্বত্য প্রদেশীয় স্বাধীন রাজার পক্ষে, এরূপ মুখস্ পরিবার প্রয়োজন বড়ই কম।

অদ্য যাঁহার জীবনকাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তিনি এক পার্ব্বত্য প্রদেশের (স্বাধীন ত্রিপুরার) স্বাধীন রাজা। নাম ৺ বীর চন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর; পাঁচ বৎসর হইল, তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে।

এই নরপতির প্রায় সপ্ততি-বর্ষ-ব্যাপী জীবনবৃত্ত নানা কারণে কৌতূহলোদ্দীপক। বঙ্গদেশের প্রান্তবর্ত্তী গিরিসঙ্কুল প্রদেশে তাল তমাল-শিরীষ সহকার-কণ্টকী-কুরুবক প্রভৃতি তরুর শীতল ছায়ায় এবং সভ্যতার কেন্দ্রভূমি ব্রিটিশরাজধানীর উত্তপ্ত বায়ু ও লবণাক্ত জলের প্রভাব হইতে সুদূরে অবস্থিত ও বর্দ্ধিত বলিয়া এই প্রকৃতি শিশুটীতে যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ত কুর্দ্দন ও স্বাধীন তাণ্ডব নর্ত্তন বিকাশ পাইয়াছিল, ভারতের অন্য কোন পরিচিত মানবশিশুতে তেমন হইয়াছিল বলিয়া জানি না।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতের অধিকাংশ রাজার জীবন ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শে গঠিত। কারণ অনেক স্থলেই বিধাতা-পুরুষ পলিটিকেল এজেণ্টের হস্তে তাঁহাদের ললাট-লিপি লিখিবার ভার ন্যস্ত করিয়াছেন। সৌভাগ্যের বিষয় যে, মহারাজ বীরচন্দ্রের সূতিকা গৃহে সেই অগ্নিবর্ণ হংসারূঢ় অদৃশ্য বিধাতা ভিন্ন কোন অগ্নিমুখ হংসপুচ্ছধারী গণ্ড-পিণ্ড অদৃষ্ট নিয়ন্তা বিধাতা প্রবেশাধিকার পান নাই।

ইউরোপীয় সভ্যতার সহিত মহারাজের বিলক্ষণ পরিচয় থাকিলেও তিনি উহাকে চিরদিন বিদেশী বঁধু বলিয়াই মনে করিতেন, এবং তদুপযোগী সম্মান ও আদরে আপ্যায়িত করিতেন। কিন্তু এই পরদেশী বঁধুয়াকে কখনো স্বীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দেন নাই। ইহার ফল ভাল কি মন্দ হইয়াছিল, তাহা বলিতে চাঁই না।

শুনিতে পাই পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলে সাম্য, ফলে কর্ত্তব্য জ্ঞান, এবং পল্লবে একের স্থলে সংঘের সুসমৃদ্ধি; আর প্রাচ্য সভ্যতার মূলে আত্মসুখ, ফলে সুরা-সীমন্তিনীর ছড়াছড়ি, এবং পল্লবে দুর্জ্জয় আলস্য, সর্ব্বগ্রাসিনী বিলাস-লিপ্সা এবং অপরিহার্য্য চিন্তাবসাদ। কিন্তু চোখের সামনে অনেক সময়ে আমরা কি দেখিতে পাই? প্রতীচ্য শিক্ষা ও সভ্যতার গুণে হিন্দুরাজার দার্জ্জিলিং-প্রবাস দ্বারকাবাস অপেক্ষা পুণ্যকর হইয়াছে। Sence অপেক্ষা Romance এর আদর বাড়িয়াছে, এবং স্বজাতীয়া অভিজাতা কামিনীকে ফেলিয়া বিজাতীয়া অশ্বপাল-দুহিতাকে অঙ্কলক্ষ্মী করা হইতেছে; সংক্ষেপে, পরকাল-চিন্তার স্থান ইহকাল-সর্ব্বস্বতা অধিকার করিয়াছে। আর অপর পৃষ্ঠে কি দেখিতে পাই? —প্রাচ্য শিক্ষা ও সভ্যতার গুণে আবিল বিলাসের প্রখর জোয়ার, ও প্রবল আলস্যের দুস্তর ভাটা, এবং কুসংস্কারের নিশ্চল জলের মধ্যেও সময়ে সময়ে দেবদ্বিজে ভক্তি, ধর্ম্মভীরুতা প্রজারঞ্জন প্রয়াস প্রভৃতি সুশোভন কুমুদ কহ্লার বিকশিত হইয়া থাকে।

বক্ষ্যমাণ মহারাজের জীবন ভারতের সম্পূর্ণ নিজস্ব; এমন কি উহাতে গঙ্গা যমুনার সম্মিলনও ছিল না। উহা যেন সংস্কৃত নাট্যোল্লিখিত কোন ক্ষত্রিয় রাজার জীবনের পুনরাবৃত্তিমাত্র।

তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কখনওাইউরোপীয় চালচলন ভাবভঙ্গীকে অবজ্ঞা করিতেন না। এক দিন তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "দেখ, সিভিলিয়ানরা কেবল যে লেখা পড়ায় পণ্ডিত, এমন নহে; আদব্ কায়দা বিষয়েও তাহারা সুশিক্ষিত। প্রত্যেক সিভিলিয়ান্ একই ধরণে চিঠির খাম ছিঁড়িয়া থাকে, একই কায়দায় দেশলাইটী জ্বালায় এবং একই ভঙ্গীতে চুরট্ টী ধরাইয়া থাকে। এমন কি hand-shake করিবার বেলা ঠিক্ একই ভাবে হাতে ঝাঁকি দিয়া থাকে। তাহাদের কাছে চিঠি লিখিলে ঠিক দিন গণিয়া উপযুক্ত সময়ে তাহার উত্তর পাওয়া যায়; ঘড়ী ধরিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহারা দেখা করিতে আসে। গাড়ীতে চড়িয়া কোথাও যাইবার সময়ে হাতে একটা খবরের কাগজ বা বই থাকা চাই; সময় নষ্ট করা তাহারা মহাপাপ বলিয়া মনে করে।" কিন্তু যে ইউরোপীয়দের তিনি এত প্রশংসা করিতেন, নিজে কখনও তাঁহাদের রীতি নীতির পথে এক পদ অগ্রসর হন নাই; বরং বিদেশিসভ্যতাভিমানী স্বদেশীকে পরান্নপুষ্ট পোষ্যপুত্র জ্ঞানে দয়ার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন!

ফতলঃ ইহা বোধ হয় এখন একটী পরীক্ষিত সত্য যে, সাহেবেরা তাঁহাদের পদানুচারী নেটিভদের অপেক্ষা স্বধর্ম্মানু-

বর্ত্তী স্বমার্গাচারী দেশীয়দিগকে সসম্ভ্রম সস্নেহ চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা ভারতীয় রাজার পার্শ্বে টানাপাখার চেয়ে তালপত্র বা চামর-ব্যজন দেখিতে ভালবাসেন, তাঁহার মুখের বক্রগ্রীব সিগার-পাইপ্ অপেক্ষা ভুজঙ্গ-কুণ্ডলীবৎ আল্‌বোলা দেখিতে ভালবাসেন, এবং আড়ম্বরশূন্য হ্যাট্, কোট্, বুট্, অপেক্ষা হীরক-মুক্তোজ্জ্বল উষ্ণীষ, সল্‌মা-চুম্‌কী-খচিত জামা, ও জরি বাদলা পরিশোভিত নাগরাই জুতা দেখিতে ভালবাসেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ বিলাতে গিয়া সে দেশীয় লোকের চোখে যে তাক্ লাগাইয়াছিলেন, সে অনেকটা তাঁহাব দেশীয় পরিচ্ছদের গুণে। ফলতঃ "নিজের উপধর্ম্ম ত্যাগ কবিয়া আমাব উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করুক," ইহা অনেক সাহেবের বাসনা ও যাবতীয় মিশনারীব দৈনিক প্রার্থনার অঙ্গীভূত হইলেও, কেহ বেশভূষায় তাঁহাদের অনুকরণ করিলে অনেক সাহেবই বোধ হয় এই মনে করিয়া তাঁহাকে ঘৃণা কবিয়া থাকেন যে, "এই লোকটী ভিন্ন সমাজের হইয়াও সেই ঈশপের দাঁড়কাকের ন্যায় কৃত্রিম উপায়ে আমাদের দলে উঠিতে চেষ্টা করিতেছে।" কেহ শিশুর অঙ্গভঙ্গীর নকল করিলে সে যেমন অসহিষ্ণুভাবে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে, এক সমাজের লোকে অপর সমাজের অনুকরণ করিলেও অনেক স্থলে সেইরূপ বিরক্তি ও অশ্রদ্ধার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

মহারাজ ইহাই বুঝিয়া, কোন ইউরোপীয়ানের সঙ্গে দেখা করিবার বেলাও নিজের দেশীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিতেন না। অনেক সময়ে গাড়ীতে না যাইয়া 'ঝাং জাং' বা 'মহাপায়া' (একরূপ খোলা পাল্‌কি) চড়িয়া যাইতেন; তৎকালে একটী ভৃত্য আলবোলা লইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইত, তিনি অসঙ্কোচে সাহেবদের সম্মুখে ভর্ ভর্ করিয়া তামাকের ধূম ছাড়িয়া দিতেন। অথচ যে সব ইউরোপীয়ানের সঙ্গে তাঁহার আলাপ পরিচয় হইয়াছে, সকলেই তাঁহাকে সম্মান, প্রতিষ্ঠা ও প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছেন। এক বার National Magazine নামক পত্রে Mr. Skrine মহারাজপ্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন, "To know the Maharajah is to love him."

সঙ্গীত ও কাব্যশাস্ত্র, চিত্র-কলা ও আলো-আলেখ্য বিদ্যায় (Photography) মহারাজের যেমন একটা উন্মাদিনী আসক্তি ছিল, তেমনি একটা ঈর্ষণীয় শক্তিও ছিল। কিন্তু তিনি আত্মপ্রশংসা অপেক্ষা আত্মপ্রসাদ ভাল বাসিতেন; তাই তিনি স্বকীয় এই গুণসমূহ যক্ষের ধনের মত চিরদিন অতি যত্নে, অতীব সঙ্গোপনে রাখিতেন; সাধারণ লোকে তাঁহার গুণের পরিচয় পাইবার কোন সুযোগই পায় নাই। সে যদু ভট্টাচার্য্য নাই, কাসেমালী খাঁর "রবাব" এখন নীরব। মহারাজের সঙ্গীত নৈপুণ্যের সাক্ষ্য কে দিবে? তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থনিচয় ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম পাড়ে আসা দূরে থাকুক, যে দুচার খানা রাজপুরীর প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া বাহিরে আসিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই বোধ হয় এখন পলাতক আসামী; এরূপ স্থলে তাঁহার কাব্যকুশলতা সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। বিশেষতঃ যাঁহার কলমের চেয়ে মরমের কবিত্ব বেশী ছিল, তাঁহার সহিত যাঁহারা হাসিবার মিশিবার অবসর পান নাই, তাঁহাদিগকে সেই নীরব ভাব-কবির পরিচয় কেমন করিয়া দিব? তিনি যথাযথ-বাদী (realistic) চিত্রকর ছিলেন; বিস্ফোটকটী তো দূরের কথা, মুখের ক্ষুদ্র আঁচিলটী পর্য্যন্ত গোপন করিতে রাজী ছিলেন না। তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিত্রগুলি সাধারণ লোকের রুচির হিসাবে অশ্লীলতাপূর্ণ। সুতরাং সে গুলি লোকের চোখের সাম্‌নে ধরিলে অনেকের হয় ত 'হিষ্টিরিয়া' হইতে পারে। পুষ্পের আঘাতে মূর্চ্ছিত হওয়া ও হস্তি-শুণ্ডে যাতায়াত করা, অথবা উষ্ট্রবরকে গলাধঃকরিয়া মশক ভক্ষণের সময়ে উদ্গার দেওয়া আমাদের দেশে অশোভন বা বিরল নহে। উদার আকাশের ক্রোড়ে শুভ্র সূর্য্যালোকে রূপ-যৌবন-স্বাস্থ্য-শোভনা রমণীর নগ্নসৌন্দর্য্য শিল্পের হিসাবে কিরূপ মনোহর ও মহামূল্য, তাহা এ দেশের লোকের এখনো শিখিবার বিষয়।

তিনি ফটোগ্রাফী বিদ্যায় কিরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তাহা সার্ভে জেনারেল আফিসের বৃদ্ধ কর্ণেল্ ওয়াটার হাউজ্, প্রথিত নামা বোর্ণ এণ্ড শেফার্ড এবং সুচতুরকর্ম্মা ক্যাপ প্রভৃতি এ শাস্ত্রের ধর্ম্মুর্দ্ধরেরা অবগত ছিলেন। তাঁহারই কাছে শিক্ষা পাইয়া তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বড় ঠাকুর সমরেন্দ্র চন্দ্র দেব বর্ম্মা ইউরোপের কয়েকটী ফটোগ্রাফিক এক্‌জিবিশনে উচ্চ শ্রেণীর প্রশংসা পত্র পাইয়াছেন, এবং তাহার ফলে আমেরিকার Practical Photographer

নামক পত্রে তাঁহার সচিত্র জীবনী বাহির হইয়াছিল। কিন্তু মহারাজ নিজে কখনো কোন প্রদর্শনীতে ফটো পাঠান নাই। অনুরোধ করিলে বলিতেন, "ও সব ছেলেদের সাজে, আমার কেন?" ফলতঃ যে যশঃস্পৃহাকে কাউপার অনেক দেখিয়া শুনিয়া "মহৎ হৃদয়ের শেষ দুর্ব্বলতা" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যাহা যৌবনের উত্তপ্ত শোণিতের উপরে অত্যুগ্র মদিরার ন্যায় প্রলয়ঙ্কর কার্য্য করিয়া থাকে, সেই যশোলিপ্সাকে উপযাচিকা হইয়াও এমন করিয়া এমন অপ্রত্যাশিত স্থানে উপেক্ষিতা হইতে আর কখনো দেখি নাই। শেষ বয়সের কথা বলিতেছি না, জীবনের বসন্তকালেও তিনি এই কুহকিনী অভিসারিকাকে এক দিনের তরে-আদর সোহাগে আপ্যায়িত করেন নাই।

তাঁহার বহু যত্নের কবিত্বপূর্ণ ফটোখানা এক্জিবিশন হলের দেয়ালে টাঙান থাকিবে, আর কোন অসাবধান অল্পজ্ঞান সমালোচক পান চিবাইতে চিবাইতে বা সীগার টানিতে টানিতে করধৃত যষ্টাগ্রদ্বারা সেই ছবি প্রদর্শন করিয়া গম্ভীরভাবে রসিকত্বশূন্য ভাষায় বলিবে, "ফটোখানার লাইট শেড্ ঠিক proportionate হয় নাই, মুখখানা যেরূপ উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট হইয়াছে, পশ্চাতের লতা পাতা তেমন ফুটিয়া উঠে নাই—ইত্যাদি," ইহা মহারাজের অভিমানপূর্ণ কোমল অন্তঃকরণে সহ্য হইত না; ঐ ছড়ির আঘাত তাঁহার বুকে শক্তিশেলের মত বিদ্ধ হইত।

ঠিক এই কারণে, অর্থাৎ বাহিরের লোকের অপবিত্র স্পর্শে বা নিঃশ্বাসে কলঙ্কিত হইবার আশঙ্কায় তাঁহার লিখিত কাব্য গ্রন্থগুলিকে তিনি রাজ-অন্তঃপুরের নিভৃত কক্ষে কঠোর জেনানা প্রথার শাসনাধীনে আজীবন আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। নিদাঘ নিশীথের চিন্তাপ্রসূত ও হৃদয়ের তপ্ত-শোণিত-লিখিত কবিতাগুলিকে কোন বাক্-চপল-আনাড়ী অনধিকারী সমালোচক লৌহ লেখনীর আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করিবে, ইহা তাঁহার ভাবপ্রবণ হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণার সৃষ্টি করিত। অহর্নিশ অশ্রান্ত চিত্ত মন্থন করিয়া যে সুধা-ভাণ্ডের আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা লইয়া পাপাশয় অসুরেরা কাড়াকাড়ি করিবে ও উল্লাসে নৃত্য করিবে, এ বীভৎস দৃশ্য তাঁহার কাছে অসহনীয় ও অক্ষমার্হ ছিল। তিনি মনে করিতেন, যাহারা যশের প্রত্যাশী বা অর্থের পিয়াসী, সেই হতভাগোরাই সমালোচকের দোদুল্যমান অসিতলে সোদ্বেগ-চিত্তে বিনিদ্রনয়নে অবস্থান করুক। অপরের সে বিড়ম্বনায় প্রয়োজন কি?

মহারাজের রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির পরিচয় আমরা সময়ান্তরে "প্রদীপের" পাঠকবর্গকে প্রদান করিব। তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, তিনি কিরূপ অনিন্দ্য কবিত্ব শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহার কবিতায় কষ্টকল্পনা বা অজীর্ণোদ্গার ছিল না। সুকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, সুবিজ্ঞ ভাবুক মিঃ আশুতোষ চৌধুরী প্রভৃতি ঠাকুর পরিবারের অনেকের সঙ্গে তাঁহার খুব মাখামাখি ভাব ছিল। রবিবাবু মহারাজের কার্সিয়ংস্থিত ভবনে প্রায় এক মাস কাল সপুত্র আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন দিনও মহারাজ স্বরচিত কাব্যগ্রন্থগুলি ইঁহাদের কাহাকেও দেখাইয়াছেন বলিয়া জানি না। বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি স্বভাবকবি বালক যেমন সময়ে সময়ে খেলার সাথীর অভাবে স্বীয় উর্ব্বর কল্পনার সাহায্যে একটী নূতন অশরীরী বয়স্যের সৃষ্টি করিয়া তাহারই সহিত খেলিতে বসে, মহারাজও সেইরূপ এই পরিদৃশ্যমান বহির্জগতের আত্মীয় বন্ধুদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অদৃশ্য অন্তর্জগতের আত্মা নামক পুরুষকে প্রবুদ্ধ করত তাহারই সহিত আজীবন নীরব খেলা খেলিয়া গিয়াছেন। যখন তিনি কোন সদ্যঃ পরিসমাপ্ত চিত্র বাম হস্তে ঈষৎ দূরে রাখিয়া, মস্তক দক্ষিণে বামে হেলাইয়া অঙ্গুলি চক্রের মধ্য দিয়া কুঞ্চিতভ্রূ নয়নে একাগ্র মনে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন, অথবা যখন কোন কবিতা রচনা করিয়া উন্মনস্কভাবে গুন্ গুন্ স্বরে তাহা বারংবার পাঠ করিতেন, তখন মনে হইত, যেন পূর্ব্বোল্লিখিত অদৃশ্য পুরুষ আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়াছে, এবং ঐ আলেখ্য তাহাকে দেখান হইতেছে ও ঐ কবিতা তাহাকে শোনান হইতেছে। ফলতঃ আত্ম-চিত্তবিনোদনই মহারাজের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। লোকের 'বাহবা'কে তিনি নির্জ্জলা হাওয়া বলিয়া মনে করিতেন; প্রকৃত পক্ষে উহা 'নেহাত ফাকা আওয়াজ' ভিন্ন আর কিছুই নহে; কিন্তু সংসারের কয়জনে তাহা বুঝে? হীরক ও অঙ্গার যে মূলতঃ একই পদার্থ, তাহা আমরা জানিয়াও বুঝি না, বুঝিয়াও মানি না।

মহারাজের যশোবিতৃষ্ণার অন্যতম উদাহরণ তাঁহার

সঙ্গোপনে দান। পূর্ব্বে আমাদের দেশে দান ধ্যান প্রভৃতি অনুষ্ঠানে অগ্নি বা শালগ্রামশিলার সমক্ষে নির্ব্বাহিত হইত, এখন তাহা সংবাদপত্রের রিপোর্টারের সম্মুখে হইযা থাকে নতুবা ঐ সকল নাকি শুদ্ধ বা সিদ্ধ হয না। কিন্তু মহারাজ যে কত লোককে কত দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার কোন তালিকা সংবাদপত্রের স্তম্ভে প্রকাশিত হয নাই, বা হইবে না, তবে যে সকল দুঃস্থ বিপন্ন ব্যক্তি তাঁহার দানে মৃত দেহে জীবনসঞ্চার পাইযাছেন, ঐ সকল দানের তালিকা স্বর্ণাক্ষরে তাঁহাদের হৃদয ফলকে লিখিত আছে, এবং অন্তর্যামী পরমেশ্বরের মহাফেজখানায তাহার হিসাব পত্র চির দিন সযত্নে রক্ষিত থাকিবে। শ্রীমদ্ভাগবতের মত বিশাল গ্রন্থ প্রচুর টীকা ও বঙ্গানুবাদের সহিত বৃহদক্ষরে মুদ্রিত হইয়া তাঁহারই ব্যযে বিনা আড়ম্বরে, বিনামূল্যে, অথচ বিনা C I E উপাধিতে বিতরিত হইয়াছিল। সে কালের রাজা বাদশাহদের দানের মধ্যে যেমন একটা সুমধুর স্বাভাবিকতা, ঔদাসীন্য, নিশ্চেষ্টতা ও সন্তোষ পরিলক্ষিত হইত, মহারাজের দানেও ঠিক সেই সকল ছিল।

তিনি একবার কথা প্রসঙ্গে বৃদ্ধ কম্পাউণ্ডারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"এবার পূজার সময়ে বাড়ী যাবে না?' কম্পাউণ্ডার বলিল, 'মহারাজ! এবার বাড়ী যাওয়া হবে না, কারণ শাস্ত্রেই আছে, "বাটী যাই—মাটী খাই।" মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কথার অর্থ কি?" কম্পাউণ্ডার উত্তর করিল, "মহারাজ! সকলে বাড়ী যায়—কত কি জিনিষ সঙ্গে লইয়া। পাঁঠা, কচু, কলা, কাপড, পোষাক, গহনা ইত্যাদি কত কি জিনিষ বড় বড় আমলাদের সঙ্গে বাড়ী উঠিবে। আমি গরিব কি লইয়া বাড়ী যাইব? তাই বলিতে ছিলাম, আমাদের মত লোকের বাটী যাওয়া ও মাটী খাওয়া সমান।' মহারাজ দ্বিতীয় প্রশ্ন না করিয়া বৃদ্ধের হাত ভরিয়া টাকা দিয়া বিদায় করিলেন, এইরূপ আশাতিরিক্ত অর্থ পাইয়া বৃদ্ধ আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। এইরূপ রোমাণ্টিক্ অথচ সাত্ত্বিক দান আজ কালের (বজেট এষ্টিমেট) হিসাব নিকাশের দিনে—নিতান্তই বিরল, কিন্তু আগরতলার তদানীন্তন রাজদরবারে ইহা প্রায় দৈনিক ঘটনার মত ছিল।

গুণীলোক অনেক সময়েই গুণগ্রাহী হইয়া থাকে, অথবা মকরন্দ-গর্ভ কুসুমের নিকট আপনা হইতেই মধু-লোভী ভ্রমরকুল আসিয়া থাকে, এই কারণে এক সময়ে মহারাজের দরবারে এমন সব গুণবান লোকের সমাবেশ হইযাছিল, এবং তাঁহাদের কোলাহল ও আস্ফালনে সভামণ্ডপ এমন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, যে তদ্দৃষ্টে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সেই বাদবিচার পূর্ব্বপক্ষ উত্তর সমস্যা মীমাংসা পূর্ণ নবরত্ন সভার কথা স্মৃতি পথে পতিত—ইহা কল্পনার কষ্টসৃষ্টি নহে, বাস্তব পরীক্ষিত সত্য। এ স্থলে কয়েকটী গুণীলোকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে দেওয়া যাইতেছে:—

১ যদুনাথ ভট্টাচায্য—বাড়ী বর্দ্ধমান, বনবিষ্ণুপুর। পূর্ব্বে কলিকাতা ঠাকুর বাড়ী (মহাযর বাড়ী) সঙ্গীতাধ্যাপক ছিলেন। শ্রীযুক্ত হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি ইঁহার ছাত্র। প্রথমে বেশী শিক্ষিত ছিলেন না, কিন্তু অসাধারণ প্রতিভা ছিল বলিয়া মহারাজের সংস্রবে ইনি প্রসিদ্ধ গায়ক, সঙ্গীতরচক ও বাদক হইযাছিলেন। ইঁহার রচিত নট-নারায়ণ রাগে যে মহারাজ সংক্রান্ত ও অন্যান্য নানা বিষয়ক অনেকগুলি ধ্রুপদ গান এখনও সঙ্গীত শাস্ত্রজ্ঞ কালোযাৎ-দের কাছে তানসেনের গানের ন্যায অতি প্রিয ও সমাদৃত। মহারাজ মৃত্যুর কিছুপূর্ব্বে সেগুলি সংগ্রহ করিয়া পরিপাটী রূপে ছাপাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, মুদ্রণও অনেক দূর অগ্রসর হইযাছিল, দেখিযাছি। কিন্তু বর্ত্তমান মহারাজ এই সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত কার্য্যটা পরিসমাপ্ত করিয়াছেন বলিয়া জানি না। না করিয়া থাকিলে, করা উচিত। মহারাজের আরব্ধ অপর একটী প্রিয কার্য্যও এইরূপ আয়ুর হ্রস্বতা বশতঃ অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে। আগরতলার রাজবংশের একটী ধারাবাহিক ইতিহাস অতি প্রাচীনকাল হইতে লিখিত হইয়া আসিতেছে। উহার নাম 'রাজমালা,' উহা বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত। উহাতে বিভিন্ন সময়ের বাঙ্গলা রচনায় বিবিধ নমুনা পাওয়া যায়। যে কারণেই হোক, স্বর্গীয় মহারাজ উহাতে পরিতৃপ্ত না হইযা, সংস্কৃত রচনায় সিদ্ধহস্ত কতিপয পণ্ডিতের সাহায্যে "রাজরত্নাকর" নাম দিযা ঐ গ্রন্থের এক সংস্কৃত পদ্যানুবাদ বহুব্যয়ে বহুযত্নে মুদ্রিত করিতেছিলেন। ম্যাকেঞ্জি নামক একজন সাহেবকে নিজের ব্যয়ে বিলাত পাঠাইয়া তাঁহাকে "কলোটাইপ্-প্রসেস্" (Collotype Process) শিখাইয়া তাঁহার দ্বারা বহুমূল্যের কলোটাইপ্-মেশিন্" প্রভৃতি আনাইয়াছিলেন।

তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে,উক্ত'রাজ-রত্নাকর'গ্রন্থে স্বাধীন ত্রিপুরার রাজ্যাভিষেক, বিবাহ প্রভৃতি প্রথার নিদর্শক কতিপয় কলোটাইপ্-চিত্র সন্নিবেশিত করিবেন। কিন্তু মানুষের আশাকে টানিয়া রবরের মত দীর্ঘ করা সহজ হইলেও আয়ুকে সেরূপ করা যায় না; তাই মহারাজকে অপূর্ণ আশা বুকে লইয়াই স সার হইতে বিদায় লইতে হইল। বর্ত্তমান মহারাজ সুবোধ ও সদাশয়, পিতার এই আরব্ধ কার্য্যটীকে তিনি কি সমাপ্ত করিবেন না?

২। কাশেমালী খাঁ—রবাব (রুদ্র বীণা—সংস্কৃত নাম) নামক প্রসিদ্ধ কাবুল দেশজাত যন্ত্রের বাদক। এই যন্ত্র রক্তচন্দন প্রভৃতি শক্ত কাষ্ঠে নির্ম্মিত। ইহাতে কোন পর্দ্দা বা 'সুন্দরী' নাই। ধাতুর তারের পরিবর্ত্তে ইহাতে তাঁত থাকে। কাঠের ছাউনী (তবলী) না থাকিয়া গোধিকার ছাউনী থাকে। ইনি সুরবীণ্ (স্বরবীণা), বীণ্ (বীণা) ও সুর-শৃঙ্গার প্রভৃতিও বাজাইতে খুব্ দক্ষ ছিলেন। অন্যে শিখিবে এই ভয়ে রবাব বাজান কাহাকেও বড় বেশী শুনাইতেন না। এমন কি,নিজের সন্তান হইলে শিখিবে এই আশঙ্কায়ই নাকি তিনি আজীবন অবিবাহিত ছিলেন।

তিনি প্রথমে রামপুরের নবাব ও নেপালের মহারাজের দরবারে ছিলেন। পরে আগরতলায় আসেন। রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর যখন মহারাজের মন্ত্রী ছিলেন, সেই সময়ে রাজসংসারের ব্যয় সংক্ষেপ উপলক্ষে ইনি কর্ম্ম হইতে অবসৃত হন। পরে ঢাকা জেলার অন্তর্গত জয়দেবপুরের রাজ বাড়ীতে কার্য্য গ্রহণ করেন,—ঢাকায় ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি প্রসিদ্ধ মিঞা তানসেনের বংশধর। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ব্রাহ্মণ। পূর্ব্বোল্লিখিত যদুর সঙ্গে ইহার অত্যন্ত প্রতিযোগিতা ছিল। সেই জন্য ইনি কখনও যদুর কাছে প্রাণান্তেও রবাব বাজাইতেন না, এমন কি তাঁহাকে যন্ত্রটীও দেখাইতেন না। কিন্তু যদু লুকাইয়া লুকাইয়া বাজনা শুনিত ও যন্ত্র দেখিত। কিয়ৎকাল পরে এক দিন যদু মহারাজকে বলিল, "অনুমতি হইলে আমি একবার ধর্ম্মাবতারকে রবাব বাজাইয়া শুনাইতে চাই। মহারাজ বলিলেন, "সে কেমন করিয়া হইবে? কাশেমালী তো তোমার হাতে তাহার রবাব দিবে না।" যদু বলিল, "আমি নিজে রবাব তৈয়ার করিয়াছি, সেই রবাব বাজাইব।" মহারাজ বিস্মিত ও প্রীত হইয়া তাহাকে পরদিনই বাজনা শুনাইতে অনুমতি দিলেন। এ দিকে কাশেমালী খাঁর কাণে যদুর এই দুঃসাহসিক প্রস্তাবের কথা পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে যদু মহারাজের কাছে হাজির হইল; কাশেমালী খাঁও ব্যগ্র বেপথু চিত্ত লইয়া দরবারের এক প্রান্তে উপস্থিত। যদু বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে স্বহস্ত-রচিত রবাব বাহির করিয়া অতি দক্ষতার সহিত বাজাইয়া মহারাজকে শুনাইল। তিনি প্রীত হইয়া যদুর ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। কাশেমালী খাঁ বিষাদ-মন্থর পদক্ষেপে মহারাজের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া এক সুদীর্ঘ আলস্যপূর্ণ সেলাম ঠুকিয়া বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার! আজ থেকে আমি রাজদরবার হইতে বিদায় হইতে চাই। এক রবাবের জন্যই আমার যাহা কিছু প্রতিপত্তি ছিল, যদু যখন তাহাতেও ভাগ বসাইল, তখন আমার এখানে থাকা বিড়ম্বনা মাত্র।" মহারাজ তাঁহাকে আশ্বাসপূর্ণ মধুর বচনে প্রবোধ দিয়া বাসায় পাঠাইয়া দিলেন।

৩। পঞ্চানন মিত্র—(ওরফে পাঁচু বাবু) বাড়ী কলিকাতা। মহারাজকে পাখোয়াজ ও তবলা বাজনা শিখাইতেন। তাঁহার ক্ষমতা অসাধারণ ছিল; কিন্তু পরে মহারাজ তাঁহার অপেক্ষা ভাল বাজাইতে পারিতেন। ইঁহার কার্য্যের লকব্ (পদবী) ছিল—মহারাজের নিজ তহবিলের দেওয়ান, কিন্তু তাহা নাম মাত্র; মহারাজকে বাজনা শিক্ষা দেওয়া, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গীতালোচন করা তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল।

৪। প্রতাপ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়—মনোহরসাহী গায়ক।

৫। ক্ষেত্র মোহন বসু—গায়ক।

৬। রাম কুমার বসাক—বাড়ী ঢাকা (নবাবপুর।) পাখোয়াজ বাদক।

৭। নিশাদ হোসেন—সেতার ও সুরবীণ বাদক।

৮। ইমামী বাইজী—রামপুরের নবাবের দেশে জন্ম স্থান। দীর্ঘকাল আগরতলায় বেতন-ভোগিনী থাকিয়া মহারাজকে গান শুনাইয়াছিল।

৯। চাঁদা বাইজী—মহারাজের রাজ্যাভিষেক সময়ে বেনারস হইতে অনাহুত ভাবে আসে। দেখিতে অতি কুৎসিত বলিয়া আসরে-তাহার মুজ্‌রা হয় নাই; সে ভাল গাইতে পারে বলিয়া কেহ মনে করে নাই। একদা জ্যোৎস্নারাত্রে মনের দুঃখে রাজবাড়ীর সম্মুখস্থ দীর্ঘিকার উত্তর পারের সিঁড়িতে বসিয়া সে বেহাগ রাগের একটী গান গাইতেছিল। মহারাজ গান শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া তাহাকে ডাকাইয়া আনিলেন,

এবং তাহার মুখে আরও কয়েকটী গান শুনিলেন। এমন সুগায়িকার কেন আসরে মুজ্‌রা হয় না, বলিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিলেন, এবং সেই রাত্রেই তাহার বেতন নির্দ্দিষ্ট হইল। ইহার পরে সে দীর্ঘকাল আগরতলায় থাকিয়া মহারাজকে গান শুনাইয়াছিল।

১০। কেশব চন্দ্র মিত্র—স্যার রমেশ চন্দ্র মিত্রের ভ্রাতা। পাখোয়াজ বাজাইবার জন্য কিয়ৎকাল নিযুক্ত ছিলেন।

১১। সাধু তবলচী—বাড়ী কলিকাতা। মহারাজেরই ছাত্র। ঢাকার প্রসিদ্ধ হুসুমুও তাঁহারই ছাত্র।

১২। হরিশ্চন্দ্র পাগ্‌লা—(কায়স্থ)—বাড়ী বর্দ্ধমান জেলায়; বেহালায় খুব্‌ ওস্তাদ্‌ ছিল।

১৩। *মদনমোহন মিত্র—'কবিতা কদম্ব,' 'জীবনময় কাব্য'* প্রভৃতির গ্রন্থকার। ইহাকে রাজ-কবি (Poet Laureate) বলিলেও চলে। ইহার বাড়ী ঢাকার সন্নিকটে।

১৪। নবীন চাঁদ গোস্বামী—সেতার বাদক।

১৫। হাইদর খাঁ—এস্‌রাজ বাদক।

১৬। ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী—গায়ক।

১৭। বড়লাট নর্থব্রুক সাহেব যখন ঢাকায় আসেন তখন এ অঞ্চলের অন্যান্য রাজা জমীদারদের ন্যায় মহারাজও তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে 'কেডি' নামে একজন সাহেব চিত্রকর মহারাজের চেহারা আঁকিয়াছিলেন। সেই ছবি দেখিয়া মহারাজ এত সন্তুষ্ট হন যে, তৎক্ষণাৎ তাঁহার বেতন নির্দ্ধারণ করিয়া তাঁহাকে রাজধানীতে লইয়া আসেন। ইনি দীর্ঘকাল রাজধানীতে ছিলেন এবং মহারাজ প্রধানতঃ ইঁহারই কাছে তৈল-চিত্রাঙ্কন শিখিয়াছিলেন।

১৮। ফটোগ্রাফী বিদ্যার আবিষ্কারের অল্পপরে মহারাজ এক জন ফরাসীকে বেতনভোগী করিয়া রাজধানী লইয়া আসেন এবং তাঁহার সাহায্যে কলোডিয়ান্‌ প্রণালীতে ফটো তুলিতে আরম্ভ করেন। বোধ হয় ইহার আগে এদেশীয় কোন লোক ফটোগ্রাফী শিক্ষা করেন নাই। উত্তর কালে নিজের অতুল অধ্যবসায়ের বলে, ফটোগ্রাফী সংক্রান্ত নানা ইংরাজী পুস্তক ও পত্রিকার সাহায্যে, বর্ত্তমান সময়ে যত রকম ফটোগ্রাফিক প্রণালী আবিষ্কৃত আছে, তিনি তাহার প্রায় সমস্তই সুচারুরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। শেষবার যখন তিনি কলিকাতায় গিয়াছিলেন, তখন সার্ভে জেনারেল আফিসের প্রসিদ্ধ টার্ণার সাহেবের সাহায্যে হাফ্‌টোন ব্লক তৈয়ার করিতে শিখিয়াছিলেন।

১৯। লিথোগ্রাফি শিখাইবার ও তুলিবার জন্য একজন ফরাসী কয়েক দিন নিযুক্ত ছিল।

দরবারে বারমেসে বেতনভোগী কয়েকটী উচ্চশ্রেণীর পালোয়ান্‌ (মল্ল) ছিল। বিদেশ হইতে কোন পালোয়ান আসিলে এই পালোয়ান্‌দিগকে তাহার সহিত মল্লযুদ্ধ করিতে হইত। প্রতিযোগিতায় বিদেশী জয়ী হইলে এবং সে সম্মত হইলে সেই দণ্ডে সেই স্থলে পরাজিতকে বিদায় করিয়া বিজেতাকে তৎপদে নিযুক্ত করা হইত।

প্রথম বয়সে মহারাজ পালোয়ানদের কাছে কুস্তি শিক্ষা করিতেন, মৃগয়াতেও তাঁহার অতিশয় আসক্তি ছিল; এইরূপ ব্যায়ামের ফলে তাঁহার শরীর অত্যন্ত বলিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু শেষ বয়সে তিনি মৃগয়া বা পালোয়ান্‌গিরি পছন্দ করিতেন না। তাঁহার কোন জামাতা পালোয়ানের কাছে কুস্তি শিখিতেছেন শুনিয়া তিনি একদিন বিরক্তির সহিত বলিয়াছিলেন, "কুস্তি টুস্তি ভদ্রলোকের সাজে না; উহাতে যে কেবল শরীর মোটা হয় এমন নহে, বুদ্ধিটাও মোটা হইয়া যায়।"

প্রাচীন বয়সে পারিবারিক ও রাজনৈতিক নানা চিন্তায় তাঁহার পূর্ব্বের সেই অনবদ্য স্বাস্থ্য কিয়ৎপরিমাণে ভগ্ন হইলেও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার মনোযোগ থাকাতে বঙ্গের অধিকাংশ ধনিসন্তানের ন্যায় তাঁহার দেহ অজীর্ণ অম্লোদ্গারজর্জ্জরিত অস্থিকণ্টকিত মাংস খণ্ডে বা অবিরত ঘর্ম্মসিক্ত তরঙ্গাবর্ত্তময় মেদপিণ্ডে পরিণত হয় নাই। দাঁত নষ্ট হইবার আশঙ্কায় তিনি কখন পান খাইতেন না; মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত তাঁহার দুই পাটি দাঁত অটুট ছিল।

শেষ বয়সে তিনি কাণে একটু কম শুনিতেন, সেইজন্য তাঁহার গীত বাদ্যের আলোচনা অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল। তখন তাঁহার প্রধান আলোচ্য বিষয় (hobby) ছিল—ফটোগ্রাফী ও তৈল চিত্র। তাঁহারই উদ্যোগে প্রতি-বৎসর রাজধানীতে একটী ক্ষুদ্র ফটোগ্রাফিক প্রদর্শনী বসিত। তাহাতে রাজকুমারগণ, ঠাকুরেরা (ইঁহারা মহারাজের জ্ঞাতি। বিবাহ আদি সম্বন্ধে রাজ পরিবারের সহিত সংসৃষ্ট) এবং স্বল্প সংখ্যক বিদেশী বাঙ্গালিরা ফটো প্রদর্শন করিতেন।

যাহাতে রাজকুমারগণ সকলেই ফটোগ্রাফী শিক্ষা করেন, ইহা তাঁহার একান্ত অভিলাষ ছিল। একবার মহারাজের একটী কুমার প্রদর্শনীতে ফটো পাঠান নাই, তাহাতে মহারাজ বিরক্তির সহিত নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন—"অনেক হয় ত মনে করে যে, এই এক্‌জিবিশনটা আমার ফটো ম্যানিয়া (photo mania) রোগেরই একটা লক্ষণ বিশেষ। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। আমাদের মত লোকের ছেলে পিলের, যাহাদের চাকরী করিতে হয় না, বা কোন নির্দ্দিষ্ট দৈনিক কার্য্য নাই, আজ বাঁদরওয়ালা আসিল,—সমস্ত দিন বাঁদর নাচই দেখিল, কাল হরি সঙ্কীর্ত্তন হইল, সমস্ত দিন সঙ্কীর্ত্তনই শুনিল, এইরূপ পতঙ্গ-প্রকৃতি ভুজগুণসর্ব্বস্ব লোকের পক্ষে সর্ব্বদা হাতের কাছে ধরিবার ছুঁইবার একটা কিছু থাকা চাই। মস্তকের উপরে এমন একটা কার্য্যভার সর্ব্বদা দোদুল্যমান থাকা চাই, যাহা উঠিতে বসিতে ললাট স্পর্শ করে। তাহা হইলে বৃথা গল্প বা পরনিন্দা করিয়া, স্বাস্থ্য-চিত্ত-হানিকর আমোদ-পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া, অথবা সংবাদ-পত্রের আজগুবি সংবাদ পড়িয়া ও আঙুল মট্‌কাইয়া, জীবনের মূল্যবান্ দিনগুলিকে ছারপোকার মত আঙুলে টিপিয়া একটী একটী করিয়া মারিতে হয় না। এই ফটোগ্রাফীর কাজটা হাতে থাকিলে, অর্থাৎ বৎসরান্তে এক্‌জিবিশনে ফটো প্রদর্শন করিতে হইবে, একথাটী মনে জাগরুক থাকিলে, আমাদের ছেলেদের অন্তঃকরণ অনেক পরিমাণে কলঙ্কস্পর্শ হইতে মুক্ত থাকিবে। আর প্রথম বয়সটা যদি এই হুজুকে কাটিয়া যায়, তবে ভাবী জীবন সচ্চিন্তার প্রসর ক্ষেত্রে ও সৎকর্ম্মের কীর্ত্তিস্তম্ভ রূপে পরিণত হইলেও হইতে পারে।"

উপরের কথাগুলি এত দূর সত্য যে, উহার উপরে টীকা করা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের দেশের ধনী যুবকদিগকে কেবল ফটোগ্রাফী বিদ্যাটী ভালরূপ শিখাইয়া দিতে পারিলে, তাহাদের জাহান্নমে যাইবার পথ অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়া আসিবে।

এক্ষণে মহারাজের শেষ বয়সের দৈনিক জীবনের একটী ছবি পাঠাকদিগকে উপহার দিতেছি। ইউরোপ প্রভৃতি দেশে বড় লোকদের দৈনিক জীবনবৃত্তের অত্যন্ত আদর। এ দেশে এরূপ জিনিষ বিকাইবে কি না জানি না, তাই সংক্ষেপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিব।

প্রত্যহ প্রাতে ৮।৯ টার সময়ে নিদ্রা হইতে উঠিয়া বিদ্রীর নল মুখে করিয়া মহারাজ বৈঠক-খানা ঘরে ফরস বিছানার উপরে বসিতেন। এত বেলায় উঠিবার কারণ কেবল পূর্ব্বদিন অত্যধিক রাত্রি জাগরণ। কি জন্য এত রাত্রি জাগিতে হইত, তাহা যথাস্থানে বলা যাইবে। এই সময়ে রাজপরিবারের ডাক্তার পরেশ বাবুকে উপস্থিত থাকিয়া মহারাজের শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিতে হইত; এবং তিনি তাহা বলিলে ডাক্তার বাবু তদনুসারে ঔষধ প্রস্তুত করিতে যাইতেন। যদিও মহারাজ হোমিওপ্যাথীরই অধিক পক্ষপাতী ছিলেন, তথাপি তিনি এলোপ্যাথী কবিরাজী হেকেমী ঔষধও ব্যবহার করিতেন। কোন বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী হওয়া বা অন্ধবৎ পরের দ্বারা চালিত হওয়া তিনি ভালবাসিতেন না; সেই জন্য কবিরাজী ও ডাক্তারী সংক্রান্ত অনেক গুলি বই সংগ্রহ করিয়া রীতিমত অধ্যয়ন পূর্ব্বক ন্যূনাধিক পরিমাণে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। নিজের অসুখ বিসুখে নিজেই সচরাচর ঔষধ ব্যবস্থা করিতেন। অধিকাংশ সময়ে কেবল ঐ ব্যবস্থার অনুমোদন করা পরেশবাবুর কার্য্য হইত। এক দিন ডাক্তার বাবু কথা প্রসঙ্গে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "মহারাজকে চিকিৎসা করিয়া কোন সুখ নাই, অনেক সময়েই তিনি নিজের ব্যবস্থা নিজে করিয়া থাকেন; আমি সাক্ষী গোপালের মত উপস্থিত থাকি মাত্র।"

ডাক্তার বাবু কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া বিদায় হইলে, মহারাজ সেই কঠোর হাড়-ভাঙা পাহাড়ে শীতেও একটী মাত্র উড়ানী দ্বারা সর্ব্বশরীর আচ্ছাদন করিয়া পায়খানায় যাইতেন। তাঁহার শীতবোধ এত কম ছিল যে, দেওয়ান বাবুর মুখে শুনিয়াছি, মধ্যম বয়সে শীতে গ্রীষ্মে অবিশ্রাম তাঁহার জন্য সজোরে পাখা চলিত, তিনি খালি গায়ে বা পাতলা একটী জামা মাত্র গায়ে দিয়া, সেই পাখার নীচে বসিয়া থাকিতেন। বার মাস মহারাজ পারাবত-মাংস ও পলান্ন ভক্ষণ করিতেন। তাহার সহিত এই শীত বোধ-হীনতার কোন সম্বন্ধ থাকা সম্ভব। যে অযোধ্যার নবাবের শীতাল্পতার বিষয়ে নানা গল্প প্রচলিত আছে, তিনিও অত্যন্ত কপোত-মাংস-প্রিয় ছিলেন।

তিনি এত দূর তাম্রকূট-প্রিয় ছিলেন যে, তাঁহার পায়খানায় যাইবার পূর্ব্বেই একটী পৃথক্ বিদ্রী তাঁহার জন্য

সেখানে সজ্জীকৃত থাকিত। ফলতঃ এমন অষ্টপ্রহরব্যাপী তাম্রকূট সেবন আর কোথাও দেখি নাই। আহার ও নিদ্রার সময় ব্যতীত সকল সময়েই তাঁহার মুখে নল থাকিত। শকটারোহণে পরিভ্রমণ, সাহেবদের সহিত সাক্ষাৎকার, অধ্যয়ন ও চিত্রাঙ্কনের সময়েও বেল ফুলের মালা জড়িত সেই স্বর্ণ নির্ম্মিত 'মুখ-নল'টীর সহিত তাঁহার অধরপুটের বিচ্ছেদ হইত না। যখন তিনি পদব্রজে বাহির হইয়া কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যের ফটো তুলিতে যাইতেন, এবং কেমেরা সুসংস্থাপিত ও লক্ষ্য সংযুক্ত করিবার জন্য চঞ্চল চরণে দক্ষিণে বামে বিচরণ করিতেন, তখনো 'হুকা-বরদার'কে কৌশলপূর্ণ ক্ষিপ্রগতিতে এমন ভাবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রীহস্তে ঘুরিতে ফিরিতে হইত, যেন উহার নল তাঁহার মুখ-ভ্রষ্ট হইয়া না যায়। যতক্ষণ তিনি বহির্ব্বাটীতে থাকিতেন, ততক্ষণ এইরূপ চলিত; অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবামাত্র বহির্ব্বাটীর হুকাবরদার হুকো লইয়া ফিরিয়া আসিত; একটী অন্তঃপুরচারিণী দাসী (আগরতলার ভাষায় 'সেবাইতা' বলে, বোধ হয় 'সেবিকা' শব্দের অপভ্রংশ) দ্বিতীয় একটী তৈয়েরী বিদ্রীর নল মহারাজের মুখের কাছে ধরিত, এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার ন্যায় কক্ষে কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইত। এই দৃশ্যটী দেখিলে স্বতঃই কাদম্বরীর সেই তাম্বূলকরঙ্কবাহিনীর কথা মনে পড়িত।

শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুরাণতত্ত্ব।*

ভারতীয় হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ এই তিন শ্রেণীর পুরাণই দৃষ্ট হয়। এতন্মধ্যে হিন্দুদিগের পুরাণই সর্ব্বপ্রাচীন। প্রথমে হিন্দু পুরাণের কথাই অতি সংক্ষেপে বলিব।

অথর্ব্ববেদ, শতপথব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্যোপনিষৎ, তৈত্তিরীয় আরণ্যক, আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্র, আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র, মনুসংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি আর্য্য জাতির সুপ্রাচীন শাস্ত্রসমূহে পুরাণপ্রসঙ্গ আছে। অথর্ব্ববেদের মতে—"অপরাপর বেদের সহিত যজ্ঞের উচ্ছিষ্ট হইতে পুরাণ উৎপন্ন হইয়াছিল।" (১১।৭।২৪) শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, অধ্বর্য্যু পুরাণ কীর্ত্তন করিতেন। (১৩।৪।৩।১৩)।

আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ও মনুসংহিতায়ও আছে,—শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্যে বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, আখ্যান, ইতিহাস, পুরাণ সকল ও খিল সমূহ শুনাইতে হইবে। (আশ্বগৃহ্য ৪।৬, মনু ৩।২৩২)। এই কয়টী প্রমাণ হইতে বুঝা যাইতেছে, এক সময়ে পুরাণ আর্য্য হিন্দুগণের অবশ্যপাঠ্য মধ্যে পরিগণিত ছিল।

শঙ্করাচার্য্যের বৃহদারণ্যকভাষ্য ও সায়ণাচার্য্যের ঐতরেয় ব্রাহ্মণভাষ্যোপক্রম হইতে জানা যায় যে, দেবাসুরের যুদ্ধ, পুরূরবা-উর্ব্বশী সংবাদ এইরূপ ব্রাহ্মণ ভাগের নাম ইতিহাস ও 'সর্ব্ব প্রথমে একমাত্র অসৎ ছিল,' ইত্যাদি সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ঘটিত বিবরণের নাম পুরাণ। ইহাতে মনে হয়, বেদের ব্রাহ্মণভাগের অংশবিশেষই পুরাণ ও ইতিহাস বলিয়া গণ্য ছিল। আবার মহাভারতে আদিপর্ব্বে শৌনক ভারতবক্তা উগ্রশ্রবাকে বলিতেছেন, 'পুরাণে সমুদায় মনোহর কথা ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের আদিবংশের বৃত্তান্ত আছে। পূর্ব্বে আমরা তোমার পিতার নিকট সে সকল কথা শুনিয়াছি'। (৫ম অধ্যায়)।

মহাভারতের আদিপর্ব্বের প্রথমাধ্যায়ে লিখিত আছে, 'পুরু, কুরু, যদু, শূর, যুবনাশ্ব, কুকুৎস্থ, রঘু, নিষধাধিপতি নল প্রভৃতি সহস্র সহস্র নরপতির কর্ম্ম, বিক্রম, দান, মাহাত্ম্য, আস্তিক্য ও আর্জবাদির বিবরণ বিদ্বান্ সৎকবিগণ কর্ত্তৃক পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে।' এতদ্দ্বারা বোধ হইতেছে যে, নানা কবি পুরাণ লিখিয়াছেন,; স্মরণীয় মহাপুরুষগণের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনও প্রাচীন পুরাণসমূহের উদ্দেশ্য ছিল। বেদে বিভিন্ন মহাপুরুষগণের চরিত্র কীর্ত্তন 'নরাশংস' নামে অভিহিত। এই সকল নারাশংসী গাথাই আদি পুরাণের একটী অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইত। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, পুরাণার্থবিশারদ ভগবান্ বেদব্যাস আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা, ও কল্পশুদ্ধির সহিত পুরাণসংহিতা রচনা করেন। স্বয়ং দেখিয়া যে কথা বলা যায়, তাহাই আখ্যান, পরম্পরাশ্রুত কথার নাম উপাখ্যান, পিতৃবিষয়ক ও পরলোকবিষয়ক গীত ও অন্যান্য কোন কোন গীতের নাম গাথা ও শ্রাদ্ধকল্পনির্ণয়ের নাম কল্পশুদ্ধি বা কুলধর্ম্ম।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, বেদব্যাস ঐরূপ লক্ষণাক্রান্ত

* সাহিত্য-পরিষদের গত পৌষ মাসের অধিবেশনে পঠিত।

একখানি পুরাণসংহিতা রচনা করিয়া তাঁহার সূতজাতীয় শিষ্য লোমহর্ষণকে প্রদান করেন। পরে লোমহর্ষণের নিকট অধ্যয়ন করিয়া তচ্ছিষ্য অকৃতব্রণ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন এই তিন জনে তিনখানি পুরাণসংহিতা রচনা করেন। এই চারিখানি পুরাণসংহিতা অবলম্বন করিয়া প্রথমে ব্রাহ্ম, তৎপরে পাদ্ম, তৎপরে বৈষ্ণব, এইরূপে পরে পরে ১৮ খানি পুরাণ রচিত হইয়াছে।"

বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা যাইতেছে যে, বেদের ব্রাহ্মণ-অংশে উপাখ্যান, গাথা প্রভৃতি যে সকল পুরাণসম্বন্ধী কথা ছিল এবং বেদব্যাসের সময়ে যে সকল জ্ঞাতব্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে নানা কবির বিবরণ একত্র করিয়া বেদব্যাস পুরাণসংহিতা প্রচার করেন। তৎপূর্ব্বে পুরাণ একখানি বিস্তৃত সংহিতাকারে ছিল না, তিনিই সংহিতাকারে পুরাণ প্রবর্ত্তিত করেন বলিয়া ও সেই সংহিতা অবলম্বনে পরবর্ত্তী কালে বিভিন্ন পুরাণ রচিত হইয়াছিল বলিয়া সকল পুরাণ বেদব্যাসের বিরচিত বলিয়া প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে।

পুরাণ সংহিতাবদ্ধ হইবার পর সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত এইরূপে পঞ্চ লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে।

ব্রাহ্ম, পাদ্ম, বৈষ্ণবাদি অষ্টাদশ পুরাণ এক সময়ে রচিত হয় নাই। তাহার প্রমাণ আমরা বিভিন্ন পুরাণ হইতেই জানিতে পারি :—বিষ্ণুপুরাণে আছে—"অভিমন্যোরুত্তরায়াং পরিক্ষীণেষু কুরুম্বশ্বত্থামপ্রযুক্তব্রহ্মাস্ত্রেণ গর্ভ এব ভস্মীকৃতো ভগবতঃ সকলসুরাসুরবন্দিতচরণযুগলস্যাত্মেচ্ছাকারণ-মানুষরূপধারিণোঽনুভাবাৎ পুনর্জ্জীবতমবাপ্য পরিক্ষিৎ যজ্ঞে॥ যোঽয়ং সাম্প্রতমেতদ্ভূমণ্ডলমখণ্ডিতায়তিধর্ম্মেণ পালয়তীতি।" (৪।২০।১২—১৩)।

এখানে জানা যাইতেছে যে, আদি বিষ্ণুপুরাণ রচনাকালে পরিক্ষিৎ রাজ্যপালন করিতেছিলেন। মৎস্যপুরাণেও এইরূপ লিখিত আছে—

"অশ্বমেধেন ততঃ শতানীকস্তু বীর্য্যবান।
যজ্ঞেঽধিসীমকৃষ্ণাখ্যঃ সাম্প্রতং যো মহাযশাঃ।
তস্মিন্ শাসতি রাষ্ট্রন্তু যুষ্মাভিরিদমাহৃতং।
দুরাপং দীর্ঘসত্রং বৈ ত্রিণি বর্ষাণি পুষ্করে।
বর্ষদ্বয়ং কুরুক্ষেত্রে দৃশদ্বত্যাং দ্বিজোত্তমাঃ।" (৫০।৬৬—৬৭)।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উপসংহারপাদেও ঐ শ্লোকটী পাইয়াছি। এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, যখন পরিক্ষিৎপুত্র জনমেজয়ের প্রপৌত্র অধিসীমকৃষ্ণ ভারত শাসন করিতেছিলেন, সেই সময় মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ রচিত হইয়াছিল। সকল পুরাণ-মতেই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণই শেষ বা অষ্টাদশ পুরাণ। এরূপ স্থলে পরিক্ষিতের সময়ে মহাপুরাণের রচনা-কাল আরম্ভ এবং তাঁহার প্রপৌত্রের পুত্র অধিসীমকৃষ্ণের সময়ে অষ্টাদশ মহাপুরাণ সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

কিন্তু প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণ আলোচনা করিলে ঐরূপ প্রাচীনতম কালে রচিত বলিয়া কি মনে হয়? অনেকে বলিতে পারেন, তাহা হইলে পুরাণ মধ্যে ভবিষ্য রাজবংশ-প্রসঙ্গে আধুনিক কথা কিরূপে প্রবেশ লাভ করিল? এদিকে অধ্যাপক উইল্‌সন্ ও মহাত্মা অক্ষয় কুমার দত্ত-প্রমুখ অনেকেই বলিতেছেন, খৃষ্টীয় ৮ম হইতে খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর মধ্যে পুরাণ রচিত হইয়াছে, তাহাই কি গ্রাহ্য করিতে হইবে?

খৃষ্টিয় ৫ম শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতবর্ষ হইতে যবদ্বীপে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ গিয়াছিল। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরাই একথা লিখিয়াছেন। এই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ আজও বালিদ্বীপের শৈব ব্রাহ্মণেরা দেববৎ রক্ষা করিয়া থাকেন, এমন কি তথাকার কোন শূদ্রকেও তাঁহারা এই ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ শুনিতে বা দেখিতে দেন না। ডাক্তার ফ্রেডারিক সাহেব ওলন্দাজ ভাষায় ঐ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বিবরণ ও ইহার কতকগুলি শ্লোক প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ সকল শ্লোকের সহিত মৎপ্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের শ্লোক মিলাইয়া দেখিয়াছি, তাহার অবিকল মিল আছে। কেবল এদেশীয় ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে যে ভবিষ্য রাজবংশাখ্যান আছে, বালিদ্বীপের ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে তাহা এক কালে পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহার কারণ কি? অধিক সম্ভব, ভবিষ্য-রাজবংশপ্রসঙ্গ প্রাচীনতম পুরাণসমূহে স্থান পায় নাই। তাহা হইলে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে আনীত যবদ্বীপের ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উহা অবশ্যই স্থান পাইত। তবে ঐ সময় হইতে যে, পুরাণ মধ্যে ভবিষ্যাখ্যান প্রক্ষিপ্ত হইতেছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ ভট্ট কুমারিল তন্ত্রবার্ত্তিকে লিখিয়াছেন, 'পৃথিবীবিভাগ, বংশানুক্রমণ, দেশকাল-পরিমাণ, ভাবী কথন ইত্যাদি পুরাণের বিষয়।'

প্রচলিত শ্রীমদ্ভাগবত যখন রচিত হয়, তখন ভবিষ্য রাজবংশবর্ণনা পুরাণের দশবিধ লক্ষণ মধ্যে স্থান পাইয়াছিল

তবে পঞ্চলক্ষণাত্মক পুরাণে এ প্রসঙ্গ স্থান পাইয়াছিল কি না, তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না।

এখনকার প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড, বিষ্ণু, মৎস্য, ও মার্কণ্ডেয়পুরাণেই আদি পঞ্চ লক্ষণাক্রান্ত পুরাণের প্রভূত নিদর্শন পাওয়া যায়। এই জন্য ঐ পাঁচখানিকে (ভাবী পঞ্চমাংশ বাদ দিয়া) আমরা অনেকটা খাঁটী পুরাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ঐ সকল পুরাণে সেই জন্য আর্ষ শ্লোকের ছড়াছড়ি।

কেহ বলিতে পারেন, যদি ১৮ খানি পুরাণ ঐরূপ প্রাচীনকালে প্রায় ৪০০০ বর্ষ পূর্ব্বে রচিত হইয়া থাকিবে, তাহা হইলে কোন নির্দ্দিষ্ট পুরাণের নাম আর্য্যজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না কেন? যখন আদি পুরাণ বেদের ব্রাহ্মণাংশ বলিয়া গণ্য ছিল, তখন অবশ্যই বিভিন্ন পুরাণের নামকরণ হয় নাই। কিন্তু ভগবান্ বেদব্যাসের পুরাণসংহিতা অবলম্বনে অষ্টাদশ পুরাণ রচিত হইলে তৎকালীন বৈদিক ধর্ম্মশাস্ত্রে পুরাণের কথা আলোচিত হইয়াছিল। আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রে এই প্রমাণ পাইয়াছি—

"অথ পুরাণে শ্লোকাবুদাহরন্তি।

অষ্টাশীতি সহস্রাণি যে প্রজামীষিরর্ষয়ঃ।
দক্ষিণেনার্য্যম্ণঃ পন্থানং তে শ্মশানানি ভেজিরে।
অষ্টাশীতি সহস্রাণি যে প্রজাং নেষিরর্ষয়ঃ।
উত্তরেণার্য্যম্ণঃ পন্থানং তেঽমৃতত্বং হি কল্পতে।"

শঙ্করাচার্য্য ছান্দোগোপনিষদ্ভাষ্যে এইরূপ পৌরাণিক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"যে প্রজামীষিরে ধীরাস্তে শ্মশানানি ভেজিরে।
যে প্রজাং নেষিরে ধীরাস্তেঽমৃতত্বং হি ভেজিরে।"

আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রে 'অষ্টাশীতি সহস্রাণি' ইত্যাদি যে পুরাণ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, আমাদের সংগৃহীত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে অনুষঙ্গপাদে ৫৪ অধ্যায়ে ঐ বচনগুলি বিবৃতি সহ পাইয়াছি। এতদ্ভিন্ন উক্ত আপস্তম্ব-ধর্ম্মসূত্রে আরও এক স্থানে ভবিষ্যৎ পুরাণের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা—

"আভূতসংপ্লবাত্তে স্বর্গজিতঃ।
পুনঃ সর্গে বীজার্থা ভবন্তীতি ভবিষ্যৎপুরাণে।" ২।২৪।৫-৬

অর্থাৎ পিতৃগণ প্রলয় পর্য্যন্ত স্বর্গে বাস করিয়া থাকেন। পুনরায় সৃষ্টিকালে বীজার্থ হইয়া থাকেন, এ কথা ভবিষ্যৎ পুরাণে আছে। দুঃখের বিষয়, প্রচলিত ভবিষ্যৎপুরাণে ঐরূপ কথা না পাওয়া গেলেও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে অনুষঙ্গপাদে ৮ম অধ্যায়ে ঐ বিবরণ পাইয়াছি। আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র রচনাকালে যে বিভিন্ন পুরাণ রচিত হইয়াছিল, তাহা ভবিষ্যৎ পুরাণের বচন হইতেই জানা যাইতেছে। উক্ত আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রের উদ্ধৃত বচনগুলি আর্ষ সংস্কৃতে গ্রথিত, উহা এখনকার ব্যাকরণসঙ্গত নহে। ইহাতে বোধ হইতেছে—আদি অষ্টাদশ পুরাণও ঐ আর্ষ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে নানা পণ্ডিতের হাতে পড়িয়া অনেকটা মার্জ্জিত হইয়াছে।

সেই প্রাচীন পুরাণে কি ছিল, মৎস্যপুরাণে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত অনুক্রমণিকা প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে জানা যায়, বিষ্ণু, ব্রহ্মাণ্ড, মার্কণ্ডেয় ও মৎস্য ব্যতীত অপর পুরাণসমূহে তত্তৎ পুরাণের প্রাচীন আদর্শ লইয়া তাহাতে অনেক অভিনব কথা সংযোজিত ও অনেক প্রাচীন কথা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আবার প্রভাব লক্ষিত হয়। সম্ভবতঃ এই সময়েই ব্রাহ্মণগণ প্রাচীন পুরাণসমূহ সংগ্রহ বা প্রচলন করিতে থাকেন। সেই জন্য আমরা পুরাণ মধ্যে ভবিষ্য রাজবংশ প্রসঙ্গে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর রাজগণেরও সন্ধান পাই। অধিক সম্ভব রাজসভাশ্রিত প্রাচীন পৌরাণিকগণ পুরাণ মধ্যে তত্তৎ রাজবংশ-তালিকার প্রক্ষেপ করিয়া থাকিবেন, কালে তাহাই পুরাণের অঙ্গ বলিয়া গণ্য হয়। তাহা বলিয়া পুরাণের প্রাচীনত্ব লোপ পায় নাই। তৎকালে ভারতে শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, বৌদ্ধ ও জৈন এই কয় সম্প্রদায়ই প্রধান ছিলেন। ব্রাহ্মণানুরক্ত শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্তগণ যে যে পুরাণে আপনাদের অভীষ্ট দেবের কথা পাইয়াছিলেন, তাহাকেই আপনাদের নিজ সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে থাকেন। এই জন্য আমরা স্কন্দপুরাণীয় কেদারখণ্ডে দেখিতে পাই।

"অষ্টাদশ পুরাণেষু দশভির্গীয়তে শিবঃ।
চতুর্ভি ভগবান্ ব্রহ্মা দ্বাভ্যাং দেবী তথা হরিঃ।" ১ অঃ।

সাম্প্রদায়িক প্রভাবেও বিভিন্ন পুরাণে অনেক প্রক্ষিপ্ত জিনিস স্থান পাইয়াছে।

এই সময় জৈন সম্প্রদায়ও বিভিন্ন পুরাণ রচনা করিয়া হিন্দু পুরাণগুলি বিকৃত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। জৈনদিগের পুরাণ গুলি পাঠ করিলে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া

যায়। সম্ভবতঃ এই সময়ে নারদ পুরাণে অষ্টাদশ পুরাণে'-উপক্রমণিকা সঙ্কলিত হয়। সে সময়ে সংগ্রহকার যত গুলি হিন্দুপুরাণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহারই অনুক্রমণিকা প্রকাশ করিয়া সাধারণকে সাবধান করিয়া দেন যে, ঐ যে বিভিন্ন পুরাণের বিভিন্ন অনুক্রমণিক প্রদত্ত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আর কোন বিষয় সেই সেই পুরাণের অঙ্গাধীন নহে অর্থাৎ তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আদিপুরাণের রূপ মৎস্যপুরাণের অষ্টাদশ পুরাণানুক্রমণিকায় বিবৃত হইয়াছে, আর হিন্দু ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় কালে নানা সম্প্রদায়ের প্রভাবে পরিবর্ত্তিত আকারে যে পুরাণ পাওয়া গিয়াছিল, তাহার রূপ আমরা নারদ পুরাণের অষ্টাদশপুরাণানুক্রমণিকায় দেখিতে পাই। এই নূতন সংস্করণই এখন চলিয়া আসিতেছে। তবে পদ্ম, স্কন্দ, প্রভৃতি কোন কোন পুরাণ মধ্যে মাধ্ব, রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণব ধর্ম্মবীরগণের অভ্যুদয়ে কতক কতক প্রক্ষিপ্ত বচন প্রবেশ লাভ করিয়াছে, নারদীয় পুরাণের অনুক্রমণিকার সহিত প্রচলিত পুরাণের অনুক্রমণিকা মিলাইলে তাহা ধরিতে পারা যায়। তবে চারি লক্ষ শ্লোকাত্মক পুরাণ মধ্যে এরূপ নিতান্ত অপ্রাচীন শ্লোকের সংখ্যা দুই শতাধিক হইবে না। অবশেষে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে, হিন্দুপুরাণ মধ্যে এই নগণ্য প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ব্যতীত আর সকল অংশ খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ হইতে ৭ম শতাব্দীর মধ্যে সংগৃহীত ব সঙ্কলিত হইয়াছে। এই সঙ্কলন গ্রন্থে তিন চারি হাজার বর্ষের পুরাতন শ্লোকাবলীও স্থান লাভ করিয়াছে। 'বিশ্বকোষে' পুরাণ শব্দে এ সম্বন্ধে আমি বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি, সময়াভাব ও বাহুল্যভয়ে তাহা আর এক্ষণে আপনাদিগকে জানাইতে পারিলাম না। যাহারা এই বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে আমি বিশ্বকোষে পুরাণ শব্দ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

এখন আমি জৈন পুরাণ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—খৃষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে হিন্দু-ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় কালে জৈন সম্প্রদায়ও প্রবল ছিল। তাঁহারা হিন্দুদিগের পৌরাণিক কাহিনী উড়াইয়া দিবার জন্য ও আপনাদের উপাস্য তীর্থঙ্কর ও সাধুদিগের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিবার জন্য পুরাণ লিখিতে আরম্ভ করেন। তবে ব্রাহ্মণদিগের মত তাঁহারা স্ব স্ব রচনার অতি প্রাচীনত্ব স্থাপনে অগ্রসর হয়েন নাই। তাঁহারা যে শাকে যে সময়ে পুরাণ রচনা করিয়াছেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

হিন্দুদিগের যেমন দশটী অবতার, জৈনদিগের অনেকটা সেইরূপ ২৪ জন তীর্থঙ্কর। এই ২৪ তীর্থঙ্করকে আশ্রয় করিয়া ২৪ খানি জৈন মহাপুরাণ রচিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আমাদের যেমন অনেকগুলি উপপুরাণ পাওয়া যায়, দিগম্বর জৈনদিগের মধ্যে সেই রূপ কয়েকখানি উপপুরাণও পাওয়া গিয়াছে। দাক্ষিণাত্যে বিভিন্ন তীর্থমাহাত্ম্য লইয়া আধুনিক কালে যেমন অনেক স্থলপুরাণ রচিত হইয়াছে, জৈন তীর্থ সম্বন্ধেও সেইরূপ জৈন স্থলপুরাণ শুনা যায়।

আমি এই কয় খানি জৈন পুরাণ দেখিয়াছি। রবিষেণ-কর্ত্তৃক ৬৭৮ খৃষ্টাব্দে রচিত পদ্মপুরাণ বা রামপুরাণ, জিনসেনাচার্য্য রচিত আদিপুরাণ, এবং তৎকর্ত্তৃক ৯০৫ শকে রচিত অরিষ্টনেমিপুরাণ, বা বৃহদ্ধরিবংশ, জিনসেনের শিষ্য গুণভদ্র কর্ত্তৃক ৮২০ শকে রচিত উত্তরপুরাণ, খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর শেষ ভাগে অরুণমণিরচিত অজিতনাথ পুরাণ, সকলকীর্ত্তি-রচিত শান্তিনাথপুরাণ, মল্লিনাথপুরাণ, চন্দ্রপ্রভপুরাণ পার্শ্বনাথপুরাণ, জিনদাসের পদ্মপুরাণ ও হরিবংশ, ব্রহ্মচারীশ্বর কৃষ্ণদাসবিরচিত মুনিসুব্রতপুরাণ ও বিমলনাথপুরাণ, কেশবসেন কৃষ্ণবিষ্ণু কর্ত্তৃক কর্ণামৃত পুরাণ, ও শ্রীভূষণসূরিকৃত পাণ্ডবপুরাণ, এই সমস্ত জৈন-পুরাণই সংস্কৃত ভাষার রচিত। এতদ্ভিন্ন প্রাচীন কর্ণাটী ভাষায় রচিত অনেক জৈনপুরাণ দৃষ্ট হয়।

রবিষেণের পদ্মপুরাণ বা রামপুরাণ, জিনসেনের অরিষ্ট নেমিপুরাণ বা হরিবংশ ও আদিপুরাণ এবং গুণভদ্রের উত্তর পুরাণ প্রধানতঃ এই চারিখানি পুরাণ পাঠ করিলেই দিগম্বর জৈনদিগের অবলম্বিত পৌরাণিক তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। উক্ত চারিখানি পুরাণের সাহায্যেই পরবর্ত্তী জৈন কবিগণ নানা পুরাণ রচনা করিয়াছেন, সকলকীর্ত্তি, অরুণমণি, শ্রীভূষণ ও ব্রহ্মচারী কৃষ্ণদাস সকলেই একবাক্যে স্ব স্ব পুরাণে এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

হিন্দুপুরাণে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ও ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণের প্রভাব খর্ব্ব করা ও ক্ষত্রিয় প্রভাব সংস্থাপন করাই যেন জৈনপুরাণের গূঢ় উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। হিন্দুপুরাণে পরশুরাম কর্ত্তৃক একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়করণপ্রসঙ্গ বিস্তারিত-

রূপে বর্ণিত হইয়াছে, জৈনদিগের হরিবংশ বা অরিষ্টনেমি পুরাণে এই বিষয়টি অন্যরূপ বর্ণিত দেখা যায়, তাহা এই—

জমদগ্নি কৌরববংশীয় কার্ত্তবীর্য্যের একটি কামধেনু হরণ করিয়া আনেন, সেইজন্য কার্ত্তবীর্য্য ক্রোধে জমদগ্নিকে বিনাশ করেন। তখন পরশুরাম পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য কার্ত্তবীর্য্যের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন। কার্ত্তবীর্য্য নিহত হন, কিন্তু তাহাতেও পরশুরামের রোষানল নির্ব্বাপিত হইল না। তিনি সপ্তবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিলেন, এই সময়ে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনমহিষী গর্ভবতী ছিলেন, তিনি জামদগ্ন্য পরশুরামের ভয়ে কৌশিক (বিশ্বামিত্র) মুনির আশ্রমে পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। তথায় এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়, এই পুত্রের নাম সুভৌম। সুভৌম বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তাঁহার হৃদয়ে পিতৃহত্যার প্রতিহিংসা জাগিয়া উঠিল ; তিনি আপন চক্রে জামদগ্ন্য পরশুরামের শিরশ্ছেদন করিয়া একবিংশতি বার পৃথিবী অব্রাহ্মণ করিয়াছিলেন।

জৈন হরিবংশবর্ণিত পরশুরাম নিধন পাঠ করিলে জৈন-পুরাণের উদ্দেশ্য অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। এইরূপ জৈনদিগের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর জন্মপ্রসঙ্গে, জৈন-পুরাণকার স্পষ্ট লিখিয়াছেন, ব্রাহ্মণরূপ হীনগৃহে তীর্থ-ঙ্করের জন্ম উপযুক্ত নহে বলিয়াই তিনি ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে অবতরণ করিয়াছিলেন। জৈন পৌরাণিক কিরূপে হিন্দু-দিগের পুরাণাখ্যান বিকৃত করিয়াছেন জৈন হরিবংশ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত বসুদেবের উপাখ্যান পাঠ করিলে আপনারা তাহা অনেকটা বুঝিতে পারিবেন ;—

মথুরাধিপ যদুর দুই পুত্র শূর ও সুবীর। শূর হইতে অন্ধকবৃষ্ণ্যাদি ও সুবীর হইতে ভোজকবৃষ্ণ্যাদির উৎপত্তি। অন্ধকবৃষ্ণির ঔরসে সমুদ্র-বিজয় ও বসুদেবাদি দশটী পুত্র এবং কুন্তী ও মদ্রা নাম্নী দুইটী কন্যা জন্মে। এইরূপ ভোজকবৃষ্ণি হইতে উগ্রসেন মহাসেন প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। অন্ধকবৃষ্ণি যথাকালে সমুদ্রবিজয়ের হস্তে সাকেতরাজ্য ও বসুদেবকে সমর্পণ করিয়া সুপ্রতিষ্ঠের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। এই-রূপে ভোজকবৃষ্ণিও উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া নির্গ্রন্থব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। বসুদেব সমুদ্রবিজয়ের আদেশে এক-দিন রমণীয় উদ্যানে অবস্থান করিতেছিলেন, সমুদ্র-বিজয়ের নিযুক্তা এক কুব্জা আসিয়া তাঁহাকে অধিক্ষেপ করে, তাহাতে বসুদেব রাজা সমুদ্রবিজয়ের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইলেন। আর রাজসংসারে থাকা উচিত নয় ভাবিয়া শ্মশানে গমন করিলেন। শ্মশানে একটী শবদেহ ছিল, বসুদেব অতি সঙ্গোপনে একটি জলন্ত চিতায় সেই শবদেহ এরূপ ভাবে ফেলিয়া দিলেন, যে দূরস্থ লোকেরা ভাবিল যেন সেই জলন্ত চিতায় বসুদেবের দেহাবসান হইল। রাজা সমুদ্রবিজয় বসুদেবের অগ্নি-প্রবেশসংবাদে অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন। এদিকে বসুদেব ছদ্ম-বেশে শ্মশান পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজয়খেট নামক পুরে আসিলেন, এখানে গন্ধর্ব্ববিদ্যাপ্রবীণ সুগ্রীব নামক এক ক্ষত্রিয়ের গৃহে অতিথি হইলেন। সুগ্রীবের সোমা ও বিজয়সেনা নামে দুইটী সুন্দরী কন্যা ছিল, বসুদেব উভয়ের পাণিগ্রহণ করিলেন। বিজয়সেনার গর্ভে অক্রূরের জন্ম হইল। পরে বসুদেব দুইজন বিদ্যাধরকুমারের বশে কুঞ্জরাবর্ত্ত নামক বিদ্যাধর-পুরে আসিয়া শ্যামা-নাম্নী এক বিদ্যাধরকন্যার পাণিগ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্য ক্রমে অঙ্গারক নামক এক বিদ্যাধর সেই কুমারীকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আকাশ মার্গে হরণ করিয়া চম্পানগরে লইয়া আসে। ইহার পর চারুদত্তের সহিত বসুদেবের মিত্রতা জন্মে, তিনি চারুদত্তকে গন্ধর্ব্ববিদ্যা শিক্ষা দেন। এখানে তিনি গন্ধর্ব্বসেনা নাম্নী এক রাজ-কুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। একদিন তিনি গন্ধর্ব্বসেনার নিকট শুনিলেন, উজ্জয়িনীতে শ্রীধর্ম্ম নামে এক রাজা ছিলেন, বলি, বৃহস্পতি, নমুচি ও প্রহ্লাদ নামে তাঁহার চারিজন মন্ত্রী ছিল। এক দিন শ্রীধর্ম্ম রাজ-মন্ত্রী চতুষ্টয়সহ জিনমুনিদর্শনার্থ বাহির উদ্যানে আগমন করেন এবং তাঁহাদের দর্শনে শ্রীধর্ম্মরাজের নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। পরে তিনি পদ্ম নামক পুত্রের হস্তে রাজ্যভার দিয়া বিষ্ণুকুমারের নিকট জৈন দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। পদ্ম বলিনামক বিপ্রকে সপ্তাহ রাজ্য প্রদান করেন, এই সময়ে বলির নিকট বিষ্ণুকুমার আসিয়া ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করিলেন। বলি পাদত্রয়পরিমিত ভূমি দান করিলেন। বিষ্ণুকুমার মহাকায় ধারণপূর্ব্বক এক পদে জ্যোতিশ্চক্র, দ্বিতীয় পদে মনুষ্যলোক ও তৃতীয় পদে আকাশ অধিকার করিয়া বসিলেন, পরে দেবগণের অনেক স্তবস্তুতিতে প্রীত হইয়া মহাকায় সম্বরণ করিলেন এবং বলিকে বন্ধনপূর্ব্বক দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করাইলেন। শ্রীধর্ম্মের উপাখ্যান শুনিয়া বসুদেব প্রীত হইলেন। পরে তিনি চারুদত্তের গণিকা কলিঙ্গ-সেনাদুহিতা বসন্তসেনার সংবাদ পান*।

ইহার পর বসুদেব নানা স্থানে গিয়া তথাকার রাজকন্যার পাণি-গ্রহণ ও তাঁহাদের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ইলাবর্দ্ধন-পুরে আসিয়া তিনি মদনবেগা নাম্নী এক রাজকন্যাকে বিবাহ করেন, তাহার গর্ভে অনাবৃষ্টি নামে এক পুত্র জন্মে। একদিন শূর্পনখা আসিয়া মদনবেগার রূপ ধরিয়া তাঁহাকে অন্তরীক্ষে লইয়া যায়, পরে গুরুজন গিয়া অনেক কষ্টে তাঁহাকে উদ্ধার করেন।

কিছুদিন পরে বসুদেব ম্লেচ্ছরাজকন্যা জরার পাণিগ্রহণ করেন, এই জরার গর্ভে কৃষ্ণনিহন্তা জরাকুমারের জন্ম হয়। তৎপরে বসুদেব অরিষ্টপুররাজকন্যা রোহিণীর স্বয়ম্বরসভায় উপস্থিত হইলেন, এখানে রোহিণীর পাণিগ্রহণ আশায় সমুদ্রবিজয় জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজন্যবর্গ আসিয়াছিলেন, রোহিণী বসুদেবের কণ্ঠেই বরমালা অর্পণ করিলেন ; তাহাতে সমুদ্রবিজয়াদি রাজগণ ঈর্ষাপরবশ হইয়া বসুদেবকে আক্রমণ করিলেন। তুমুল যুদ্ধ ঘটিল, শেষে বসুদেবই জয়লাভ করিলেন। সমুদ্র-বিজয় বসুদেবের পরিচয় পাইয়া ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং উভয় ভ্রাতায় আবার মিলন হইল। রোহিণীর গর্ভে রামের জন্ম হয়। তৎপরে বসুদেব পুত্র ও ভার্য্যা সহ সাকেত নগরে আগমন করেন। তাঁহাদের আগমনে রাজা সমুদ্র বিজয় মহোৎসব করিয়াছিলেন। এখানে কংস আসিয়া বসুদেবের নিকট ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করেন। এ সময়ে জরাসন্ধ অতিশয় বল দর্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাকে জয় করিবার জন্য বসুদেব শিষ্য কংস সহ রাজগৃহাভিমুখে গমন করিলেন, এই সময়ে সিংহপুররাজা সিংহরথ ঘোষণা করেন, 'যে জীবিত কুম্ভীর ধরিয়া আনিতে পারিবে, তাহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিব।' বসুদেবের আদেশে কংস বীরপতাকা ধারণ করেন ও গুরুর আদেশে সিংহরথকে বান্ধিয়া জরাসন্ধপুরে নিক্ষেপ করেন। কংসের সহিত জরাসন্ধকন্যা জীবদ্‌যশার বিবাহ হয়, তৎপরে কংস মথুরায় আসিয়া নিজ পিতা উগ্রসেনকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া রাজ্য গ্রহণ করেন ও বসুদেবকে আনিয়া গুরু দক্ষিণাস্বরূপ আপন ভগ্নী দেবকীকে সম্প্রদান করিলেন। একদিন জীবদ্‌যশা কংসকে বলিল যে, আমি শুনিয়াছি বসুদেবপুত্রহস্তে আমার পতিপুত্রের মৃত্যু হইবে। তাহা শুনিয়া কংস গুরুকে ছলনা করিয়া

* চারুদত্তের ও বসন্তসেনার কথা জৈন হরিবংশে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে।

প্রসবকালে দেবকীকে নিজ গৃহে রাখিলেন। যথাকালে দেবকীর গর্ভে নৃপদত্ত, দেবপাল, অনীকদত্ত, ও শক্রঘ্নাদি ছয় পুত্র জন্মে। এই ছয় জনেই কংসের হস্তে অকালে কালকবলে প্রেরিত হয়।

দেবকীর সপ্তম গর্ভে শঙ্খ-পদ্ম গদাসিধারী শ্রীকৃষ্ণ ভাদ্র শুক্ল দ্বাদশী তিথিতে জন্ম গ্রহণ করিলেন। বসুদেব গোপনে কৃষ্ণকে লইয়া নন্দালয়ে রাখিয়া আসিলেন এবং তথা হইতে নন্দকন্যা দুর্গাকে আনিয়া দেবকীর সূতিকাগারে রক্ষা করিলেন। কংস প্রভাতে উঠিয়া সূতিকাগারে আসিয়া সেই কন্যার নাসিকা ছেদন করিয়াছিলেন। তৎপরে দেবকী নন্দালয়ে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া চরিতার্থ হইয়াছিলেন। যথাকালে কৃষ্ণ ও বলদেব মথুরায় আসিয়া কেশী, গজ, চানুর, মুষ্টিক প্রভৃতিকে বিনাশ ও কংসবধপূর্ব্বক উগ্রসেনকে রাজ্য প্রদান করিলেন। তৎপরে কংসনিপীড়িতা যশোদাগর্ভজাতা দুর্গা জিনদেবের সেবা করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিলেন।

উপরি উক্ত উপাখ্যান হইতেই বুঝিতে পারিবেন যে, জৈন পৌরাণিকের হস্তে হিন্দুপুরাণ কিরূপ বিকৃত হইয়াছে। এইরূপ মহাভারত ও রামায়ণাদির অধিকাংশ মুখ্য উপাখ্যান গুলিই বিভিন্ন জৈনপুরাণে বিকৃতভাবে বর্ণিত দেখা যায়। জৈনযতিগণ বলিয়া থাকেন, প্রচলিত হিন্দুপুরাণগুলির এক খানিও অকৃত্রিম নহে। সেই আদি ও অকৃত্রিম প্রাচীন পুরাণাখ্যানই জৈনপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। যদি জৈনপুরাণ-সমূহের রচনাকাল লিপিবদ্ধ না হইত, তাহা হইলে বাস্তবিকই কোন্ পুরাণ প্রাচীন ও মৌলিক, তাহা ভাবিবার বিষয় হইত। যাহা হউক, যখন প্রায় দেড় হাজার বর্ষ হইতে চলিল, জৈনপুরাণের উৎপত্তি হইয়াছে এবং তাহার পরেও আমাদের কোন কোন পুরাণ পুনঃ সঙ্কলিত হইয়াছে, তখন জৈন পুরাণগুলি এককালে অবহেলার জিনিস নহে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হওয়া আবশ্যক এবং বলিতে পারি না, তাহা হইতে ভবিষ্যতে কত নূতন তত্ত্ব আমরা লাভ করিতে পারিব। আমি যথাসাধ্য বিশ্বকোষের 'পুরাণ' শব্দে ঐ সকল পুরাণের আলোচনা করিয়াছি এবং সাধারণকে আলোচনা করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি।

সময়াভাবপ্রযুক্ত বৌদ্ধপুরাণের আলোচনায় বিরত হইলাম।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

সুখ।

(গল্প)

তখন চা পানের সময়, সান্ধ্যদীপ জ্বালান হয় নাই। পল্লী-গৃহ হইতে সমুদ্র বেশ দেখা যাইতেছিল; সূর্য্যদেব সমস্ত আকাশকে আরক্ত করিয়া অস্ত গিয়াছেন—অম্বর পথ যেন স্বর্ণরেণুতে অবলিপ্ত; আর মধ্যসাগর নিস্তরঙ্গ, অকম্পিত, প্রসন্ন, মুমূর্ষু রবির কিরণে তখনও উজ্জ্বল—যেন একখানি প্রকাণ্ড সমুজ্জ্বল ধাতুপাত্রের মত পড়িয়া রহিয়াছে।

দূরে—দক্ষিণে, বন্ধুর গিরিশ্রেণী পশ্চিমের পাণ্ডু-লোহিত নভোদেশে আপনাদের কৃষ্ণ চিত্র অঙ্কিত করিতেছিল।

আমরা "প্রেম" সম্বন্ধে গল্প করিতেছিলাম; সেই পুরাতন বিষয়ে তর্ক করিতেছিলাম; যে সকল কথা ইতঃপূর্ব্বে কতবার বলিয়াছি, তাহা লইয়াই নাড়া চাড়া! গোধূলির ক্লান্ত মাধুর্য্যে আমাদের কথোপকথন মৃদুতর হইয়া আসিতেছিল; অন্তঃকরণে করুণা কাঁপিয়া উঠিতেছিল। আর, "প্রেম" এই শব্দটী, কখন পুরুষের পরুষ কণ্ঠে, কখন বা রমণীর ক্ষীণ কণ্ঠে অবিরাম উচ্চারিত হইয়া ছোট কক্ষটা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল, সেখানে একটা ত্রস্ত বিহঙ্গের মত পক্ষপুট সঞ্চালন করিতেছিল, একটা, ভূতযোনির মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

বছর কতক ব্যাপিয়া কেহ কি প্রেমাসক্ত থাকিতে পারে?

কেহ কেহ বলিলেন, "হাঁ"।

অপর কেহ বা, "না"।

আমরা ঘটনার পার্থক্য দেখাইতেছিলাম, প্রেমের সীমা স্থির করিতেছিলাম। কত বা উদাহরণ দিতেছিলাম। স্ত্রী পুরুষ সকলেই আপনাদিগের কষ্টকর স্মৃতিতে ব্যথিত হইতেছিলেন; সে সকল কথা তাঁহাদের ওষ্ঠাগ্রে আসিয়া কম্পিত হইতেছিল; কিন্তু উহা ব্যক্ত করিতে না পারিয়া, তাঁহারা সেই সর্ব্বলোক-সাধারণ, সেই সর্ব্বোচ্চ বস্তু, দুটী প্রাণীর কোমল ও রহস্যময় মিলনের কথা গভীর আবেগে এবং উৎসাহপূর্ণ আগ্রহের সহিত বারংবার বলিতেছিলেন।

কিন্তু হঠাৎ একজন দূরে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন:—

"ওঃ! ওখানে দেখুন, ওটা কি?"

সাগরোপরি, দিগ্‌বলয়ের ঠিক নিম্নে একটী ধূসরবর্ণ প্রকাণ্ড স্তূপীকৃত বস্তু দৃষ্টিগোচর হইল।

মহিলাগণ আসন হইতে উঠিয়া এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন; তাঁহারা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এমন দৃশ্য তাঁহারা কদাপি দেখেন নাই।

একজন বলিলেন :—

"এ যে কর্সিকা! বাতাসের বিশেষ পরিষ্কার অবস্থায়, বৎসরে দু' তিন বার এরূপ দেখা যায়। দূরস্থ দ্রব্য সামুদ্রিক কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন থাকাতে দেখা যায় না বটে, কিন্তু মরীচিকা বেশ দেখা যায়।"

আমরা পৃথক পৃথক পর্ব্বতশ্রেণী অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইলাম। মনে হইল, উহাদের শিখরস্থ তুষার পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছি। একটী নূতন জগতের এই আকস্মিক আবির্ভাবে, সাগরোদ্ভূত এই বায়বীয় দৃশ্যে প্রত্যেকেই বিস্মিত ও শঙ্কিত-প্রায় হইয়া রহিলেন। হইতে পারে, কলম্বসের মত লোক—যাঁহারা অজ্ঞাত জলধিপারাপার করিয়াছেন—এমন অদ্ভুত দৃশ্যও দেখিয়াছেন।

একটী বৃদ্ধ এতাবৎ নীরব ছিলেন, তিনি বলিলেন :—

"আমার কিছু বলিবার আছে। ঐ যে দ্বীপটী আমাদের সম্মুখে এখন আবির্ভূত, ওটী যেন আমাদের কথোপকথনের উত্তর দিতে, আমার সেই বিশেষ স্মৃতিটীকেই জাগাইতে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ওখানকারই একটী অত্যাশ্চর্য্য সত্য প্রেমকাহিনী আমি জানি। সে প্রেম অসাধারণ সুখের ছিল।"

"ব্যাপারটা এই—

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার কর্সিকায় গিয়াছিলাম। ফ্রান্সের তটপ্রান্ত হইতে আজ যেমন আমরা কর্সিকা দেখিলাম, অনেক সময় এইরূপ দেখা যায় বটে, কিন্তু ঐ অসভ্য দ্বীপটী আমেরিকার অপেক্ষাও অজ্ঞাত ও দূরবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়।

এমন একটা জগতের কল্পনা কর যা' এখনও জড়পিণ্ড মাত্র; পুঞ্জীভূত পাহাড়ের কল্পনা কর—তাহাদের মাঝে মাঝে কেবল অপ্রসর স্রোতঃপ্রধাবিত সুগভীর খাত; একটীও সমতল ভূমি নাই, শুধু প্রস্তরের অনন্ত তরঙ্গ; শুধু ভীষণ "চড়াই" আর "উৎরাই"—গুল্মপুঞ্জে এবং সমুচ্চ বাদাম ও দেবদারু বৃক্ষের অটবীবৃন্দে সমাচ্ছন্ন। অকর্ষিত, জনশূন্য, নীরস ভূভাগ; কচিৎ দু'একটী গ্রাম —যেন একটী পর্ব্বতের শিরোভাগে শিলাস্তূপ। কৃষি নাই, বাণিজ্য নাই, শিল্প নাই। ক্ষোদিত কাষ্ঠের টুকরা বা ভাস্কর-খচিত প্রস্তর খণ্ডও সেখানে দেখিতে পাইবে না; পূর্ব্বতন অধিবাসিগণের রুচি ও সুন্দর দ্রব্যজাতের প্রতি অনুরাগের সামান্যতম চিহ্নও সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় না। যে সকল সৌন্দর্য্যের চর্চ্চাকে আমরা "কলাবিদ্যা" বলি, তাহারই প্রতি চিরন্তন ঔদাসীন্যই তাহাদের প্রকাণ্ড নীরস দেশের পরমাশ্চর্য্য বিশিষ্টতা।

ইতালী কি সুন্দর দেশ। তা'র প্রত্যেক প্রাসাদ কত না মনোহর দ্রব্যে পরিপূর্ণ! সেখানে মর্ম্মর, দারু, পিত্তল, লৌহ, সকল ধাতুই, এবং মহার্ঘ রত্নরাজি মানবের প্রতিভার সাক্ষ্য দিতেছে। কত প্রাচীন গৃহের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সামান্যতম জিনিষটীও কলাশ্রীর প্রতি অপার্থিব অনুরাগের পরিচয় দিতেছে। ইতালী ত আমাদের কাছে চির সাধের পবিত্র দেশ; কারণ, সৃষ্টিক্ষম প্রতিভার আন্তরিক উদ্যম, মহত্ত্ব, ক্ষমতা, এবং সাফল্যের পরিচয় ও প্রমাণ সেখানেই পাই।

আর, তাহার সম্মুখেই ঐ অসভ্য কর্সিকা!—চিরদিনই প্রাচীনতম যুগের বর্ব্বর অবস্থায় রহিয়াছে! সেখানে মানুষ নিজের জীবিকামাত্র এবং পারিবারিক বিবাদ বিসংবাদ ছাড়া অপর সকল বিষয়ে উদাসীন হইয়া সামান্য গৃহে বাস করিতেছে। অসভ্য জাতির দোষ গুণ তাহাতে সম্পূর্ণ বর্ত্তমান। সে প্রচণ্ড ক্রোধপরায়ণ, হিংসুক, রক্তলোলুপ, ও অনুতাপ-বিহীন; অথচ অতিথিবৎসল, উদার, অনুগত, ও সরল; অপরিচিত পথিককেও সাদরে গৃহে লইবে, এবং সামান্যমাত্র সহানুভূতি পাইলে নিজের কৃতজ্ঞ বন্ধুত্ববন্ধনে লোককে বদ্ধ করিবে।

এই চমৎকার দ্বীপে আমি এক মাস ছিলাম—মনে হইত, পৃথিবীর কোন সীমান্তে রহিয়াছি। আর সরাই নাই, পান্থশালা নাই, রাজপথ নাই। অশ্বতর সাহায্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে যাও, দেখিবে সেগুলি যেন পর্ব্বতগাত্রে ঝুলিতেছে; উহাদের নিম্নে বক্রগামী অতল-স্পর্শ গহ্বর—সন্ধ্যার সময় সেখান হইতে স্রোতঃপ্রবাহের গম্ভীর শব্দ শুনিতে পাইবে; বাড়ীর দরজায় আঘাত কর; রাত্রের জন্য আশ্রয় এবং কিছু খাদ্য চাও; তার পর, দরিদ্রের ভোজ্য কিছু খাইয়া, দীন গৃহতলে শয়ন কর; প্রাতে আশ্রয়দাতা তোমাকে পল্লীর প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত পথ দেখাইয়া দিবে; তুমি তাহার করপীড়ন করিয়া বিদায় লও।

এখন, একদিন রাত্রে, দশ ঘণ্টা পথ চলিয়া একটী নিভৃত উপত্যকার একটী ছোট বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছি-

লাম। ক্রোশ দেড়েক দূরস্থ সাগরের সহিত মিলিয়া উপত্যকাটী শেষ হইয়াছে; গুল্ম, গাত্রবিচ্যুত উপল, এবং বড় বড় বৃক্ষে সমাকীর্ণ দুইটি সমুন্নত পর্ব্বত বিষণ্ণ মূর্ত্তি উপত্যকাটীকে প্রাচীরের মত বেষ্টন করিয়া আছে।

কুটীরটীর চারিপার্শ্বে দ্রাক্ষালতা, একটী ছোট উদ্যান, এবং দূরে কতকগুলি বৃহৎ বাদাম গাছ—ইহাতেই বেশ সংসার চলিয়া যায়; বস্তুতঃ, এ দরিদ্র দেশে উহাই বিভব।

একটী বৃদ্ধা আমাকে অভ্যর্থনা করিল; সে গম্ভীর প্রকৃতি এবং পরিচ্ছন্ন—অসামান্য পরিচ্ছন্ন। একজন পুরুষ মোড়ায় বসিয়াছিল, আমাকে অভিবাদন করিবার জন্য উঠিল, এবং একটী মাত্র কথা না কহিয়া পুনর্ব্বার আসন গ্রহণ করিল। তাহার সঙ্গিনী বলিল,

"ওঁকে মাপ করুন; উনি এখন বধির। ওঁ'র বয়স বিরাশী বৎসর।"

রমণী ফ্রেঞ্চ ভাষা বলিল—আমি ত আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম:—

"আপনি কি কর্সিকার লোক নন?"

সে উত্তর দিল:—

"না; আমরা কণ্টিনেণ্টের লোক। কিন্তু আমরা এখানে পঞ্চাশ বৎসর বাস করিতেছি।"

মানব-নিবাস হইতে এত দূরে, এই বিপদসঙ্কুল গহ্বরে পঞ্চাশ বৎসরের বাস শুনিয়া, আমার হৃৎকম্প হইতে লাগিল।

একটী বৃদ্ধ কৃষাণ বাড়ী আসিলে, আমরা আহার করিতে বসিলাম। সেখানে একমাত্র খাদ্য—আলু, কপি, ও শূকরের বসার ডাল্না!

অল্প ক্ষণেই আহার শেষ হইল; আমি দরজার সম্মুখে গিয়া বসিলাম। বিষণ্ণ সন্ধ্যায় জনহীন স্থান বিশেষে একেলা পড়িলে, পথিকের মন যেমন সময় সময় খারাপ হইয়া যায়, এই শোকাচ্ছন্ন স্থানের বিষাদ মূর্ত্তি দেখিয়া আমারও হৃদয় সেইরূপ ক্লিষ্ট হইতে লাগিল। মনে হইতেছিল, যেন প্রত্যেক জিনিষ, এই অস্তিত্ব, বিশ্বপর্য্যন্ত মুহূর্ত্ত মধ্যে লয়-প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। জীবিতের নিদারুণ দৈন্য, প্রাণের মহাশূন্য, দ্রব্য মাত্রেরই অকিঞ্চিৎকরতা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম। মৃত্যুর পূর্ব্বে হৃদয়ে যে স্বপ্নভয়াতুর অন্ধকার অসহায় ভাব অনুভূত হয়, আমি তাহাই অনুভব করিলাম।

নিতান্ত বিরাগীর চিত্তেও ঔৎসুক্য চিরদিন জাগ্রত থাকে; বৃদ্ধাও কৌতূহল পীড়িত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল;—

"আপনি তবে ফ্রান্স্ থেকে আস্ছেন?"

"হাঁ;—আমি আনন্দোভোগের নিমিত্ত ভ্রমণ করিতেছি।"

"সম্ভবতঃ, আপনি প্যারিস থেকে এসেছেন?"

"না, আমি Nancy থেকে আস্ছি।"

এই কথা শুনিয়া যেন সে অসাধারণ আবেগে উত্তেজিত হইল। কি করিয়া যে আমি তাহা ধরিলাম বা অনুভব করিলাম, নিজেই জানিনা।

সে মৃদুস্বরে আবৃত্তি করিল:

"Nancy থেকে আস্ছেন?"

দ্বারের নিকট উপবিষ্ট পুরুষটীকে অপর সকল বধিরের মত সুখ দুঃখের অতীত বলিয়াই বোধ হইল।

রমণী পুনর্ব্বার বলিল,

"ইহাতে কিছু আসিয়া যায়না; উনি শুনিতে পাননা।"

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে জিজ্ঞাসা করিল,

"তবে আপনি Nancyর লোকদের জানেন?"

"অবিশ্যি; প্রায় সকলকেই জানি।"

"Sainte Allaize পরিবারকেও?"

"হ্যাঁ, বিশেষ জানি; তাঁরা আমার পিতার বন্ধু।"

"আপনার নাম কি?"

তাহাকে আমার নাম বলিলাম। কোন কথা ভাবিতে ভাবিতে লোকে যেমন আন্মনে কথা কয়, সে তেমনই মৃদুস্বরে বলিল;

"হাঁ, হাঁ; আমার বেশ মনে পড়্ছে। আর Brise-mares, তাহাদের খবর কি?"

"তাদের আর কেহ জীবিত নাই।"

"আহা!—আর, আপনি এদের জানেন, Sirmont দের?"

"হাঁ, তাদের শেষ পুরুষ একজন সেনাপতি।"

আবেগে, মনস্তাপে, জানিনা কিসে, সে কাঁপিয়া উঠিল; তাহাদের নাম শুনিয়া তাহার হৃদয় নিশ্চয়ই বিচলিত হইয়াছিল; এবং যে সকল কথা সে আপনার অন্তরের অন্তস্তলে এতদিন লুকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহাই বলিতে চেষ্টা করিল:

"হাঁ, Henri de Sirmont; আমি তাকে খুব জানি। সে আমার ভাই!"

আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া তাহার দিকে চাহিলাম। তখন, হঠাৎ আমার সব মনে পড়িল :—

Lorraineএর সম্ভ্রান্ত বংশে এক সময়ে নিতান্ত কলঙ্কাপবাদ প্রচারিত হয়। Suzanne de Sirmont নামে একটী কিশোরী একজন সৈনিকের সহিত পলায়ন করিয়াছিল। বালিকার পিতা সেই সেনাদলের নায়ক ছিলেন।

যে সৈনিকটী সেনাপতির কন্যাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, সে বেশ সুপুরুষ, কৃষকের পুত্র, কিন্তু চাল চলন বেশ ফিট্ ফাট্। যখন সেনাদল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতেছিল, নিঃসন্দেহ তখনই বালিকা তাহাকে দেখে, দেখিয়া মুগ্ধ হয়, এবং তাহাকে ভালবাসিতে থাকে। কিন্তু কেমন করিয়া সে তাহার সহিত কথা কহিত, কেমন করিয়া বা উভয়ের দেখা হইত, কি উপায়ে পরস্পরের সংবাদ পাইত, কি করিয়াইবা বালিকা নিজ প্রেম তাহাকে জানাইল— তাহা কখন জানা গেল না।

কেহ কিছু অনুমান বা সন্দেহ করে নাই। এক দিন রাত্রে, যখন যোদ্ধাটীর চাকুরীর মেয়াদ ঠিক সম্পূর্ণ হইয়াছে, তাহারা উভয়ে অদৃশ্য হইল। বৃথায় লোকে তাহাদের অনুসন্ধান করিল। তাহাদের সংবাদ আর পাওয়া গেল না। সকলে ভাবিল, বালিকা মরিয়াছে।

এই অভাবিত স্থানে আমি তাহাকে দেখিলাম!

আমি উত্তর দিলাম;—

"হাঁ, আমার সব মনে পড়িল। আপনি Mademoiselle Suzanne।"

সে মাথা নাড়িয়া জানাইল "হাঁ" এবং নয়নের ইঙ্গিতে দ্বারনিষণ্ণ বৃদ্ধটীকে দেখাইয়া জানাইল :—

"এই সেই।"

আমি বুঝিতে পারিলাম সে এখনও তাহাকে ভালবাসে, এখনও মুগ্ধ দৃষ্টে তাহাকে দেখে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—

"আপনি সুখী হয়েছিলেন ত?"

সে বলিল :—

"নিশ্চয়ই! খুব সুখী। আমাকে উনি যথেষ্ট সুখী করেছিলেন। কখনও আমাকে অনুতাপ করিতে হয় নাই।"

তাহার স্বর আন্তরিক।

প্রেমের মহিমাময় শক্তিতে বিস্ময়মূঢ় হইয়া, আমি তাহার মুখে বিষণ্ণ নয়নে চাহিলাম। সেই ধনবতী যুবতী এই লোকটাকে—এই কৃষককে গ্রহণ করিল! সে ইচ্ছা করিয়া কৃষকের পত্নী হইল! বৈচিত্র্যহীন, বিলাসবিহীন, নিখিল ইন্দ্রিয়সুখকর সামগ্রীবিরহিতজীবন সে পছন্দ করিল! সে সামান্য আচার ব্যবহারের বশ্যতা স্বীকার করিল! তখনও তাহাকে সে ভালবাসে! দরিদ্র চাষার স্ত্রী হইতে তাহার দ্বিধা বোধ হইল না! তৃণাসনে বসিয়া সে আলু ও কপির ডান্‌লা খাইত! একখানি মাদুরের উপর তাহারই পার্শ্বে শয়ন করিত!

তাহাকে ছাড়া রমণীটী আর কিছু কদাপি ভাবে নাই। রত্নালঙ্কার, সুন্দর সুন্দর পোষাক, রমণীয় বিলাসোপকরণ, কিম্বা ঝালর-পরিশোভিত সুগন্ধামোদিত কক্ষ, অথবা সুকোমল শ্রমহারী পালঙ্কের শয্যার জন্য সে কখনও দুঃখ করে নাই। সে ছাড়া তাহার আর কোন দ্রব্যের প্রয়োজন ছিল না। সে যদি কাছে রহিল, তবে তাহার আর কিছুই বাঞ্ছনীয় নাই।

বালিকাবস্থায় সে মানুষ, সমাজ, অভিভাবক, স্বজন— সকলই ত্যাগ করিয়াছিল। একাকী তাহার সহিত সেই ভীষণ উপত্যকায় গিয়াছিল। যাহা কিছু স্পৃহনীয়, যাহা কিছু কল্পনার, যাহা কিছুর জন্য লোকে চিরদিন চাহিয়া থাকে, যাহা কিছু অনন্ত আশার সামগ্রী—বালিকার নিকট সে-ই সব। আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সে বালিকার জীবন সুখ-পূর্ণ রাখিয়াছিল।

অধিকতর সুখী সে হইতে পারিত না।

সেই অনুরাগিনীর পার্শ্বে শয়ান বৃদ্ধ সৈনিকটীর শ্রুতি-কটু নিঃশ্বাস শব্দ শুনিতে শুনিতে, আমি সমস্ত রাত্রি, সেই অদ্ভুত অথচ সহজ সাহস-কীর্ত্তির—সেই অনাবিল সুখের কথা ভাবিলাম। সে সুখ এত অল্পে পাওয়া গিয়াছিল!

সূর্য্যোদয়ে, বৃদ্ধ দম্পতীর করপীড়ন করিয়া বিদায় লইলাম।

* * * * *

বক্তা থামিলেন। একজন মহিলা বলিলেন :—

"সোজা কথা;—তাহার আকাঙ্ক্ষা সহজেই পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, তাহার অভাব নিতান্ত সামান্য, তাহার প্রার্থনা একান্ত সহজ-সাধ্য ছিল। সে কেবল মূর্খের মত কাজ করিয়াছিল।"

অপর একজন মৃদু ধীর কণ্ঠে বলিল, "তাহাতে কি আসিয়া যায়, সে সুখী ছিল।"

সেথায়, চক্রবালের নিম্নে, কর্সিকা রজনীর অন্ধকারে মিলাইয়া যাইতেছিল—আপনার প্রকাণ্ড প্রতিবিম্ব মুছিয়া দিয়া যেন ধীরে সমুদ্রগর্ভে ফিরিয়া গেল। যে দুটী দীন প্রেমিক তাহার তীরে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাদের কাহিনী বলিবার জন্যই যেন কর্সিকা সহসা আবির্ভূত হইয়াছিল।*

শ্রীমন্মথনাথ সেন।

* গী দে মোপাসাঁ রচিত ফরাসী গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে —লেখক।

সৃষ্টির বিশালত্ব।

(শেষ প্রবন্ধ)

একাদশ বৎসর অন্তর এক এক বার সূর্য্যে ঝটিকাদির প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। ঐ সময়ে সূর্য্যমণ্ডলস্থ এই কৃষ্ণবর্ণের চিহ্নগুলি বর্দ্ধিত আকারে এবং অধিক পরিমাণে দেখা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বিপুল বৈদ্যুতিক উৎপাতের সঞ্চার হইয়া সমস্ত সৌরজগৎময় ব্যাপ্ত হয়। এতদূরে থাকিয়াও আমরা এগার বৎসর পর পর সূর্য্যের এই উচ্ছৃঙ্খলতার দরুণ অসুবিধা ভোগ করি। এখানেও তখন ঝড় বৃষ্টির প্রকোপ বৃদ্ধি পায় এবং কিছুকালের জন্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে।

সূর্য্যের মূর্ত্তি আমরা যেরূপ দেখিতে পাই, তাহা উহার যথার্থ মূর্ত্তি নহে; ঐ গোলাকার পিণ্ডের চতুর্দ্দিকে এমন অনেকগুলি পদার্থ আছে যাহা উহার প্রচণ্ড আলোকের জন্য সহজ চক্ষে দেখিতে পাই না। সূর্য্যের সম্পূর্ণ গ্রহণ হইলে ঐ সকল পদার্থ দৃষ্টি-গোচর হয়। অগ্নি হইতে ধূম বহির্গত হইলে যেমন দেখায়, ঐ সকল পদার্থও তেমনি। বাস্তবিক উহা সৌর ঝটিকার প্রচণ্ড তেজে উৎক্ষিপ্ত বাষ্প রাশি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইরূপ এক একটা বাষ্পস্তম্ভ তিন লক্ষ মাইলেরও অধিক উচ্চ হইতে দেখা গিয়াছে; উহার উদ্‌গমনের বেগ সেকেণ্ডে এক শত মাইল অপেক্ষাও দ্রুত হইয়া থাকে।

সূর্য্যের কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নগুলির সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে যে, পৃথিবীর আহ্নিক গতির ন্যায় উহারও একটা আহ্নিক গতি আছে। পৃথিবী চব্বিশ ঘণ্টায় একবার, আর সূর্য্য প্রায় ২৫ দিনে একবার আবর্ত্তিত হয়।

কেবল তাহাই নহে। পৃথিবী যেমন আবর্ত্তন করিতে করিতে ক্রমে অগ্রসর হয়, সূর্য্যও তেমনি অগ্রসর হইতেছে। এই সৌরজগৎকে সঙ্গে লইয়া সূর্য্য ঘণ্টায় কুড়ি হাজার মাইল বেগে আকাশের এক প্রান্তাভিমুখে ধাবিত হইতেছে।

আকাশরূপ অনন্ত সমুদ্রকে পার হইবার উদ্যম অতিশয় প্রশংসনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কার্য্যের ফলাফল সম্বন্ধে আমাদের অধিক উদ্বিগ্ন হওয়া নিষ্প্রয়োজন। উহা সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। তদপেক্ষা বর্ত্তমানে সূর্য্য আমাদের জন্য কি করিতেছেন, তাহার আলোচনা হওয়া অধিক বাঞ্ছনীয়। সার রবার্ট বলের জ্যোতিষ বিষয়ক গ্রন্থে এ বিষয়ের এইরূপ বর্ণনা আছে :—"সূর্য্য-রশ্মির ঐন্দ্রজালিক শক্তি ধরাকে শস্যশালিনী করিতেছে। সূর্য্যোত্তাপে সমুদ্রের জল হইতে মেঘ সকল উত্থিত হয়; এবং সেই মেঘ হইতে বৃষ্টিধারা পতিত হইয়া ধরাকে সতেজ এবং পোতবাহিনী নদী সকলকে পরিপূর্ণ করে। সৌরতেজে মেদিনী উত্তপ্ত হইয়া বায়ুকে সঞ্চারিত করে; সেই জন্যই অর্ণবযানসকল সমুদ্র পার হইতে সমর্থ হয়। শীত ঋতুর সন্ধ্যাকালে অগ্নিসেবন করিতে বসিয়া আমরা সেই যুগ যুগান্তর পূর্ব্বে ভূপৃষ্ঠাগত সূর্য্য রশ্মিকেই উপভোগ করিয়া থাকি। সেই প্রাচীন কালের সূর্য্যোত্তাপ অঙ্গার যুগের উদ্ভিদ সকলকে বিপুল বৃদ্ধিসম্পন্ন করিয়া কোটি কোটি বৎসর কয়লার অভ্যন্তরে নিদ্রিত ছিল, এতকাল পরে আমরা পুনরায় তাহাকে সচেতন করিতেছি। কয়লায় সঞ্চিত সৌর-শক্তিই আমাদের বাষ্পীয় যন্ত্র সকলকে প্রধাবিত করে। কয়লায় নিহিত সূর্য্যালোকেই আমাদের নগর সকল আলোকিত হয়।"

এবম্ভূত সূর্য্যকে কেন্দ্রে রাখিয়া বিধাতা তাহার চতুর্দ্দিকে সৌর জগতকে সাজাইয়াছেন।

সূর্য্যের সাড়ে তিন কোটি মাইল দূরে বুধ, পৌনে সাত কোটি মাইল দূরে শুক্র, সওয়া নয় কোটি মাইল দূরে পৃথিবী, ১৪ কোটি মাইল দূরে মঙ্গল, আটচল্লিশ কোটি মাইল দূরে বৃহস্পতি, আটাশ কোটি মাইল দূরে শনি, এক শত আটাত্তর কোটি মাইল দূরে ইউরেনস্, এবং দুই শত আটাত্তর কোটি মাইল দূরে নেপচুন্ বিচরণ করিতেছে।

গ্রহগণ শকট চক্রের ন্যায় আবর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হয়। একবার আবর্ত্তনের কালকে গ্রহের এক অহোরাত্র এবং একবার সূর্য্যের চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিয়া আসিবার কালকে উহার এক বৎসর বলা যায়। যে গ্রহ যত দূরবর্ত্তী, তাহার গতি ততই ধীর। এ স্থলে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, আমরা সচরাচর যেরূপ ধীর গতির প্রসঙ্গে গোধিকা কচ্ছপ শম্বুকাদির কথা স্মরণ করি, গ্রহগণের গতি বাস্তবিক সেই প্রকার ধীর। এ ধীরতা আপেক্ষিক ধীরতা মাত্র। এক গ্রহের তুলনায় অন্য গ্রহের গতি মন্দ হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক সর্ব্বাপেক্ষা মন্থর গামী গ্রহের গতিও অতিশয় প্রচণ্ড। কামানের গোলার বেগ তাহার তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর।

সর্ব্বাপেক্ষা অলস গ্রহ নেপচুন। কারণ তাহা সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী। কিন্তু এই গ্রহও প্রতি সেকেণ্ডে সাড়ে তিন মাইল গমন করে। ইউরেনসের বেগ সেকেণ্ডে চারি মাইল, শনির ছয় মাইল, বৃহস্পতির আট মাইল, মঙ্গলের পোনের মাইল, পৃথিবীর সাড়ে আঠার মাইল, শুক্রের বাইশ মাইল, এবং বুধের তেইশ হইতে পঁয়ত্রিশ মাইল।

গ্রহগণের দূরত্ব এবং বেগ এত বিভিন্ন হওয়াতে উহাদের বৎসরও বিভিন্ন হয়। আমাদের পৃথিবীর বৎসরের তুলনায় বুধের বৎসর তিন মাসে, শুক্রের বৎসর সাড়ে সাত মাসে, মঙ্গলের বৎসর প্রায় তেইশ মাসে, বৃহস্পতির বৎসর প্রায় বারো বৎসরে, শনির বৎসর প্রায় ত্রিশ বৎসরে, ইউরেনসের বৎসর চুরাশী বৎসরে, নেপচুনের বৎসর এক শত পঁয়ষট্টি বৎসরে পূর্ণ হয়।

গ্রহদিগের সকলে সমান বড় নহে, ইহা পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে। এই বিভিন্নতার মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আছে। সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী চারিটি গ্রহ অর্থাৎ বুধ, শুক্র, পৃথিবী এবং মঙ্গল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। দূরবর্ত্তী চারিটি গ্রহ অর্থাৎ বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনস্ এবং নেপচুন ইহাদের তুলনায় অতিশয় বৃহৎ। বুধ, শুক্র, এবং মঙ্গল ইহারা সকলেই পৃথিবী অপেক্ষা ক্ষুদ্র কিন্তু নেপচুন আয়তনে পৃথিবীর পঁচাশী গুণ ইউরেনস্ পয়ষট্টি গুণ, শনি সাত শত একুশ গুণ, বৃহস্পতি এক হাজার তিন শত নয় গুণ।

গ্রহগণ যেমন সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে উপগ্রহগণ তেমনি গ্রহদিগকে প্রদক্ষিণ করে, আমাদের চন্দ্র এই শ্রেণীভুক্ত। পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করা ইহার কার্য্য। আমরা যে উহাকে এত বৃহৎ দেখিতে পাই, পৃথিবীর সান্নিধ্যই ইহার এক মাত্র কারণ। কিন্তু বাস্তবিক উহার আয়তন পৃথিবীর আয়তনের পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। গুরুত্বে উহা পৃথিবীর আশী ভাগের এক ভাগও হয় না।

পৃথিবী তাহার পৃষ্ঠস্থ পদার্থ সকলকে যেরূপ বলের সহিত আকর্ষণ করিতেছে, চন্দ্র তাহার পৃষ্ঠস্থ বস্তু সকলকে তাহার ষষ্ঠাংশ পরিমিত বলের সহিত আকর্ষণ করে। এই হিসাবে দেখা যায় যে চন্দ্রলোকে গেলে গর্দ্দভের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইত; কারণ এই পৃথিবীতে তাহাকে যে ভার বহন করিতে হয়, চন্দ্রলোকে তাহার ওজন এখানকার ছয় ভাগের এক ভাগ মাত্র।

চন্দ্রলোকে গমনের প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন হয় যে, তথায় কিরূপ জীব বাস করে। এ প্রশ্নের উত্তরে দুঃখের সহিত বলিতে হয় যে আমরা যেরূপ জীবের কথা জানি, তাহাদিগের পক্ষে চন্দ্রলোকে বাস করা সম্ভব নহে। জীবন রক্ষার প্রধান দুটি উপাদান যে জল আর বায়ু, এ উভয় বস্তুরই চন্দ্রে অভাব দেখা যায়। বায়ুহীন দেশে শব্দের উৎপত্তি অসম্ভব। সেখানে বজ্রপাত হইলেও তাহা নীরবেই হইবে। উষা এবং গোধূলী সে দেশ হইতে চিরকালের জন্য নির্ব্বাসিত হইয়াছে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তথায় রজনীর ঘন অন্ধকার বর্ত্তমান থাকে, আর সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই ঘোর অমানিশার সঞ্চার হয়। তথাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও অতিশয় ভীষণ। জীবহীন রসহীন শুষ্ক শতধা বিদীর্ণ কঙ্করময় শ্মশান ভূমিকে বেষ্টন করিয়া মৃত আগ্নেয় গিরির কঙ্কাল সকল প্রহরীরূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। চন্দ্রের ক্ষুদ্র কলেবরের তুলনায় এই সকল পর্ব্বত হিমালয়ের অপেক্ষাও প্রায় তিন গুণ উচ্চ। তথাকার বায়ুহীন আকাশে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী অনৈসর্গিক উগ্রতা

সহকারে দীপ্তি পায়। আমাদের পৃথিবী সেই আকাশের চন্দ্র, আমরা যে চন্দ্রকে দেখিতে পাই, তদপেক্ষা সেই চন্দ্র পঞ্চাশ গুণ বৃহৎ।

এই অসহনীয় উজ্জ্বলতার সঙ্গে অভাবনীয় শৈত্যের সমাবেশ হইয়া চন্দ্রের ভীষণতাকে দ্বিগুণ ভয়ানক করিয়াছে। চন্দ্রের আগ্নেয়গিরি সকলকে মৃত বলা হইয়াছে। বাস্তবিক এখন আর সে সকল আগ্নেয় গিরি হইতে অগ্নি নির্গত হয় না। চন্দ্রের অগ্নি অনেক দিন যাবৎ নির্ব্বাপিত হইয়াছে।

সৌর জগতে এ পর্য্যন্ত একুশটি চন্দ্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। পৃথিবীর একটি, মঙ্গলের দুটি, বৃহস্পতির পাঁচটি, শনির আটটি, ইউরেনসের চারিটি এবং নেপচুনের একটি।

শনিগ্রহের আটটি চন্দ্র ব্যতীত আর একটি অতিশয় অদ্ভুত অনুচর আছে। দুরবীক্ষণে দেখিলে শনির মূর্ত্তি কতকটা গাড়ীর চাকার ন্যায় বোধ হয়। গাড়ীর চাকার মধ্যস্থলে একটা পিণ্ডের ন্যায় এবং চতুর্দ্দিকে বলয়ের ন্যায় থাকে, যাহাদিগকে ক্রমান্বয়ে উহার নাভি এবং নেমী বলা যায়। শনিগ্রহও ঐরূপ একটি বলয় বেষ্টিত গোলক। এইরূপ বলয় সৌর জগতে আর কোন গ্রহেরই নাই। উহা যে বাস্তবিক কিরূপ বস্তু, তাহা সহজে স্থির হয় নাই। দুরবীক্ষণের ক্ষমতা যতই বাড়ে, এই বলয়ের মূর্ত্তি ততই অদ্ভুত হইয়া দাঁড়ায়। গ্যালিলিয়ো তাঁহার ক্ষুদ্র দুরবীক্ষণ দিয়া, উহাকে বলয় বলিয়া বুঝিতেই পারেন নাই। আধুনিক বৃহৎ দুরবীক্ষণ সকলে উহাকে অনেকগুলি বলয়ের সমষ্টিরূপে দেখা যায়। উহার কোন কোন অংশ অর্দ্ধ স্বচ্ছ, তাহার ভিতর দিয়া শনির দেহ অল্প অল্প দৃষ্ট হয়। বলয়ের মূর্ত্তিতে সময় সময় কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনও হইয়া থাকে।

এই বলয় অথবা চক্রের ব্যাস এক লক্ষ বায়াত্তর হাজার আট শত মাইল। ইহার পরিসর বিয়াল্লিশ হাজার তিন শত মাইল। শনির পৃষ্ঠ হইতে ইহার দূরত্ব ছয় হাজার মাইল। বলয়ের আয়তনের তুলনায় ইহার বেধ অতি সামান্য। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে তাহা ৫০ মাইলের অধিক হইবে না।

এই বলয় যে কোন কঠিন বা তরল বস্তু নহে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। বাস্তবিক উহা একটি পদার্থ নহে। অসংখ্য ক্ষুদ্র উপগ্রহ দলবদ্ধ হইয়া শনিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। উহারা এতই ক্ষুদ্র যে, উহাদিগকে পৃথক্ ভাবে দেখা সম্ভব নহে। সুতরাং আমরা উহাদিগকে সমষ্টিতে বলয়ের ন্যায় দেখি। এই সকল বলয় এবং আটটি চন্দ্র মিলিত হইয়া শনির আকাশকে না জানি কত সুন্দর করিয়া রাখিয়াছে!

উপগ্রহদের বৃহত্তমটি বৃহস্পতির সহচর। উহার ব্যাস পাঁচ হাজার পাঁচ শত পঞ্চাশ মাইল। শনির সহচর আর একটি উপগ্রহও প্রায় ইহার সমান। এই দুটি উপগ্রহ বুধগ্রহ অপেক্ষাও বৃহৎ।

মঙ্গলের উপগ্রহ দুইটি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। ইহাদের ব্যাস হয়ত দশ মাইলের অধিক হইবে না।

গ্রহগণের কথা শেষ করিবার পূর্ব্বে ক্ষুদ্র গ্রহগুলির সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

এই সকল গ্রহ আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব্বেই জ্যোতির্ব্বিদেরা ইহাদিগের স্থানটিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন। ইহার কারণ অতিশয় বিস্ময়কর। সূর্য্য হইতে গ্রহগণের দূরত্বগুলিকে পৃথিবীর দূরত্ব দিয়া ভাগ করতঃ সেই ভাগফলকে দশ গুণ করিলে বুধ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে ৪, ৭, ১০, ১৬, ৫২ ১০০, ১৯৬ এই সকল রাশি পাওয়া যায়। ইহাদের প্রথম রাশিকে ক্রমান্বয়ে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ প্রভৃতি রাশি হইতে বাদ দিলে, ৩, ৬, ১২, ৪৮, ৯৬, ১৯২ এইরূপ বিয়োগফল সকল বাহির হয়। ১২ আর ৪৮এর মধ্যে ২৪এর অঙ্কটি থাকিলে রাশিগুলি ক্রমান্বয়ে দ্বিগুণিত হইয়া আসিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর জ্যোতিষিকগণ এই ২৪এর অঙ্কটির অভাব বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলেন। মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মধ্যস্থলে কোন গ্রহ থাকিলে এই শূন্য স্থান পূর্ণ হয়, সুতরাং ঐ স্থানে একটি অনাবিষ্কৃত গ্রহের অস্তিত্বে অনেকেই বিশ্বাস করিতেন।

ইহা ইউরেনস্ আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব্বের কথা, উক্ত গ্রহ আবিষ্কৃত হইলে দেখা গেল যে এই নিয়ম তাহার স্থলেও কার্য্যকর। সুতরাং পুনরায় সেই মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মধ্যস্থিত শূন্য স্থানটিতে লোকের দৃষ্টি পতিত হইল। পরে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিনে ঐ স্থানে একটি গ্রহ আবিষ্কৃত হয়। তদবধি ঐ বিশেষ স্থানটিতে আরো অনেকগুলি গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই সকল গ্রহের সংখ্যা প্রায় সাড়ে চারি শত।

ইহাদের আয়তন নিতান্তই ক্ষুদ্র। ইহাদের কাহারও ব্যাস ৫০০ মাইলের অধিক নহে। ১০।২০ মাইল ব্যাস বিশিষ্টও অনেকগুলি আছে। এতদপেক্ষাও ক্ষুদ্র যে নাই, এমন কথাই বা কি করিয়া বলা যায়? বাস্তবিক ইহাদের সংখ্যা প্রতি বৎসরই এত বৃদ্ধি পাইতেছে যে, এরূপ ভাবে কিছু দিন চলিলে পরে ইহাদের হিসাব রাখাই কঠিন হইবে।

এই গ্রহপুঞ্জের সহিত শনিগ্রহের বলয়ের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখা যায়।

গ্রহগণের সকলেরই এক একটা বিশেষত্ব আছে, যথা বুধ সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী গ্রহ; শুক্র সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল গ্রহ; মঙ্গল সর্ব্বাপেক্ষা পৃথিবীর অনুরূপ গ্রহ; বৃহস্পতি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রহ; শনি সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত গ্রহ; ইউরেনস্ ইদানীন্তন কালের প্রথম আবিষ্কৃত গ্রহ; নেপচুন সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী গ্রহ।

মঙ্গল গ্রহকে পৃথিবীর অনুরূপ বলার অর্থ এই যে, পৃথিবীর ন্যায় উহাও জল স্থলময় গ্রহ। পৃথিবীর মেরুর ন্যায় ইহার মেরুও তুষারে আবৃত। শীতকালে এই তুষার বৃদ্ধি পায়, এবং গ্রীষ্মকালে উহার আয়তন কমিয়া আসে। ইহাতে মেঘ সঞ্চারিত হইতে দেখা গিয়াছে। সুতরাং ইহাতে যে বৃষ্টি পতিত হয় তাহাও সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। বৎসরের কোন কোন ভাগে ইহার বর্ণ স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত হয়। এতদ্দ্বারা ইহাতে বৃক্ষলতাদির অস্তিত্ব সূচিত হওয়াও আশ্চর্য্য নহে।•

মঙ্গল গ্রহের সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য সংবাদ এই যে ইহাতে এমন অনেকগুলি পদার্থ লক্ষিত হইয়াছে, যাহা দৃষ্ট মাত্রই কৃত্রিম বলিয়া বোধ হয়। ঐ গ্রহে মনুষ্য আছে কি না, তৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা হইতেছে না; কিন্তু তথায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন, বিশেষ ক্ষমতাশালী জীব আছে বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। তাহারা বলেন যে, বিশাল পয়ঃপ্রণালী সকল খনন করিয়া মঙ্গলের অধিবাসিগণ জলচালনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সকল পয়ঃপ্রণালী এত বৃহৎ, যে তাহাদের ক্ষুদ্রতমগুলির পরিসর ১৮ মাইলের কম হইবে না। স্থানে স্থানে এক একটা হ্রদ হইতে এইরূপ পাঁচ ছয়টা পয়ঃপ্রণালী নির্গত হইতে দেখা যায়।

মঙ্গল গ্রহে বুদ্ধিমান্ জীবের অস্তিত্বে অনেকের এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস যে ইতি মধ্যেই তাহাদের সহিত পরিচয় করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এতৎ প্রসঙ্গে সম্প্রতি সংবাদপত্রে মঙ্গল গ্রহ সম্বন্ধে যে একটি সংবাদ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কিছু দিন হইল আমেরিকার কোন মানমন্দিরে দূরবীক্ষণ যোগে মঙ্গলগ্রহকে পর্যবেক্ষণ করা হইতেছিল। এমন সময় উহার এক স্থানে অনেকগুলি আলোক হঠাৎ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া জ্বলিয়া উঠিতে দেখা গেল, এবং কিছু কাল পরে তাহা আবার হঠাৎ নিভিয়া গেল। যাঁহারা এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা মনে করিলেন যে উহা মঙ্গলের অধিবাসিগণের কার্য্য এবং আমাদিগকে তাঁহাদের সংবাদ দেওয়া ইহার উদ্দেশ্য।

মঙ্গলের এই সকল পয়ঃপ্রণালী যদি বাস্তবিকই কোন জীবের কার্য্য হয়, তবে সেই জীব মনুষ্য অপেক্ষা অনেক গুণে উন্নত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভগবান্ তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে কত মঙ্গল, কত পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে কত উন্নত হইতে উন্নততর জীবকে রাখিয়াছেন তাহা কে বলিতে পারে?

সৌরজগতের অপর কোন গ্রহে জীবের নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। বৃহস্পতি প্রভৃতি বৃহৎ গ্রহগুলির এখনও শৈশবাবস্থা। উহারা কালে জীবনিবাসের উপযোগী হইলে হইতেও পারে, কিন্তু এখন তথায় জীব না থাকাই সম্ভব।

আমাদের এই পৃথিবীও যে এক কালে জীবনিবাসের অনুপযুক্ত ছিল, তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। এমন এক সময় গিয়াছে যখন এই পৃথিবী সূর্য্যের ন্যায় অগ্নিময় ছিল। উহা কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বের কথা। তৎপর যুগ যুগান্তর ধরিয়া পৃথিবী ক্রমে শীতল হইতেছে, এবং তাহাতে নানারূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এই সকল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কত জীব প্রাদুর্ভূত হইয়া জীবন লীলা সাঙ্গ করিয়া গেল তাহার ইয়ত্তা নাই। মনুষ্য অতি অল্প দিন যাবৎই পৃথিবীতে আসিয়াছে, এবং পৃথিবীর জীবন কালের তুলনায় আর অতি অল্পকালই এখানে থাকিতে পাইবে। পৃথিবীর জন্মাবধি ক্রমে উন্নত হইতে উন্নততর জীব জন্মগ্রহণ করতঃ শেষে যেমন মনুষ্যের হস্তে ইহার আধিপত্য রাখিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছে, সেইরূপ মানুষও কালে কোন উন্নততর জীবকে আসন ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া পড়িবে কি না, তাহা বিধাতাই জানেন। এ বিষয়ে

কোনরূপ অনুমান করা যদি আমাদের পক্ষে সঙ্গত হয়, তবে তাহা এই যে পৃথিবী ক্রমে শীতল হইয়া কালে এমন অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, যে তখন আর তাহাতে কোনরূপ জীব থাকা সম্ভব হইবে না। তত দিনে অন্যান্য লোক জীব নিবাসের উপযোগী হইয়া দয়াময়ের মহিমার সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

ধূমকেতু এবং উল্কার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা আবশ্যক দেখা যায় না। সৌরজগতের ধূমকেতুগুলি চিরকালই ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

অন্যান্য অসংখ্য ধূমকেতুর ন্যায় ইহারা অনন্ত আকাশের অধিবাসী ছিল। শেষে উর্ণনাভের জালে মক্ষিকা আবদ্ধ হইবার ন্যায় সূর্য্যের আকর্ষণে ধরা পড়িয়াছে।

ধূমকেতুর সম্বন্ধে যখন লোকের জ্ঞান তত পরিষ্কার ছিল না, তখন ইহাদিগকে দেখিয়া সকলে অতিশয় ভয় পাইত। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে ইহারা অতিশয় নিরীহ। দেখিতে উহাদের এক একটা যতই বিশাল এবং ভয়াবহ হউক না কেন, উহাদের মধ্যে পদার্থ এত অল্প আছে যে তাহার সম্বন্ধে অধিক সময় নষ্ট করা উচিত বোধ হইতেছে না।

উল্কাগুলির সহিত ধূমকেতুর অতিশয় ঘনিষ্ট সম্বন্ধ দেখা যায়। ধূমকেতুগণ সূর্য্যের চারিদিকে ভ্রমণ করিতে করিতে শেষে উল্কাপুঞ্জে পরিণত হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সেই সকল উল্কা সেই ধূমকেতুর অবলম্বিত পথে অদ্যাপি বিচরণ করিতেছে। পৃথিবী ঐ পথের নিকট দিয়া গমন করিবার সময় ঐ সকল উল্কাকে আকর্ষণ করে। তখন উল্কা সকল বেগে বায়ু মণ্ডলে প্রবেশ পূর্ব্বক ঐ বায়ুর সংঘর্ষণে অতিমাত্র উত্তপ্ত ও দগ্ধ হইয়া ধ্বংস পায়। আমরা যাহাকে উল্কাপাত বলি, তাহা ঐ উল্কার জীবনের শেষ উজ্জ্বল মুহূর্ত্ত মাত্র।

পৃথিবীতে ২৪ ঘণ্টায় কি পরিমাণে উল্কাপাত হয়, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে। যাহা চক্ষে দেখা যায়, এরূপ উল্কার সংখ্যা প্রতিদিন এক কোটির কম হইবে না। কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক উল্কাই আমরা চক্ষে দেখিতে পাই। উহারা যে বায়ু মণ্ডলে প্রবেশ করিয়া ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়, ইহা আমাদের নিতান্তই সৌভাগ্যের কথা বলিতে হইবে। ভগবান যদি বায়ুস্তরকে এত গভীর না করিতেন, তাহা হইলে এই সকল উল্কার আঘাতে অনেক দুর্ঘটনা ঘটিত তাহাতে সন্দেহ নাই।

সৌরজগতের আভ্যন্তরিক গঠন প্রণালীর কতক আভাস পাওয়া গেল। এখন ইহার ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে যতদূর নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা হওয়া ভাল। আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে এই ইতিবৃত্তের দু এক কথা শিখিতে পারা যায়। বনের ভিতরে যেমন সকল অবস্থার বৃক্ষই দেখিতে পাওয়া যায়, আকাশেও সেই রূপ সকল অবস্থার জ্যোতিষ্কই আছে। নিতান্ত শিশু বৃক্ষটি হইতে আরম্ভ করিয়া, পূর্ণবয়স্ক বৃক্ষ, প্রাচীন বৃক্ষ, শুষ্ক মৃত বৃক্ষ সকলই বনের ভিতরে দৃষ্টি গোচর হয়; এবং তাহা হইতে বৃক্ষ কিরূপে বীজ হইতে অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে বর্দ্ধিত, এবং অবশেষে জরাগ্রস্ত ও মৃত হয়, তাহা আমরা অনায়াসেই কল্পনা করিয়া লইতে পারি। সেইরূপ আকাশের দিকে তাকাইয়াও আমরা নানা অবস্থার জ্যোতিষ্ক দেখিতে পাই এবং তাহাদের অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া জ্যোতিষ্কের জীবনের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস প্রাপ্ত হই। নীহারিকাগণের অবস্থাই জ্যোতিষ্কের প্রথম অবস্থা বলিয়া বোধ হয়। আমাদের এই সৌরজগৎ এক সময়ে এইরূপ বাষ্পরাশি মাত্র ছিল। সেই বাষ্পরাশি সর্ব্ব প্রথমে কিরূপে আবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহা ঈশ্বর জানেন। বাষ্প যতই সংকুচিত হইতে লাগিল, আবর্ত্তনের বেগ ততই বাড়িয়া চলিল। এইরূপে কেন্দ্রাপগামিনী শক্তি সঞ্চারিত হওয়াতে মাঝে মাঝে সেই বাষ্পরাশি হইতে এক এক অংশ পৃথক্ হইয়া পড়িতে লাগিল, এবং এইরূপে গ্রহ গুলির জন্ম হইল। সূর্য্য হইতে গ্রহ সকল যে প্রণালীতে নির্গত হইয়াছে, গ্রহ হইতে উপগ্রহ সকলও ঠিক সেই প্রণালীতে নির্গত হইয়াছে।

কটাহের রাশিকৃত উষ্ণ দুগ্ধ হইতে এক চামচ দুগ্ধ তুলিয়া আনিলে, চামচের দুগ্ধ অতি শীঘ্রই শীতল হইয়া যায়; কিন্তু কটাহস্থিত দুগ্ধ তখনও হয় ত পূর্ব্ববৎ উষ্ণই থাকে। এইরূপ কারণে সূর্য্য শীতল হইবার অনেক পূর্ব্বেই গ্রহগণ কঠিনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। বৃহস্পতি অপেক্ষা পৃথিবী অনেক ক্ষুদ্র, সুতরাং পৃথিবী তদপেক্ষা অনেক শীঘ্র শীঘ্র শীতল হইয়া আসিতেছে। চন্দ্র এতদপেক্ষাও ক্ষুদ্র; এইজন্যই চন্দ্রের উষ্ণতা ইতিমধ্যেই লোপ পাইয়াছে। চন্দ্রের

আহা সে ললনা মলিন বসনা
রাখে অঙ্ক'পরে করুণ বীণ্‌ !
নয়ন আসার সিক্ত তন্ত্রী তার
মুছি' কোন মতে আঁচলে হায় !
আপন রচনা মরি মূর্চ্ছনা
বার বার বালা ভুলিয়া যায়।
হইতে দেহলী ফুল দল তুলি'
গণে বিরহিণী বিরহমাস,—
গেল কত তার বাকি কত আর,
ফুরাইবে কবে বিরহ রাশ।
ভাবিতেছে কিবা কোথা কোন দিবা
নাথ-আলিঙ্গন লভিবে বালা,—
এমন চিন্তায় সদা ভুলে যায়
বিরহবিধুরা মরম জ্বালা।
নানা সাধনায় দিবস ফুরায়
বিরহ তেমন নাহিক দহে,
আসিলে যামিনী আহা সে দুখিনী
মরণ অধিক যাতনা সহে।
অবনী শয়নে অনিদ নয়নে
নিশীথে নীরবে কাঁদে সে হায় !
হে করুণ ঘন ! হ'তে বাতায়ন
আমার বারতা কহিয়ো তায়।
বিরহ-শয্যায় এক পাশে হায়
কৃশ তনুলতা রয়েছে পড়ি',—
যেন প্রাচী মূলে পড়িয়াছে ঢলে'
ক্ষীণ শশিকলা মলিন মরি !
সাধের মিলনে সুখ-জাগরণে
কাটিত যে নিশি পলকে হায়,
আজি সে যামিনী যাপিছে কামিনী
তিতি আঁখিনীরে যুগের প্রায় !
ইন্দু কিরণ হ'তে বাতায়ন
পড়িছে ঝরিয়া শয়ন কোলে,
সুখের আশায় হেরিতে তাহায়
চমকি' ললনা [illegible] খোলে।
অমনি উথলে [illegible]র আঁখিজলে,
[illegible] আসে,—

বাদলের দিনে যেমতি বিপিনে
জাগরণহীন নিদ্রা বিহীন
স্থল কমলিনী বিষাদে ভাসে !
চারু চঞ্চল রুখু কুন্তল
পড়েছে আসিয়া কপোলে হায়,
অধর রাঙ্গিয়া মলিন করিয়া
তুলায় নীরব নিশ্বাস তায়।
স্বপন মাঝারে লভিতে আমারে
চাহিছে ললনা ঘুমের ঘোরে,
ঘুমাবে কেমনে ? উথলে নয়নে
আমরি নিঠুর নয়ন-লোর !
প্রথম বিরহ দিবসে অসহ
বাঁধিলা যে শিখা বিষাদে ভাসি',
বলয়ের পরে হরষের ভরে
করিব মোচন আমি যা' আসি,'
এক বেণী হায়। সে শিখা লুটায়
কঠিন, বিষম, কপোল'পরে,
নত মুক্ত মরি ! পরশে শিহরি'
দিতেছে সবাসে সনখ করে !
আহা সে অবলা বিরহ বিকলা
অসহ ভূষণ ফেলিছে খুলি,'
দারুণ দহনে বিরহ শয়নে
মৃদুল তনুয়া পড়িছে ঢুলি'।
দরশি' সে দুখ বিদরিবে বুক
অশ্রুরূপে তব পড়িবে ধারা,—
সজল অন্তর গলে নিরন্তর
করুণা পরশে, জগত সারা।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

শব্দদ্বৈত।

গত ফাল্গুন মাসের প্রদীপে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত রবিবাবুর বাঙ্গালা শব্দদ্বৈত প্রবন্ধের যে সমালোচনা করিয়াছেন, উহা পাঠ করিয়া দুইচারিটী কথা মনে উদিত হইল ; নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি। রবিবাবুর প্রবন্ধ

পাঠ করিবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই। সমালোচনা পড়িয়া যাহা মনে হইয়াছে, তাহাই লিখিতেছি। রবিবাবু অথবা শ্রীনিবাসবাবুর ত্রুটি প্রদর্শন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা যাহা লিখিতেছি, তাহার সমস্ত সঙ্গত নাও হইতে পারে। বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ বিষয়ে আলোচনা করিবার অধিকার সকলেরই আছে, এই বিশ্বাসে আমরা অতিশয় সংকোচের সহিত দুই একটী কথা বলিতেছি।

আমাদের মতে শ্রীনিবাসবাবু "তিন তিন" "চারি চারি" প্রভৃতির যে অর্থ করিয়াছেন, উহা তাহাদের সাধারণ অর্থ বটে; কিন্তু রবিবাবুর অর্থেই বিশেষত্ব আছে। "চারি চারিটে পেয়াদা"র যে অর্থ রবিবাবু করিয়াছেন, উহাই বিশেষ ভাবাত্মক বোধ হয়। একটা নয়, দুইটা নয়, "চারি চারিটে পেয়াদা" উহাতে এইরূপ অর্থই বুঝায়। বিশেষত্ব এই যে, একটা পেয়াদাই যথেষ্ট, সেই স্থানে চারিটা। একটাতেই আশঙ্কা বা অশান্তির কারণ আছে, চারিটা খুবই বেশী। শ্রীনিবাসবাবু সাধারণ অর্থের দিকে গিয়াছেন। আমরা যে বিশেষত্বের কথা বলিলাম, উহা বুঝাইবার নিমিত্ত দুই একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। "লোকটার চারি চারিটে ছেলে মারা গেছে, কাজেই শোকে মর মর।" একটীর মৃত্যুতেই শোক হইবার কথা; চারিটীর শোক অত্যন্ত অধিক। এইরূপ"—(একটা নয় দুটোনয়) দশ দশটা টাকা হারাইয়া গেল।" অর্থাৎ একটা গেলেও অনুতাপের কথা—সেখানে দশটা। এমনই "পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা লোকসান্।" আমাদের মতে রবিবাবুই এই বিশেষ অর্থ টানিয়া আনিয়াছেন; শ্রীনিবাস বাবু তাহা পারেন নাই। "তখন তাহাকে ধরিবার জন্য চারি চারি পেয়াদা আসিয়া হাজির" এ প্রয়োগ ঠিক এবং আমরা এরূপ প্রয়োগ শুনিয়াছি।

শ্রীনিবাসবাবু "সকাল সকাল" দ্বিত্বেরও সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রদীপ-সম্পাদক মহাশয় টীকায় তাঁহার ভুল ধরিয়া দিয়াছেন। সম্পাদক যে প্রয়োগটী দেখাইয়াছেন, উহাতেই "সকাল সকাল"-এর বিশেষ অর্থ সূচিত হইয়াছে। ইহার অর্থ "নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে।" 'সকাল সকাল উঠা'র অর্থও তাহাই। প্রতিদিন যে সময়ে উঠা হয়, তাহার পূর্ব্বে উঠা, অথবা সাধারণতঃ লোকে যে সময়ে উঠে, তাহার পূর্ব্বে উঠা এইরূপ বুঝায়। "সকাল সকাল বেড়িয়ে যেন দিনে দিনে সেখানে পৌছিতে পার" বা "সকাল সকাল বেরুতে হবে, সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় ফেরা চাহি"—প্রয়োগ দেখুন। অন্যদিনে বাহির হইয়া দিন থাকিতে থাকিতে পৌছান যায় নাই বা ফিরিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি হইয়াছে, তাই সে সময়ের পূর্ব্বে বাহির হইবার কথা বলা হইতেছে। "সন্ধ্যায় সন্ধ্যায়" এর অর্থ বোধ হয় সন্ধ্যার কাছাকাছি, অর্থাৎ সন্ধ্যার একটু ও দিকে গেলেও ক্ষতি নাই।

"গরম গরম" এর অর্থেও শ্রীনিবাস বাবু পূর্ব্বের ন্যায় কেবল সাধারণ অর্থ ধরিয়াই টানিয়াছেন। আমাদের মতে ইহার অর্থ রবি বাবুর "খুব গরম" বলিয়াও বোধ হয় না। ইহার অর্থ যেন ঈষদুষ্ণ বা যতটা গরম সহ্য করা যায়, তাহাই। "জলটা গরম গরম খাবেন" বলিলে কিছু গরম (থাকিতে) খাবেন ইহাই বুঝা যায়। জল ঠাণ্ডা খাওয়াই সাধারণ নিয়ম। ঠিক এমনই "গরম গরম দুধ খাবেন," বা "দুধ্‌টা গরম গরম খাবেন।" "গরম গরম লুচি" বলিলে আমরা বুঝি, যতটা গরম সহ্য করা যায় বা আহারের পক্ষে ভাল—তাহাই। মুখে ফোস্কা পড়ে, এমন গরম নহে। তবে এখানে শ্রীনিবাস বাবুর অর্থ অর্থাৎ প্রত্যেক খানাই গরম এরূপ অর্থ—করাও চলে। কিন্তু "তাহার মেজাজটা গরম গরম বোধ হ'ল" এখানে অর্থ বোধ হয়, কিছু গরম—স্বাভাবিক নিয়মের অতিরিক্ত। "সাহেবী সাহেবী মেজাজ" বলিলেও খুব সাহেবী বুঝায় না। "চেহারাটা নরম নরম" বা "মুখ খানা শুক্‌নো শুক্‌নো" বা "কথাগুলো ফাঁকা ফাঁকা" ইহার অর্থ লইয়া বোধ হয় মতদ্বৈধ হইতে পারে না। কাপড়টা বা কাপড়খানা "ভিজে ভিজে রয়েছে" বলিলে ঈষৎ আর্দ্র বা স্থানে স্থানে আর্দ্র রহিয়াছে, এইরূপ বুঝা যায় বলিয়া আমাদের ধারণা।

"গরমাগরম" কথাটী আমাদের মতে বাঙ্গালা কথাই নহে। ইহাকে শব্দদ্বৈতের মধ্যে টানিয়া আনা ভাল হয় নাই। সহরের 'সাড়ে বত্তিশ ভাজা' বিক্রেতা হিন্দুস্থানীর মুখে ভিন্ন এ কথা অন্য কোথায়ও শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তবে 'ঝমাঝম্ বৃষ্টি' ঠিক বটে। সপাসপ্ বেত বা পটাপট্ পাদুকা প্রহার এই শ্রেণীর কথা। টপাটপ্ রসগোল্লা উদর-সাৎ করাও শুনা যায়। এ সকল স্থানেই যেন ক্রিয়াজনিত ধ্বনির সহিত সাদৃশ্য রাখিয়া এক একটী পদের সৃষ্টি হইয়াছে।

রবিবাবুর প্রবন্ধ দেখি নাই ; সুতরাং সাহস করিয়া কোন কথা বলিতে পারি না। আমাদের মনে হয়, শব্দদ্বৈতের একটা শৃঙ্খলা থাকা আবশ্যক। কতকগুলি বিশেষ্যদ্বৈত, কতকগুলি বিশেষণদ্বৈত, আর কতকগুলি ক্রিয়া-বিশেষণদ্বৈত, এতদ্ভিন্ন ক্রিয়াদ্বৈতও আছে। এই রূপ ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজাইলেই যেন ভাল হয়। ঝাঁ ঝাঁ, টা টা, শাঁ শাঁ, অথবা টো টো, ভো ভো, হো হো প্রভৃতি পৃথক রাখিলেই চলে। শ্রীনিবাস বাবুর সমালোচনায় সকল শ্রেণীরই দৃষ্টান্ত আছে, কিন্তু শৃঙ্খলা নাই। আমাদের বিবেচনায় এক এক শ্রেণীর বিশেষ ভাবাত্মক পদগুলি সংগ্রহ করিয়া সাধারণ অর্থবাচক শব্দযুগ্মের দুচারিটী দৃষ্টান্ত দিলেই চলিতে পারে। সমস্ত শব্দদ্বৈত নিঃশেষ করা সম্ভবপর নহে, করিতে গেলেও ভাষার অভিধানের ন্যায় প্রকাণ্ড গ্রন্থ লিখিতে হয়। বাঙ্গালার বড় অভিধান হইলে তাহাতেই প্রত্যেক শব্দের পার্শ্বে তাহার পুনরাবৃত্তি হয় কি না, অথবা অন্য কোন শব্দের সহিত তাহার সংযোগ হয় কি না, তৎসমস্তের উল্লেখ করিলেই যেন চলিতে পারে।

আমাদের মতে "পদে পদে লাঞ্ছিত" বা "গ্রামে গ্রামে প্রচার" এরূপ প্রয়োগের বিশেষত্ব নাই বলিয়া উল্লেখ না করিলেও চলে। কিন্তু "ধর্ম্মে ধর্ম্মে রক্ষা পাওয়া" বা "প্রাণে প্রাণে বেঁচে থাকার" উল্লেখ করা আবশ্যক।

শ্রীনিবাস বাবুর লিখিত অনেকগুলি শব্দকে আমরা শব্দদ্বৈত বলিতে চাহি না। আমাদের মতে "ধর্ম্ম টর্ম্ম" কে শব্দদ্বৈত না বলিয়া এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, ভাষার অনেক শব্দের প্রথম অক্ষরের পরিবর্ত্তে "ট"কার বসাইয়া এইরূপ পুনরাবৃত্তি করা হইয়া থাকে। যথাঃ—ধর্ম্ম টর্ম্ম, কথা টথা, বই টই, ধান টান, দুধ টুধ ইত্যাদি। বাঙ্গালায় অন্য রূপ শব্দেরও এইরূপ পুনরাবৃত্তি হয়। এমন কি টকারাদ্য শব্দেরও এই পুনরাবৃত্তি হইতে নিস্তার নাই। যথাঃ—"টাকা টাকা কিছু আছে ?" "দেখো যেন টান্ টান্ লাগে না।" শ্রীনিবাস বাবু টর্ম্মকে ধর্ম্মের বিপরীতবোধক ভাবিয়া ধর্ম্ম টর্ম্ম এর বিপরীত অর্থই করিয়াছেন। আমাদের মতে এইরূপ পুনরাবৃত্তিতে বস্তুর সদৃশ, তজ্জাতীয় বা তৎ সংক্রান্ত কিছু বুঝায় ; বিপরীত কখনই বুঝায় না। টাকা টাকা বলিলে আমরা টাকা এবং যাহাতে টাকার কাজ হয় (পয়সা নোট ইত্যাদি) এমন কিছু বুঝি। ধর্ম্ম টর্ম্মের অর্থও সেইরূপ।

চিঠিপত্রকেও শব্দদ্বৈত বলিয়া ধরিতে আমাদের আপত্তি আছে। পত্র শব্দটী প্রভৃতি অর্থ বুঝাইতে সাধারণতঃ যে যে শব্দের পরে প্রযুজ্য, তাহাদের কতকগুলি উল্লেখ করিলেই চলে। যথাঃ—চিঠি, কাগজ, পুঁথি, হিসাব, নিকাশ, খরচ, বিছানা বাসন, জিনিষ। আমরা খতপত্র, খাজনা পত্র বা তৈজসপত্র বলিয়া থাকি ; কিন্তু দোয়াত বা কলমপত্র, টাকা বা পয়সা পত্র বা ঘটী পত্র শুনা যায় না।

প্রবন্ধলিখিত কতকগুলি শব্দকে যে শব্দদ্বৈতের মধ্যে স্থান দেওয়া উচিত নহে, ইহা প্রবন্ধ শেষে শ্রীনিবাস বাবু স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, রবি বাবুর প্রবন্ধেও এইরূপ কথা আছে। আমরা কাহাকেও সমর্থন করি না। যে সব কথা লেখা হইয়াছে, তাহাতে ঘর দোর, ঘটী বাটী, গণ্ডা কুড়াল, ছাতি লাঠি কিছুই বাদ দেওয়া চলে না। ইহাতে দীনবন্ধু বাবুর সেই 'সকলই দুই দুই' মনে পড়ে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রবি বাবুর প্রবন্ধ দেখি নাই ; প্রদীপে স্থানও সংকীর্ণ। এই দুই কারণেই সংক্ষেপে আমাদের ক্ষুদ্র মন্তব্য শেষ করিলাম।

শ্রীচন্দ্রশেখর কর।

কৈফিয়তের জবাব।

বায়ুনভোবিদ্যা নামক প্রবন্ধের প্রতিবাদের কৈফিয়ৎ সমন্ধে দুই এক কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। লেখকের মতে সায় দিতে পারি নাই, এবং কেন পারি নাই, তাহাই আমার প্রতিবাদের উদ্দেশ্য ছিল। কোন এক জন বা দুই জনের অনুমানকে অপর বিশ জন যে "সিদ্ধান্ত" বলিবে এমন কথা নাই। বায়ুনভোবিদ্যা-লেখক যদি লিখিতেন, অমুক বৈজ্ঞানিক এই কথা বলেন, তাহা হইলে কাহারও কিছু বলিবার থাকিত না। তৎপরিবর্ত্তে তিনি "আধুনিক দার্শনিকগণ" "আধুনিক মত," "বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্ত" ইত্যাদি লিখিয়া অতিব্যাপ্তিদোষ ঘটাইয়াছিলেন। যাহা হউক, এ সকল বিষয় সম্প্রতি আলোচ্য নহে।

কৈফিয়ৎলেখক "অযথা ব্যাখ্যা করিয়া প্রদীপের স্থানের অপব্যবহার করা অনাবশ্যক" বলিয়া ভূমিকা করিয়াছেন। কিন্তু দেখিতেছি, তিনি বায়ুনভোবিদ্যা নামটার বিলক্ষণ অযথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আপ্তেকৃত ইংরাজি সংস্কৃত অভিধানের প্রতি আমারও শ্রদ্ধা আছে। বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ বিষয়ে তত না থাকিলেও আমি বলিতে বাধ্য যে, উপস্থিত প্রসঙ্গে কৈফিয়ৎ-লেখক মহাশয় আপ্তের অভিধানের অপব্যবহার করিয়াছেন। আপ্তে মহাশয় meteorology শব্দে করিয়াছেন,

অন্তরীক্ষবিদ্যা, বায়ুনভোবিদ্যা। কিরূপে তাঁহার অভিধান ব্যবহার করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ দেখিলে জানা যায় বায়ুনভোবিদ্যা একটি শব্দ নহে, দুইটি (see *directions to the student*)। পৃথক করিয়া লিখিলে 'বায়ুবিদ্যা' বা 'নভোবিদ্যা' হইত। এখানে আপ্তে মহাশয় দ্বন্দ্বের কোন সম্ভাবনা রাখেন নাই। কৈফিয়ৎ লেখক বৃথা দ্বন্দ্ব করিয়াছেন। যাহা হউক, বায়ুনভোবিদ্যা শব্দটি পুরাতন ত নহেই, আপ্তে মহাশয়ও রচনা করেন নাই। তিনি করিয়াছেন বায়ুবিদ্যা, আমি করিয়াছি আবহ [বা ভূবায়ু] বিদ্যা। অতএব দেখিতে গেলে তাঁহাতে আমাতে ঐক্য আছে এবং 'বায়ুবিদ্যা' শব্দ অপেক্ষা 'আবহবিদ্যা' ভালই বোধ হইবে। বাস্তবিক 'বায়ুনভোবিদ্যা'র নভস্ শব্দে মেঘ আদৌ মনে হয় নাই। অমরের মতানুসারে নভোঽন্তরিক্ষং বুঝিয়াছিলাম। তাহা ছাড়া 'বায়ু ও আকাশের' পরিবর্ত্তন পড়িয়া নভস্ শব্দে আকাশ বা অন্তরিক্ষই মনে হইয়াছিল। দেখিতেছি আপ্তে মহাশয়ও অন্তরীক্ষ বুঝিতে বলেন। কৈফিয়ৎলেখক এখনও নভস্ শব্দে মেঘ বুঝিতে বলিলে কোন কথা নাই। তথাপি জিজ্ঞাসা করি, কৈফিয়তে লিখিত "চন্দ্রাকর্ষণে বায়ুনভের জোয়ার ভাটা" অর্থে কি বুঝিব? বায়ুর ও মেঘের (?) জোয়ার ভাটা? জানি বাঙ্গলায় বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দের অত্যন্ত অভাব। [illegible] বিষয় পাচ্য ও প্রতীচ্য আভিধানিকগণ এই সকল পারিভাষিক শব্দসঙ্কটে শরণ হইতে চান না। হইলে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শ্রম অনেক লঘু হইত।*

পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় হলচালনা নিষিদ্ধ ইহার কারণ জানিতে চাহিয়াছিলাম। এখানে এদেশ ওদেশের কথা ছিল না। যে দেশে ঐ ঐ তিথিতে নিষিদ্ধ, সেই দেশে সেই নিষেধের কারণ বায়ুনভোবিদ্যা লেখক যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে আমার সন্দেহ জন্মে। আমার মনে হইয়াছিল, ঐ ঐ তিথি পর্ব্ব বলিয়া অন্যান্য অনেক কর্ম্মের ন্যায় হলচালনও নিষিদ্ধ। তাই পঞ্জিকা হইতে দেখাইয়াছিলাম, স্মৃতির ব্যবস্থার হেতু নির্দ্দেশ করা আদৌ সহজ নহে।

সৌরকলঙ্কের আবির্ভাব সম্বন্ধীয় একাদশবর্ষের নিয়মটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করা দূরে থাক তাহার ব্যভিচারে বায়ুনভোবিদ্যা লেখকের ব্যাখ্যার দুর্ব্বলতা দেখানই আমার উদ্দেশ্য ছিল। বলা বাহুল্য যে নিয়ম বা আবিষ্কারের বিরুদ্ধে কেহই কিছু বলিতে পারেন না, প্রমাণ দেখাইতে পারেন না, অথচ তদ্দ্বারা প্রত্যক্ষ ঘটনার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তাহাকেই "সিদ্ধান্ত" বলিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু যাহা Theory মাত্র কিম্বা যাহা Theoryও নহে, একটা Hypothesis মাত্র, তাহাকে সকলেই গ্রহণ করিতে বাধ্য নহে। তাহা হইলে দারবিনের বিবর্ত্তনবাদ লইয়া এখনও বাগ্‌বিতণ্ডা চলিত না। তাহা ছাড়া কোনও বৈজ্ঞানিকের অনুমান আপ্তবাক্যও নহে। অলমতিবিস্তরেণ।

শ্রীযোগেশ চন্দ্র রায়।

উপহার।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন সুহৃদ্বরেষু—

বাণীর চরণ তলে বসে আছ কুতূহলে,
সাধক সুন্দর!

ভাবে ভরা ভোলা প্রাণ নাহি ভাণ অভিমান,
উদার অন্তর।

অমিয় সাগরে নামি, তৃপ্তিহীন দিবাযামী
কি করিছ পান?

গীতিময় বক্ষ পুটে ভূমানন্দে বাজি উঠে,
কাব্য জয় গান।

থাক্ বা না থাক্ মধু, নহে এ মানসী বধূ
নহে প্রেমভীতা,

খোল হৃদি কুঞ্জদ্বার ধর ধর উপহার
আমার কবিতা।

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

চীনযুদ্ধে বিদেশীয় সেনা।

বিগত জানুয়ারী মাসের রিভিউ অব্ রিবিউস্ পত্রিকায় বিখ্যাত ষ্টেড্ সাহেব 'খ্রীষ্টধর্ম্ম অথবা নরকাগ্নি—এতদুভয়ের কোন্‌টি আমরা চীনদেশে লইয়া যাইতেছি?' এই শীর্ষক ডাক্তার ডিলনের লিখিত একটি প্রবন্ধের সারোদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। আমরা সেই প্রবন্ধের একটী বঙ্গানুবাদ পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি। পাঠকবর্গ দেখিবেন, ষ্টেড্ সাহেবের ব্যবহৃত শিরোনামটি নিতান্ত অযৌক্তিক হয় নাই।

'ডেলি টেলিগ্রাফের' চীনদেশস্থ বিশেষ সংবাদদাতা ডাক্তার ই, জে, ডিলন ইংরেজী খবরের কাগজ সমূহের সংবাদদাতাগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষ ও বহুদর্শী। অল্পদিন হইল, তিনি চীনদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, এবং কণ্টেম্পোরারি রিভিউতে 'ইউরোপীয় মেষ ও চীনদেশীয় ব্যাঘ্র' শীর্ষক একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবন্ধের গর্ভে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহার তুলনায় শিরোনামটি নিতান্তই মৃদু হইয়াছে বলিতে হইবে। জনৈক প্রত্যক্ষদ্রষ্টার সাক্ষ্য অবলম্বনে তিনি যাহা লিখিয়াছেন—তাহার মর্ম্ম এই যে, সম্মিলিত খ্রীষ্টিয়ান শক্তিপুঞ্জ চীনদেশে পিশাচের ন্যায় আচরণ এবং খ্রীষ্টধর্ম্মের পরিবর্ত্তে তথায় নরকাগ্নি বিস্তার করিতেছেন। ডাক্তার ডিলন ব্রিটিশ ও আমেরিকান সৈন্যগণকে সর্ব্বাপেক্ষা জঘন্য অত্যাচার সমূহের অপবাদ হইতে বিমুক্ত রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন দেখিয়া

---

* কয়েকবৎসর পূর্ব্বে সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় আমি প্রায় পাঁচশত পারিভাষিক শব্দের তালিকা দিয়াছি। তন্মধ্যে দুই একটার বিরুদ্ধে সমালোচনা দেখিয়াছি। "আবর্ত্তন" শব্দ সর্ব্ববাদিসম্মত বলিতে পারি। যেহেতু, উহা পুরাতন।



শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন

ও

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী।

KUNTALINE PRESS

আমরা সুখী হইয়াছি ; কিন্তু হেগ শান্তিসমিতির নিয়মাবলী সত্ত্বেও চীনরাজধানীর সর্ব্বত্র যে লুণ্ঠনকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে যোগদানের দুর্নাম হইতে তিনি তাহাদিগকে মুক্তি দিতে পারেন নাই। ডিলনের প্রবন্ধটি পড়িলে স্তম্ভিত হইতে হয়। মনে হয় আমরা কোন এক সৃষ্টিছাড়া জগতে আসিয়া পৌছিয়াছি। তাঁহার প্রবন্ধপাঠে দেখা যায় যে, নামতঃ আমরা (ইউরোপীয়ানেরা) চীনীয়দিগের অপরাধের শাস্তি প্রদান করিতে গিয়াছি বটে, কিন্তু তাহাদের একটী অপরাধের স্থলে আমরা শত শত অপরাধ করিতেছি।” বস্তুতঃ খ্রীষ্টীয় দেশসমূহের বিরুদ্ধে এতদপেক্ষা ঘোরতর তিরস্কার কখন কাহারও লেখনী হইতে নিঃসৃত হয় নাই। কাম ও হত্যা প্রবৃত্তির এই প্রকার নৃশংস উদ্দাম ভয়াবহ অভিনয়, এই সকল ঘটনায় সংশ্লিষ্ট গবর্ণমেণ্ট সমূহের স্মৃতির উপর একটি চিরস্থায়ী কলঙ্করেখা অঙ্কিত করিয়াছে। যে সকল লোক এই প্রকার লোমহর্ষণ নিষ্ঠুরাচরণে প্রবৃত্ত, তাহারাই “হিদেন” চীনবাসিগণের নিকট খ্রীষ্টীয় সভ্যতা প্রচাররূপ ধার্ম্মিকতার আবরণে খ্রীষ্টধর্ম্মের আশীর্ব্বাদসহ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হইয়াছে, ইহা ভাবিলেও ভয় হয়। খ্রীষ্টয়ান দেশসমূহের এরূপ নিষ্ঠুর অভিনয়ে বিস্মিত ও চমকিত হইয়াছি।

খ্রীষ্টীয় দেশসমূহের অপরাধ।

যমরাজ যদি বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে যথার্থ ন্যায় বিচারের জন্য অবতীর্ণ হইতেন, তাহা হইলে খ্রীষ্টিয়ান জাতিসমূহ কখনই চীনীয়দিগের নিকট ক্ষতিপূরণের দাবী করিতে পারিত না, বরঞ্চ চীনবাসিগণই সমস্ত খরচসহ ডিক্রী পাইত। চীনবাসী খ্রীষ্টীয়জাতিসমূহের সংঘর্ষে আসিয়া তাহাদিগের নৃশংসাচরণে যেরূপ নির্য্যাতিত হইয়াছে, বুল্‌গেরিয়া দেশে তুরস্কের অত্যাচারও তদপেক্ষা অধিক কষ্টদায়ক হয় নাই। খ্রীষ্টীয় দেশসমূহের সেনাগণ কর্ত্তৃক যে সকল ঘোরতর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে কেবল তত্তদ্দেশসমূহেরই লজ্জার কারণ আছে এমন নহে, তদ্দ্বারায় সমগ্র মানবজাতির চরিত্র কলঙ্কিত হইয়াছে। কারণ প্রত্যেক মানবহৃদয়ের অন্তঃস্থলে যে পশুপ্রবৃত্তি নিহিত রহিয়াছে, সভ্যতা ও শাসনের শৃঙ্খল ভগ্ন হইলে তাহা কি প্রকারে বাহির হইয়া পড়ে, এই সকল শোকজনক ঘটনা আমাদিগকে তাহাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আশা করি যে, রুষসম্রাটই হউন, জর্ম্মণসম্রাটই হউন, বা ব্রিটিশসম্রাটই হউন, সকলেই এই ঘোরতর অত্যাচারী অপরাধী সৈন্যবৃন্দের উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিতে বিরত হইবেন না। যাঁহারা যুদ্ধ বাধাইবার প্রধান উদ্যোগী, অনুষ্ঠিত অত্যাচার সমূহের দোষ প্রক্ষালন নিমিত্ত তাঁহারাই যুদ্ধকে ‘নরক’ বলিয়া যে বর্ণনা করেন, তাহা সত্য বটে ; কিন্তু খ্রীষ্টীয় সভ্যতার প্রচার ব্যপদেশে যে সকল জাতি যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন, অন্ততঃ তাহাদের সেই নরককে সভ্যতার সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখা উচিত। চীনে ঠিক ইহার বিপরীত নীতি অনুসৃত হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। রুষগণকেই এ বিষয় সর্ব্বাপেক্ষা দোষী দেখা যায়, জর্ম্মণগণও বড় কম নহে। জাপানীরাও একেবারে বাদ যান নাই, তবে অন্যান্য সমস্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহিত ডাক্তার ডিলন একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, নাস্তিকভাবাপন্ন জাপানী তাহার খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী সহচরগণ অপেক্ষা অশেষগুণে ভাল আচরণ করিয়াছে।*

সুসভ্য চীন।

ডাক্তার ডিলন প্রথমেই দেখাইয়াছেন যে, চীনদিগকে অসভ্য বলা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। চীন-সভ্যতা আমাদের সভ্যতা হইতে বিভিন্ন বা কোন কোন বিষয়ে আমাদের সভ্যতা হইতে অপকৃষ্ট হইলেও, অনেক বিষয়ে উৎকৃষ্ট। তিনি বলিতেছেন :—

“যে সকল দেশ তাহাদের সাহায্যার্থ অগ্রসর, তাহাদের

* এস্থলে জাপানীদিগের সম্বন্ধে অন্য দুই এক জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মতামত উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। চীনসাম্রাজ্যের মাশুল বিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তা সার রবার্ট হার্ট গত নবেম্বর মাসের ফোর্টনাইটলি রিবিউ পত্রিকায় লিখিয়াছেন, “আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জাপানাধিকৃত নগরবিভাগ সর্ব্বাপেক্ষা সুশাসিত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। কিন্তু অপর একটী সভ্যদেশের সেনাগণ যাহা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে নাই, তাহারই যথেচ্ছা ধ্বংসসাধন করিয়া পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছিল ; অন্য এক সভ্যদেশের সেনাগণ প্রকাশ্যস্থানে মলমূত্রত্যাগকারীকে বধ করিয়া শারীরিক পরিচ্ছন্নতার নীতি প্রচারিত করিয়াছিল ; এবং আর এক সভ্যদেশের সেনাবৃন্দ বলপূর্ব্বক গৃহস্থদিগের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া বয়স্কা স্ত্রীলোক ও বালিকাদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া পারিবারিক পবিত্রতা রক্ষার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল।” পুনশ্চ, টমাস্ মিলার্ড সাহেব স্ক্রীবনার্স মেগেজিনে লিখিয়াছেন, “এই অযশস্কর যুদ্ধের যাহা কিছু প্রশংসা, তাহা মিকাডোর ক্ষুদ্র পিঙ্গলবর্ণ সেনাগণেরই প্রাপ্য। পাশ্চাত্য জাতিসমূহের নিকট ইহা বিস্ময়জনক ও শ্রুতিকটু হইলেও, অস্বীকার করিবার যো নাই। যেসকল বিদেশীয় জাতি এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছেন, তন্মধ্যে জাপানীগণের নীতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।”

অনেকের অপেক্ষা চীনবাসী অধিকতর স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া থাকে। সে অবাধে যখন যথায় ইচ্ছা যাইতে পারে, পুলিস অথবা সরকারী কর্ম্মচারিগণ তাহাতে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে না। যে পাসপোর্ট রুষীয়ের জীবন দুর্ব্বহ করিয়া তোলে, সে তাহার কিছু মাত্র জানে না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হইয়া চীনবাসীকে সৈন্যদলে প্রবেশ করিতে হয় না; সে সভা আহ্বান করিতে, পথিপার্শ্বে বক্তৃতা করিতে, স্বপক্ষের সহিত দলবদ্ধ হইতে, বক্তৃতা ও লেখনী চালনা দ্বারা গবর্মেণ্টের কার্য্যের সমালোচনা করিতে, এমন কি রাজবংশের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিতেও সমর্থ। সাধারণ লোক ও ভদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে সে কোন ভেদ জানে না, সে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত এই দুই শ্রেণী-বিভাগ মাত্র বুঝিতে পারে, এবং তাহাদিগের প্রত্যেক ধীমান্ ব্যক্তিই কালে মান্দারিণ বা তত্তুল্য উচ্চপদ লাভ করিতে পারে। ইংলণ্ডে একজন দরিদ্র সন্তানের রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশমাত্রলাভের যতটা সম্ভাবনা থাকে, চীনদেশের সেই শ্রেণীর লোকের বৈদেশিক রাজদূত হওয়ার সম্ভাবনা তদপেক্ষা অধিক থাকে। চীনদিগের অনেক দোষ আছে, কিন্তু সেগুলি তাহাদের গুণ হইতেই উৎপন্ন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে অধিক মনোযোগ বশতঃ বৃহৎ বৃহৎ ঘটনা তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। চিরকাল বাহ্য ব্যাপারে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকায় সার বস্তুর প্রতি তাহাদের নজর নাই। তাহারা মন্দকে ঘৃণা করে, কিন্তু তাহার উপর জয়লাভের চেষ্টা না করিয়া তাহাকে এড়াইতে চায়।"

চীনদেশে খৃষ্টানদিগের অবনতি।

কিন্তু চীনদিগের দোষ যত গুরুতরই না হউক কেন, তাহাতে আমাদের বিরক্ত হইবার কোন কারণ নাই। যদি তাহারা পাশ্চাত্য সভ্যতাপেক্ষা তাহাদের স্বদেশীয় দোষাবহ সভ্যতা পছন্দ করে, তাহাতে আমাদের হস্তক্ষেপের কিছুই অধিকার নাই। ডাক্তার ডিলন বলেন :—

"চীন, ইউরোপীয় ব্যাপার সমূহে কখন হস্তক্ষেপ করে নাই। শক্তিপুঞ্জকে অভিযোগের কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ সে প্রদান করে নাই। বস্তুতঃ তাহার প্রধান দোষই এই যে, এতদুভয়ের জন্য আপনাকে উপযোগী করিয়া তুলিতে সে নিতান্ত উদাসীন। যদিও তাহার লোকসংখ্যা এখন আর স্বদেশে কুলাইয়া উঠিতেছে না, তথাপি সে অন্যের দেশ লইয়া কাড়াকাড়ি করে না, অন্যান্য সকলকে সে যেরূপ শান্তিতে থাকিতে দেয়, সে নিজেও তদ্রূপ শান্তিতে থাকিতে চায়। এইরূপ একাকী থাকিবার তাহার অধিকার আছে। রুষ বিদেশীয় মিশনরিদিগকে স্বীয় প্রজাবর্গের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করিতে দেয় না। একজন রুষীয় প্রজাকে গ্রীক প্রণালীর খ্রীষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রটেষ্টেণ্ট বা কাথলিক ধর্ম্মগ্রহণে উপদেশ দান আইনানুসারে দণ্ডনীয়। তদ্রূপ কোন আচরণ চীনদেশে কেন দণ্ডনীয় হইতে পারিবে না? শক্তি-পুঞ্জ যে তাঁহাদের অবলম্বিত নীতির পরিবর্ত্তন করিবেন, এরূপ আশা করা বৃথা। কিন্তু সংবাদপত্র সমূহ যে ভাষায় তাহার বর্ণনা করেন, তাহা একটু সংযত করিতে বলিলে অন্যায় হইবে না। শিক্ষিত ও সত্যবাদী সংবাদপত্র লেখক-গণ কেন যে এখনও চীনকে সভ্য করিয়া লইবার মহৎ উদ্দেশ্যের কথা প্রচার করেন, তাহা বুঝি না। কারণ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এতদ্দ্বারা তাঁহারা কেবল চীন-দেশবাসীর সর্ব্বনাশ ও স্বদেশীয় সৈন্যগণের নৈতিক অবনতি সাধন করিতেছেন।"

স্ত্রী জাতির উপর ভীষণ অত্যাচার!

ডাক্তার ডিলন যে সকল ঘটনার বিবৃতি করিয়াছেন, তাহাতে শেষোক্ত উক্তিটির সত্যতা অত্যন্ত ভয়াবহরূপেই সপ্রমাণ হয়। আমাদের সভ্যতা-প্রচারমূলক যুদ্ধের একটি প্রধান ঘটনা এই :—

"এক দিবস আমি টাং-চাউ নগরে একজন মৃত ধনী ব্যক্তির গৃহে একটা প্রকাণ্ড কাল বাক্স দেখিয়া উহার মধ্যে কি আছে, জিজ্ঞাসা করিলাম। বাক্সটির মধ্য হইতে ভয়ানক পূতিগন্ধ নির্গত হইতেছিল। আমার ইউরোপীয় সঙ্গী উত্তর করিল, উহার ভিতর তিনটি স্ত্রীলোকের মৃত দেহ আছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কে উহাদিগকে ইহার মধ্যে রাখিয়াছে? সে উত্তর করিল, কয়েকজন সৈনিক কর্ম্মচারী।

'তুমি ঠিক্ জান?'

'হাঁ, আমি স্বয়ং সম্মুখে থাকিয়া দেখিয়াছি।'

'তুমি ঐ যুবতীদিগকে স্বয়ং দেখিয়াছ?'

'হাঁ; তাহারা এই গৃহস্বামীর কন্যা। সৈনিকপুরুষ-গণ তাহাদের সতীত্ব হরণ করিয়া তরবারির আঘাতে

তাহাদের বধ সাধন করিয়া তাহাদিগকে এই বাক্সে পুরিয়া রাখিয়াছে।'

'ভগবন্! কি ভয়ানক অবস্থাতেই আমরা উপনীত হইয়াছি!'

'পূর্ব্বে এরূপ আরও অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে। ইহার অপেক্ষা বীভৎস ঘটনাও ঘটিয়াছে। ইহাদিগের সতীত্ব নষ্ট করিয়া পরে বধ করা হইয়াছে। কিন্তু অনেক স্থলে এরূপও হইয়াছে যে, পুনঃ পুনঃ পাশব অত্যাচারে অস্ত্রাঘাত-ব্যতিরেকেই অনেক কুসুমকোমলা কামিনীর মৃত্যু হইয়াছে।"

কামচরিতার্থতার নিমিত্ত যুদ্ধযাত্রা!!

যেখানে জীবন রক্ষা অপেক্ষা হত্যা করা উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে, তথাকার অবস্থা বাস্তবিকই বড় শোচনীয় সন্দেহ নাই। ডাক্তার ডিলন বলিতেছেন:—

"সৈন্যদিগের অপরাধের দ্বারা তাহাদের জাতিগত চরিত্রের তুলনা সঙ্গত হইবে না, কিন্তু ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, চীনদেশে স্ত্রীলোকের প্রতি বহু লোমহর্ষণ অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা ভিন্ন মিলিত শক্তিপুঞ্জের সেনাসমূহ অরক্ষিত ব্যক্তির ও সম্পত্তির বিনাশ সাধন, এই দুইটি পাপেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে অন্তর্লিপ্ত।

জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার সুব্যবস্থা হওয়ার অনেক পরেও কর্ত্তৃপক্ষের অগোচরে নির্ভয়ে স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইত। একটি ঘটনার স্মরণ হইতেছে, যে সকল বন্ধুর সহিত আমি এ বিষয়ে আলাপ করিয়াছি, তাহাদের সকলের নিকটই উহা অতি বীভৎস কার্য্য বলিয়া বোধ হইয়াছে। পিকিং নগরে সে পৈশাচিক ঘটনাটি ঘটে। নগরের রুষাধিকৃত অংশের একটী সম্ভ্রান্ত বাড়ীতে তিনজন রুষবাসী সৈনিক প্রবেশ করিল। বাড়ীতে কেবল তিনটি প্রাণী ছিল,—পিতা, মাতা এবং কন্যা। কন্যাটিকে দেখিয়া সৈনিকত্রয় তাহার সতীত্বনাশে কৃতসঙ্কল্প হইল, কিন্তু পিতামাতার উপস্থিতি বিঘ্নজনক বিবেচনা করিয়া দুইজনে তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলিতে চাহিল, কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি তাহাদিগকে অন্য একটি ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতে বলিল। মুহূর্ত্তকাল পরামর্শের পর অধিকাংশের মতানুসারে স্বামী



স্ত্রী নিহত হইল। এমন সময় নিকটস্থ একজন চীনীয় চীৎকার ও বন্দুকের ধ্বনি শুনিতে পাইয়া একজন ইউ-রোপীয় সহ তথায় উপস্থিত হওয়ায় পাষণ্ডদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না বটে, কিন্তু মৃত দম্পতী আর পুনর্জ্জীবিত হইল না।

অন্যায় লুণ্ঠন।

স্ত্রীলোক দিগের প্রতি এরূপ অত্যাচারের পর লুণ্ঠনের কথা বলিতে গেলে নিতান্তই বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্রে অবতরণ করিতে হয়। কিন্তু হেগের শান্তি-সমিতিতে চীন অন্যতম পক্ষ ছিল, এবং তথায় লুণ্ঠন সর্ব্বপ্রকারে নিষিদ্ধ হইয়াছে, এই বিবেচনা করিয়া তৎসম্বন্ধে নিম্ন লিখিত প্রমাণ উদ্ধার করা অসঙ্গত হইবে না ;—

"যেপর্য্যন্ত লুণ্ঠনের উপযুক্ত কিছুমাত্র ছিল, সে পর্য্যন্ত অবিরাম গতিতে উচ্ছৃঙ্খল লুণ্ঠন চলিয়াছিল। শেষে যখন লুণ্ঠনের কিছু রহিল না, তখনও এই প্রথা সকলত্র নিষিদ্ধ হয় নাই। জাপানীগণ সর্ব্বপ্রথম লুট বন্ধ করিয়াছিল, রুষ শীঘ্রই তাহার অনুসরণ করিয়াছিল। কিন্তু এই অল্প সময়েই জাপান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লুট করিয়াছিল। নগরের চীন-দিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াই সম্মিলিত সৈন্যবৃন্দ পরিতৃপ্ত হয় নাই, যে সকল ইউরোপীয় অধিবাসীর রক্ষার নিমিত্ত তাহারা প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদের সম্পত্তি লুট করিতে তাহারা ক্রটি করে নাই।"

জর্ম্মন-সম্রাটের শিষ্যগণ*।

ইহাদের অযথা প্রাণিবধে কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না, সুতরাং তাহারা যে নিহত ব্যক্তি সমূহের সম্পত্তি লুণ্ঠনে দ্বিধা করিবে না, ইহাই স্বাভাবিক ; এবং চীনদেশে যে একত্র ও পৃথগ্‌ভাবে শক্তিপুঞ্জের মধ্যে প্রাণিহিংসার স্রোত বহিয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। জর্ম্মন-সম্রাট্ তাঁহার সৈন্য-গণকে নির্ম্মমহৃদয়ে অসভ্য হুনদিগের ন্যায় যুদ্ধ করিতে যে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তাহা কি ভয়াবহরূপেই প্রতিপালিত হইতেছে, তাহা ভাবিলে তিনি নিশ্চয়ই বিবেকতাড়িত হই-বেন। ডাক্তার ডিলন বলিতেছেন :—

"আমি যতদূর জানি, নবেম্বরের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ইংরাজ সৈন্যগণই* কেবল বক্সারদিগের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিয়াছে, ও আহত বক্সারদিগকে হাসপাতালে স্বজাতীয়ের ন্যায় পরিচর্য্যা করিয়াছে। যে সকল চীনবাসী তাহাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বহুকাল পরে নিরস্ত্র অবস্থায় ধৃত হইয়াছিল, তাহাদিগকে বিনা উত্তেজনায় বধ করিতেও তাহারা অস্বীকার করিয়াছিল। কেবল জাপানীগণ সমগ্র চীনযুদ্ধে নিতান্ত সচ্চরিত্রতা প্রদর্শন করিয়াছে এবং তাহারাই প্রকৃত পক্ষে চীনবাসীদিগের মনের ভাব বুঝিতে পারিত। এই কারণে তাহাদের বিশ্বাস আকর্ষণ পূর্ব্বক তাহারা রাজ্যে সম্পূর্ণ শৃঙ্খলা স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল। টিন্ সিন্ ও পিকিনের জাপানাধিকৃত অংশ অন্যান্য শক্তি কর্ত্তৃক অধিকৃত স্থান হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও তাহাদের আদর্শস্বরূপ হইয়াছিল।"

অখ্রীষ্টান মিত্রবর্গ।

"লুণ্ঠনরূপ পৈশাচিকতা দমনে জাপানী সেনাপতিগণ দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তাঁহারা অপরাধীদিগকে এরূপ গুরুতর শাস্তি প্রদান করিতেন যে, জাপানী সৈন্যগণের মধ্যে লুণ্ঠন-প্রথা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এই রূপে জাপানীগণ তাহাদের বৈদেশিক মিত্রগণকে উৎকৃষ্ট রাজ-নীতিজ্ঞান শিক্ষা দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যুদ্ধকালে ভয়ঙ্কর ও নির্ভীক ভাব ধারণ করিলেও তাঁহারা গ্রাম ও নগরের নিরীহ লোকদিগের প্রাণনাশ করিতেন না, এবং চীন অধিবাসীদিগের উপর যাহাতে অত্যাচার না হয়, তন্নিমিত্ত অন্যান্য শক্তিপুঞ্জকে অনুরোধ করিয়া সেই মর্ম্মে নানা স্থানে ঘোষণাপত্রের প্রচার করিতেন।"

টাকুবন্দরে জাহাজের মাল তুলিবার সময় তিন শত নিরস্ত্র কুলীর প্রাণবধ সর্ব্বাপেক্ষা নৃশংস ঘটনা। তাহারা পলাইবার উদ্যোগ করিতেছিল কিন্তু—

"কুক্ষণে রুষ সৈন্যগণ তাহাদিগকে দেখিতে পাইল। রুষদিগের প্রতি নাকি তখন হুকুম ছিল, শিখাধারী চীনবাসি-মাত্রকেই বধ করিতে হইবে। সেই তিনশত কুলির প্রত্যেকে রুষীয় বন্দুকের গুলির আঘাতে প্রাণত্যাগ করিল।"

ইউরোপীয়গণ রক্ত পিপাসায় উন্মত্ত হইয়াছিল। তাই উপরি উক্ত ঘটনার ন্যায় আরও অনেক ঘটনাই ঘটিয়াছিল। ডাক্তার ডিলন বলিতেছেন :—

"আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, টাউ চাউ নগরের পথঃ প্রণালী সমূহ পুনঃ পুনঃ রক্তরঞ্জিত হইয়াছিল, এবং

* মনে রাখিতে হইবে, ইহারা ইংলণ্ডের ভারতীয় সেনা।

সময়ে সময়ে মনুষ্য-শোণিতে পাদুকা সিক্ত না করিয়া পথে চলা অসম্ভব হইত। যে সকল নিরীহ অধিবাসিগণ বন্দুক অথবা সৈনিক-পরিচ্ছদ দর্শনমাত্র ভয়ে কম্পিত হইত, তাহাদের প্রতি এই প্রকার ভয়ানক অত্যাচারের কোন কারণ ছিলনা। কিন্তু শোণিত পিপাসা বৈদেশিক সেনাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিল। নিতান্ত অপদার্থ ও অজ্ঞাত-কুলশীল ইউরোপীয়ের এবং জাপানীর হস্তে নগরের সর্ব্বাপেক্ষা সুসভ্য চীনবাসীর জীবনমরণের ভার সম্পূর্ণ ন্যস্ত ছিল। তাহাদের কার্য্যের বিরুদ্ধে কোন আপীল ছিল না। একটি ইউরোপীয়েরও ক্রোধোদ্রেক হইলে তাহার কি দশা হইবে, কোন চীনবাসী তাহা জানিত না। অনেক সময় ভারবাহী পশুর ন্যায় ১২।১৪ ঘণ্টা খাটিয়া সামান্য বিশ্রাম লাভের নিমিত্ত শয়ন করিলেও তাহাকে তুলিয়া কয়েক পদ দূরে লইয়া গিয়া, গুলি করিয়া মারিয়া ফেলা হইত। কি কারণ তাহার প্রতি মৃত্যুদণ্ড বিহিত হইল, তাহা সে নিজেও জানিত না, কেহ তাহাকে বলিয়াও দিত না।"

কিন্তু খ্রীষ্টান জাতিগণ কিরূপে যুদ্ধ করেন, সে সম্বন্ধে যে সকল গুপ্তকথা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার ভয়াবহ অর্থ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে হইলে ডিলনের সমগ্র প্রবন্ধটি পড়া আবশ্যক। যাহা হউক, পাপের এই রহস্যোদ্ঘাটন হইতে আর একটি ঘটনার উদ্ধার না করিয়া আমরা প্রবন্ধ শেষ করিতে পারিতেছি না :—

"কো-সো নামক স্থানে নদীতীরে আমি দুটি শবদেহ দেখিতে পাইলাম। যেসকল বীভৎস দৃশ্য সমাধিক্ষেত্রতলে লুক্কায়িত থাকে, তৎসমুদয় প্রকাশ্য দিবালোকে দেখিতে দেখিতে আমি তাহাতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলাম, তথাপি এই ঘটনাটি আমাকে বিচলিত করিয়াছিল। এক পিতা ও তাহার অষ্টম বর্ষীয় পুত্র হাত ধরাধরি করিয়া দয়াভিক্ষা করিতেছিল, এমন সময় সভ্যতার নামে তাহারা গুলির আঘাতে পঞ্চত্ব পায়! সেই অবস্থাতেই তাহারা হাত ধরাধরি করিয়া পড়িয়াছিল, একটা ধূসর বর্ণ কুক্কুর পিতার একখানি হস্ত ধীরে ধীরে চিবাইতেছিল। এরূপ দৃশ্য দেশবাসী ইউরোপীয়দিগেরও করুণার উদ্রেক করিত; চীনবাসীর নিকট ইহা কেবল শারীরিক নহে, আত্মার দুর্গতিরও পরিচায়ক। কারণ যে পুত্র ইহলোকে পিতৃ-স্মৃতি জাগরূক রাখিত এবং পরলোকেও তাঁহার কল্যাণ সাধন করিত, পিতার সহিত তাহার জীবন তক একত্রে বিচ্ছিন্ন করা তাহাদের মতে মহাপাপ।"

আমরা ষ্টেড্ সাহেবের প্রবন্ধ ও তৎকর্তৃক উদ্ধৃত ডাক্তার ডিলনের মন্তব্য এইখানে শেষ করিলাম। ইহার উপর আর সমালোচনা অনাবশ্যক। ইউরোপীয় সভ্যতা যে কীদৃশ পদার্থ, আশা করি, বাহ্য চাকচিক্য-বিমুগ্ধ বঙ্গবাসী এখন তাহা অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন এবং তাহার ভবিষ্য জাতীয়তা সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য অনুকরণে গঠন করিয়া তুলিবার পূর্ব্বে একবার ভাবিয়া দেখিবেন। পাশ্চাত্য সমাজে কি কি দোষ থাকা প্রযুক্ত তাহার নিয়স্তর সমূহ এতদূর নীতিজ্ঞানশূন্য, উচ্ছৃঙ্খল ও নৃশংস হইয়া উঠিতে পারে, তাহা আমরা কল্পনা করিতেও ভয় পাই। কিন্তু তাহা বাস্তবিকই ভাবিয়া দেখিবার বিষয় বটে। ষ্টেড্ সাহেব বলিয়াছেন, মনুষ্যচরিত্রে পাশব প্রবৃত্তি লুক্কায়িত থাকে, সভ্যতা ও শাসনের বাঁধাবাঁধি না থাকিলে তাহা সহজেই প্রস্ফুট হইয়া উঠে। অতএব হিন্দুসমাজের কঠোর নিয়মগুলিকে কুসংস্কার, সঙ্কীর্ণতা ও অসভ্যতার পরিচায়ক বিবেচনা করিয়া তাহাদের সংস্কারপ্রয়াসের পূর্ব্বে চীনদেশে সভ্যতাভিমানী পাশ্চাত্য জাতি সমূহের আচরণের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করা ভাল।

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্রীক জাতির স্বাধীনতালাভ।

(সঙ্কলিত)

খ্রীষ্টীয় ১৫ শ শতাব্দীর প্রারম্ভে গ্রীসদেশের অধিবাসীরা আপনাদিগের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া মোসলমানদিগের অধীনতা-পাশে বদ্ধ হন। তদবধি প্রায় চারিশত বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহারা তুরস্কের ভিন্ন ভিন্ন অধিপতিগণের বিবিধ অত্যাচার সহ্য করিয়া দাসত্বের দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন। সেই চারিশত বৎসরের মধ্যে গ্রীসদেশের সর্ব্বত্র মোসলমান রাজ্য, মোসলমানধর্ম্ম ও মোসলমান আচার ব্যবহার প্রভৃতির প্রাবল্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দেশের নানাস্থানে খ্রীষ্টীয় গির্জ্জার পরিবর্ত্তে মহম্মদীয় মসজেদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ক্রুশচিহ্নের পরিবর্ত্তে মুসলমানদিগের অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত পতাকায় দেশ ছাইয়া গিয়াছিল।

এইরূপ পারতন্ত্র্যকালে গ্রীসদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার

বিস্তার হয়। গ্রীসবাসীরা ক্রমশঃ শিক্ষিত হইয়া স্বদেশীয় প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। তাহার ফলে স্বদেশের প্রাচীন গৌরবকাহিনী ও পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তি-কলাপের প্রতি তাঁহাদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। বৈদেশিক বিজেতার অভিনব শিক্ষা দীক্ষা ও শৌর্য্যবীর্য্য দর্শনে চমকিত হইয়া যাঁহারা আপনাদিগকে অপদার্থ ভাবিতেন, পূর্ব্বপুরুষগণের প্রাচীন মহিমা ও সভ্যতা, তাঁহাদিগের প্রাচীন স্বাধীনতা ও শিল্পকৌশল, প্রাচীন যুদ্ধ-পদ্ধতি ও পরাক্রম প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিয়া তাঁহাদিগের আত্ম-মর্য্যাদা-জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হইল। তাঁহারা যে এক বিশ্বপূজিত সুসভ্য জাতির বংশধর, ইহা ভাবিয়া তাঁহাদিগের অনেকে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতে লাগিলেন। তখনও ইউরোপ খণ্ডের সর্ব্বত্র প্রাচীন গ্রীকজাতির সম্বন্ধে সাধারণের যে শ্রদ্ধা ছিল, তাহাতে তাঁহারা স্বাধীনতা-লাভের জন্য তুরস্কের সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে ইউরোপের অনেক জাতিই তাঁহাদিগের সহায়তা করিতে অগ্রসর হইতেন বলিয়া বোধ হয়। তথাপি সে সময়ে কোনও গ্রীসবাসীরই প্রকাশ্যভাবে মোসলমান-শাসনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইবার সাহস ছিল না। কারণ, তাঁহাদিগের মস্তকের উপর তুরস্কের যে শাণিত অসি অবিরামভাবে ঝুলিতেছিল, তাহা কখন যে মস্তকের উপর আপতিত হইয়া তাঁহাদিগের শিরশ্ছেদ করিবে, তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা ছিল না। শাসক সম্প্রদায় তাঁহাদিগকে বহুদিন হইতে নিরস্ত্র করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সমস্ত দুর্গ তুর্কদিগের হস্তগত হইয়াছিল, তাঁহাদিগের সমস্ত সৈন্য তুরস্করাজের আজ্ঞাধীন ছিল। সুতরাং প্রকাশ্যভাবে সুলতানের শাসন শৃঙ্খল উচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিলে যে গ্রীকজাতির সমূলে বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা, সকলেই ইহা বুঝিতে পারিয়াছিল।

এরূপ অবস্থায় দুর্ব্বল ও পরাধীন জাতির পক্ষে প্রবল শাসক সম্প্রদায়ের হস্ত হইতে আত্মোদ্ধার সাধন করিবার যে একমাত্র উপায় সকল দেশে প্রচলিত আছে, গ্রীস-বাসীরা তাহারই অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহারা দেশের মধ্যে নানাস্থানে গুপ্তসভার প্রতিষ্ঠা করিলেন। কনষ্টাণ্টিনোপল, ব্যাভেরিয়া, অষ্ট্রীয়া, রুষিয়া প্রভৃতি স্থানেও এই সকল সভার শাখাসমিতি স্থাপিত হইল। কেবল গ্রীসবাসীর শৌর্য্য সাহসের বলে, সুযোগ পাইলেই যাহাতে আপনাদিগের প্রণষ্ট স্বাধীনতা-রত্নের পুনরুদ্ধার করিতে পারা যায়, তাহার উপায়-নির্দ্ধারণ ও তদুপযোগী ব্যবস্থার বিধান করাই সেই সকল গুপ্ত সভা সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ইতিহাসে সেই সকল গুপ্তসমাজ "হিটেরিষ্ট-দিগের সভা" নামে পরিচিত।

হিটেরিষ্টদিগের সমাজে গ্রীসদেশের অধিকাংশ বড় লোকেই যোগদান করিয়াছিলেন। যে সকল গ্রীক সেই সভায় সদস্য হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন, তাঁহাদিগের সকলকেই এই সমাজভুক্ত করিয়া লওয়া হইত। কার্য্য-নির্ব্বাহের সুবিধার জন্য যোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সভার সভাসদ্‌বর্গকে কতিপয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছিল। সাধারণ সভ্যদিগকে জানান হইত যে, গ্রীসদেশবাসীর সামাজিক অবস্থার উন্নতিসাধনই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য। তদপেক্ষা উন্নত শ্রেণীর সভ্যেরা "ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমী সদস্য" নামে পরিচিত হইতেন। রাষ্ট্রবিপ্লব সাধন করিয়া তুরস্কের অত্যাচার হইতে গ্রীসদেশকে মুক্তিদান করাই যে সভার উদ্দেশ্য, তাহা এই শ্রেণীর সদস্যের নিকট ব্যক্ত করা হইত। সাধারণ শ্রেণীর সভ্যগণের মধ্যে যাঁহারা বহুদিনের পরীক্ষায় যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেন, তাঁহাদিগকে এই ব্রহ্মচারিসমাজের অন্তর্ভুক্ত করা হইত। তৃতীয় শ্রেণীর সভ্যেরা এই রাষ্ট্রবিপ্লবসংক্রান্ত বিশেষ গোপনীয় তত্ত্বসম্বন্ধে অভিজ্ঞ থাকিতেন। চতুর্থশ্রেণার সভ্যগণ হিটেরিষ্টদলের নেতৃস্বরূপ ছিলেন। এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ১৬ জনের অধিক ছিল না। কিরূপ ব্যক্তি এই শেষোক্ত সমাজভুক্ত হইতেন, তাহা অদ্যাবধি জানিতে পারা যায় নাই। তবে অনেকের বিশ্বাস, রুষিয়ার জার, ব্যাভেরিয়ার রাজপুত্র প্রভৃতি এই শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছিলেন।

মস্কো নগরে এই গুপ্ত সমাজের পীঠস্থান বা প্রধান আড্ডা ছিল। তাহার উচ্চপদস্থ সদস্যগণের পত্র-ব্যবহারের জন্য এক প্রকার সাঙ্কেতিক চিহ্নের আবিষ্কার হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক শ্রেণার সভ্যগণের পৃথক্ পৃথক্ নিদর্শন চিহ্ন থাকিত। বলা বাহুল্য, এক শ্রেণীর সদস্যের নিদর্শন চিহ্ন কি, তাহা অপর শ্রেণীর সদস্যদিগকে জানিতে দেওয়া হইত না। এইরূপে হিটেরিষ্ট সমাজের চেষ্টায় কিছুদিনের

মধ্যেই গ্রীসদেশের প্রত্যেক অধিবাসীর মনে নূতন ভাবের সঞ্চার হইল। প্রত্যেকেরই মনে হইতে লাগিল যে, তাহাদিগের স্বাধীনতালাভের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। এদিকে এই সমাজের চেষ্টায় ইউরোপ খণ্ডের নানা প্রদেশস্থিত হিটেরিষ্ট-হিতৈষিগণ তাঁহাদিগকে গুপ্তভাবে অর্থ ও যুদ্ধোপকরণাদি দানে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

গ্রীসবাসীরা যখন এইরূপে স্বাতন্ত্র্যলাভের দুর্দ্দমনীয় বাসনার বশীভূত হইয়া সাধারণতন্ত্রমূলক শাসনপ্রণালীর পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছিলেন, এবং তুরস্কজাতির প্রতি তাঁহাদিগের চিরপ্রবৃদ্ধ বিদ্বেষানল জ্বলনোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়ে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে স্পেনদেশে একটা রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে। সেই রাষ্ট্রবিপ্লবের অগ্নিশিখা-সংস্পর্শে ক্রমশঃ নেপল্‌স, সিসিলী, পিডমণ্ট প্রভৃতি জনপদসমূহেও বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হয়। উহারই একটি স্ফুলিঙ্গ ১৮২১ খৃষ্টাব্দে গ্রীসদেশে পতিত হইয়া তথায় মহাবিপ্লবের সঞ্চার করে।

গ্রীসবাসীরা আপনাদিগের প্রণষ্ট স্বাধীনতালাভের জন্য পূর্ব্ব হইতেই ব্যগ্র হইয়া রহিয়াছিলেন। তুরস্কের শাসনের বিরুদ্ধে তাঁহাদিগের হৃদয়ে যে বিদ্বেষানল প্রধূমিত হইতেছিল, হিটেরিষ্ট সমাজ এই সময়ে প্রাণপণে তাহাতে বায়ুব্যজন করিতে লাগিলেন। এরূপ অবস্থায় দেশব্যাপী রাষ্ট্রবিপ্লবানল প্রজ্জ্বলিত না হওয়াই বিচিত্র।

১৮২১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের ৩০ শে তারিখে সুলতানের শাসনাধীন ওয়ালেচিয়া প্রদেশের তুরস্ক শাসনকর্ত্তা ইহলোক পরিত্যাগ করেন ও তাঁহার পদে অপর শাসনকর্ত্তা প্রেরিত হন। প্রাচীন সুবাদারের মৃত্যু ও নূতন সুবাদারের ওয়ালেচিয়ায় উপস্থিতি, এতদুভয় ঘটনার মধ্যবর্ত্তী কালই স্বাধীনতার ধ্বজা উড্ডীন করিবার পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া হিটেরিষ্টগণ কর্ত্তৃক বিবেচিত হইল। তুরস্ক রাজপুরুষ বা তদনুগত ব্যক্তিবর্গের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে সহসা একদিন বুচারেষ্ট নগরে প্রায় দেড় শত গ্রীক সমবেত হইলেন এবং থিওডোর ল্যাডিমারুকো নামক রুষরাজ্যের জনৈক শৌর্য্যশালী লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেলকে আপনাদের অধিনায়ক পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশোদ্ধারকার্য্যে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা প্রথমে জরনিট্‌জ নামক নগর অধিকারপূর্ব্বক তথা হইতে একটি বিজ্ঞাপনী বা ঘোষণাপত্র প্রচারিত করিলেন। সেই ঘোষণাপত্রে লিখিত ছিল—"তোমাদিগের স্বাতন্ত্র্যলাভের সময় অতীব নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। অতএব তোমরা সকলে উত্থিত হও এবং অত্যাচারী তুরস্কদিগের শাসনপাশ ছিন্ন কর!" তুরস্ক রাজপুরুষদিগের অত্যাচারমূলক করদানপদ্ধতির ফলে গ্রীসদেশের কৃষকেরা এরূপ অসন্তুষ্ট হইয়া রহিয়াছিল যে, পূর্ব্বোক্ত ঘোষণাপত্র প্রচারিত হওয়ামাত্র তাহারা দলে দলে থিওডোরের পতাকাতলে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। এইরূপে কয়েক দিবসের মধ্যেই থিওডোরের অধীনতায় দেড় শতের স্থানে দ্বাদশ সহস্র যুযুৎসু গ্রীসবাসীর সমাবেশ হইল।

ঠিক এই সময় অর্থাৎ ১৮২১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চমাসে মাল্‌ডেভিয়া প্রদেশের রাজধানী "জ্যাসী" নগরে ইপ্সিল্যাণ্টী নামক একজন প্রসিদ্ধ রুষীয় সেনানী দুইশত অশ্বারোহী সৈন্যসহ উপস্থিত হইলেন এবং তত্রত্য অধিবাসীদিগকে তুরস্কশাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তিনি রুষরাজের আদেশক্রমে গ্রীসবাসীর অধীনতাপাশ মোচন করিতে আসিয়াছেন, বলিয়া প্রকাশপূর্ব্বক নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন,—

"হে মাল্‌ডেভিয়াবাসিগণ! তোমাদিগের সকলকে জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, এ সময়ে গ্রীসদেশ স্বাধীনতার মশাল প্রজ্জ্বলিত করিয়া দাসত্বের শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। আপনাদিগের সমস্ত অধিকার ও স্বত্ব পুনর্লাভ করিবার জন্য গ্রীসবাসী এ সময়ে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। আমার কর্ত্তব্যবুদ্ধি আমাকে যাহা করিতে বলিতেছে, তাহা করিতে আমি অগ্রসর হইয়াছি। আমাদিগের কার্য্যকলাপের দ্বারা তোমাদিগের ধন মান বা প্রাণে কোনও প্রকার আঘাত লাগিবে না। যদি কোনও তুরস্কসেনা তোমাদিগকে আক্রমণ করিতে আইসে, তাহা হইলে তোমরা ভীত হইও না। কারণ তাহাদিগের দুর্ব্বৃত্ততার শাসন করিবার জন্য একটি মহাশক্তি (রুষিয়া) উদ্যত রহিয়াছে!" বলা বাহুল্য, এই ঘোষণাপত্র হিটেরিষ্টদিগের উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিল। রুষের পৃষ্ঠবলের আশ্বাস পাইয়া অনেক গ্রীসবাসীই সাহসে বুক বাঁধিল।

পূর্ব্বোক্ত ঘোষণাপত্র যখন "ওডেসা" নগরে পঠিত হইল, তখন তত্রত্য অধিবাসীদিগের আনন্দের পরিসীমা

রহিল না। তাহারা সেই স্বাধীনতার ধ্বজাধারীদিগের সহায়তার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতে লাগিল। একার্য্যে অর্থদান করিতে প্রায় কেহই পশ্চাৎপদ হইলেন না। অল্পদিনের মধ্যে বিদ্রোহীদিগের সহায়তার জন্য বিপুল অর্থ সংগৃহীত হইল। সাধারণের এতাদৃশী সহানুভূতি দর্শনে উৎসাহিত হইয়া ইপ্সিলাণ্টী মহোদয় "সেক্রেড ব্যাটালিয়ন" বা "পবিত্র সেনাদল" নামে একটি পল্টন গঠিত করিলেন। সেই সেনাদলের সহায়তায় তিনি পরে কতিপয় মহাযুদ্ধে জয় লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এইরূপে ১৮২১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে গ্রীসদেশে স্বাধীনতার জন্য যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ছয় বৎসরকাল স্থায়ী হইয়া স্বীয় প্রচণ্ড প্রতাপে তুরস্কপতিকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলে। গ্রীসবাসীর এই প্রশংসনীয় উদ্যমে ইউরোপীয় খ্রীষ্টানদিগের সহানুভূতি থাকায় পাশ্চাত্য নরপতিগণ গ্রীকজাতির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিলেন। খ্রীষ্টীয় নরপতিগণের অনুরোধে তুরস্কের সুলতানকেও পরিশেষে গ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকার করিতে হইল। গ্রীকজাতি তাঁহাদিগের শৌর্য্য সাহস ও ষড়্‌বর্ষব্যাপী পরিশ্রমের পুরস্কার-স্বরূপ স্বাধীনতারত্নের অধিকারী হইলেন।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। নিস্তার সোহাগ—কবিতাগাথা ও সামাজিক দৃশ্য প্রণেতা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

পুস্তক পাঠে বুঝিলাম, পরলোকগতা পত্নীর বিরহে ব্যাকুল হইয়া গ্রন্থকার এই শোকগাথা রচনা করিয়াছেন। এই প্রকার পুস্তকের সহিত সাধারণের সম্বন্ধ অতি অল্প। সুতরাং ইহার সমালোচনা অনাবশ্যক।

২। উত্তর স্বভাব ও ফুলের বাগান—প্রকাশক মোক্তার, কিন্তু গ্রন্থকারও মোক্তার কি না জানিতে পারিলাম না। তিনি যাহাই হউন, বীণাপাণির কাছে কিন্তু মোক্তারেরই ন্যায় বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি বিবিধ প্রকারের নজীর প্রদর্শন করিয়া বাল্মিকী, ব্যাস কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতির ন্যায় প্রতিভা প্রার্থনাপূর্ব্বক বলিতেছেন—

"বাগেদবী ভগবতি, দেও প্রতিভা এ দীনে
করিবে উজ্জ্বল বঙ্গ যে কবিত্ব আভা,
পূর্ণিমা নিশিতে যথা রবির প্রতিভা।"

তাঁহার "কবিত্ব আভায়" বঙ্গ উজ্জ্বল হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই; পুস্তকেও তাহার পরিচয় পাইলাম না।

৩। বন কুসুম—শ্রীপ্রসন্নকুমার মজুমদার বি, এল্ প্রণীত। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"বনকুসুমে উদ্যান কুসুমের শোভা সৌরভ কি মাধুর্য্য সম্ভবে না বলিয়া কি বনকুসুম প্রস্ফুটিত হয় না? তাই এ "বন কুসুম" প্রস্ফুটিত হইল। উদ্যান কুসুম-সৌরভ-মধুরসজ্ঞ পাঠক যদি বন কুসুমে বিন্দু মাত্রও আরণ্য মধু পান করিতে পারেন, তবেই বনকুসুম ধন্য হইবে।"

আমাদের পরম দুর্ভাগ্য, তাই 'বনকুসুম'কে "ধন্য" করিতে পারিলাম না।

৪। কাব্য চিন্তা—শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত।

পূর্ণ বাবু একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রাচীন লেখক। তাঁহার লিখিবার ক্ষমতা আছে, চিন্তা আছে, ভাব আছে, স্বদেশপ্রীতি আছে। তিনি কয়েকখানি সারবান্ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সাধারণ্যে যথেষ্ট পরিমাণে যশোলাভ করিয়াছেন। কাব্যচিন্তা তাহারই অন্যতম। কাব্য চিন্তা পাঠ করিয়া আমরা বহু পরিমাণে উপকৃত হইলেও একটি কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক বোধ করিতেছি।

পূর্ণ বাবু সমালোচক। সমালোচকের সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ হওয়াই আবশ্যক। একচোখো দৃষ্টি লইয়া সমালোচনা করিতে যাওয়া ভাল নহে। আমাদের বিশ্বাস, পূর্ণবাবুর লেখনী সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে চালিত হয় নাই। তিনি আমাদের দেশের যাবতীয় প্রাচ্যভাবের যৎপরোনাস্তি প্রশংসা করিয়াছেন। প্রশংসা করুন তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু প্রতীচ্য ভাবমাত্রই কি মন্দ? পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারা আমরা স্থলবিশেষে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকিতে পারি—কিন্তু কিছুই কি লাভ করি নাই? পূর্ণবাবুর ন্যায় প্রবীণ সমালোচকের নিকট আমরা নিরপেক্ষ সমালোচনাই প্রত্যাশা করি। এই প্রকার "একচোখো" সমালোচনা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত নিন্দার্হ। যাহা হউক, তাঁহার কাব্যচিন্তা যিনি পাঠ করিবেন, তিনিই যে উপকৃত হইবেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। বঙ্গসাহিত্যে কাব্যচিন্তার ন্যায় গ্রন্থ যত অধিক প্রচারিত হয়, ততই মঙ্গল।

৫, ৬। নির্ঝর ও কীর্ত্তি—শ্রীরঘুনাথ শুকুল প্রণীত। মূল্য ।৵০ আনা। দুইখানিই কবিতা পুস্তক। স্থানে স্থানে গ্রন্থকারের কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল।

৭। রমা—(নাটক) শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার এম্ এ প্রণীত। সেরিডান কর্ত্তৃক অনূদিত কোনও জর্ম্মান নাটক অবলম্বনে গ্রন্থ খানি লিখিত হইয়াছে। আমরা পুস্তকখানি বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি; পাঠ করিবার সময় অনুবাদ বলিয়া মনে হয় নাই। রমা, গ্রন্থকারের প্রথম উদ্যমের ফল হইলেও বিশেষ প্রশংসনীয় হইয়াছে।

২৬নং স্কটস্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত ও ২০৮।২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস দ্বারা প্রকাশিত।



শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম্ এ।

KUNTALINE PRESS